

3-32
3002

বিশিষ্টাংশ নমুনালোচন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

5

বিশিষ্টাংশ

CJ/K-H01974-5-~~P30625~~
P30625

P30625

মধুচ্ছন্দার আজ্যশাস্ত্র ।

“বয়ঃ হৃপর্ণা উপসেছুরিত্বং শ্রিয়মেধা ধ্বয়ো নাধয়ানাঃ ।

অপক্লান্তম্ উর্গুহি গুর্বি চক্ষুঃ মুমুখি জ্ঞানান্ নিধয়েব বন্ধান্ ॥”

—ঋগ্বেদ ; ১০।৭০।১১

গৌরিবীতি ঋষি বলিতেছেন,—যজ্ঞপ্রিয় ঋষিগণ প্রজ্ঞা যাজ্ঞা করিয়া সুন্দর-
পক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী বহিয়া ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রার্থনা
কবিলেন,—প্রভু ! অন্ধকায় দূর কর, চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর, আনন্দা যেন
পাশবদ্ধ আছি,—আমাদিগকে মোচন কর !

ইহা ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদী ঋষিগণের ঋষিহস্তাঙ্কিত চিত্র ।

সেই ঋগ্বেদের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে ‘অগ্নিনীধে পুরোহিতঃ’

ইত্যাদি বে প্রসিদ্ধ মন্ত্রট দেখা যায়, তাহারই যজ্ঞশাস্ত্রীন পারিভাষিক নাম
‘আজ্যশাস্ত্র ।’ আমি বহু দিন হইতে এই আজ্যশাস্ত্রটির ব্যাখ্যার মানসে,—
অর্থাৎ ব্যাখ্যার পূর্ণ রচনারূপ,—‘সাহিত্যে’ বেদঘটিত অনেক কথার আলো-
চনা করিয়া আসিতেছি । অস্ত্র সেই ব্যাখ্যাটি শেষ করিয়া পাঠকবৃন্দের নিকট
বিদায়গ্রহণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছি ।—অতএব পূর্বোক্ত কথার সংক্ষেপে

একবার পুনরাবৃত্তি আবশ্যক । মধুচ্ছন্দার মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের প্রারম্ভে থাকিলেও
তিনি ঋগ্বেদী ঋষিদের মধ্যে এক জন অর্কচাঁদীন ঋষিমান । তাঁহার রচনা ঋগ্বে-
দেব আদিম অংশের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । শকাব্দা প্রবর্তনের
ন্যূনাধিক ১৬০০ বৎসর পূর্বে কীকট বা প্রাচীন মগধদেশের পশ্চিম প্রান্তে
এক্ষণকার ভোজপুর নামক প্রদেশে সম্ভবতঃ তিনি বিদ্যমান ছিলেন । তাঁহার
পিতা বিশ্বামিত্র এবং বসিষ্ঠ সমসাময়িক ঋষি ; উভয়েই সুদাস রাজার রাজত্ব-
কালে বর্তমান ছিলেন । কুরুক্ষেত্রায়ন রসিষ্ঠের প্রপৌত্র, এবং তাঁহার সময়ে
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধসংঘটন হয় । নন্দের রাজ্যাভিষেকের ১০১৫ বৎসর পূর্বে কুরু-
ক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং শকাব্দা প্রবর্তনের (৪২৫ + ৭৮ =) ৫০৩ বৎসর
পূর্বে নন্দ মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন । এতদ্বারা মোটামুটিরূপে তাঁহার
সময় নির্ণীত হইতেছে । বিশ্বামিত্রের রচনায় প্রকাশ,—কীকটবাসীদের সহিত
তাঁহার জ্ঞাতিগণের বিরোধ ছিল ; তাহাতেই তাঁহার বাসস্থান কীকটের সন্নি-
কটে ছিল জানা যায় । রামায়ণের বিবরণও তদ্রূপ ।

তখন আর্য্যাবর্ত সভ্যতার বিস্তার সমুন্নত হইয়াছিল । নানা স্থানে রীতিমত

বিভাগের স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদ্ব্যয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে রাখা অধ্যাপনা করাই-
 তেন । অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বেদবাক্য সকল এবং শিক্ষা করণ, ব্যাকরণ, নিকট,
 ছন্দঃ এবং জ্যোতিষশাস্ত্র, প্রধানতঃ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয় ছিল।
 বেদের ভাষা তখন লৌকিক ভাষা হইতে অনেক বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়া-
 ছিল । মধুচ্ছন্দার পিতা বিখ্যাত একজন প্রসিদ্ধ ঋকৃরচনাকারী অধ্যাপক
 ছিলেন ; তিনি আবার বৃদ্ধজনদমিনী নামক এক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী অধ্যাপকের
 ছাত্র ছিলেন । মধুচ্ছন্দার বংশই এক বিখ্যাত ঋষি-বংশ । তাঁহার পিতা,
 পিতামহ, প্রপিতামহ এক এক জন ঋষি । তাঁহার ভাতারাও কেহ কেহ
 ঋষি, তাঁহার পুত্র দ্বৈতা একজন ঋষি । তখন বিদ্বৎসমাজ বিলক্ষণ পরি-
 পুষ্ট । তৎকালে গোহত্যা অর্থাৎ বধে একবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং
 ‘অয়া’ ও ‘জয়া’ অর্থাৎ অহস্তব্য, অহস্তন্যা, যব ও গাভীর প্রতিশব্দ স্বরূপ
 হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । যে স্ত্রীদাস রাজার সময়ে যা অব্যবহিত পরে মধুচ্ছন্দা
 আবিভূত হইয়াছিলেন, তিনি কৃষিকার্যের অতিশয় পক্ষপাতী এবং একজন
 দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। বোধ হয়, কৃষিকার্যের জন্ত এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময়
 দূর দূরে আবশ্যকীয় ব্যবসস্তাবাদি-বহনো জন্ত গো-পশুর বিশেষ আবশ্যিকতা
 দেখিয়াই, গোহত্যা রাজ্যজ্ঞান নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ।

ঐ সময়ে সমুদ্রসম্পন্ন ব্যক্তির ‘সোমধাগে’ নামক একপ্রকার উপাঙ্গনা-
 ক্রিয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান ছিলেন । সোমধাগের দ্বারা আশ্রয় নথর দেহের পক্ষ-
 বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্বলাভ করে, এবং তাহার অবিনশ্বর দ্বিতীয় স্নায়
 হয়, এইরূপ এক বিশ্বাস তৎকালে সমুদ্রযাত্রায় অতীব ব্যস্তগল হইয়াছিল ।
 লোকে আত্মাকে অনিন্দীশী বলিয়া হাময়ম করিয়াছিল, এবং মৃত্যুর পরে
 পরলোক আছে, তাহা বিশ্বাস করিত ।

এই সকল সোমধাগে ব্যবহারের উদ্ভূত ঋগ্বেদের অধিকাংশ ঋকৃসূক্ত
 বিরচিত হইয়াছিল । ঋগ্বেদকে কুবকের সঙ্গীত না বলিয়া, যদি সোমগীতী
 যাজ্ঞিকগণের সঙ্গীত বলি, তবে অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত হয় ।

সোমধাগের প্রধান উপাসনা দিবনে, একবার প্রাতঃকালে একবার মধ্যাহ্নে
 একবার সন্ধ্যাবে সোনাভিষব হইত, ইহার নাম প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিসবন ও
 সায়ন্তন বা তৃতীয় সবন ।

প্রাতঃসবনে ‘পবমান’ স্তোত্র, ‘নাসক’ বেদসঙ্গীত, এবং ‘আজ্যপত্র’ নামক
 বেদশংসন হইত । সোমোত্তমবক্রিয়াকালে উক্ত সঙ্গীত এবং ‘অগ্নিময়নকো

উক্ত শংসনকার্য সম্পন্ন হইত। ‘অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ’ এই মন্ত্র, অগ্নিমহনক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্ত বিরচিত। পাঠককে কল্পনা করিতে হইলে যে, তিনি অগ্নিমহনক্রিয়া দেখিতেছেন, এবং একজন হোতা ঋষিক ‘অগ্নিমীলে’ পড়িতেছেন; কাষ্ঠের মধ্যে অদৃষ্টভাবে নিহিত অগ্নি মহনের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন, স্মৃতসিক্ত হইয়া দেবীপ্যমান হইতেছেন; সেই সময়ে বেদমন্ত্রের সংঘর্ষে মানব-হৃদয় হইতে দিব্য জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইতেছে; অগ্নির জ্যোতির মধ্যে যজ্ঞ-মানের এক অপূর্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবশক্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এবং নানা ছন্দে তাঁহার নিকট মনের আকাজক্ষা সকল প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই আজ্যশস্ত্র।

‘সোমের’ গুঢ় অর্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান এবং ভগবৎপ্রেম। তাহা মুখ ও ওষ্ঠের পের নহে, হৃদয়ের পের সামগ্রী। তাহা পান করিলে আত্মাতে নূতন তেজের সঞ্চার হয়, আত্মার এক অনন্তকালস্থায়ী নবজীবনের উপলব্ধি হয়, এবং তাহা অমূল্যব করিয়া গম্য্য অনিন্দে নৃত্য করে, উন্মত্তপ্রায় হয়। ইহাই সোমের সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাদৃশ্য। সোমপায়ীরা আপনাদিগকে ‘দ্বিজনা’ বা ‘দ্বিজ’ বলিয়া পরিচয় দিতে ভাল বাসেন, এবং তাঁহারা কণ্ঠের গুঞ্জ প্রগাথ ঋষির স্তায় সোমপান করিয়া অনিন্দে বিহ্বল হইয়া গান করিতেন,—

“সুপান সোমম্ অমৃতম্ অমৃতম্ অগম্য জ্যোতিব্ অবিদ্যম্ দেবান্।—ঋষেদ; ৮।৪৮।৩
অর্থাৎ, “আমরা সোমপান করিয়া দিব্য জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলাম;
আমাদের আর মৃত্যু নাই।”

এখন প্রশ্ন এই,—এই ব্রহ্মজ্ঞানীদের ব্রহ্ম কীদৃশ?—আমি এ পর্যন্ত এই কঠিন প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করি নাই। ইহাতে নানা মূনির নানা মত। আমার মতে পাঠকগণ সায় দিবেন কি না, জানি না;—কিন্তু এক্ষণে আমার যাহা মত, তাহা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক হইয়াছে।

ঋগ্বেদে ব্রহ্মসম্বন্ধে অনেক বাদান্তবাদ দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি এক না অনেক,—এ বিষয়ে সকল ঋষির একমততা দৃষ্ট হয় না। কেহ তাঁহাকে এক বলেন, কেহ তাঁহাকে বহু বলেন। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে ষ্ণগপৎ এক ও বহু বলেন। কেহ বা তাঁহাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত অভিন্ন, কেহ বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন, বলিয়া গিয়াছেন।

যিনি ঋগ্বেদে ব্রহ্মসম্বন্ধে একই প্রকার সুসঙ্গত মতের অব্বেষণ করেন, তাঁহাকে বিফলমনোবধ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। যদি বিতণ্ডা বা

জিগীষা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে যে পক্ষই অবলম্বন কর'না কেন, ঋগ্বেদ হইতে আপন মতের পোষক প্রমাণ পাইবে।

শ্রীধর রমেশচন্দ্র দত্ত ইয়ুরোপীয় মতের অনুসরণ করিয়া বিবেচনা করেন, ঋগ্বেদের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম স্তরকে বলা nature-worship, সুর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন জড়োপাসনা,—এবং ক্রমশঃ এই নিরবচ্ছিন্ন জড়োপাসনা হইতে বাইবেল বা কোরাণের ঈশ্বরের জ্ঞান এক অদ্বিতীয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, এবং সেই সঙ্গে মহাশক্তির আত্মারও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের জ্ঞান স্ফুর্তি পাইয়াছে। তদীক্ষ

ভাষায় ঋগ্বিরী ক্রমশঃ 'from nature up to nature's God'এ পৌছিয়া ছিলেন। দত্ত মহাশয়ের প্রথম স্তর কোনটি এবং শেষ স্তর কোনটি, তাহা না জানিলে, এ মতের বাধার্তী সঙ্গোচনা অশক্য। মধুচ্ছন্দাকে তিনি প্রথম স্তরের ঋষি বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু আশ্রয় দেবিত্ব—মধুচ্ছন্দা বৈদিক যুগের শেষ ভাগের লোক। আর ইহাও নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে যে, কোরাণ ও বাইবেলের সৃষ্টিকর্তা এবং দেবদের সৃষ্টিকর্তা, এই উভয়ে আকাশ-পাতাল ভেদ।

জড়োপাসনা বা nature-worship শব্দে বক্তা কি বলিতে ইচ্ছা করেন, এবং প্রোত কি বুঝেন, তাহা অনেক সময়ে ঠিক হয় না। যদি জড়োপাসনা শব্দে জড়কে জড় জানিয়া পূজা করা হয়, তবে নিঃসংশয়ে বলা বাইতে পারে, ঋগ্বেদের কোনও স্তরেই জড়োপাসনা নাই।

আর যদি "অবিদেবতার" পূজাকে জড়োপাসনা বলা, তবে ঋগ্বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত, জড়োপাসনা।

ঋগ্বেদের সত্ত্বভাগের ছই এক স্থানে, এবং উপনিষদগে বাছল্যে; যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তিনি এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেমন আমাদের আত্মা আমাদের দেহের অধিষ্ঠাতা, তেমনি পরমাত্মা এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-দেহের অধিষ্ঠাতা। অধিকতর পরমাত্মাই আছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতপক্ষে নাই। উহা মায়ামরীচিকামাত্র।

আব কাহারো অগ্নি ইজ বায়ু ইত্যাদি নামবারী সাম্রাণ দেবতা, তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ডের এক এক অংশের বা শক্তিবিশেষের অধিষ্ঠাতা। ঋগ্বেদের দেবতার নিরাকার; এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঐশী শক্তির অধিষ্ঠাতা মাত্র। আর যিনি ঋগ্বেদের "পরমব্যোম" বা পরমাত্মা—তিনি পূর্ণাবয়ব ঐশী শক্তির অধিষ্ঠাতা মাত্র।

এখন ঋগ্বেদের ঈশ্বর, অর্থাৎ প্রধানতঃ ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগের ঈশ্বর, এক না বহু?—অত্যাশ্চর্য্য ঋগ্বেদের কথা ছাড়িয়া আস্তানের মধুচ্ছন্দার ঈশ্বর এক না বহু? ঋগ্বেদগীত মত দুর্য্যোধন যদি একককার দেবীয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্যদের মত কি জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে দেখি, স্বর্গীয় দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন, ঋগ্বেদের দেবতা বা ঈশ্বর এক বহু কদাচ বহু নহেন; তিনি ঋগ্বেদের ঈশ্বরকে পাশ্চাত্য সমাজের উপাশ্রয় ঈশ্বরে পরিণত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ত্রিভুক্ত মহেশ্চন্দ্র ভ্রায়রত্ন মহাশয় বলেন, ঋগ্বেদের দেবতা কদাচ এক নহেন,—বহু। ভ্রায়রত্ন মহাশয় পাশ্চাত্য-বিদ্যাসাম্রাজ্যী একেশ্বর ও ঋগ্বেদী একেশ্বরের যে ভেদ, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। দয়ানন্দের ‘অগ্নিমীলে’ ব্যাখ্যাকে তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছেন।

আধুনিক পণ্ডিত ছাড়িয়া যদি প্রাচীন পণ্ডিতদের মত অন্বেষণ করি, তবে সাংখ্যদর্শনের প্রধান আচার্য্য মহামতি কপিলকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তিনি অতি প্রাচীন পণ্ডিত, এবং তাঁহার যুক্তি সকল অলস্ত আভ্যাস। বিশেষ সাংখ্যবিজ্ঞানই এ দেশের আদিম বিজ্ঞান। বেদ যেমন প্রাচীন, এই বিজ্ঞানও তদ্রূপ প্রাচীন বলিয়া গণ্য। কপিল এই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন মাত্র। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, হৃত্যয়ুগে যেমন বেদ প্রথম প্রকাশিত হয়, তেমনি সাংখ্যবিজ্ঞানও প্রথম প্রকাশিত হয়। (৩য় অংশ; ২য় অধ্যায়)। দেখা যায় যে, মহর্ষি কপিলের সময়েও বেদের ব্রহ্ম বিক্রপ, তাহা লইয়া বিতর্ক ও বিতণ্ডা প্রচলিত ছিল। ঐ সময়ে বেদের দেব দেবী সকল মিথ্যা, এক অনাদি সৃষ্টিকর্তাই সত্য, অনেকে এই কথা বলিতেন। মহর্ষি কপিল বলেন যে, তোমরা যে বেদের দেব দেবী ছাড়িয়া দিয়া এক অনাদি, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, পরমকারণিক, আনন্দময় অভিনব সৃষ্টিকর্তার কথা বল, তিনি ত যুক্তি ও বিচারের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া যান। যুক্তি-অনুসারে এরূপ ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রথমতঃ, তাদৃশ ঈশ্বরের সম্ভার প্রমাণ নাই; কেন না, ঈশ্বরকে কেহই প্রত্যক্ষ করে নাই, এবং সম্ভাব্যতার দৃষ্টে অনুমানেরও অবসর নাই।

(কপিলসূত্র ৫।১০-১১) অধিকন্তু তোমাদের নিত্য ঈশ্বর, মুক্ত না বদ্ধ? যদি মুক্ত হয়েন, তবে তিনি সৃষ্টিব্যাপারে আবৃত্ত হইতে পারেন না; যদি বদ্ধ হয়েন, তবে অক্ষম হইবেন; আর নিত্য এবং সর্ব্বজ্ঞ, অথচ পরমকারণিক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা এরূপ ক্রেশময় সংসার সৃষ্ট হওয়া একবারেই অসম্ভব। যদি নিত্য ঈশ্বর অসিদ্ধ হয়, তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতির কি গতি হইবে? তদন্তরে কপিল এক বিখ্যাত সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, যথা—

“মুক্তান্ননঃ প্রশংসা—উপাসনা সিদ্ধন্ত বা ।”—১১৩

অর্থাৎ, বেদের দ্বারা দেবতা, তাঁহারা হয় মুক্ত-আত্মা, না হয় সিদ্ধপুরুষ।
যাঁহারা উপাসনা দ্বারা লঙ্ঘ্যতিশয় হইয়াছেন, এইরূপ পুরুষ বা আত্মা সকলকে
‘সিদ্ধপুরুষ’ বলা যায়। কপিল বলেন যে, আমি যদিও তোমাদের কর্তৃত্ব নিত্য
ও অনাদি জৈবর স্বীকার করি না, কিন্তু আমি ‘জ্ঞাত জৈবর’ স্বীকার করি।
তাঁহাদের আর এক বিখ্যাত হ্রদ্য এই—

“ঈদৃশেষবসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ।”—১১৭

অর্থাৎ, “প্রকৃতিলীনস্ত জ্ঞাতেশ্বরস্ত গিদ্ধিঃ সর্ব-স্বগতৈব, নিত্যেশ্বরত্বৈব বিবাদা-
ল্পদবাদিতার্থঃ ।” কপিল ইহা কেবল আশীনারই মত বলিতেছেন না, ইহা
সর্ববাদিসম্মত মত বলিয়া ধ্যাপন করিতেছেন।—অর্থাৎ, ইহাই ঋষিদের
সর্ববাদিসম্মত মত। আত্মা বা পুরুষ সকল সমুদ্র, কীট, পশু, পক্ষী-দেহে
মখন সংযত বা বদ্ধ থাকে, তখন তাঁহাদিগকে ‘প্রকৃতিলীন’ বলা যায়। এই
প্রকৃতিলীন আত্মা ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি লাভ করিতে করিতে উপাসনা দ্বারা লঙ্ঘ-
তিশয় হইয়া ‘জৈবর’ অর্থাৎ প্রকৃতির উপর অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এই-
রূপ লঙ্ঘ্যতিশয় ‘সহাপুরুষ’ বা জৈবর সকলকে সাংখ্যপরিভাষায় ‘জ্ঞাত জৈবর’
বলা যায়।

ঋষিদের দেবতার সকলেই ‘জ্ঞাত জৈবর’; কেন না, ঋষিদের ভূরি ভূরি
স্থানে, বিশেষতঃ ঋষিদের বিনি সমুদ্রলতম ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, সেই বাম-
দেব ঋষির রচনার অনেক স্থানেও তাঁহাদের জন্মের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

তখন সোমপারী ঋষিরা বলিতেন,—

“অপাং সোমস্ অমৃত অত্ম অগ্নম্ জ্যোতিব্ সবিদ্যাম দেবাম্ ।”

তখনও তাঁহাদের মুখে ‘দেবান্’ অর্থাৎ অনেক দেবতার কথাই শুনি, এক
জৈবরের কথা শুনি না। ‘অমৃত অত্ম’ এই শব্দেরও তাৎপর্য আর কিছুই নহে,
শুদ্ধ এই যে, আমি বা দেবতা হইরাছি; কেন না, ঋষিদের ‘অমৃত’ ও ‘দেবতা’
প্রতিশব্দমাত্র। ‘জ্যোতিতে আসিয়াছি—দেবতাদিগকে জানিয়াছি, দেবতা
হইরাছি’—সোমপারীদের এই আনন্দগীতা।

কথাটি এত আবশ্যক যে, তদ্বিষয়ে পাঠকবৃন্দের কোনও প্রকার সন্দেহ
না থাকে, এরূপে প্রতিপন্ন করা উচিত। ধর্মপথে থাকিলে আমরা মৃত্যুর পর
দেবতা হইব, ইহা বেদের একটি মূলতত্ত্বরূপ। এমন কি, বাগ্ বজ্র ব্যরিয়াই
দেবতার। যে দেবত্ব পাইয়াছেন,—এ কথার প্রতিধ্বনিতে আমাদের সাহিত্য-

মন্দির পবিপূর্ণ। ইন্দ্র যিনি, তিনিও শত অশ্বমেধ করিয়া ইন্দ্রকে পাইরাছেন। বেদের তুরি তুরি স্থানে দেবতাদের যজ্ঞ করার কথা শুনা যায়।

বামদেবের পুত্র বৃহদ্রথ ঋষি একটি বিখ্যাত হুক্ত (১০।৫৬) রচনা করিয়া গিয়াছেন; সেটি এ স্থলে বিশিষ্ট উদাহরণস্বরূপ ব্যবহাব করা যাইতে পারে। এই হুক্তে পাঁচ ঋক আছে। তন্মধ্যে আমার বিবেচনায় প্রথম তিনটিই মূল অবশিষ্ট চারিটি পরে অপূর্ণ হস্তের বোজনা। এই শেষের চারিটি ঋক প্রথম তিনটির তাৎপর্যব্যাখ্যা স্বরূপ। বৃহদ্রথের পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি এই হুক্তটির রচনা করেন বলিয়া কথিত হয়। ঋষির মৃতপুত্র হিম্মনে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে দেখিয়া উদ্বেলিতহৃদয়ে তিনি কাঁদিয়া বলিতেছেন :—

“এই তোমার এক অংশ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইল—হে বৎস। আর এই তোমার এক অংশ বায়ুতে নিশিলা; জ্যোতিঃস্বরূপ তৃতীয় অংশের সহিত দেবলোকে প্রবিষ্ট হও। উৎকৃষ্টজন্ম স্থানে দিব্য দেহে প্রবেশকালে মনোহর মুক্তি ধারণ পূর্বক দেবতাদের প্রিয় হও। হে মানসীল! যিনি তোমার তমকে আপনার তমুতে মিশাইয়া লইতেছেন, সেই পৃথিবী আমাদিগকে যেমন রক্ষণীয় বস্ত্র দেয়, তেমনি তোমাকে রূপ দান করুন। অধঃপতিত না হইবা হারিভাবে অবস্থানে বস্ত্র স্বর্ণে দেবতাসমাজে এবং স্বর্গীয় জ্যোতিঃপ্রিয় দেহে যুগপৎ প্রবিষ্ট হও। তুমি বজ্র অন্নদান করিয়াছ, অতএব তুমি দেবতাদের অতিশয় কান্ত। যেমন হৃন্দরূপে প্রেবিত হইয়া স্তব করিয়াছিলে, এক্ষণে তেমনি হৃন্দরূপে প্রেবিত হইয়া স্বর্ণে গমন কর। যেমন হৃন্দবস্ত্রপে প্রেরিত হইয়া সত্য এবং মুখ্য ধর্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, এক্ষণে তেমনি হৃন্দরূপে প্রেরিত হইবা অতুত বেগবান (শুদ্ধ চিন্ময় দেহ) লাভ কর।”

ইহাই মৃতপুত্রের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষির উক্তি। হস্তের যে অবশিষ্ট ভাগ ইহারই তাৎপর্যব্যাখ্যা স্বরূপ, তাহা এই :—

“আমাদের পিতৃগণ এই দেবতাদের মহিমা লাভ করিয়া ঈশ্বর হইয়াছেন। ঐহারা দেবতা, ঐহারা দেবতাদের উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং যে সকল তেজোময় পরার্থদীপ্ত হইতেছে দেখিতেছ, উহাদের সহিত সংগত হইয়াছিলেন, এবং পুনর্বার তাহাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন। অসংখ্য পূর্বতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় সামর্থ্যের দ্বারা ঐহারা বিশ্বসংসার অরণ করিয়াছেন। বহুবিধ তন্ত্রে তাহারা বিশ্বসংসারকে নিয়মিত করিয়াছেন। নানাক্রমে প্রজা বুদ্ধি করিয়াছেন। প্রেবিতগণ স্বর্গধানে ক্ষেত্র অন্নরূপে দুই একবে স্থাপিত করিয়াছেন। জনকেরা তৃতীয় কর্তৃক দ্বারা বীর অগত্য উৎপাদন করিয়া পৈতৃক তেজকে অবরোহে স্থাপিত করিয়াছেন, এবং প্রজারূপ তন্ত্রকে বিত্তীয় করিয়াছেন। নৌক দ্বারা যেমন নদী পার করে, ঐহারা দ্বারা তেমনি পৃথিবীর দুর্বলতম দিক্‌সমূহকে পার করিয়া বৃহদ্রথ কবি মহিমা প্রকাশ করিয়া বীর অগত্যকে অবরোহে স্থাপিত করিলেন, পরোহে স্থাপিত করিলেন।”

এই তাৎপর্যব্যাখ্যা ঋগ্বেদের সর্ববাদিসম্মত দেবতাতত্ত্ব একদেবী অষ্টৈতবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়। মনুষ্যগণ বে দেবত লাভ

করিবে, ইহা ত স্পষ্টই বলা হইয়াছে। তদতিরিক্ত আরও বলা হইয়াছে যে, “প্রেরিত” অর্থাৎ ঋষিগণের মতে ‘স্বর্গধামে জ্যেষ্ঠ অমর’ অর্থাৎ পরমাত্মা জড় ও আত্মা এই দ্বিধা কল্পিত হইয়াছেন। জড়ের নাম ‘অবয়ব’ বা ‘নিকৃষ্ট’। আত্মার নাম ‘পর’ বা ‘উৎকৃষ্ট’। বৃহদ্রথ আপনার পূজকে এইরূপে দ্বিধা বিতর্ক করিয়া দিয়া মুক্ত কবিতা দিলেন।

পাঠকবৃন্দ এই অদ্বৈতবাদ একদেশী বলিয়া পরিভাষা করুন। ব্রাহ্ম অবপিষ্ট থাকে, তাহাতে ইহাই সুব্যক্ত যে, মানবাত্মা সকল দানাদি উৎকৃষ্ট সত্য ও মুখ্য ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে এই নখর মুগ্ধ দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে দেবতাসমাজের মধ্যে অপূর্ণ জ্যোতির্ময় দেহধারণ করিয়া প্রবিষ্ট হয়। সকল দেবতাই এই রূপে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।

ইহাতে বিবেচনা হয়, ঋষিদের মতে মনুজের জ্ঞান প্রকৃতিজনীত আত্মা হইতেই দেবতাদের জ্ঞান মুক্ত-আত্মা সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা নিকৃষ্ট-আত্মা; দেবতারা উৎকৃষ্ট-আত্মা। আমরা অপবিত্র-আত্মা, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া পবিত্র-আত্মা হইয়াছেন। সাংখ্যপরিভাষানুসারে আমাদিগের যেমন ‘পুরুষ’, দেবতারাও তেমনি ‘পুরুষ’, তবে তাঁহারা ‘মহাপুরুষ’। বেদের যিনি পরম দেবতা বিষ্ণু, বিষ্ণুপুরাণের প্রারম্ভে তিনিও ‘মহাপুরুষ’ পূর্বজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি মহাপুরুষগণের মধ্যে গুরুপ্রথমে দোষজন্ম লাভ করিয়াছেন মাত্র। আমরা সকলেই সিদ্ধিলাভ করিলে দেবতা হইতে পারি, এবং আমাদের পূর্বে আমাদের জ্ঞান অসংখ্য আত্মা সিদ্ধিলাভ করিয়া দেবতা হইয়াছেন। এই দেবতাদের আত্মা দ্বারা জল স্থল ভাঙ্গা পূর্ণ। ইহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবিষ্টা-স্বরূপ আমাদের হিতার্থে সর্বদা উদ্যত আছেন। ইহাই ঋষিদের দেবতাতত্ত্ব।

ঋগ্বেদী ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী বামদেব ঋষি, যিনি মনুজবান্ধব, সমসাময়িক,—তিনি বলিতেছেন,—

“গর্ভেহু সন্ নমু এভাম্ অবেনম্ অহং দেবানাং জনিমানি বিধা।”

“আমি মনুজদেহরূপ গর্ভবাসকালেই দেবতাদের জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি।”

মনুজদেহান্তেই উপাসনাসিদ্ধ আত্মার দেবজন্মলাভের কথা। সুতরাং ঐশ্বরিক ব্যক্তির মনুজদেহে বাস; দেবজন্মলাভের পূর্বে গর্ভবাসের স্বরূপ। ঋষি আনন্দ ও উল্লাসের সহিত বলিতেছেন, অহো! আমি গর্ভবাসকালেই আমার ভাবী

দেবজন্মের কথা অবগত হইয়াছি। পরেই বলিতেছেন,—

“শতং মা পূব আরসীর অরক্ষন” অথন্তে নো ববসা নিরসীরং।”

অর্থাৎ, “ইতিপূর্বে যথোনির্মিত শতসংখ্যক পুরীতে আরসী ছিলাম। এখন শ্রেন পক্ষীর শায় বেগে নির্গত হইলাম।” এ স্থলে ঋষি ব্রহ্মজ্ঞানজনিত মুক্তির অল্পভব করিতেছেন। আমি কীট ছিলাম, পতঙ্গ ছিলাম, পক্ষী ছিলাম, পশু ছিলাম, বরষর মনুষ্য ছিলাম। তত্তদশায় আমার দেহ এক একটি অয়ো-নির্মিত পুরীর শায় ছিল,—তাহা ভেদ করিয়া, তাহার বাহিরে ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিঃ দেখিতে পাই নাই, এখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রেন পক্ষীর শায় বেগে বিজ্ঞানের আকাশে উড্ডীন হইলাম। যদি বল যে, আত্মা নামে কোনও স্বাধীন পদার্থ নাই; উহা কেবল পাক্তোক্তিক দেহের কাণ্ডমাত্র, তবে ত আর কোমণ্ড কথাই নাই; তবে দেবতাও নাই, ঈশ্বরও নাই। আর যদি বল, তোমার আত্মা ভিন্ন সংসারে নিত্যবস্ত আর কিছুই নাই, আর তাহাই ঈশ্বর, তবে সেও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতামাত্র। কিন্তু যদি আত্মা নামক অসংখ্য নিত্য স্বাধীন পদার্থ থাকে, তাকে বাহ্যকে মৃত্যু বলা যায়, তাহা কদাচ আত্মার বিনাশ নহে। মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য থাকিবে। মনুষ্য-অবস্থাপন্ন আত্মার যদি অধোগতি হয়, তবে সে মৃত্যুর পর হয় ত পশু হইবে—আর যদি উর্দ্ধগতি হয়, তবে সে দেবতা হইবে।

ইহাই ত ঋগ্বেদের দেবতা-তত্ত্ব বলিয়া আমার বিবেচনা হয়। দেবতার কপিলের পরিভাষামতে “মুক্তায়া” বা “সিদ্ধগুরুষ” স্মাত্র। তাহার সংখ্যায় অনেক। এই সকল দেবতার আমাদিগকে বৃত্তিদান করেন, জ্যোতিঃ দান করেন, অন্নদান করেন, নানা মতে দাতারিক ক্রেশ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, এবং সম্পদে আমাদের জীবন মধুগন্ধ করেন, এবং সর্বোপরি আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দিয়া আমাদিগকে অলক্ষিতভাবে মুক্তির পথ অর্থাৎ দেবজন্মদাতের পথ দেখাইয়া দেন। রহিগণের পুত্র গৌতম ঋষি একস্থানে বলিতেছেন,—

“হং সোম প্রচিক্রিতো মনীষা হং রজিষ্ঠম্ অহুর্নোবি পন্ডা।”

তব প্রীতী পিতবো ন ইংদো দেবেষু রয়ম্ অভজন্ত ধীরাঃ।”

“হে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিষ্ঠাতা সোমদেব! অনেক চিন্তায় পর, তুমি কে,—তাহা হুঁরিয়াছি। তুমি ঋজুতম পথের পথদর্শক। তুমি আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পণ দেখাইয়া দেবতাদের মধ্যস্থতাইয়া গিয়া রমনীয় বস্তুর অধিকারী করিয়াছ।”

* ব্রহ্মজ্ঞান = বেদনিহিত দেবতাবিজ্ঞান। ব্রহ্ম = বেদ। বেদবিজ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান।

১৯১১ । যাহা 'ধর্ম', গোতমের ভাবায় তাহাই 'রজিষ্ঠঃ পন্থা', অর্থাৎ মুক্তি-
লাভের বা সিদ্ধিলাভের ক্ষুদ্রতম পথ । দেবতার। আমাদের সেই পথের সাথী ।

ঋষিরা বলেন যে, দেবতার। বাস্তবিক অসংখ্য, ইহাও প্রজ্ঞাপতি মন্ত্ৰ,
যিনি আমাদের উপরনাশ্রয়ালী ব্যবস্থাপক, তিনি যজ্ঞীয় দেবতা মূলে একা-
দশ* এইরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন । ইহার এক নিগূঢ় ব্যাখ্যা আছে ।
দেবতার। একাদশ, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর দেবতার। একাদশশত্রু ;
কেন না, আমাদের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বে ইন্দ্রিয়, তাহার সংখ্যা একাদশ । পঞ্চ
জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এবং মন নানক উভয়েন্দ্রিয়, — এই একাদশ । এই
একাদশ পথে, একাদশ আকারে, দেবশক্তি আমাদের আত্মার উপর কার্য
করে । অতএব ইন্দ্রিয়গোচর দেবতার। সংখ্যা একাদশ । এই একাদশ দেবতা
আবার স্বর্গেও আছেন, অন্তরীক্ষেও আছেন, এবং পৃথিবীতেও আছেন ;
কল্পনা করিয়া ঋগ্বেদী দেবতার। সংখ্যা ৩৩ হইয়াছে । দীর্ঘতম ঋষি এই ৩৩
জন যজ্ঞীয় দেবতাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন ;—

“যে দেবাসো দিবি একাদশঃ পৃথিব্যামধি একাদশঃ ।

অপুষ্কিতে মহিনৈকাদশঃ তে দেবাসো যজমিগং ভুবনম্ ।”—ঋগ্বেদ : ১১৩৩১১১

এখানে ঋগ্বেদী দেবতাতত্ত্বের স্বর্গের একাদশ, পৃথিবীর একাদশ, এবং অন্ত-
রীক্ষের একাদশ, এই তেত্রিশ দেবতার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যাইতেছে ।

মন্ত্রের ৩৩ দেবতা, ইহার। যজ্ঞীয় অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞে আহুতি পাইয়া
থাকেন, তাহার। ঋগ্বেদে অতিশয় প্রসিদ্ধ । ভূরি ভূরি স্থানে তাহাদের উল্লেখ
আছে । কিন্তু তা বলিয়া যে বাস্তবিক দেবতার। সংখ্যা ৩৩, তাহার বেশীও নহ,
কমও নহ, ইহা ঋষিদের অভিপ্রায় নহে । প্রকৃতপক্ষে দেবতা অসংখ্য, কেবল
মন্ত্রের বুদ্ধিগম্য দেবশক্তি ৩৩ প্রকারমাত্র । ‘বিষুদেব নিবিদ্’ নামক এক
অতিপ্রাচীন বেদমন্ত্রে এই কথা স্পষ্ট করা হইয়াছে ।

সাহিত্যের পাঠ্যবর্গকে আমি ইতিপূর্বে প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা দেখাই-
য়াছি যে, নিবিদমন্ত্র সকল ঋকমন্ত্র অপেক্ষা, অন্ততঃ অধিকাংশ বর্তমান ঋকমন্ত্র
অপেক্ষা, অনেক প্রাচীন ; কেন না, নিবিদমন্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ বহুতর ঋকমন্ত্রে
আছে ; এমন কি, অনেক ঋকমন্ত্রে নিবিদমন্ত্রের ভাব ও ভাব। নিবদ্ধ হইয়াছে,

* যে শাস্ত্রে তত্ত্বের সংখ্যা নির্ণীত হয়, তাহার নাম সাংখ্যশাস্ত্র । সাংখ্যশাস্ত্র দুই ভাগে
ভক্ত ; ‘সাংখ্যদর্শন’ এবং ‘সাংখ্যকৃতি’ । সাংখ্যদর্শনে প্রত্যক্ষ ও অমুমানমূলক তত্ত্বের
খ্যা নির্ণীত হয়, সাংখ্যকৃতিতে দেবতাতত্ত্বের সংখ্যাকারী প্রজ্ঞাপতি মন্ত্রকেও তজ্জন্ম
ব্যবস্থার একজন প্রবক্তা বলিতে হইবে ।

এবং স্পষ্টাক্ষরে নিবিদ সকলকে প্রাচীন রলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে বিশ্বদেবনিবিদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।—

বিশ্বদেব নিবিদ।

মূল।

অনুবাদ।

১। ওঁ। বিশ্বে দেবাঃ সোমস্ত মঃসন্।

১। ওঁ। বিশ্বদেবগণ সোমপান করিয়া
আনন্দিত হউন।

২। বিশ্বে বৈধানরঃ।

২। সকলেই বৈধানর। (অর্থাৎ মনুষ্যের
অন্তর্যামী)।

৩। বিশ্বেহি বিশ্বমহসঃ।

৩। সকলেই সর্ব স্তোত্রোন্ময়।

৪। মহিঃসহস্রতঃ।

৪। অতীত মহান।

৫। তাকান্নানেমতিধীবানঃ।*

৫। * * * *

৬। আনুঃ পচতবাহসঃ।

৬। শত্রু আক্রমণকারী, অন্নবহনকারী।

৭। বাতান্নো অগ্নিদুতঃ।

৭। বায়ু তাহাদের আশ্রয়, অগ্নি তাহাদের
দুত।

৮। যে দ্যাং চ পৃথিবীং চ তত্ত্বঃ।

৮। যাহারা দু্যলোকে এবং পৃথিবীতে অধি-
ষ্ঠান করেন।

৯। আপ্যন্ত স্বচ।

৯। আপ্যলোকে এবং স্বলোকে।

১০। ব্রহ্ম চ ক্রত্বং চ।

১০। ব্রহ্মে এবং ক্রত্রে।

১১। বর্হিতে বেদিধঃ।

১১। বর্হিতে এবং বেদিতে।

১২। যজ্ঞং চোহ চান্তরিকং।

১২। যজ্ঞেতে এবং বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে—
(‘বিস্তীর্ণ’)

১৩। যেহঃ গ্রঃ একাদশ।

১৩। যাহারা হয়েন, তিন একাদশ।

১৪। ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ।

১৪। তিন এবং ত্রিশ

১৫। ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা।

১৫। তিন এবং তিন শত ৩০৩ ৩০৩৩

১৬। ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা।

১৬। তিন এবং তিন সহস্র ৩০০৩

১৭। তাবস্তো ত্রিষাচঃ।

১৭। তৎসংখ্যক পার্থক্য।

১৮। তাবস্তো রাত্রিষাচঃ।

১৮। তৎসংখ্যক * * *

১৯। তাবতীঃ পত্নীঃ।

১৯। তৎসংখ্যক পত্নী।

২০। তাবতীর্ঘাঃ।

২০। তৎসংখ্যক * * *

২১। তাবস্ত উদবণে।

২১। তৎসংখ্যক উপানে।

২২। তাবস্তো নিবেশনে।

২২। তৎসংখ্যক উপবেশনে।

২৩। অতো বা দেবা ভূমাস্তঃ স্বঃ।

২৩। হে দেবগণ, ইহা অপেক্ষাও তোমাদের
সংখ্যা অধিক।

২৪। নাবো দেবা অশিশাঃ।

২৪। * * * *

২৫। নাবো দেবা অশিশাঃ।

* সাংখ্যায়ন ঐতিহ্যের পাঠভেদ, —“পাকান্নানেমতিধীবানঃ।”

† সাংখ্যায়নহস্তের পাঠভেদ, —“অশিশাঃ নাবিশাঃ পুত্রা বক্ষি।”

মূল।

অনুবাদ।

- ২৫। বিধে দেবা ইহাশব্দ ইহা সোমস্ত সৎসন। ২৬। হে বিধদেবগণ! এই যজ্ঞে (সান্নিধ্যের) প্রার্থনা প্রবেশ কর এবং সোমপান করিয়া যজ্ঞ হও।
- ২৭। প্রেমার দেবা দেবহৃতিমবন্ত দেবা। ২৮। দেবতার! এই দেহহৃতিকে দৈবীবুদ্ধি দাও। রক্ষা করুন।
- ২৯। প্রেমার ব্রহ্ম প্রেমার ব্রহ্ম। ৩০। এই ব্রহ্মসমাজকে ও এই ব্রহ্মসমাজকে।
- ৩১। প্রেমার অমৃত্যু ব্রহ্মসান্নিধ্যসমস্ত। ৩২। এই সোম্যভিববন্তরী ব্রহ্মসান্নিধ্যকে রক্ষা করুন।
- ৩৩। চিত্তাশ্রিত্যভিত্তিক্রিতিঃ। ৩৪। বিভিন্ন দেবগণ তাঁহাদের বিভিন্ন রক্ষার দ্বারা।
- ৩৫। শব্দ ব্রহ্মাণ্যবস। গজ্ঞ। ৩৬। ব্রহ্ম (শব্দ) সকল শব্দে ভর্তুক এবং রক্ষার সহিত আগমন করুন।

এই নিবন্ধের ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন, এবং স্থানে স্থানে বড়ই অস্পষ্ট। যেখানে বক্তা যাহা না, সেখানে অনুবাদ করিতে পারিলাম না। কতুহলী পাঠকগণ বোধ্যই নগরে মুদ্রিত গ্রন্থের পরিমিষ্টে এই নিবন্ধ দেখিতে পাইবেন। হোম সাহেবের প্রকাশিত সাক্ষ্যবাদ ঐতরেয়ব্রাহ্মণেও সপ্তহোত্রপ্রব্রোজনামক গ্রন্থে হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। *

* প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে বলিতেছি যে, ২৬ হইতে ৩০ পদ প্রত্যেক নিবন্ধেরই অন্তিম অংশ এবং ধূম্র-রূপ। পাঠকবর্গ বিমিত হইবেন যে, গ্রন্থের অপেক্ষা প্রাচীন যে নিবন্ধ তাহাতেও 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ এবং 'কর' অর্থাৎ কর্ত্তব্যসমাজের উল্লেখ আছে। অতঃপর বাহারি বলিবেন যে, গ্রন্থের সময় চাতুর্কণ্য ছিল না, তাহারে সাহস যত, — আর কি বলিব। গ্রন্থের ভূরি ভূরি স্থানে 'পুরু-কৃতি' 'পুরুকৃতি' 'পুরুজন' ইত্যাদি শব্দে সাদৃশ্যসম্বন্ধ ব্যাখ্যা-অনুসারে ব্রাহ্মসমাজ চারি বর্গ এবং পুরুষ নিবাহ রূপ বুঝায়। বাহারি পুরুষসমাজে আজীবন বেদপাঠে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহাদের এই মত। কৃতিপুরুষ ইহুরোগীয় পণ্ডিতের মত ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহাদের মতে সাদৃশ্য দিতে পারি না। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইহুরোগীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অতিপ্রাচীনবেদবিদ্যারিস্পায় পণ্ডিত সান্নিধ্যহোম গ্রন্থের সময় চাতুর্কণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদ এবং পুরাণ মিলাইয়া আসি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, নববংশীয় বোদ্ধারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করায় পূর্বে এ দেশে কেবল দুই বর্গ ছিল, বৈশ্যবর্গ ও দাসবর্গ। পুরুষা নহনের শিতানহ। তাহারই বংশ ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইয়া বৈশ্যগণকে কর্ত্তব্য করেন, — তৎপূর্বে ভারতবর্ষে কর্ত্তব্যহী রাজা ছিল না। এই বংশ হইতেই ব্রহ্ম ও ক্রতু উৎপত্তি। পুরুষা হইতে অশ্বত্থন বর্ষ পুরুষে শৌনক এবং ব্রোহ্মণ পুরুষে বিদ্যাসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান করেন। শৌনক ভারতবর্ষে চাতুর্কণ্যের ব্যবস্থাপক। পুরুষা প্রতিষ্ঠান-মণের (বর্তমান-আকাশানিহনের) রাজা ছিলেন। প্রতিষ্ঠান হইতেই ব্রহ্ম ক্রতু এবং ভারতবর্ষে প্রচলিত করিয়াছিল। হানাবুরে এ কথা সন্নিহিত আশোচনা করিব।

এই নিবিদের প্রাচীনতার প্রমাণ আর কি দিব, বিবেচনা করি, এই বলিলেই ঋগ্বেদে হইবে যে, বিশ্বামিত্র ইহা জানিতেন, এবং এক স্থানে ইহার উল্লিখিত ৩৩৩৯ দেবতার কথা তিনিও বলিয়া গিয়াছেন। এই নিবিদের তাৎপর্য্য এই যে, দেবতার বাস্তবিক ৩৩ নয়, অসংখ্য। তাঁহাদিগকে ৩৩৩ বলা যায়, ৩০৩৩ বলা যায়, এবং ৩০০৩৩ বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক। এখন যে কয়েকটি সংখ্যা এই নিবিদে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে বেগে করিলে ৩৩৩৯ দেবতা পাওয়া যায়। তাহাতে এই নিবিদ অনুসারে দেবতাদের এক নূতন সংখ্যা বাহির হইল, ৩৩৩৯। এই নিবিদ ভিন্ন অন্য কোথাপি এই অভিনব দেবতাসংখ্যাকল্পনার মূল দেখা যায় না। বিশ্বামিত্র এই সংখ্যার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

“ত্রিগণিতা ত্রীমহাংশি অরিং ত্রিশচ্চ দেবা নবচাসংখ্যন।

উক্লন্ স্তুতৈব অন্তন বহিব্ অশ্মা আদ ইৎ হোতাং নিঃ অসাহসন্ত ॥”—৩.৯।৯

“তিনি হাজার তিন শত উনচল্লিশ জন দেবতা অগ্নির পরিচর্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্তুতসিক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার অস্ত্র বর্হি আস্ত্রীর্ণ করিয়াছিলেন, এবং শেষে তাঁহাকে হোতা করিয়া বসাইয়াছিলেন।”

একগণে নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঋগ্বেদের ঋষিদের অর্থাৎ অধিকাংশ ঋষিদের মতে, দেবতা অসংখ্য। তাঁহাদের তেজস্ব দ্বারা ছালোক, ভুলোক এবং অন্তরীক্ষ লোক পরিব্যাপ্ত এবং অধিষ্ঠিত। কেবল আমাদের জ্ঞানের দ্বার একাদশবিধ বলিয়া আমাদের বুদ্ধিতে দেবতার অথবা দেবশক্তির সংখ্যা একাদশমাত্র, এবং এই একাদশকে ত্রিলোকের অধিষ্ঠাতা কল্পনা করিলে ৩৩ সংখ্যা পাওয়া যায়।—এই ৩৩এর মধ্যে কেহই বড় নহেন,—কেহই ছোট নহেন,—সকলেই সমান,—সকলেই অতীবমহান। বৈবস্বত মহা ঋষি বলেন * ;—

“নহি বো অস্তি অর্ভকো দেবাসো ন সুসারকঃ।

বিবে সতো মহাস্ত ইৎ ॥

ইতি স্তভাসো রভবন্ রিশাদসো বেষ্ব ত্রযশ্চ ত্রিশচ্চ।

দনোর্দেবা যজিরাঃ ॥

* ‘ঋগ্বেদ রসেশচন্দ্র দত্ত আশঙ্ক্য কবেন যে, মনু বধন এই ঋকে পিতা মনু বলিয়া উল্লিখিত, তখন তিনি এই ঋকের ঋষি কিরূপে হইতে পারেন? তাহার উত্তর এই যে, বৈবস্বত মনু ও ‘পিতা মনু’ ভিন্ন। যিনি ঋগ্বেদে ঋষি, তিনি বৈবস্বত মনু, অর্থাৎ মনুবংশের জনৈক ঋষি। যিনি ঋকের সাধ্য উল্লিখিত, তিনি ‘মনুশিতা’ অর্থাৎ মনুবংশের আদিপুরুষ।

তে নব্রাহ্মণে ভেদবত ত উনো অধিবোত্তত ।

মানঃ পুথঃ পিত্র্যোন্-মানবাদবি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ।

বে দেবা সো ইহম ন বিসে বৈবানরা উত ।

অদ্বিত্যং শর্ম্ম সপ্রণো গবে অশ্বাৎ বচ্ছত ॥—কথেন্দু, ৮৩০

এই বেদাংশ অতীব প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু ভাষা ও ভাব তুলনা করিলে বিশ্বদেবনিবিদ্বে ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা হইবে। ইহাতে স্থানে স্থানে বিশ্বদেবনিবিদ্দের ভাবা নফল করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই;—“হে দেবতাগণ! পিতা মহু তোমাদিগকে এই বলিয়া শ্রব করিতেন যে, তোমাদের মধ্যে ছোট বড় নাই, তোমরা সকলেই ‘সতোমহান্ত’, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সুপদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পিতা মহু তোমাদের ৩৩ সংখ্যা নির্ণয় করিয়া তোমাদের অল্প বহুভাগের বিধান করিয়া গিয়াছেন; তোমরা আমাদিগকে জ্ঞাপ কর, রক্ষা কর, আমাদের অনুকুলে কথা কও, এবং আমাদিগকে পিতা মহুর অনুরূপ পদ্য হইতে দূরে লইয়া যাইও না। হে সকল সমুদ্রের অন্তর্ভামী দেবতাগণ! আমাদিগকে, আমাদের গোগণকে ও আমাদের অঙ্গগণকে বিস্তীর্ণ কল্যাণ প্রদান কর।”

মহু এইরূপে অসংখ্য দেবতাকে ৩৩ সংখ্যক করায় প্রশ্ন উঠে যে, অসংখ্যকে যদি ৩৩ বলা যায়, তবে ‘এক’ বলিতেই বা হানি কি? এইরূপে বহু ঈশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের তর্ক অর্থাবর্তে আরম্ভ হয়। একেশ্বরবাদীরা বলিতে লাগিলেন, ৩৩ বা ১১ দেবতার কল্পনা অপেক্ষা এক দেবতার কল্পনাই ত সরল।

দেখা যায়, এই প্রশ্ন উঠিলে ঋষিসমাজে প্রবল বাদানুবাদ উঠিয়াছিল, এবং ঋষেদের পর যখন উপনিষদ সকল রচিত হয়, তখন অধিকাংশ ঋষিরই বিবেচনায় ঈশ্বর একগাছ। ফলতঃ, সে ঈশ্বর যাইবল বা কোরাণের ঈশ্বরের মত নহেন। সে ঈশ্বরও যিনি, হে প্রিয়দর্শন পাঠক! তুমিও তিনি। সে ঈশ্বর জীষ্টপদ্য ও মহানন্দ-পদ্য ঈশ্বরের ছায় তোমার আশ্রয় সৃষ্টিকর্তা নহেন। মহর্ষি কপিল এই মতের প্রতি অনেক বিজ্ঞপ করিয়াছিলেন।—“যো যাহা হউক, ঋষেদী-ঋষিরা এই মত সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে অবলম্বন করেন নাই। দীর্ঘতয়া ঋষি ভয়ে ভয়ে এক স্থানে বলিতেছেন,—“আমি বালক, কিছুই জানি না। অজ্ঞান আমি, বাহীরা জানেন—সেই কবিদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, যিনি বড় লোকের সম্ভবরূপ, সেই পরমাত্মা এক কি না?” (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৫।৬) তদন্তরে তিনিই আবার বলিয়াছেন যে, হাঁ একই বটেন,—ঋষি ইহা বাহু ইত্যাদি

তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র। তিনি একং সৎ, অর্থাৎ তিনি এক ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই।

কিন্তু এই মত কোনও কোনও ঋষি অবলম্বন করিলেন মাত্র। অধিকাংশ ঋষিই ইহার প্রতিদ্বন্দী হইয়া বৈবস্বত মনুর ভাবায় দেবতাদিগকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “হে দেবতারা! পিতা মনুর অন্ত্যস্ত পথ হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যাইও না।”—একেশ্বরবাদ পিতা মনুর প্রদর্শিত উপাসনা প্রণালীর বিসংবাদী। পিতা মনুর মতে দেবতারা অসংখ্য, আর দীর্ঘতমাদির মত নবীন ঋষিদের মতে দেবতা এক! এবং সেই এক ভিন্ন সত্তাবান্ দ্বিতীয় বস্তুই নাই! এই নবীন ঋষিদের মত অনুসরণ করিলে নাস্তিকতা অর্থাৎ শূন্যবাদ অপরিহার্য হইয়া পড়ে; উত্তরকালে মহর্ষি কপিল ইহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

অবশেষে মহামতি বিশ্বামিত্র ঋষি প্রাদুর্ভূত হইয়া এই উভয়বিধ বিসংবাদী মতের সামঞ্জস্য করিয়া এক অপূর্ণ একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। তাহা এই;—দেবতারা বাস্তবিকই বহু—এক নহেন; কিন্তু দেবতাদের ‘অম্বরত্ব’ অর্থাৎ ‘ঈশ্বরত্ব’ এক। অথবা বিশ্বামিত্রের অতীত হৃদয়গ্রাহী ভাবায়—“মহৎ দেবানাম্ অম্বরত্বমেকম্।” তিনি এই মহাবাক্যকে অবলম্বন করিয়া একটি বিস্তীর্ণ সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা ঋগ্বেদে ৩য় মণ্ডলের ৫৫ সূক্ত। ইহাতে ২২টি ঋক্। এই ২২ ঋকের প্রত্যেকেরই শেষভাগে ঋষি বিশ্বামিত্র-গভীর স্বরে ধ্যাপন করিতেছেন,—

“মহৎ দেবানাম্ অম্বরত্বমেকম্।”

‘দেবতারা অনেক—কিন্তু তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব এক।’ এই মহাবাক্যের তাৎপর্য এই যে, দেবতারা সকলেই এক এক আনন্দময় ও প্রেমময় চিৎশক্তি-স্বরূপ। কিন্তু তাঁহারা অনেক হইলেও মনুষ্যের মত তাঁহাদের মধ্যে কোনও বিসংবাদ নাই। মনুষ্যের মধ্যে শাসনকর্ত্তা বা রাজার আবশ্যক, দেবতাদের মধ্যে রাজার আবশ্যক নাই। তাঁহারা সকলেই বিপুল জ্ঞান, নির্মূল আনন্দময় স্বভাব এবং পরিব্রজ প্রেমের অধিকারী সিদ্ধ পুরুষ। তাঁহারা সমবেতভাবে—অবিসংবাদিকরূপে একই প্রকার কার্য্য করেন। তাহাতে সমবেত দেবশক্তির মধ্যে, এক অপূর্ণ ঐক্য আছে। যেমন ‘ফ্রেঞ্চম্যান’ বহু হইলেও ‘ফ্রেঞ্চ-বেপলিক্’ এক, তেমনি দেবতা বহু হইলেও ‘মহৎ দেবানাম্ অম্বরত্বমেকম্।’ তদ্রূপ প্রাচীন ভাবতে অনেক যাদবে যদুবংশ গঠিত হইয়াছিল,—কিন্তু যাদব-দেব ‘রাজ্’ এক, কৃষ্ণের বে রাজ, সমগ্র যদুবংশের সেই রাজ। দেবতাসমাজ

সেইরূপ এক বহুবংশের ছাত্র। ঋগ্বেদের শেষস্থক পাঠ কর, তাহা হইলে এই মহাবাক্যের সহিত বৃদ্ধিতে পারিবে।—এই অতীব মনোহর যুক্তটি সমস্ত নরনারীর কণ্ঠভরণ হউক, এই আমার কামনা;—তজ্জন্ত তাহা এখানে সুমুদ্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

“সংবনন ঋষি।

সংসমিদং ব্রহ্মসে ব্রহ্মন জয়ে মিথানি অর্বাণা।

ইলঙ্গমে সমিধ্যসে সনো বহুনি আন্তর।

সংগচ্ছস্ব সংবধস্ব সংবো রীণাসি জানতাং।

দেৱা ভাগং বধা পূর্বে সংজানানী উপাসতে।

সমানো যজ্ঞঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিন্তসেবাং।

সমানং যজ্ঞম্ অভিবব্রজে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।

সমানীষ আকৃতিঃ সমানী শ্রদ্ধয়ানি বঃ।

সমানম্ যজ্ঞং বো মনো বধা বঃ হসহসতি।”—ঋগ্বেদ, ১০।১০১

সংবনন ঋষি বলিতেছেন;—

“হে অভিল্যয়ের সফলকর্তা প্রভু অগ্নি! তুমি বৈমানরূপে সকল প্রাণীকে ব্যাপ্ত করিয়াছ। তুমি উত্তর বেদীতে দীপ্তি পাইতেছ; আমাদের অস্ত্র রত্ন আহরণ কর।

“হে মহাস্বয়ংগ, দেব! তোমাদের দেবতার ‘সংজ্ঞানের’ সহিত যেমন পূর্বে তেননি আজিও আপন আপন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন। অতএব তোমরাও একত্র মিলিত হও। পরস্পর বিরোধপরিতাগি করিয়া একবিধ বাক্য বল। তোমাদের মনও ‘সংজ্ঞান’ যুক্ত হউক।

“দেখ তোমাদের এই সকল দেবতাদের সমান যজ্ঞ—সমান সমিতি—সমান মন—সমান হৃদয়। তোমাদের অস্ত্র সমান সন্নে সকল দেবতাকেই আমন্ত্রণ করিতেছি—সমান হবিতে সকল দেবতার হোম করিতেছি। অতএব তোমাদের সংকল্প সমান হউক—তোমাদের হৃদয় সকল সমান হউক—তোমাদের মন সমান হউক। প্রার্থনা করি, তোমাদের শোভন “সাহিত্য” ভাব হউক।”

* “সংজ্ঞান” অর্বাণ মিলিত একতান জ্ঞান। “সংজ্ঞানের” মধ্যে বিরোধ বিসংবাদ নাই। যাহা সকলেরই এককণ।

† মূল “হসহসতি” = হ + সহ + অসতি। হ = শোভন; সহ = সাহিত্য; অসতি = ভাবতি।—সারণ। সাহিত্যের পাঠকবৃন্দ এই হসহান “সাহিত্য” ভাব লাভ করুন—ইহা এই যজ্ঞ লেখকের কামনোবাক্যে প্রার্থনা।

ইহাই ঋগ্বেদের দেবতাতত্ত্ব। অসংখ্য মুক্ত আত্মা—অসংখ্য সিদ্ধপুরুষ দেবতাপদ প্রাপ্ত হইয়া আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে, জলে, স্থলে, তরু জায়, চক্রে সূর্য্যে, মেঘে এবং আমাদের হৃদয়ের মধ্যে, অলঙ্কিতভাবে আপনাদেব ঐশীশক্তির পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের সমবেত ঐশীশক্তি আমাদের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের এবং জ্ঞান-অজ্ঞান, হিতাহিত-বুদ্ধির উন্মেষসাধন করিয়া আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে। অতএব এই সকল পবিত্র আত্মা আমাদের উপাসনার উপযুক্ত।

ঋগ্বেদকে আমি একেশ্বরবাদ বা অবৈতেশ্বরবাদ বলিতে পারি না।—আমি ইহাকে ‘বিশ্বদেববাদ’ বলিয়া থাকি। দেবতার অনংখ্য, অথচ মিলিত। তাঁহাদের মন সমান—হৃদয় সমান—অভিপ্রায় সমান—কার্য্য সমান। তাঁহাদের ‘মহৎ অমরত্ব’, অর্থাৎ সমবেত দেবশক্তি এক। ঋগ্বেদ প্রধানতঃ দেবতার এই সমবেত মহতী ঐশীশক্তিকেই পূজা করে। কেন না, যদিও ঋগ্বেদী ঋষিদের বিবেচনায় প্রকৃতপক্ষে দেবতাব সংখ্যা করা যায় না, তথাপি ঋগ্বেদে উপাত্ত বলিয়া যে সকল দেবতার নাম শুনা যায়, তাঁহারা এই সমবেত ঐশীশক্তিরই জ্ঞানের বৈচিত্র্যবশতঃ নামের বিচিত্রতামাত্র। মূল কথা, বেদে দেবতাপদ দুই অর্থে ব্যবহৃত, এবং এই দুই অর্থের ভেদ সম্যক না বুঝিলে ভ্রম জন্মে। প্রথম অর্থে দেবতা সিদ্ধ পুরুষ, এবং তাঁহারা অসংখ্য। দ্বিতীয় অর্থে দেবতা সিদ্ধ পুরুষগণের মিলিত ঐশী শক্তি। তাহা এক। এই মিলিত দেবশক্তির নামান্তর ব্রহ্ম। সমগ্র বেদ সেই ব্রহ্মবই মহিমা প্রকাশ করে। এই কথাটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য, এবং তৎকালই দ্বিতীয় অর্থে এক এক দেবতা অজ্ঞাত সর্ব দেবতাব সমতুল্য। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ক্রমশঃ এই ভ্রমে উপনীত হইতেছেন, কিন্তু ইহার গাভীর্ঘ্য এ পর্য্যন্ত সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি না সন্দেহ। এখন বড় বড় পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের দেবতাতত্ত্বকে ‘কেটিশিসম্’, ‘পল্লিথিরীসম্’ বা ‘অনোথিরীসম্’ বা ‘প্যান্থিরীসম্’ ইত্যাদি পুরাতন নামে নামকরণ করিতে দলুচিত হইতেছেন; এখন তাঁহারা সেই ভ্রমকে ‘হীনোথিরীসম্’ এই এক অভিনব নাম দিতে চাহেন। আমাদের ঐ সকল বৈদেশিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের ঋগ্বেদের দেবতাতত্ত্বের নাম ‘বিশ্বদেববাদ’, অর্থাৎ অসংখ্য দেবতার সমবেত ঐশীশক্তির নাম ‘বিশ্বদেবা’ বা ‘বিশ্বদেব’, বা ‘ব্রহ্ম’; এবং অগ্নি বিষ্ণু প্রভৃতি উপাত্ত দেবতার সেই মহাশক্তির নামান্তরমাত্র। এই ভ্রত আমার স্বকপোলকল্পিত নহে;—ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণ উদঘাটন কর,

প্রথমেই দেখিতে পাইবে,—“অগ্নিরৈ দেবানাগবগঃ বিষ্ণুঃ পরমঃ । তদন্তরেণ সর্বা দেবতাঃ । অগ্নিরৈ সর্কে দেবাঃ বিষ্ণুরৈ সর্কে দেবাঃ ।”—যিনি অগ্নি, তিনিও সকল দেবের মিলিত ঐশীশক্তি ; যিনি বিষ্ণু, তিনিও সকল দেবের মিলিত ঐশীশক্তি । প্রভেদ এই, পৃথিবীতে অগ্নির সহিত আমাদের অধিক সম্পর্ক, স্বর্গেতে বিষ্ণুর সহিত অধিক সম্পর্ক ।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বামিত্রের মত ও পিতা মহুয় মত মূলে এক । কেবল উভয়ের ভাষাগত ভেদমাত্র লক্ষিত হয় । পিতা মহু অসংখ্য দেবতার মিলিত ঐশীশক্তি জ্ঞানের বিচিত্রতা অনুসারে একাদশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । মহর্ষি বিশ্বামিত্র ত্র্যম্বজনক আরোপিত একাদশ সংখ্যা যুচাইয়া সেই মিলিত ঐশীশক্তির একতা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃষ্টরূপে বহুমানগণের সম্মুখে খ্যাপন করিলেন ।

এক্ষণে ভরসা করি, আমাদের পাঠকবৃন্দ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মহর্ষি মধুচ্ছন্দার ‘আজ্ঞাশত্রেয়’ অগ্নিদেবতার তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবেন । মহুয় দেবানামস্তরঙ্গম্ একম্ । সেই ‘অস্তরঙ্গ’ বখন উত্তাপ এবং আলোকে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদের আত্মার উপর কার্য্য করে, তখন তাহার বৈদিক পারিভাষিক নাম ‘দেব-অগ্নি’ । তাহা ভুলোকে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে প্রকাশিত হয়, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ-আকারে প্রকাশিত হয়, ছালোকে সূর্য্যের আকারে প্রকাশিত হয় । সে শক্তি সর্বব্যাপিনী ।

এখানে আর তর্ক বা যুক্তির অবসর কিছু নাই । বিশ্বাস হয়, বিশ্বাস কর ; অবিশ্বাস হয়, করিও না । উত্তাপ এবং আলোকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে কোনও প্রকার ‘অস্তরঙ্গ’ দেখিতে পাইবেন না ;—কিন্তু তোমার জন্ম বদ্বি বিশ্বাস করিতে চাহি যে, সংসারের সমুদায় ব্যাপার এক অলৌকিক মঙ্গল-ময়ী ও মাধুর্য্যময়ী চিৎশক্তির পরিচয় দিতেছে,—তবে বেদ অগ্রসব হইয়া বলেন যে, সেই অলৌকিক চিৎশক্তিকে,—যে উত্তাপ এবং আলোকের সহিত আমাদের জীবনের অতিবিনিষ্ট সম্বন্ধ, সেই উত্তাপ এবং আলোকের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ামক বলিয়া বিশ্বাস কর ।

একবার পূর্বে বলিয়াছি—এখানে গুরুর আবৃত্তি করিতেছি যে, স্বধেদী ঋষির বিশেষতঃ আমাদের মধুচ্ছন্দার পিতা মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্পষ্টাকরে এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, দেবতাদের কার্য্যকলাপ যদৃচ্ছামূলক নহে । তাঁহাদের সমবেত ঐশীশক্তি নিয়মতন্ত্রমূলক । শক্তি এবং নিয়তি বিভিন্ন

পদার্থ। বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়াকাবিতার নাম শক্তি—অবুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়াকাবিতার নাম নিয়তি। শক্তিতে স্বাধীনতা আছে, নিয়তিতে স্বাধীনতা নাই। দেবতার। শক্তিসম্পন্ন, আর অল্প জড় প্রকৃতি নিয়তির অধীন। নিয়তি শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত ও চালিত হইয়া এই স্বাব্যবস্থামাত্রক বিশ্বসংসারের আকার ধারণ করিয়াছে। শক্তি নিয়তিকে চালিত করিতে পারে, কিন্তু অপলাপ করিতে পারে না। সুতরাং দেবতাদের কার্য অচল, অটল নিয়মের অধীন, এবং তজ্জন্ত তাহাও 'ব্রত' বা নিয়ম বলিয়া উক্ত হয়। শক্তির অধ্যাক্ষতার নিয়তি 'ব্রতে' পরিণত হইয়াছে। দেবতাদিগের যে ব্রত বা কার্য, তাহা নিয়তির সৃষ্টি নহে, ব্যবস্থা বিধান মাত্র। "দেবতাদের সেই আদিম ব্রত সকলকে, কুশলশিল্পীরা কি অগাধবুদ্ধি পণ্ডিতেরা, অত্যাধা করিতে পারেন না। পর্বতের স্রাব তাহার। অবনত হইবার নহে!"—(ঋগ্বেদ ৩।৫৬।১)। ফেন না, নিয়তি সেই সকল ব্রত বা ব্যবহার ভিত্তিস্বরূপ। ইহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল সত্যের উপর রচিত 'বেদ'। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই ব্রতের মূলীভূত নিয়তির অস্তিত্বপ্রকাশ করে; বেদ সেই ব্রতের ব্যবস্থাপক দেবতাদের অস্তিত্ব এবং সমবেত ঐশীশক্তির কথা ধ্যাপন করে।

এখন আমরা আর অধিক বিলম্ব না করিয়া, মধুচ্ছন্দার আজ্যশস্ত্রের মূল ও ভাষার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

অগ্নিঃ পূর্বোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবম্ ঋত্বিজম্। হোতারঃ রত্নপাতনম্ ॥ ১

অগ্নিঃ পূর্বোহিতঃ বিতীর্ণো নূতনৈরুত। সদেবাঃ এহ বক্তি ॥ ২

অগ্নিনা রসিমন্মবং পোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীণবৃত্তমম্ ॥ ৩

অগ্নেবং যজ্ঞম্ অক্ষরং বিবতঃ পরিভূযসি। সইন্দেবেহু গচ্ছতি ॥ ৪

অগ্নিহোতা কবিকৃত্যঃ সত্যশিঞ্জরবস্তমঃ। দেবো দেবেভিবাগমৎ ॥ ৫

যদংগদাশুবেদম্ অগ্নে ভজং কবিযাসি। তবন্তং সত্যমঙ্গিলঃ ॥ ৬

উপহায়ে দিবেদিবে দেয়াবিত্তিগ্নিঃ বযম্। মনোভরন্ত এমসি ॥ ৭

রাজেতমক্ষবাগাং গোপাম্ ঋতন্ত দীদিবিং। বর্দ্ধমানং বেদমে ॥ ৮

মনঃ পিতব হুনবে অগ্নে স্থপাবনোভব। সচাশাঃ স্বন্তয়ে ॥ ৯

১। যজ্ঞপুস্তকের পুরোহিতস্বরূপ (১) দেবযজনে হোতা ঋত্বিকস্বরূপ—রত্নপাতনশ্রেষ্ঠ দেব অগ্নিকে আহুি স্তব করিতেছি।

(১) মূল "যজ্ঞস্ত পূর্বোহিতঃ"। যজ্ঞস্ত—যজ্ঞনীয়স্ত। বেদে বাহাকে 'যজ্ঞপুস্তক' বলে, তিনি দেবতাদের সমবেত অস্তিত্ব। বিদ্যামিত্রের ভাষায় 'দেবতাদের মহৎ অস্থবক'। সেই অস্থবক যে ভাবে সর্বাঙ্গেক্ষা আমাদের সন্নীপবর্তী, তাহাই অগ্নি। তিনি যেন যজ্ঞপুস্তকের 'পুরোহিত' বা সমুৎপত্তি অংশ। অগ্নিব স্তব কবিলেই সকল দেবতার স্তব করা হয়, অগ্নি সকলকে লইয়া আইসেন, তাই তাঁহাকে হোতা ঋত্বিকের সহিত উপাসিত করা হইয়াছে।

২। অগ্নি প্রাচীন ঋষিদের যেমন উপাস্ত, নবীন ঋষিদেরও তেমনি । তিনি দেবতাদিগকে এই দেবযজনে আনয়ন করেন ।

৩। অগ্নি দ্বারা মনুষ্যের দিনে দিনে বর্দ্ধমান সমৃদ্ধি এবং অতিশয়রূপে পুত্রপৌত্রসম্বিত বশঃ লাভ কবে ।

৪। হে অগ্নি যে অহিংসিত বস্তুকে তুমি পরিবেষ্টন কর, তাহাই দেবতাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় ।

৫। হোতা অগ্নি মনুষ্যকে কবি (১) করেন । তিনি চিত্রশ্রবা (২) শ্রেষ্ঠসত্যবাক্য । (৩) সেই দেব অজ্ঞাত দেবগণের সহিত দেবযজনে আগমন করণ ।

৬। হে অগ্নি! দাতাকে তুমি যে সম্পদ প্রদান করিবে, (৪) তাহা ভোমারই হইবে । হে অগ্নি বা ইহাতে সংশয় নাই ।

৭। ৮। হে অগ্নি! দিন দিন সন্ধ্যা সকালে মনের মধ্যে নবাকার ধারণ কবিয়া তোমার সমীপে আমবা আসিয়া থাকি (৫), তুমি রাজার স্তাব; তুমি অহিংসিত উপাসনাকার্যের রক্ষাকর্তা; ক্রতের প্রকাশকর্তা (৬) স্বৰূপ আমাদের অগ্নিশালার বৃদ্ধি পাইয়া থাক ।

৯। হে ঈশ্বর মহামুখ্য অগ্নি । পুত্রের পক্ষে পিতার স্তাব, আমাদের পক্ষে তুমি সুপায়ন (৭) হও; আমাদের স্বস্তির স্রষ্টা তুমি আসিয়া মিলিত হও ।

এখন পাঠকগণ একবার চিন্তা করুন তাঁহার। মধুচ্ছন্দার উপাসনার যোগ দিতে সক্ষম কি না । এই বিশ্বসংসার এক মহিমাময় দেবশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত ও চালিত । সেই শক্তি অগ্নির অধিষ্ঠাতৃস্বরূপে আমাদের জ্ঞান রমণীয় ধন উৎপাদন করিতেছেন । তাহারই প্রসাদে আমরা ধনসমৃদ্ধি এবং পুত্র পৌত্র লাভ করি । তিনি আমাদের হৃদয়ে দেবতাদের অস্তিত্বের কথা এবং আমাদের

(১) কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী । মনুষ্য যখন জড় পদার্থের নিয়মেব বাইর্দেখে সেই সকল নিয়মের ব্যবস্থাপক দেবতাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, তখন তাহাকে 'কবি' বলা যায় । হোতা অগ্নি মনুষ্যকে কবি করেন;—তিনি মনুষ্যের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থাৎ বৈদিক দেবতাতত্ত্ববিষয়ক বিভ্রান্তি দূরীভূত করিয়া দান করেন ।

(২) চিত্রশ্রবা = বিচিত্র বশঃ পালী ।

(৩) সত্যবাক্য । কেন না সংসারের অবিচলিত নিয়মের ব্যবহাভেই অগ্নির সত্য প্রকাশ পায় ।

(৪) অগ্নি আমাদের যে সম্পদ দিবেন, তাহা তাঁহার ইষ্ট এবং প্রিয়কার্যেই নিবেশিত হইবে ।

(৫) অগ্নিহোত্র নামক নিত্য উপাসনা সারংকালে এবং প্রাতঃকালে নির্বাহ হয় । তাহাই এ স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে ।

(৬) ক্রতের প্রকাশকর্তা ।—আমরা যে অবিচলিত নিয়মের অধীন, অগ্নিই এই সত্য আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ করেন ।

(৭) সুপায়ন = সহজে স্বীকার সমীপে যাওয়া বাইতে পারে । ঋষি শেখার্দর্শন। এই যে, হে অগ্নি । আমরা যেন জনাবাসে তোমার সমীপে—তোমার নিরাকার সত্ত্বাৎ সমীপে উপস্থিত হইতে পারি । আমরা যেন নিঃসংশয়ে তোমার জ্যোতিঃ হৃদয়ভ্রম করিতে পারি । তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের হৃদয়ে আসিয়া মিলিত হও ।

ভাবী জীবনের কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। আমরা মধুচ্ছন্দার সহিত সম্বন্ধে অঙ্গীকার কবিত্তে কি প্রস্তুত যে, হে অগ্নি। তুমি যাহা দিবে, তাহা তোমারই কার্যে নিয়োজিত হইবে? অগ্নি আমাদের হৃদয়ে এই জ্ঞান বদ্ধমূল করেন যে, সংসার নিয়তির অধীন। আমরা যদি এই অনির্বচনীয় দেবশক্তির সমীপস্থ হইতে পারি, তবেই গরম কল্যাণের ভাঞ্জন হইব।

আমরা এক্ষণে মধুচ্ছন্দার আজ্যশস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার ‘অগ্নিকে’ চিনিলাম। অতঃপর পাঠকবৃন্দ যদি জিজ্ঞাসা করেন, মধুচ্ছন্দার আর আর উপাস্ত্র দেবতা কি? তদ্বত্তরে সংক্ষেপে বলিতেছি যে, মধুচ্ছন্দার রচিত কেবল ১১টি মাত্র স্বক্ক কালের শ্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই এগারটি স্বক্ক প্রাতঃসবন এবং মাধ্যম্নিন সবনে ব্যবহারজন্ত বিরচিত। তৃতীয় সবনের জন্ত বিরচিত মধুচ্ছন্দার স্বক্ক দেখা যায় না। সম্ভব যে, উহা রচনার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইরাছিল, অথবা তাঁহার রচনার এক অংশ বিগুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃসবনের প্রধান দেবতা অগ্নি, মাধ্যম্নিন সবনের প্রধান দেবতা ইন্দ্র, সায়ন্তন সবনের প্রধান দেবতা সূর্য্য, সবিতা বা বিষ্ণু। সূর্য্য, সবিতা বা বিষ্ণু, একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম। অগ্নি পৃথিবীর দেবতা, ইন্দ্র অন্তরীক্ষের দেবতা, এবং সবিতা বা বিষ্ণু, দ্যুলোকের দেবতা। অর্থাৎ, পৃথিবীস্থ একাদশের মধ্যে অগ্নি প্রধান, অন্তরীক্ষস্থ একাদশের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান, এবং দ্যুলোকস্থ একাদশের মধ্যে বিষ্ণু প্রধান। মধুচ্ছন্দার প্রাতঃসবন-স্বক্কমালায় দেবতা ঠিক ১১ সংখ্যক। যথা—

১। সোম। ২। অগ্নি। ৩। বায়ু। ৪। ইন্দ্র। ৫। বিজ। ৬। বরুণ। ৭। অশ্বিন।

৮। সরস্বতী। ৯। মরুতান। ১০। বিশ্বদেবাঃ।

২২৫-২৬৬

সকল ঋষির ১১ দেবতাই যে সমান, তাহা নহে; কিন্তু মধুচ্ছন্দার অর্চনায় এই ১১ দেবতা দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যিনি ইন্দ্র, তিনিই মাধ্যম্নিন সবনের প্রধান উপাস্ত্র দেবতা। কলতঃ, সমবেত দেবতাদের যে ঐশীশক্তি, অগ্নি, ইন্দ্র ও সবিতা বা বিষ্ণু, তাহারই ভিন্ন ভিন্ন নাম। পৃথিবীতে, এই মহিমময় শক্তির বিলাস দেখিতে চাও ত অগ্নিকে চিন্তা কর, অন্তরীক্ষে দেখিতে চাও ত বিহ্বলতা-সমুদ্ভাসিত বজ্রনাদী-ঋটিকান্দোলিত নীলবর্ণ মেঘকে চিন্তা কর, আর দ্যুলোকে দেখিতে চাও ত দিব্য-সাবর্ণ্যময় সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর। জড় অগ্নি, জড় মেঘ বা জড় সূর্য্যকে যদি দেবতা বলিয়া তোমার বোধ হয়, তবে তোমার বেদাধ্যয়ন বৃথা। যদি তুমি এই সমুদায়ের মধ্যে সমবেত দেবলোকের

‘সংজ্ঞান’ উপলব্ধি করিতে পার, তবে কথঞ্চিৎ তোমার বেদাধ্যয়নের ফল হই-
রাছে; বলা বাইতে পারে। এই ‘সংজ্ঞান’ পৃথিবীতে প্রাণী ও প্রাণীর জন্ত অন-
সৃষ্টি করিতেছে। আকাশে এই প্রাণি-সৃষ্টি ও প্রাণি-রক্ষার জন্ত ইহাকে এক
ভীষণ সংগ্রামব্যাপারে ব্যাপ্ত দেখা বাইতেছে, এবং ছালোকে সবিতৃমণ্ডলের
মধ্য হইতে ইহা আমাদের দৃশ্যভেদী এক অপূর্ণজ্যোতির উদগীরণ করি-
তেছে। মধুচ্ছনা সেই প্রাণ ও অনসৃষ্টিকর্তা, অগ্নি, এবং সেই সৃষ্টিব্যাপারের
জন্ত বৃজ্রাস্ত্রের সহিত মহাহবে ব্যাপ্ত ইন্দ্রের স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন,
আর যদিও ‘সবিতৃমণ্ডলবর্তী নারায়ণের’ জ্যোতির কথা তাঁহার স্তোত্রে আমরা
দেখিতে পাই না, তথাপি তাঁহার মহামহিম ঋষিশ্রেষ্ঠ পিতা বিশ্বামিত্র সে
অভাব পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। সেই মহাবীর রচিত সাবিত্রী বা গায়ত্রীমন্ত্র
আজিও বিজ্ঞাতিসমাজের কণ্ঠান্তরণ হইয়া রহিয়াছে। অগাধবেদরিতাসম্পন্ন
ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন যে, ‘সবিতা’ শব্দের অর্থ ‘প্রেরক’। ‘সবিতুঃ =
সর্বান্তর্ব্যামিত্য প্রেরকস্ত।’ (ঋগ্বেদ ৩.৬২.১০ মন্ত্রের ভাষ্য)। দেবতাদের
যে ‘সংজ্ঞান’ অন্তর্ব্যামিতাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসকলকে জ্ঞান অজ্ঞানের ভেদ
দেখাইয়া মুক্তি বা দেবজন্মের পথে প্রেরণ করিতেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্যের আজিও সেই সংজ্ঞানকে ‘সবিতা’ নামে, সায়ণকালে ও প্রাতঃকালে,
পাণধ্বংস করিবার জন্ত উপাসনাকাজী, আজিও দ্বিজাতিসমাজ বিশ্বামিত্রের
ভাষ্যে সেই সবিতার বরণীর জ্যোতিঃকে এই বলিয়া ধ্যান করেন,—

ও তৎ সবিতুর্করেণ্যং ভর্গোদেবন্ত ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

শ্রীভূমেশচন্দ্র বটব্যাল।

আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ।

মুগ্ধ জগৎ ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম লইয়া গঠিত। স্থূলতঃ এ কথা
সত্য। এ জগতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান। প্রথম
পদার্থ, দ্বিতীয় শক্তি, তৃতীয় ব্যোম অথবা আকাশ।

পদার্থ ত্রিবিধ আকারে দেখা যায়। ক্রিয়াকারে—অর্থাৎ কঠিনরূপে;
জ্ববাঙ্কারে—অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত; বায়বাকারে—অর্থাৎ মরুৎরূপে। জড় পদার্থ
সর্ব সময়ে শক্তি অথবা তেজ দ্বারা স্পন্দিত হইতেছে। এই মহাজগৎ ব্যোমে

দোলায়মান রহিয়াছে। মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। তাহারই বলে অসীম আকাশে বিশ্ব জগৎ ভ্রমণ করিতেছে, উদ্ভূত হইতেছে, এবং পুনরায় মিলাইয়া যাইতেছে।

সর্বত্রই দেখা বাউক, শক্তি কি প্রকারে স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়।

... রেলের ট্রেনে সঙ্কেত প্রেরণের দৃশ্য সকলেই দেখিয়াছেন। এক দিকে রজ্জু আকর্ষণ করিলে দূরস্থ কাঠখণ্ড সঞ্চালিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অল্প প্রকারেও শক্তি সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। নদীর উপর দিয়া যখন জাহাজ চলিয়া যায়, কলের আঘাতে জল তরঙ্গাকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীতট বারবার আঘাত করে। এ স্থলে কলের আঘাত তরঙ্গবলে ঘুরে নীত হয়।

বাদ্যকরের অঙ্গুলিতাড়িত তন্ত্রীও এইরূপে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনে বায়ুরাশিতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। শব্দজ্ঞান বায়ুতরঙ্গ-আঘাতজনিত।

বাস্তবস্থ ব্যতীতও সূচরাচর অনেক সুর শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ু-কম্পিত বৃক্ষপত্র, জলবিন্দুপতনে, তরঙ্গাহত সমুদ্রতীরে বহুবিধ সুর শ্রুতি-গোচর হয়।

সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই চড়া হয়। যখন প্রতি সেকেন্ডে বায়ু ৩০,০০০ বার কাঁপিতে থাকে, তখন কর্ণে অসহ্য অতি উচ্চ সুর শোনা যায়। তাব আরও ক্ষুদ্র করিলে হঠাৎ শব্দ ধামিয়া যাইবে। তখনও তার কাঁপিতে থাকিবে, তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে; কিন্তু এই উচ্চ সুর আর কর্ণে ধ্বনি উৎপাদন করিবে না।

কে মনে করিতে পারে যে, শত শত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আমরা তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাই না? গৃহে, বাহিবে নিরন্তর অগণিত সংগীত গীত হইতেছে, কিন্তু তাহা আমাদের শ্রবণের অতীত।

জড়পদার্থের কম্পন ও তজ্জনিত সুরের কথা বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আকাশেও সর্বদা অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। অঙ্গুলিতাড়নে প্রথমে বাদ্যযন্ত্রে ও তৎপরে বায়ুতে যেকোন তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, বিছাড়াড়নেও সেইরূপে আকাশে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। সেই গীত শুনবার জন্য অল্প ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক। বায়ুর তরঙ্গ আমরা কর্ণ দিয়া শ্রবণ করি, আকাশের তরঙ্গ সূচরাচর আমরা চক্ষু দিয়া দেখি।

বায়ুর তরঙ্গ আমরা অনেক সময়ে শুনিতে পাই না। আকাশের তরঙ্গও সর্ব সময়ে দেখিতে পাই না।

দুইটি দাতুগোলক বিদ্যুৎ-বস্তুর সহিত যোগ করিয়া দিলে, গোলক দুটি বারংবার বিদ্যুত্বাড়াইত। হইবে, এবং ডিউকলে চতুর্দিকেই আকাশে তরঙ্গ ধাবিত হইবে। তার ছোট করিলে, অর্থাৎ গোলক দুটিকে ক্ষুদ্র করিলে, সুর উচ্চে উঠিলে। এইরূপ প্রতি মূহুর্তে সহস্র কম্পন হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে কোটি, এবং তাহা হইতে কোটি কোটি কম্পন উৎপন্ন হইবে।

মনে কর, অন্ধকার গৃহে অদৃশ্য শক্তিবলে বাবু বারংবার আহিত হইতেছে। কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গভীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কম্পনসংখ্যা বড়ই বর্দ্ধিত করা যাইবে, সুর ভতই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিলে। অবশেষে সহসা কর্ণবিদারী সুর ধাগিয়া নিস্তব্ধতার পরিণত হইবে। ইহার পর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ কর্ণে আঘাত করিলেও আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না।

এখনে বিদ্যুৎদ্বলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া থাকি; লক্ষাধিক তরঙ্গ প্রতি মূহুর্তে চতুর্দিকে ধাবিত হইবে। আমরা এই তরঙ্গান্দোলিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিব। সুর ক্রমে উচ্চে উথিত হইতে থাকুক। প্রতি সেকেন্ডে যখন কোটি কোটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অকস্মাৎ নির্জিত ইন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া উঠিলে, শরীর উত্তাপ অহুভব করিলে। সুর যখন আরও উচ্চে উথিত হইবা অধিকতরসংখ্যক তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোকরেখা দেখা যাইবে। কম্পনসংখ্যার আরও বৃদ্ধি হউক—ক্রমে ক্রমে পীত, হরিৎ, নীল আলোকে গৃহ পূর্ণ হইবে। ইহার পর সুর আরও উচ্চে উঠিলে, চক্ষু পরাত্ত হইবে, আলোক রাশি পানরার অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ইহার পর অগণিত স্পন্দনে আকাশ স্পন্দিত হইলেও আমরা কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা অহুভব করিতে পারিব না।

তবে ত আমরা এই সমুদ্রে একেবারে দিশাহারা! আমরা বধিরও অন্ধ! কি দেখিতে পাই, কি শুনিতে পাই? কিছুই নয়! হই এক খান। ভয় দিক্‌গণনশীলকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে বাজা করিয়াছি।

পূর্বে বলিয়াছি, তাপ ও জ্বালোক আকাশের ঐচ্ছাতিক স্পন্দন মাত্র। যে স্পন্দন স্বক দ্বারা অহুভব করি, তাহার নাম উত্তাপ; আর যে কম্পনে দর্শনে-

জ্বিন্ন স্পন্দিত হয়, তাহাকে আলোক বলিয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আকাশে
বহুবিধ স্পন্দন আছে, বাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অগ্রাহ।

হস্তিদেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া অক্ষেরা একই জন্তর-বিভিন্ন রূপ
কল্পনা করিয়াছিল; শক্তিসম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ কল্পনা করি।

কিরণকাশ পূর্বে আমরা চুম্বকশক্তি, বিদ্যুৎ, তাপ ও আলোককে বিভিন্ন
শক্তি বলিয়া মনে করিতাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, এ সকল একই
শক্তির বিভিন্ন রূপ। চুম্বকশক্তি ও বিদ্যুতের সম্বন্ধ সকলেই জানেন। তাপ-
রশ্মি ও আলোক যে আকাশের বৈদ্যুতিককম্পনজনিত, ইহা অল্প দিন হইল
প্রমাণিত হইয়াছে।

আকাশ দিয়া ইহাদের তরঙ্গ একই গতিতে ধাবিত হয়, বাতুগণে প্রতিহত
হইয়া একই রূপে প্রত্যাবর্তন করে, বায়ু হইতে অল্প অল্প দ্রব্যে পতিত হইয়া
একই রূপে বজ্রীভূত হয়। কম্পনসংখ্যাই বৈষম্যের একমাত্র কারণ।

সূর্য্য এই পৃথিবী হইতে নয় কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের
উপরে বায়ুমণ্ডল ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। তার পর শূন্য। দূরস্থ সূর্য্যের
সহিত এই পৃথিবীর আপাততঃ কোনও যোগ দেখা যায় না।

অথচ সূর্য্যের বহুময় সাগরে আবর্ত্ত উখিত হইলে, এই পৃথিবী সেই
সোরোৎপাতে ক্ষুব্ধ হয়—অমনি পৃথিবী জুড়িয়া বিদ্যুৎস্রোত বহিতে থাকে।

অতরাং বাহা বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচ্ছিন্ন নহে।
শূন্যে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি জগৎ আকাশস্বর্জে গ্রথিত। এক জগতের স্পন্দন
আকাশ বাহিয়া অন্ত জগতে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া নানান রূপ ধরিতেছে। সূর্য্যকিরণেই
বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়, পুষ্প রঞ্জিত হয়। কিরণরূপ আকাশকম্পন আসিয়া বায়ুস্থিত
অঙ্গারক-অণুগুলি বিচলিত করিয়া বৃক্ষদেহ গঠিত করে। অসংখ্য বৎসর পূর্ব্বের
সূর্য্যকিরণ বৃক্ষদেহে আবদ্ধ হইয়া পৃথীগর্ভে নিহিত আছে। অর্দ্ধ করুণা হইতে
সেই কিরণ নিমুক্ত হইয়া গ্যাস ও বিদ্যুৎআলোকে রাজবর্ষ আলোকিত করি-
তেছে। বাষ্পধান, অর্ণবপোত এই শক্তিভেদেই ধাবিত হয়। মেঘ ও বাত্যা
একই শক্তিবলে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্য্যকিরণে লালিত উদ্ভিদ ভোজন করিয়াই প্রাণিগণ জীবন ধারণ করি
তেছে ও বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে দেখা যায় যে, এই ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব গতির

মুগে স্বর্বাধিকরণ। আকাশের স্পন্দন ঘাবাই পৃথিবী স্পন্দিত হইতেছে ;
জীবনেব শ্রোত বহিতেছে ।

আমাদের চক্ষের আবরণ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতেছে । এক্ষণে আমরা
বুঝিতে পাবিতেছি যে, এই বহুকণী বিবিধশক্তিশালী জগতের মূলে ছাট্ কাঙ্ক্ষণ
বিদ্যমান । এক, আকাশ ও তাহার স্পন্দন ; অপর জড় বস্তু ।

জড় পদার্থ বিবিধ আকারে দেখা যায় । এক সময়ে লোহবৎ কঠিন,
কখনও দ্রব, কখন বায়বাকাবে, আবার কখনও বা তদপেক্ষা স্বল্পতর রূপে
দেখিতে পাওয়া যায় । শূন্যে উড়ন্ত অদৃশ্য বাষ্প, আর প্রস্তরবৎ কঠিন তুষার
একই পদার্থ, কিন্তু আকারে কত প্রভেদ ।

গৃহমধ্যে নিশ্চল বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না । উহার অস্তিত্ব সহসা
আমরা কোনও ইচ্ছায় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না । কিন্তু এই অদৃশ্য বায়ু
বায়ুরাশিতে আবর্ত উথিত হইলে, উহা বিভিন্ন শব্দ ধারণ করে । আবর্তময়
অদৃশ্য বায়ুর কঠিন আঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রাম জনপদ বিনষ্ট হইবার কথা
সকলেই জানেন ।

জড় পদার্থ আকাশেরই আবর্ত মাত্র । কোন কালে, আকাশ-সাগরে
অজ্ঞাত মহাশক্তিবলে অগণ্য আবর্ত উদ্ভূত হইয়া পরমাণুব সৃষ্টি হইল ।
উহাদের মিলনে হিন্দু, অসংখ্য হিন্দুর সমষ্টিতে জগৎ, মহাজগৎ উৎপন্ন
হইয়াছে ।

আকাশেরই আবর্ত জগৎরূপে আকাশসাগরে ভাসিয়া রহিয়াছে ।

আশ্বিন কবি রিক্টার, স্বপ্নরাজ্যে দেবদূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন । দেব-
দূত কহিলেন, “মানব, ভূমি বিশ্বরচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ—
আইস, মহাবিশ্ব দেখিবে ।” মানব দেবস্পর্শে পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত
হইয়া দেবদূত সহ অনন্ত আকাশপথে যাত্রা করিল । আকাশের উচ্চ হইতে
উচ্চতর স্তর ভেদ করিয়া তাহার ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল । দেখিতে
দেখিতে সপ্তগ্রহ পশ্চাতে কেলিয়া বৃহর্ষের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল ।
স্বর্গের ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উথিত মহাপাবকগন্ধা তাহাদিগকে দগ্ধ করিল
না । পরে সৌররাজ্য ত্যাগ করিয়া সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল ।
সমুদ্রতীরস্থ বালুকাগণার গণনা মহুয়ের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এই অসীমে বিকিপ্ত
অগণ্য জগতের গণনা কল্পনারও অতীত । দক্ষিণে বামে, সমুখে পশ্চাতে দৃষ্টি
সীমা অতিক্রম করিয়া অগণ্য জগতের অনন্ত শ্রেণী । কোট কোটি মহাস্বর্ঘ্য

প্রদক্ষিণ করিয়া কোটি কোটি গ্রহ, ও তাহাদের চতুর্দিকে কোটি কোটি চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। উর্দ্ধহীন, অবোহীন দিক্‌হীন অনন্ত। পরে এই মহাজগৎ জতিক্রম করিয়া আরও দূরস্থিত অচিন্ত্য জগৎ উদ্দেশে তাহারা চলিল। সমস্ত দিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া কলনাভীত নূতন মহাবিশ্ব মুহূর্ত্তে তাহাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সমাবেশ দেখিয়া মানুষ একেবারে অবসর হইয়া কহিল, “দেবদূত। আমার প্রাণবায়ু বাহিব করিয়া দাও। এই দেহ অচেতন ঘলিকণার মিশিয়া গাউক। অসহ্য এ অনন্তের ভার! এ জগতেব শেষ কোথায়?”

তখন দেবদূত কহিলেন, “তোমার সম্মুখে অস্ত্র নাই; ইহাতেই কি তুমি অবসর হইয়াছ? পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ, এ জগতের আরম্ভও নাই।”

শেষও নাই, আরম্ভও নাই!

সাব্বের মন অসীমের ভার বহিতে পারে না। ঘলিকণা হইয়া কিরণে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কলনা মনে ধারণা করিব?

অমুবীক্ষণে ক্ষুদ্র বিন্দুতে বৃহৎ জগৎ দেখা যায়। বিপর্যায় করিয়া দেখিলে জগৎ, ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়; অমুবীক্ষণ বিপর্যায় করিয়া দেখ। ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া ক্ষুদ্র কণিকার দৃষ্টি আবদ্ধ কর।

আগাদের চক্ষুর সমক্ষে জড়বস্তু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। অগ্নিদাহে মহানগর শুল্ভে বিলীন হইয়া যায়। তাহা বলিয়া এক বিন্দুও বিনষ্ট হয় না। একই অণু কখন যুক্তিকাকারে, কখন উত্তিদাকারে, কখন মহুয়াদাহে, পুনরায় কখন অদৃশ্য বায়ুরূপে বর্ত্তমান। কোন বস্তুরই বিনাশ নাই।

শক্তিও ত বিনশ্বর। এক মহাশক্তি জগৎ বেঁঠন করিয়া রহিয়াছে; প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এ মুহূর্ত্তে বাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্ত্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান্ নদীস্রোত বেরূপ উপলব্ধকে বার বার ভাদিয়া অনবরত তাহাকে নূতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তিস্রোতও সেইরূপ দৃষ্ট জগৎকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাদিতেছে ও গড়িতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই স্রোত অপ্রতিহতগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিবাম নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। সমুদ্রের এক স্থানে ভাঁটা হইলে অন্য স্থানে জোয়ার হয়। জোয়ার ভাঁটা উভয়ই এক কারণজাত, সমুদ্রের জলপরিমাণ সমানই রহিয়াছে। এক স্থানে যত হ্রাস হয়, অপর স্থানে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

এইরূপ জোয়ার ভাঁটা—ক্ষয় বৃদ্ধি—ভয়নের ছায় পৃথিবীর চতুর্দিকে ছুরিরা বেড়াইতেছে ।

শক্তির তবলও এইরূপ—ক্ষয় বৃদ্ধি, ক্ষয় বৃদ্ধি! প্রত্যেক বস্তু এই তরঙ্গ দ্বারা সর্বদা আহত হইতেছে—উপলব্ধও ভাঙিতেছে, ও গড়িতেছে । শক্তি-পেদিশ উর্দ্ধিমালা দ্বারা জগৎ জীবন্ত রহিয়াছে ।

এখন জড় জগৎ ছাড়িয়া জীব-জগতে দৃষ্টিপাত করি । বসন্তের স্পর্শে নিদ্রিত, পৃথিবী জাগরিত করিয়া, প্রান্তর বন আচ্ছন্ন করিয়া, উদ্ভিদ-শিশু অন্ধকার হইতে মস্তক তুলিল । দেগিতে দেগিতে হরিৎ প্রান্তর প্রস্রবিত । শরৎ কাল আসিল, কোঁথার সেই বসন্তের জীবনোচ্ছ্বাস । জীব পশু-ভূপতিত, তরুদেহ স্তম্ভিকায় প্রোথিত, শুষ্ক পুষ্পদল ! আগরণের পরেই নিদ্রা ।

প্রাণের বসন্ত ফিরিয়া আসিল ; শুষ্ক পুষ্পালে আচ্ছাদিত, বীজে নিহিত, নিদ্রিত বৃক্ষ-শিশু পুনরায় জাগিয়া উঠিল । বৃক্ষ, যত্নের আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল । সেই বিন্দু হইতে বৃক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিল ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতিজীবনে দুটি অংশ আছে । একটি অজয়, অমর;—তাহাকে বেটন করিয়া নব্বর দেহ । এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে । অমর জীববিন্দু প্রতিপুনর্ভবয়ে নূতন গৃহ বাধিয়া লয় । সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ঘেরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে । আদ্য যে পুষ্পকলিকাটি অকাতরে বৃত্তান্ত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে ।

কেবল তাহাই নহে । প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত ।

সুতরাং বর্তমান কালের জীব অনন্তের নক্ষিহলে দণ্ডায়মান । তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস, ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ ।

আর মানুষ ? প্রথম জীবকণিকা সমুদ্ররূপে পরিণত হইবার পূর্বে কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে ! অগাধ্যবংশরব্যাপী, বিভিন্নগতিগঠিত অনন্ত সংগ্রামে জরী, জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব !

আজ সেই কীটাত্মক বংশধর, দুর্বল জীব-স্রীর অপূর্ণতা ভুগিয়া অগীম বল ধারণ করিতে চাহে । আকাশ হইতে বিছাৎ কাহরণ করিয়া স্রীর রথে যোজন । কয়ে । অজ্ঞান ও অন্ধ হইয়াও পৃথিবীর আদিম ইতিহাস উদ্ধার করিতে

উৎসুক হয়। ঘনভিমিরাবৃত বদনিকা উন্মোচন করিয়া ভবিষ্যৎ দেখিবার প্রয়াসী হয়।

যদি কখনও সৃষ্ট জীবের দৈব শক্তির আবির্ভাব সম্ভব হয়। তবে ইহাই সেই দৈব শক্তি।

অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা, কিংবা এই সসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস—কোনটা অধিক বিস্ময়কর?

পূর্বেরে বলিয়াছি, এ জগতের আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এখন দেখিতেছি, এ জগতে ক্ষুদ্রও নাই, বৃহৎও নাই।

জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব এ কথা সর্ব সময়ের জ্ঞাত ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মল্লম্বে উন্নত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাস নিরাকার মহাশক্তি হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তৎসং বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে; উদ্ধীভিমুখেই, সৃষ্টির গতি। আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রদারিত।

ক্রীষ্ণগদীশচন্দ্র বসু।

হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা।

প্রথম প্রস্তাব।

হরিনাথ দস্ত চড়ে' কর্ডমেল ট্রেন—
দুর্গাপুন্ডার ছুটি—শ্বশুরবাড়ী আসিছেন।

এ কথা সত্য, যে হরিনাথ দস্ত
পাটিনার ঢাকবি করেন,—সে, ঢাকবির অর্থ
বলা কিছু শক্ত; কাবণ এটি ব্যস্ত
যে তিনি মাঝে মাঝে প্রত্যেকে তান্ত্র
কর্ডেন ঢাকার জড়ে, যেন তাঁর কন্ডায়
বিগ্নে করে অভাগিনী চিরঅবরুদ্ধাব
পিছু এবং মাতৃকুল করেছিলেন উদ্ধাব।

হরিনাথ উপস্থাস কবে' মেলা জড়
পড়িতেন দিবাবাত্র; কাম কর্ত্ত্ব বড়'
শিখেন নি; বসে' পড়িতেন কসে
কপালকুণ্ডলা আর দুর্গেশনন্দিনী,
স্মার দিবানিশি তাই ভাবিতেন তিনি।

হরিনাথের বাপের বাড়ী পাখনা জেলার;
বাঙ্গালদের আদিহান,—বিক্রপুং গাঁয়;
শ্বশুরবাড়ী হুগলীর গ্রাম পরিকায়।
তার স্ত্রী সত্য, শিক্ষিতা ও নব্যা,—
আবো সে (বলিতে গেলে সব কথা খুলে)
পড়ুছিলও বছর চাষের বালিকাস্কুলে।

—এখন বালিকাবা শিশুমে লেখা এবং পাঠ,
ঘটেই না ঘটে যৎসামান্য বিভ্রাট,—
তাব, বাধে নাক ঘোঁণা, চুল কেয়ায় তোকা,
সাড়ী এত বড় হয় যে বিরক্ত হব ঘোঁণা;
শান্তিপুত্র, বারামণী, ঢাকাই বার চুলোর,
পলে' এমন 'বম্বাই' বিশহাত লম্বা,
তাও এত কুচোর যে ঘোঁমটোতে না কুলোর;
তাব নীচে পরে কামিজ, ম্যাক্রেট পরে পায়ে;
পায়ে দেয়না আঁতা বৎ মোজা দেয় পায়ে;

তার উপর জুতো; ইত্যাদি, বস্তুতঃ
কীতাই তাদের স্থালাশ্রয়টোটে ওঠে জ্যোতি নানী,
বাঁপ মা হয় সর্পিবাণ্ড—ক্ষেপে যায় স্বামী ।

সোদামিনীর অবস্থাই ছিল সে সব দোষ;
কিন্তু তাতে বড় কেউ করিতেন না রোষ;
কারণ হরির খণ্ডব, বাগকাস্ত বহুব
টাকাব ছিল না স্বাকৃতি, তাই এ সব কল্পের
বহিজর্গভেগ কাছে যেত সব ঢেকে;
খবচ হ'ত না। দিতে কারব পকেট থেকে;
(গোলাকৃতি আকাশ, অনেক গুণ টাকাব
তিনিই এ কলিযুগেব পরব্রহ্ম নাকাব)
আবো এটা বলে বাণি, সোদামিনী অতি
রূপসী ও সাধ্বী, দৃশবর্বীষা যুযুতী ।
মোটো গত হোল, প্রাণ বাস নোল
দিবাছেন বিবে তাঁকে তাঁর মা বাপ,—
আব দুবার হরিব সঙ্গে চাক্ষুষ অলাপ ।
আটশব হরিব স্ত্রী থাকেন বাপেব বাড়ী;
দেখিতে তাই-তিনি হেন সোদামিনী
আসিছেন মহোন্মাদে চড়ে' রেলের গাড়ী ।

হরিনাথ দত্ত চড়ে ইন্টারমিডিয়েট ব্রাঞ্চে,
একখানি গাড়ী'ব বেঞ্চে বসে এক পাশে,
বাইরের দিকে চাচ্ছিলেন ও চিবুচ্ছিলেন পান,
আর তাঁর সঙ্গরূপ কচ্ছিলেন ধ্যান;
যে রূপ রাশি,—চাহনি ও হাসি,
পাবে নাক ধুঁরে এলেও বৃন্দাবন ও কান্দি ।
দেখবেন সে বধুব, মুণবাণি মধুব,
ভাকবেন কত ভালবেসে নাম ধরে সঙ্গব;
বলবেন কি কি কথা, কি কি রসিকতা,
কর্কেন সঙ্গরূপে তিনি বহুদিন পবে,—
ভেবে হরিনাথের মুখে হাসি নাহি ধবে ।
তিনি বাড়ী গিয়ে, যরের দুখোর দিগে
প্রথমতঃ ভাকিবেন সুখোঁধিরা "প্রিয়ে";
সহু বলবে "নাথ", তাঁব পরে বলবেন তিনি
"প্রাণেশ্বর, প্রিয়তমে, সহু, সোদামিনী";
দিবে উত্তর সহু, "প্রাণেশ্বর, বঁবু,
হৃদয়বল্লভ, এভো, প্রাণনাথ, পতি,
স্বামিন, জীবিতেশ্বর"—বলিয়ে যুযুতী
তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গনে তাঁব নিঃসন্দেহ,
মুচ্ছা বাধে—ঠেকাত্তে তা পাবিবে না কহ;

এই ভেবে হরিনাথের উৎখলিত প্রাণ,
চোখ হ'ল ছল ছল, মুখ হ'ল মান ।

বা হ'ক, নিশ্চয়, তাতে নাই ভয়;
ভালিলে সে মুচ্ছা সহু উত্তীৰ্য্য অচিবে
বলিবেই নিম্নতঃ ভাসি অক্লনীবে ।
"নাথ তব লাগি, নিশিনিশি লাগি,
কি হয়েছি ধেং'নাথ এ দেহ কি রহে
তোমার বিরহে নাথ তোমাব বিরহে ?
পাষাণধরব, নিটুব নিময়"—
"নিটবে আমার" তিনি বলিবেন চুপি,
"কিরাপে গিয়াছে দিন জ্ঞান, তা কি ভুপি ?"
দুই জন আলিঙ্গিয়া নিঃসন্দেহ পরে
কাদিবেন দুই বটা চোঁচা উচ্চঃস্ববে ।
ভানিতে ভানিতে আঁহা বিরহী সে হবি
কাদিতে লাগিল সত্যাই ভেউ ভেউ করি ।

পার্শ্বে একটি শুভ্রলোক—জানি না
লোকটি কে—

করসা তাঁব স্বং, একহারো চং,
'টুটসে বুদ্ধ, যেন আব সিদ্ধ,
'আর রসে ভরা, যেন মেব জবা,
বাব বাব তিনিই সেই হরিনাথের দিকে
চেরে চেরে দেখছিলেন উক্ত সব ব্যাপাব,
ভাবছিলেন এ সব লক্ষণ কি ক্র্যাপার ?
পবে বর্ণন দেখলেন তিনি আর্শি বাহির করে'
হরি সমুপেতে তাঁব বহুক্ষণ ধরে'
চেখে তাব পানে অতৃপ্তমনানে
মুখ টিপে হাসেন, আর আঁচড়ান মাড়ি,
আর কৌচান, গোড়ে, পরা' কালাপেড়ে;
বুঝিলেন ব্যাপার কতক, দূরদূর ছাড়ি
বসিলেন অবিলম্বে হরির কাছে এসে;
কল্পেন অহনি আলাপ স্বহৃৎ, দুতিনবার কেনে,
"মহাশয়ের নাম? নিবাস? কোথা হয় থাক?'
কোথা যান? কি কবেন? পান কত টাকা?"
ইত্যাদি বিস্তর প্রশ্নে করিয়া তদন্ত
জানিলেন বড়, ব্যাপার বা গুঢ়,
তাঁব নাথ, বাড়ী, 'নক্ষত্র ও নাড়ী'
জানিলেন সব—স্ত্রীর বয়স পর্য্যন্ত ।

এখন বুড়োব মাথায় উপর বসে বয়ে বয়ে
'বুলছিল সময়টা বেশী ভাবি হয়ে';
করিলেন ভুল্লোকটি মনস্ব অগত্য।
সময়কে নিয়মত কবিবারে হতল।

দ্বিজাশিলেন তিনি কের "পহিহিবেন কটায়"
উত্তরিলেন হবি "রাত আটটা কি নটায়"
— "চিঠী লিখেছেন?"

"বাক্সাল পেয়েছেন কি আসায়?"
চিঠী লিখে শশুরবাড়ী যায় কতু জামাই?"
— "সে কি বলেন?—আপনার যেতে হবে রাত
তখন সব যে ঘুমিয়ে পড়বে,
পানেন না যে ভাত।"

— "হয় কতু কি এ,—এক বছর বিয়ে,
ভাত পায় না জামাই নতুন শশুরবাড়ী গিয়ে?
যাব এমন হঠাৎ যে আনন্দের ঝড়ে,
বিবাহিণী সন্তু আসাব মুছায় বাবে পড়ে";
কিন্তু আগে চিঠি লিখলে হয় বড় মন্দ,
আপেতেই হয়ে যায় খানিক আনন্দ।"
এই বলে হরিনাথ আয়না ক'রে বের,
দেখে নিলেন গর্বে নিজেই চেহারাটি কের।

এখন ভুল্লোকটির স্বভাব একটু বসিক ধাঁজের
ছেড়ে দিয়ে তখন তিনি ও সব কথা বাজের;
বলিলেন কেশে, মুহূমল হেসে,
"মহাশয়ের চেহারাটি অতীত হুচল,
মনে ত পড়ে না এমন দেখছি যে কার";
তবে,—এক কথা ঠাট্টা এমন পরিপাটি—
চেহারাটি দাড়িতেই করিয়াছে সাজি।"
হরিনাথের সে বিষয়ে হ'ল কিছু সন্দ,
বলিলেন "ক্যান? কিস্তে দ্যাখিলেন সন্দ?"

— "জানেন না কিসে?—এমন বিষ্ময়ে—
কালো দাড়ি রাখে শুণু বাজাল আর সহসে,
এমন কোঁকড়ান, ঘন, এত লম্বা দাড়ি—
রাখে বাবুচি ও ডোম, দর্জি ও হাড়ি।
এখনকার দাড়িব ক্যাসন—করেননি পাঠও—
দাড়ি হবে সোজা, ছুঁচলো, কটা ও থাটো;
আ রাম। হেন, সৌন্দর্য ও ধেনো,
দাড়ি বুদ্ধিমান হয়ে রেখেছেন জেনেও।
এখনই কামিয়ে হবিসাবু কেলে দেন ও।"

শুনিয়া এ সব হরি ত নীরব;
ভাবিলেন 'তাই ত কিরূপে মারা হাড়ি—
ফেলে দিই এত দিনের যতনের দাড়ি?

ভুল্লোকটি বুঝিলেন হরিনাথের সন্দ;
বলিলেন পেনে, একটু আবার কেশে,
"এ—ঈ—বিশেষতঃ শিক্ষিতা দ্বী বত
দাড়িটা একবারেই করে না পছন্দ;
অতিশয় রাগে ও অতিশয় চটে।"
তখন মাগ্রে হরি বলিলেন "বটে?
সত্যি?"— "নর কি মিথ্যে—ভা

"কহিবাব মান্দে?"

এ কথাও কল্কাতাব সকলেই জানে।"
"কিষ্ট এ যে বহুদিনের?" বুলাইয়া হাত
আঁশ সান্বে ধবি, বলিলেন হরি,—
"এত যতনের, ফেলে দিব কি হঠাৎ।"
"দেবেন না ত দেবেন না, হোলে একটু সাফ—
আপনার মুখখানি, আসাব কি লাভ?"
এই বোলে একটু রাগ ভান কবে গিয়ে'
হেলান দিলেন, মুখ ঢেকে হাতের বহি দিয়ে।

"তাই ত, তাই ত" ব'লে ভাবতে

লাগলেন হবি—

"কামাব কি কামাব না?—এখন কি কবি?"

হঠাৎ ভুল্লোকটি বজেন, বহি ক'রে বন্ধ

"আব ছি ছি একি, আহন দেখি, দেখি;

হু এক গাছ যে পাকা, হোন্ দেখি বাঁকা,

ওঃ বাস। দাড়িতে আবার এমনও দুর্গন্ধ।

ওয়ার্ণ ওঃ-ওয়ার্ণ।"— "সত্যি নাকি?"—

"ওয়ার্ণ।"

কি গন্ধ! মা গো! আপনি বাজাল নিঃসন্দ।"

"বলেন কি?"— "দেখতে পান না? আপনি

কি অন্ধ।"

এ দাড়িও রাখে? ছাঃ! নিয়ে এই দাড়ি—

পেলে আপনি, মশায়, আপনাব শশুরের বাড়ী

ভাববে আপনাকে ডোম, বাঙ্গি, কি হাড়ি।

ওয়ার্ণ-ওঃ-ওয়ার্ণ—আপনার সন্তু—

এই দাড়ি দেখবে, এবং শুঁকবে সে যবে

চুনো খাওয়া দুবে থাকে—কথাও না ক'বে।"

এবার হলেন হরি সম্পূর্ণ পরাস্ত—

বলিলেন তখন তিনি হ'য়ে কিছু ব্যস্ত—

"মহাশয় দেখুন, উপায় কি এখন

এ দাড়ি কানাই কোথা?"— "কেন। বর্জমান।"

"সেখানে নাপিত আছে?"— "কত গণ্ডা চান?"

তখন ঠিক হ'ল, বর্জমানে থামলে পড়ি

হরিনাথ অবসরে কামিয়ে দেবেন দাড়ি।

সট্ সট্ সট্—শৌ, যট্ যট্—শৌ,
বর্ধমানের ক্রমে গাড়ি এল করে চৌ—
আর সেই বর্ধমানে যেই থামা গাড়ী,
নান্দলেন অমনি হরিনাথ কামাইতে দাড়ি।
সনিসেব অধেষণে, বর্ধমান ষ্টেশনে,
পেলেন এক নাপিত—কিঙ্ক কাব

কথা কে শোনে,

কারণ সেটি ১২৮২ সাল, বে সনে
নবীনের স্বীপাঙ্কর বিচাবেতে সেশনে;
সবাই ব্যস্ত সেই গল্পে, পড়েছে চিটিকান;—
অনেকের অনুনয়ে নাপিত কথাকিৎ স্বীকাব।

এখন দাড়ি অতি প্রবীণ, নাপিত অতি নবীন,
“বাকি সমস্ত ৮ মিনিট, এত তাড়াহাড়ি
হবে কি”—ভাবিল নাপিত—“কামান এ দাড়ি
খা' হ'ক সে বিষয়ে চিন্তা করিলেই ক্ষতি;
(সে নাপিতের পরসার দয়াকবও অতি)
বলিল “এক টাকা চাই কামা'তে এ সমস্ত
প্রবীণ দাড়ি।” করি স্বীকাব; করি তা'র ট্যাকস
প্রামাণিক ভাইব, ক্ষুর করে বাহিব,
বস! হল কর্ত্তে তাঁর চাপুখা জাহির।

চৌচা ডংকগাং কচাং কচাং
কাজিতে বাহিকের দাড়ি হইল নিপাত;
তাতে পড়ল সাবানের জল, ক্ষুরে পড়ল শান;
খ্যাস্ খ্যাস্ খ্যাস্, ক্যান্ ক্যান্ ক্যান্,
হল শীঘ্র প্রামাণিকের নৈপুণ্য প্রমাণ—
কাণ্ডেতে নিহত যেন অগ্রহারণের ধান,
গড়িল সে ক্ষুরে দাড়ি সেইমন্ত, আর
বাহিকের মুখ ক্রমে হ'ল পরিষ্কার।

এখন প্রামাণিক হাঁচি, লাগাইল কাঁচি—
দিকে অপরাধ, এমন গম্বয় বর্ধ-
মানে রেলের ঘণ্টা জোরে পড়ল তিনবার;
চং চং চং, চং চং চং, চং চং চং,
শোনা গেল সেটি অতি পরিষ্কার ও সাক;
—(পাঠকস্ব'শর এ সমস্ত বরিষণে মাপ
যদি গোলে ছন্দ, হয় কিছু মন্দ)—
হরি ত আর নেই—চৌচা মিলেন এক লাফ,
চাপব মাধ্যম ফেলে, লোক জন তেঁলে,
উঠিলেন বহু কষ্টে পুনরাব রোলে।

এখন বলি এখানেতে সত্য কথাটি কি—
তখনও সময়ের ছিল পাঁচমিনিট বাকি;
সেটি মোটে প্রথম ঘণ্টা: সংকলিই জানে
ছবাব ঘণ্টা চিরকাল পড়ে বর্ধমানে।
পাঁচমিনিট হরিনাথ বোসে রইলেন খাড়া,
তবে পড়ল ঘণ্টা ফেব তিনবার; তা ছাড়া;
এক্সিন ফলে, শৌ, পরে ফলে শৌ,
ভক্ ভক্ ভক্, টক্ যট্,
নড়িল সে গাড়ী, পবে সট্ সট্ সট্,
চলিল, ও প্লাটফর্ম ছাড়াইল চট।
গেল রেল-গাড়ী বর্ধমান ছাড়ি;
বইলই কামান অর্ধ হরিনাথের দাড়ি।

তখন ভ্রমলোকটি হেসে হরিনাথকে এসে
বলিলেন—“এফি ম'শয় বরিলেন একি?”
বলিলেন রাগিয়া হরি—“ম'শয় দেখুন দেখি,
আপনার কুপারামর্শে দাড়িব অবস্থাটি”—
“তাই ত একবারে দাড়ি কবেছেন সচী;
এমনও কি করে? তবে হয়েছে এক লাভ,
মুখের তবু কতকটা হয়ে গ্যাছে সাক।”

বোলে উঠিলে: ববে হো: হো: হো: হো: কোরে
ভ্রমলোকটি হাসলেন ১০ মিনিট ধ'বে;
হরিনাথ রইলেন বোসে চুপ করে বেগে;
হৃগলীতে থামলেন গাড়ী অতিশয় বেগে
ট্রেন থেকে-নেমে, “একটু না থেসে,—
(সবাই তাকায় তাঁর পানে সাহেব ও মেমে)
দিয়ে ছুট, তাড়া কবে এক বোড়াব পাড়ী,
হরিনাথ—কথাটি নেই, চৌচা মিলেন পাড়ী।”

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

রাজি প্রায় দুপুর, বাড়ীর মধ্যের উপর
সৌদামিনী আর তাঁর বোন এই দুইয়ে
জুড়ে তাঁদের সিঁদামায়ের দুই দিকে শুয়ে,
অকাতরে মটির মতন ঘুমোচ্ছেন গড়ে।
বাড়ী অতি শুদ্ধ, নাহি সাড়া শব্দ—
হেন কালে উত্তরিলেন হরি নোকা চড়ে;
হোল রেরি বেকুফিতে হরির নোকাব মাঝি—
তাই হবি খণ্ডরবাড়ী দু'প'র রাতে হামির।

মহা হুড়োহুড়ি, আব মহা ডাকাডাকি—

জ্বগে উঠিলো সবাই ভেবে 'ডাকাত

পড়ল নাকি ?'

চাকরেরা উঠে সব লাঠি কবে খাড়া,

হতভাগ্য হরিনাথকে কলে মহা তড়া ;

কঠী বাবু উঠে, ছাদে এলেন ছুটে—

কডাকড় হকুম দিলেন নৌচেতে না নামিই

"সার বেদম বজ্ঞাৎকো"—আমি।

আমি ! আমি !"

চীৎকারিলেন হরিনাথ "দেখুন নেমে এসে—

আমি"—আর আমি, চোঁচা তাঁর পশ্চাদ্বেশে,

পড়িল তিন লাঠি, যুদ্ধে নাহি আঁটি

হরিনাথ নিজ দেহে মাণিলেন মাটি।

সবাই তাঁরে বাঁধে, পরে নিয়ে কাঁধে,

নিয়ে এল বাবুর কাছে; সেখা তাঁরে নামাই

দিল মনঃপূতা জোরে, লুতো ;

কঠী বলেন "বেটা এখন ঠেকাখ তোরে কেটা ?

শীঘ্র নাম তোব বল শালা চোর ;—

দুগর রাতে ডাকাতি ?—কে ডুই বল

জামাই।"

"চোর নহি, ডাকাত নহি, শালা নহি—

জামাই।"

বলিলেন হরিনাথ ক্রমে হাঁপ ছাড়ি।

"জামাই"—তবে কোথা গেল একদিকেব

দাড়ি ?

কেটা বগামার্ক চোর, আবার বলে জামাই ;—

অর্দ্ধেক দাড়ি গেল কোথা ?"—ফেলেছি তা

কামাইয়ে।"

পরে পাঁহাড় সমান, হরি দিলেন প্রমাণ—

যে তিনি ডাকাইত নহেন, জামাইই বস্ত্রত ;

তখন স্বপ্নর মহাশয় দারণ অপ্রস্তুত, ও

লজ্জার যেন কাঁথা—চুলকাইয়া মাথা,

বলেন "বটে বটে, কিন্তু এমনও কি করে ?

চিঠি না লিখে হাজির রাত দুপ্রহবে।

ছিঃ রাস রাস, বলতে হয় নামও ;

এত লাঠি, 'আমি' ভিন্ন কথা নাহি হবে।

তাতে অর্দ্ধ দাড়ি হীন ; এমনও কি করে ?

এখনি অগত্যা হইত গোহত্যা—

অর্থাৎ—বাহকু শোণ্ডে যাও বাড়ীর

ভিতর গিয়ে।"

(স্বগত) "এ গরুর গন্ধেও দেয় মেয়েব নিয়ে।"

হরিনাথ শুলেন গিয়ে বিনা বহু কথা—

অভ্যর্থনার স্বর হল কিছু গুরু

হবে ইহা হগলীজেলার আদরের প্রথা—

পেতে দিলেও বৃষ্ণতাম হত কড়ামিটে ;

তা দিলে না মোটে মরি ক্ষুধার চোটে

পেটে পড়ল দ, এবং মাটি পড়ল পীঠে।

যাহোক, প্রিবার যুগপক্ষ্ম নেহারি,

পেটের ও পীঠের জ্বালা ভুলিতেও পারি।"

ভাবছেন হবি এইরূপ বিছানা উপরে,—

এদিকে সত্বর মা গিরে সহকে তাঁব জাগিরে,

অনেক ক্ষণ বুঝিয়ে, 'ভোগা' দিয়ে, বুঝিয়ে,

পাঠালেন সহকে হরিনাথের ঘরে।

প্রবেশিল ঘরে সহ সহ জুৎকম্প,

হবি অমনি উঠেই দিখে এক ছোট লক্ষ,

তারে বুকে নিয়ে, কহিলেন "প্রিয়ে—"

হল না করিতে বেশী সন্তাষণ মধুব—

"ওগো মেবে কেষ্টে গো"—মুছা হল সহব।

সহব মা উঠে—এলেন ঘরে ছুটে—

দেখিলেন সহ তাঁর ধন্য পড়ে লুটে ;

আর তাঁব জামাতা—পেকে তাঁর পা, মাথা

পর্যন্ত আড়ষ্ট, ষাড়া, যুখ কোরে যাক,

(একদিকে দাড়িহীন)—নিশ্চল নির্ঝাঁক।

দেখে গিল্লী জাম্বল, ঠিক তেলে-বেগুন,

বলিলেন চীৎকারিয়া "হুম্মান, কেরে,

সোনাব বাহা সহকে যে খেলেছিন্ মেরে ;

সোনার মেয়েটিবে আঁহা দিল কিরে

কাবতের ঢেঁকি, বুড়ো, এক হতচ্ছিরে ;

বাবুই ত ঘটাল এ, এত ছিল জানাই ;

আমি ত এ বরাবরই করিছিলাম মানাই,—

বেরো বুড়ো, বাড়ী থেকে বেরো শিবধিব

বেবো ;

দেখ্জিস্ কি চেবে ;—আঁহা সোনার মেয়ে

কপালের গেরো গো কপালের গেরো।"

তখন সহব মা কত মুখে জল দিয়ে,

সহকে বাঁচিয়ে, সঙ্গে চলে যান নিরে।

দেখে ব্যাপাব এই হরি ত আর নেই—

পেয়ে উক্ত তড়া না গিরে সাড়া

ভাবিতে লাগিলেন হ'য়ে সন্দের মত খাড়া ;

হোল ভদ্র আঁহা তাঁর সারা পথের আঁশা,

ভুলিয়া কি গেল সহ এত ভালবাসা ?

কই এরূপ চোঁচা মুচ্ছা স্বামী দশননে,
 ভূর্গেশনন্দিনী, কিংবা যুগ্মালিনী,
 গিরিছিল কভু যে, তা পড়ে না ত মনে ।
 চাহিল নাও ভাল করে, কহিল নাও কথা ।
 আরও ক্রাসাইয়ের এ কিরণ অভ্যর্থনার প্রণা,
 আহারের সঙ্গে মোটে নাইক নাম গন্ধ,—
 আদর স্বরু লাঠি জুতাধ—শেবে অর্দ্ধচন্দ্র ।
 যাহক্ এ সব ভেবে পাছে যান ফেপে,
 দীর্ঘ শাণি, ছাড়ি ধওরের বাড়ী,
 জাগি সারা বাত, আতে কামাইয়া দাড়ি,
 চোড়ে পুন সৌকা, ছ্যাকড়া আব রেল-গাড়ী
 সেই দিনই হরিনাথ পাটনার দিলেন 'পাড়ি' ।

নন্দ ।

প্রথমতঃ মিষ্টের কাজ কান্ধি দিয়ে, বড়
 প'ড়োনাক উপস্থাস,—যদি কিছু পড়
 নিতাম্ভই, 'পোড়ো' ভাল কাজের বহি; খেনো,
 উপস্থাসেব অধিকাংশই গাছাখুরি জেনো,
 দ্বিতীয়তঃ,—দাড়ি কভু তাড়াডাড়ি
 কামিও না; চোলে যার যাক্ রেল-গাড়ী;
 না হয় দেরিই হ'ল এক দিন বেতে শব্দবাবাড়ী ।
 তৃতীয়তঃ—কাউকে বেশী করোনা বিষাস,
 এবং নিজেব খাড়ীর কথা করোনাক কাস
 বার তাব কাছে;—এ জগতে আছে
 হরেক রকম লোক সেটা দেখে নিও শিখে—
 শেষতঃ, যেও না কোথাও চিঠি নাহি লিখে ।

D. L. R. m

✱ বাদসাহী আমোদ প্রমোদ ।

শিকার ।

'আকবর-নামা' প্রণেতা এক স্থলে বলিয়াছেন; "সাধারণ লোকে শিকারকে আমোদের কার্য্য বলিয়াই মনে করে। যাহারা আবার বেশী গাধুপ্রকৃতি, তাহারা অনর্থক প্রাণিহত্যার দ্বারের সৃষ্টিনাশ করা হয় বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকে। কিন্তু শিকারের মূলে, তাহাদের সহজ চক্ষু হইতে অতি দূর, এক নিভৃত স্থানে, এত মহান ভার নিহিত আছে, তাহা তাহারা দেখিতে পার না। যাহারা শিকারকে ব্যসন বলিয়া ভাবে, ইহার মূলে কোনও গভীর উদ্দেশ্য দেখিতে পায় না, ইহাকে রাজধর্ম্মের বহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদের ভ্রান্তি যে অতি শোচনীয়, তাহার সন্দেহ নাই ।" এইরূপ ভূমিকার পর তিনি আকবর সাহের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী হইতে শিকারসম্বন্ধে কতকগুলি মনোরম শিক্ষাপ্রদ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অসমর সাহিত্যের পাঠকবর্গকে বাদসাহী আমোদ প্রমোদের অন্তর্ভূত শিকারসম্বন্ধে কয়েকটি মনোজ্ঞ ঘটনা অবগত করাইব ।

শিকার বীরের ক্রীড়া। শক্তিশালীর শারীরিক শক্তির চরমোৎকর্ষের উদাহরণ। শিকারের যাহা আমোদ, তাহা ভারতের ক্ষত্রিয় নৃপতিগণই বিশেষরূপে বুঝিয়া গিয়াছেন। রোম ও গ্রীস এক সময়ে এই ব্যসনে মাত্তিরা জগতের সমক্ষে

অদ্বুত কাহিনী রাখিয়া গিয়াছে। আহেরিয়ার উৎসব রাজবারীর সময়ে সময়ে কতই না শোচনীয় ও বিপ্লবকারী ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে। শিকার—বীরের আনন্দোৎসব। আকবর নিজে অসাধারণ বীর ছিলেন, তাঁহার শিকারের বন্দোবস্ত কিরূপ নির্দ্ধারিত ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে পরিচালিত হইত, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাবলী হইতেই বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে।

• আকবর সাহের সভাসদ ও তাঁহার নিত্যসহচর, আবুল ফজল এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন,—“শিকার একটি মহাব্যসন, তথাপি বাদসাহ তাহার নিম্নস্তরে এক গভীর উদ্দেশ্য নিহিত রাখিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভাবে শিকারে বাহির হইয়া, সহস্র গ্রাম ও নগর মধ্যে ছদ্মবেশে উপস্থিত হইতেন। কেহ জানিত না যে, বাদসাহ আসিতেছেন। তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে সঙ্গী আমীর ওমরাহগণ অল্প পথে প্রান্তরে বা গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন। ছদ্মবেশে নগর ও গ্রাম মধ্যে, সরাইধানার বা অতিথিশালায় প্রবেশ করিয়া, বাদসাহ পাখার প্রকার মুখ, চুপ, অভাব, অভিযোগ সবই জানিয়া লইতেন। তৎপরে রাজধানীতে ফিরিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতেন।”

আকবরের শিকারণালী সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত চাষ্টাই প্রথা অনুমোদিত নহে। রাজপুত রাজস্ববর্গের সহিত ক্রমাগত সংমিশ্রণে ও আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক হিন্দুতাবে, রাজ্যের অসংখ্য বিভাগগুলির দ্বারা শিকারবিভাগেও তিনি প্রাচীন রাজপুতপ্রথার অনেক সংমিশ্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। শিকারের সময়ে মানসিংহ প্রভৃতি হিন্দু রাজস্ববর্গ তাঁহার অনুগামী হইতেন। অধীনস্থ উচ্চপদস্থ সেনানায়কদিগের বল, সাহস ও বুদ্ধিকৌশল পরীক্ষার জন্ত, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু, মুসলমান আমীর ওমরাহ লইয়া শিকারে যাইতেন।

“মীরশিকার”—মুগয়াবাপিরের প্রাধান্য কর্মচারী। তাঁহার অধীনে “করাওল” ও “বিজুমতিয়া” নামক দুই শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। বাদসাহের মুগয়েচ্ছা হইলে, “মীরশিকার” স্থাননির্বাচন করিয়া করাওল ও বিজুমতিয়াদিগকে পূর্বে পাঠাইয়া দিতেন। করাওলগণ “মীরশিকারের” নির্দিষ্ট স্থান বেটন করিয়া বাদসাহের জন্য অপেক্ষা করিত। সমস্ত আমীর ওমরাহগণও এই স্থানে তাঁহার অপেক্ষায় থাকিত।

বাদসাহ আসিয়া দলের সহিত মিলিলে, সমস্ত আমীর ওমরাহগণ তাঁহার সহিত কিয়দূর গমন করিতেন। মুগয়ার স্থান—আশে পাশে পাঁচ ক্রোশ, কখনও বা তদুর্দ্ধেও উঠিত। স্থানিক দূর অগ্রসর হইয়া বাদসাহ জনকতক বাছা

বাছা আমীর ওমরাহ সঙ্গে লইয়া আরও কতক দূর অগ্রসর হইতেন। পরে বতাই গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেন, ততই ইচ্ছা কবিতা সঙ্গীদের বিদায় দিয়া শেষে একক বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন। ববাহ ও মুগ শিকারেই এই প্রকার নিয়মের অনুষ্ঠান করা হইত।

ব্যাঘ্রশিকার ।

জীবিত ব্যাঘ্রশিকার সে সময়ের একটি বিশেষ আমোদ ছিল। ব্যাঘ্রশিকারের অনেকপ্রকার প্রথার প্রচলন ছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম উপাষটি এই;—বনের যে স্থানে ব্যাঘ্রের গতিবিধি থাকিত, সেই স্থানে একটি লৌহপিঞ্জর মুক্তিকার সহিত লৌহকীলক দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করা থাকিত। পিঞ্জরের মধ্যে একটি জীবিত ছোট গুঠ ছাপ থাকিত। ছাগটি একরূপ একটি লৌহবেষ্টনীর মধ্যে থাকিত যে, ব্যাঘ্র তাহাকে দেখিতে পাইলেও কোনও উপায়ে তাহার প্রাণনাশ করিতে পারিত না। পিঞ্জরের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত থাকিত। শার্দূলরাজ নধর ছাগবৎস দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কলকৌশলময় দ্বার আপনাই আবদ্ধ হইয়া বাহিত। দ্বিতীয় উপায়;—একটি সেবৎসকে ব্যাঘ্রের বাতারাতে গাথে একটি ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হইত। তাহার চারি ধারে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ ব্যাপিয়া খড়ের আঁটিতে গলান শিরীয় রাখাইয়া ছড়াইবা দেওয়া হইত। এই সম্প্রদায়ের উপর দিয়া আসিতে ব্যাঘ্রের গায়ে সেই খড়ের আঁটি লাড়াইয়া বাহিত, এবং শত টেঙা দ্বারাও সে তাহাদের প্রাস হইতে মুক্ত হইতে পারিত না। এই প্রকার অবহাশ শিকারিরা বন হইতে বাহির হইয়া, তাহাকে বর্ষার আঘাতে নিপাত করিত। তৃতীয় উপায়;—ব্যাঘ্রের গন্তব্যপথস্থ একটি বৃক্ষের মূলদেশে বা সন্নিহিতস্থ শাখায় একটি বিষাক্ত বাপ একপা ভাবে দোহলায়ান রাখা হইত যে, সামান্য সংসর্গমাত্রেরেই তাহা ছুটিয়া গিয়া ব্যাঘ্রের গায়ে লাগিত ও তৎক্ষণাৎই তাহাকে ভূপাতিত করিত।

আকবর সাহ কিন্তু এ সকল উপায় পছন্দ করিতেন না। কাপুরুষের ভাব কৌশলক্রমে প্রাণিবধ তাঁহার ননঃপূত হইত না। বনে বাঘ দেখিলেই শিকারি নিজে গিয়া তাহাকে রথ করিবে, ইহাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। একরূপ করিয়া অনেক সময় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার মহারাজ গানসিংহ এই প্রকার বিপদে পতিত হইবা মহাবাক্ষে জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন।

আকবর সাহের নূতন উদ্ভাবিত উপায়ে মহিষের উপর চড়িয়া বাঘ শিকার

করা হইত। কোনও বীরপুরুষ অস্ত্রশস্ত্রে অসম্মিত হইয়া ব্যাত্তকে আক্রমণ করিতেন। তেজবীর মহিষাসুরই শুদ্ধোৎক্ষেপণে ব্যাত্তগাত্র বিদীর্ণ করিয়া দিত। শিকারিকে বড় একটা বেশী পরিশ্রম করিতে হইত না। একরূপ দৃষ্টান্ত ভয়ানক। কখন কখন শিকারি একপ বিপন্ন হইয়া পড়িত যে, সকলের সহায়তার তাহার প্রাণরক্ষা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। *

আকবরের জীবনচরিতলেখক, একটি অন্তত শিকার-ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সেই মহাপ্রতাপাশ্রিত বীরকেশরী সম্রাটের পক্ষে একরূপ কার্য নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ঘটনাটি এই,—“আকবর সাহ একবার মথুরায় শিকার করিতে যান। সূজা খাঁ নামক এক জন ওমবাহ একাকী বনমধ্যে অগ্রসর হইয়া সহসা এক ব্যাত্তের সম্মুখীন হওয়ার তাহসহীন হইয়া পড়েন। আকবর সাহ পশ্চাতে ছিলেন। ব্যাত্ত সূজা খাঁর উপর লক্ষ্যপ্রদানে উদ্যত, কিন্তু সংসার আকবরের তীক্ষ্ণ ও স্থির দৃষ্টির অধীনস্থ হইয়া সে কুকুরবৎ ভুলুষ্ঠিত হইয়া পড়ে।”

হরিণশিকার।

ব্যাত্তশিকারের পরবর্তী আমোদ চিতা দ্বারা হরিণ শিকার। চিতাবাঘ অনেক কাজে লাগিত, আজকাল শিকারিসম্প্রদায় যেমন কুকুর প্রতিপালন করেন, + আগে শিকারের জন্য সেইরূপ চিতা প্রতিপালন করা হইত। আগরার দুর্গের মধ্যে চিতাবাঘ প্রতিপালন ও শিকারে শিক্ষিত করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর শিকারী বাঘ প্রতিদিন পাঁচ সের করিয়া মাংস পাইত। রবিবারে কোনও প্রকার প্রাণিবধের নিয়ম ছিল না, এজন্য শনিবারে, রবিবারের খাবার দিয়া রাখা হইত। প্রত্যেক

*-কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে এতদপেক্ষা দুঃসাধ্য শিকারের পবিচয় পাওয়া যায়। আফগান খাঁ নিজে রিক্তহস্তে এক ব্যাত্ত শিকার করিয়া “শের” উপাধি প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীর যখন নুবজাহানকে লাভ করিবার জন্য সিংহবিদগ্জ্ঞানশূন্য, তখন শের আফগানকে কোশলে নিহত কবিবাব জন্য সুগম্য ব্যাপদেশে বনমধ্যে লইয়া যান। সিংহগণ যখন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ব্যাত্তক্রমণে উদ্যোগী, তখন জাহাঙ্গীর বলিলেন, আমাব সঙ্গে কি এমন কোনও বীর নাই, যিনি রিক্তহস্তে, বিনা অস্ত্রে ব্যাত্ত শিকার করিতে পারেন? অপব সকলো এই আদেশপালনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে, শের আফগান তাহার মর্যাদাবক্ষা করেন।

+ মুসলমানধর্মের কুকুর অপ্স্রু। কিন্তু আকবর সাহ ইসলাম সম্বন্ধে ততদূর আব্রাহাম ছিলেন না বলিয়া, কুকুর পুষিতেন। তবে সেকালে কুকুরের অপেক্ষা “চিতার” আদরই বেশী ছিল। কুকুরভলি কাবুল হইতে আমদানী হইত।

শিকারিবাঘের জন্ত চারি জন করিয়া চাকর নির্দিষ্ট থাকিত। সুগরার সময়ে চিতা, কখনও বা শিকারীর সহিত অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও বা গাড়ীতে, এবং কখনও বা ডুলিতে নীত হইত। শিকার গুণ এমনি যে, এই শোণিতলোলুপ হিংস্র-জাতিও কুকুর বিড়াগাদি গৃহপালিত পশুর স্তায় প্রভুর সহিত অবাধে ও যথেষ্ট বিচরণ করিত।

চিতা বাঘের এত আদর ছিল যে, আজকালকার কালে কোনও পদস্থ রাজ-কর্মচারীর সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। “খাসা” বা সর্বশ্রেষ্ঠ চিতাগুলির শয়নের জন্ত অফিসদেপ্তার বহুমূল্য কার্পেট হৃতিকায় বিছান থাকিত। তাহার গলদেশের বন্ধনী স্বর্ণনির্মিত ও বহুমূল্যরত্নখচিত হইত। তাহাদের বহন করিবার জন্ত “মিহাকা” (ডুলি) ব্যবহৃত হইত। এই ডুলি কখনও বা হস্তিপৃষ্ঠে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও বা গোশকটে আরোহিত হইত, কখনও বেহারার পিঠয়ারির স্তায় ডুলির মধ্যে চিতা উঠাইয়া চলিয়া যাইত।

আকবর সাহের একটি আদরের চিতাবাঘ ছিল, তিনি আদর করিয়া তাহাকে “সমন্বমানিক” বলিয়া ডাকিতেন। “মানিক” রত্নরাজপথে বাহির হইত, তখন এক মহা হলস্থল কাণ্ড ঘটিত। চৌদোলার উপর “মানিক” একটা মস্ত আমীরের মত রত্নভরণে ভূষিত হইয়া বলিয়া থাকিত। স্বর্ণশৃঙ্গে চৌদোলার খুঁটির সহিত আবদ্ধ হইয়া সে চারি দিকে ভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। আগে পিছে নাকার বাদ্য হইতেছে; আর রাজপথে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। একপ দৃষ্ট আজকাল নিতান্ত বিরল, অবিখ্যাত ও অসঙ্গতদর্শন।

চিতা দ্বারা কেবল হরিণ শিকারই হইত। শিকারের তিন প্রকার নিয়ম ছিল। (১) উপল্লাটী, (২) রিঘ্নী, (৩) মুহারি। প্রথম প্রথামুসারে শিকারিরা হরিণ দেখিলেই চিতা ছাড়িয়া দেয়। চিতা দ্রুতবেগে হরিণের দিকে ধাবিত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করে। দ্বিতীয় প্রকার নিয়মে,—শিকার-দেখাইয়া দিয়া চিতাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চিতা একেবারে হরিণের উপর প্রকাশ্য ভাবে না পড়িয়া গোপনে গোপনে ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার অনুসরণ করে, তৎপরে তাহার উপরে গিয়া পতিত হয়। তৃতীয় প্রকার,—চিতা বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকে। এ দিকে যে গাড়ীতে তাহাকে বনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, বনের পথে সে গাড়ীখানি রাখা হয়। হরিণ সেই পথে গড়িয়া বুদ্ধিহারা হইয়া পড়ে। সে স্থির করিতে পারে না,—গাড়ীর মধ্যে, কি বনে, কোথায় তাহার

শত্রু লুণ্ঠানিত আছে। সে যেমুন কিংকর্ষব্যবিসৃষ্ট হইয়া, গতি মন্দ করিয়া দেখ
বা হির হইয়া দাঁড়ায়, অমনি চিতা সবেগে লক্ষপ্রদান পূর্বক হরিণের উপর
পড়িয়া উহাকে বিনষ্ট কবে।

আকবর সাহ "ছত্রমণ্ডল" নামে এক নূতনবিধ "চিতার শিকারের" উদ্ভাবন
করিয়াছিলেন। বাদসাহ সঙ্গিগণ সহ প্রচ্ছন্নভাবে বনমধ্যে একস্থানে অবস্থান
করিতেন, অল্প দিক হইতে চিতা ছাড়িয়া দেওয়া হইত। একেবারে অসংখ্য
হরিণ এইরূপে চারি দিক হইতে তাক্ত হইয়া তাঁহাদের ব্যূহের সন্নিকটস্থ
হইত। সর্কোপেক্ষা এই প্রকার শিকারেই আমোদ কিছু বেশী হইত।

আকবর সাহ হরিণ শিকারে বিশেষ অমুরক্ত ছিলেন; হরিণশৃঙ্গে তাঁহার

বিশেষ প্রয়োজন ছিল। * এতদন্ত হরিণশিকারের অন্য বিশেষরূপ পারি-
তোষিকও ছিল। বাদসাহের ত্রাস অনেক আমীর ওমরাহও চিত্রা পুতিতেন ॥

যাহার চিতা যত হরিণ মারিত ও যিনি যত বেশী শৃঙ্গ আনিয়া দিত্তে পারি-
তেন, তিনি তদনুসারে পুরস্কৃত হইতেন। এক এক সময়ে এক এক চিতার
পুস্তার এক নুদ্রা হইতে পাঁচ মোহরে পৌছিত।

আকবর সাহেব আর একটি সখ ছিল। চিতাগুলিকে গৃহপালিত করিয়া
তাঁহাদের ষোড় বাধিয়া দিয়া, তিনি নূতন শাবক উৎপাদনের অনেক পরীক্ষা
করিয়াছিলেন। বস্ত্রপশুর শাবকের সহিত গৃহপালিত শাবকের কিরূপ
পার্থক্য দাঁড়ায়, ইহা দেখিবার জন্য তিনি এরূপ করিতেন। কিন্তু বলা বাহুল্য,
তিনি ইহাতে সফলকাম হন নাই। আগরার চিতাখানায় প্রায় নয় সহস্র চিতা
প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইত। উগ্র স্বভাব ত্যাগ করাইয়া, ইহাদিগকে
সারমেয়ের ত্রাস আত্মাধীন করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হইত,
আকবর নিজে তাঁহাদের উদ্ভাবিতা ছিলেন। †

শ্রীহরিশাধন সুপোপাধায়।

* In this year (981. H.) His Majesty built several edifices and castles on the road from Agra to Ajmere. The reason was this. He thought it incumbent on him once a year to make a pilgrimage to the tomb (Dargah) of Muin-i-Chishti at Ajmere. He therefore had houses built at every stage on the road to the town. He also erected at every Kos, a Tower and had a well made near it. The Towers were studded with several hundred thousand horns of deer which His Majesty had killed during his life-time.—*Badooni II. P. 173.*

† ইক্বালনামায় আমরা দেখিতে পাই,—The Emperor (Akbar) during his youth was passionately fond of leopards. He had about ৩০০০ leopards collected during his reign and tried much to pair them so as to get cubs but in vain.—*Iqbalnmd Trs. P. 70.*

(স্বাক্ষর)

রাক্ষসবিবাহ।

রাক্ষসবিবাহের লক্ষণ ভগবান মনু এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

হস্তাঃ স্খিয়াঃ চ ভিষা চ ক্রোশাঃ কদভীঃ গৃহাঃ ।

এসহ কহাহবণং রাক্ষসো নিধিকৃত্যতে ॥

—মনুসংহিতা; ৩য় অধ্যায়; ৩৩

ইহার অর্থ—কন্তাপক্ষীর লোকদিগকে হনন করিয়া, ছেদন করিয়া, তাহার প্রাকারপুরজগাদি ধ্বংস করিয়া, বিলপস্থী রোক্তমানা কন্তাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষসবিবাহ। তবে, হননাদি কার্য সকল স্থলেই যে অবশ্য-করণীয়, তাহা নহে। যে স্থলে কন্তাপক্ষীর লোকে প্রতিপক্ষতা করিয়া হরণকার্যে বাধা না দেয়, সেই স্থলে হননাদির আবশ্যক হয় না। সেই অস্ত্র-ভাঙ্গার, মেঘাতিথি এবং টাঁকা-কর কুল্লুক ভট্ট উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা-স্থলে নির্দেশ করিয়াছেন যে—“কন্তাপক্ষাদ্বয়ং কারণে কন্তায় হরণং রাক্ষসো বিবাহঃ।” রাক্ষসবিবাহের অর্থ, বলপূর্বক কন্তাহরণ।

রাক্ষসবিবাহের অস্তিত্ব বা পূর্বাভিষেকের নিদর্শন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে রাক্ষসবিবাহ এখনও বহু প্রচলিত। যে সকল স্থলে প্রকৃত বলপ্রয়োগ অপচলন হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেও বলপ্রয়োগের ভাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক জাতি, যাহারা এক্ষণে সভ্যতার অভ্যুত্থান সোপানে সগারুঢ়, তাহাবাও পূর্বে যে রাক্ষসবিবাহ-পব্যয়ণ ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। অনেক স্থলে অসভ্য জাতির বৈবাহিক অন্তর্ভুক্তি রাক্ষসবিবাহের পূর্বাভিষেক এখনও সূচিত হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে বা কিছুকাল পূর্বে ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ;—

কোন নবীন যোদ্ধার জীগ্রহণের আবশ্যক হইলে প্রায়শঃ পরিবর্ত্ত নিয়মে এ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে; অর্থাৎ আপন পরিবার, কুল, বা জাতি হইতে কোন বিবাহযোগ্য কন্তা অপেক্ষে দিয়া, তাহার বংশীয়া বা জাতীয়া কোন কন্তাকে পক্ষীকূলে লাভ করিতে হয়। কিন্তু যদি তাহার কুল বা সম্প্রদায়ে সেই সময়ে বিবাহযোগ্য কন্তা না থাকে, তাহা হইলে বলপ্রয়োগ দ্বারা স্বকার্য-সিদ্ধির উপায় দেখে। ইহার পূর্বে হয়-ত সে কোন বালিকাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে। সেই বালিকার আবাসস্থানের আশে পাশে কিছু

কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং কোন সময়ে কেমন করিয়া তাহাকে অপহরণ করা যায়, তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে। তদনন্তর একদিন গভীর নিশায় অস্ত্রের অলক্ষিতভাবে সেই সুপ্ত বালিকার নিকটবর্তী হইয়া তাহার মস্তকে লুণ্ঠাঘাত করে; বালিকাও সেই আঘাতে অচেতন্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া কোনও নিভৃত স্থানে রক্ষা করে। পরে তাহার চৈতন্ত হইলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন কুটীরে লইয়া যায়, এবং ইহাতেই তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। কখন কখন একই উদ্দেশ্যে দুই জনে মিলিত হইয়া কার্য্য কবিত্তে অগ্রসর হয়। লুকায়িতভাবে কিছুদিন ধরিয়া তাহারা আপনাদের অভীক্ষিত বালিকাঘরের স্থিতিগতি ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করে। পুজামুপুজা অন্নসন্ধান লইয়া, তাহারা সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করে। যখন দেখে, রাজি-অন্ধকার, ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, অস্ত্র লোকের বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ঘোঁপ ঝাড়ের অন্তরাল দিয়া এমটি সুপ্ত বালিকার নিকটবর্তী হয়। তাহাদের একজন আপন সজ্জি বালিকার আলুলায়িত কেশদ্বারা মধ্য প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে ঘুবাইতে থাকে, এবং অপর জন তাহার হস্তস্থিত সজ্জি বালিকার কণ্ঠলগ্ন করিয়া রাখে। কেশাকর্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বালিকা সহজেই উপলব্ধি করে যে, অবিরোধে এবং বিনা বাধ্যব্যয়ে ইহাদের অনুগামিনী না হইলে মৃত্যু নিশ্চয়। কাজেই সে তখন অনন্তগতি হইয়া তাহাদের অনুগামিনী হয়। তাহাকে লইয়া গিয়া কোন দূর্ব্বস্থিত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়া, অপরাহ্নে হরণ করিবার জন্ত তাহারা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে, এবং উক্ত উপায়ে ইহাকেও হরণ করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, অপদ্রুত অঙ্কলক্ষ্মীসমভিযাহারে তাহারা বিজয়োল্লাসে আপনাদের আড্ডায় উপনীত হয়, এবং এই বীরোচিত কার্য্যের দ্বারা আপন সম্প্রদায়কর্তৃক-সাদরে ও সম্মোহনে অভিযুক্ত হয়। এইরূপ ব্যাপারনিবন্ধন সময়ে সময়ে দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়; সে বিবাদের প্রকৃতি ও পরিণাম বিবৃত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এই স্থানে ইহা বলিয়া রাখা উচিত যে, পরবর্তী ভ্রমণকারীদের লিখিত যুগান্ত-পাঠে বোধ হয় যে, সর্ব্বদা কলহ বিবাদ যুদ্ধাদি বাধে বলিয়া, এই গ্রন্থা এক্ষণে কতকটা পরিবর্তিত আকার ধারণ করিয়াছে, এবং জী-অপহরণের পোনাঃপুস্ত্রও অনেকটা হাস পাইয়াছে।

উনিয়াক, দ্বীপের অধিবাসীরা নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ আক্রমণ করিয়া তথাকার স্ত্রীসোকদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। স্ত্রী-অপহরণের জন্যই তাহারা এইরূপ সগরভিষান করিয়া থাকে। যুদ্ধকালে প্রতিপক্ষ জাতির স্ত্রীলোক অপহরণ করা কালিকর্ণিয়ার বোনকে জাতির সনাতন প্রথা। প্যাটাগোনিয়ার ইণ্ডিয়ানদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ প্রথা লাগিয়াই থাকে, এবং ইহাদের মধ্যে সকল স্থলেই যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ—পুরুষদিগের হত্যা এবং স্ত্রীদিগের অপহরণ। ওয়েন নামক জাতি এ বিষয়ে সকলের শীর্ষস্থানীয়। ইহারা প্রতিবৎসর ‘লোহিতপত্রের’ সময়ে পর্বত হইতে নাগিয়া আসিয়া হতভাগ্য কুয়েজিয়ানদিগের কুফর, অজ্ঞ এবং স্ত্রীলোক কাড়িয়া লইয়া যায়। কারীব জাতির মধ্যে অল্প জাতির স্ত্রীলোক অপহরণ করা এতই প্রচল যে, স্বামী এবং স্ত্রীকে এক ভাবার ব্যবহার কবিত্তে প্রায় কোথাও দেখা যায় না।

আফ্রিকা মহাদেশের অনেক প্রদেশে, অনেক জাতির মধ্যে বলপূর্বক কন্যাহরণের প্রথা প্রচলিত আছে; তবে, কোথাও বা এই বলপ্রয়োগ প্রকৃত, কোথাও বা কৃত্রিম অস্থানমাত্র। মেওরি জাতির প্রাচীন ও সাধারণ প্রথাও প্রায় এইরূপ ছিল। ফিলি দ্বীপপুঞ্জের প্রধান প্রধান দ্বীপগুলিতে, সার্মোয়াতে, তুকেপিগাতে, নবগিনিতে এবং ভাবতবর্ষের বহুজাতিদিগের মধ্যে বলপূর্বক কন্যাহরণ-প্রথা প্রচলিত আছে। ভারত-সাগরের দ্বীপপুঞ্জে ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার। উত্তরপশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার দিকে সাব জর্জ গ্রে লিখিয়াছেন যে, এখানে এমন অসংখ্য স্ত্রীলোক প্রায় দেখা যায় না, যাহার শরীরে বহু অঙ্গক্ষত চিহ্ন নাই। যাহারই সৌন্দর্য্যগোরব আছে, তাহাকেই বহুবার বহুজনকর্তৃক দাপ-হৃত হইতে হয়, স্ততরাং বহুবার আহত হইতে হয়;—বাহাকেই সে প্রত্যাখ্যান করে, সেই তাহাকে আশ্রিত করে। যাহার রূপ আছে, অক্ষত দেহে জীবনের পথ অতিক্রম করা তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব; তাহার জীবন বড়ই দুঃখ-বস্ত্রণাময়। ইচ্ছার, অনিচ্ছার, বহু পুরুষের সেবা তাহার পক্ষে অনিবার্য্য—প্রায় বিবিনির্ভয়ের ছার অবশ্যজ্ঞাবী। অনিচ্ছাকৃত যৌনসাহচর্যের বিড়ম্বনা এবং সপত্নীদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের জন্য হতভাগিনী পুনঃ-পুনঃ পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সে আশ্রয় ছাড়িয়া পলায়ন করে বাটে, কিন্তু রূপ তাহাকে ছাড়ে না; স্ততরাং সে পুনরায় ধৃত হয়, পুনরায় দুর্য্যবৃত্তি বৃন্দীকরণে নীত হয়;—পুনরায় সেই মর্ষণীড়া, সেই নিষ্ঠুর আশ্রিত, সেই নিশ্চয় অত্যাচার। পুনঃপুনঃ এই ভীষণ নাটকের অভিনয় হইয়া যখন তাহার

ঘোষনের অবসান হইয়া আইসে, তখন দেখা যায় যে, স্নাতাগিনী তাহার শৈশবের গৃহ হইতে বহুশতবোজনদূরবর্তী কোনও অজ্ঞাত দেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

মন্দিটো ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তা হির-হইয়া গেলে, এবং বৌতুক উপহারাদির আদান প্রদান হওয়ায় পুত্র, বর আদির কতকৈ ধরিয়া লইয়া যায়, এবং কঁজাপণের কুটুখিনীরা তাহাদের পশ্চাদ্ভাবন এবং বরের হস্ত হইতে কতাকে মুক্তকবিরার কুজিম চেষ্টা প্রদর্শন করে। অরোক্ষানীর জাতির মধ্যে বলপ্রয়োগের ভাণ করিয়া কতাহরণ করা বিবাহব্যাপারের অবশ্যপালনীয় পূর্বাহুষ্ঠান। এমন কি, কত্যা বরের যতই কেন পক্ষপাতিনী ও অমুরাগিনী ইউক না, সে যদি এই কুজিম অপহরণে বাধা না দেয়, এবং আত্মমুক্তির চেষ্টা না করে, তাহা হইলে নারীধর্মের অবমাননা করা হয়। কত্যা এবং কতাকর্তা সম্পূর্ণরূপে সম্মত থাকিলেও, ইউপে জাতির স্নাতকন রীতি এই যে, কতাকে প্রকৃত বা কুজিম বলপ্রয়োগপূর্বক হরণ করিতে হয়। তাহাদের বিবাহব্যাপারে আর কোনও অহুষ্ঠান নাই। ফিউজিয়ানদিগের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত।

বেচুয়ানা জাতির সম্বন্ধে কন্ডর সাহেব বলেন যে, ইহাদের বৈবাহিক অহুষ্ঠানের মধ্যে একটি এই যে, বরকর্তৃৎ কত্যা কুটীরে একটি শর নিক্ষেপ হয়। এই রীতি যে পূর্বপ্রচলিত রাক্ষসবিবাহেরই লোপাবশেষ, সহজেই তাহার উপলব্ধি হয়। ওয়ারাঙ্গা জাতির মধ্যে আত্ম-বিবাহ প্রচলিত, অর্থাৎ কত্যা ক্রয় করিয়া লইতে হয়; কিন্তু মূল্যাদি হির হইলে পর ইহাদিগকেও বলপ্রয়োগপূর্বক বা কোশলে কত্যা হরণ করিতে হয়।

পৃথিবীতে যে সকল জাতি এক্ষণে সন্মত, তাহাদের মধ্যে রাক্ষসবিবাহ আর প্রচলিত নাই বটে; কিন্তু পূর্বে যে ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় আদিদিগের মধ্যে যে রাক্ষসবিবাহ প্রচলিত ছিল, এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে উক্ত সন্মতবচনই তাহার প্রমাণ। বিচিট্রবীর্ষ্যের সহিত কাশীরাজ-কত্যাষয়ের বিবাহ রাক্ষসবিবাহ। অজ্ঞানের সহিত সুভদ্রার বিবাহ, মূলতঃ গান্ধার্কবিবাহ হইলেও, কার্যতঃ রাক্ষসবিবাহ। মনুর সময়ে রাক্ষসবিবাহ কেবল বীরধর্মী কুজিয়দিগেরই অহুষ্ঠান ছিল, অত্যাচার বর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল; কেন না, যে সকল বর্ণ যুদ্ধবিরত, তাহাদের অত রাক্ষসবিবাহের ব্যবস্থা বিড়ম্বনামাত্র। তবে এই নিষেধে-এমন বৃথাহিতে-

পারে যে, এককালে এই প্রকার বিবাহ সকল বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। অথবা এমনও হইতে পারে যে, বখন ভারতবর্ষীয় আখ্যাদিগের মধ্যে রাক্ষস-বিবাহ, সাধারণ্যেও নির্বিশেষে প্রচলিত ছিল, তখন বর্ণবিভাগ হয় নাই; বর্ণবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বীরধর্মী ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্ত্যস্ত বর্ণের মধ্যে রাক্ষস-বিবাহ অপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

হেলিকার্ণেসের দাইওনিসিয়স্ বলেন যে, রাক্ষসবিবাহ এক সময়ে প্রাচীন গ্রীসের সর্বত্রই প্রচলিত প্রথা ছিল। প্লুতার্ক বলেন যে, বলপূর্বক কস্তাহরণ-স্বচক অমুষ্ঠান স্পার্টানদিগের বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। পারকেলস্ নান্নী কস্তার বিবাহের যে বিবরণ হেরোদোটসের গ্রন্থে প্রকটিত আছে, তাহাতে রাক্ষসবিবাহ ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। সাকেলেরিয়স্ বলেন যে, গ্রীস দেশে এখনও, সময়ে সময়ে এক আধটা রাক্ষসবিবাহ ঘটে। রোমকদিগের মধ্যেও বর এবং তাহার বন্ধু বান্ধবেরা সশস্ত্র সমাগত হইয়া মাতা বা নিকট-আত্মীয়ের ক্রোড় হইতে ভীতিবিহ্বলা কস্তাকে বলপূর্বক লইয়া যাইত। আপুলিয়স্ তাহার ‘বলিনী কিশোরী’ নামক গল্পে এইরূপ হরণের একটি সমৃদ্ধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক কালে ইহা বৈবাহিক অমুষ্ঠান-মাত্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক সময়ে যে প্রকৃত বলপ্রয়োগ দ্বারা হরণকার্য সম্পন্ন হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। রমুলস্ কর্তৃক দেবাইন্ কুমারীদিগের হরণ, ঐটি রাক্ষসবিবাহের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিজুইন আরব-দিগের মধ্যে বরকর্তৃক কস্তাকে বলপূর্বক আপন তাঁবুতে প্রবিষ্ট করান বিবাহের অবশ্যপালনীয় অমুষ্ঠান। ইহাব অমুষ্ঠান একটা অমুষ্ঠান মগদশ শতাব্দীতেও ফ্রান্সের কোন কোন প্রদেশে প্রচলিত ছিল। লাপ্লাও, এস্‌থোনিয়া এবং ফিনল্যাণ্ডে পূর্বে রাক্ষসবিবাহ প্রচলিত ছিল; ফিনল্যাণ্ডের কোন কোন অংশে বিবাহামুষ্ঠানে এই প্রকার পূর্বাস্তিত্বের নিদর্শন আজিও পাওয়া যায়। ওলেনস্ ম্যাগনস্ বলেন যে, মস্কোভিতে, লিথুয়েনিয়ার এবং লিভোনিয়ার পূর্বে রাক্ষসবিবাহ ছিল। তিনি আরও বলেন যে, স্ক্যান্ডিনেভীয় জাতিদিগের মধ্যে জীহরণের উদ্দেশ্যে বা জীহরণের প্রতিশোধার্থে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত। প্রাচীন উইটটনের বিবাহার্থে জীহরণ সচরাচরই করিত। প্লাত জাতি প্রাচীন কালে রাক্ষসবিবাহপরায়ণ ছিল; রুষ এবং অন্ত্যস্ত প্লাত জাতির বৈবাহিক অমুষ্ঠানে আজিও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এমন কি, বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেও দক্ষিণপ্রদেশবাসী প্লাতদিগের মধ্যে প্রকৃত বলপ্রয়োগপূর্বক জীহরণ

প্রথা প্রচলিত ছিল। ঋতুধর্ম অবলম্বনের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত স্বান্দিনে-
ভীয়দিগের মধ্যে অস্ত্রবলে স্ত্রীলাভ করারই রীতি ছিল। ঋত্বীয় ধর্মগ্রহণের বহু
কাল পর পর্যন্তও সুইডেন দেশে বিবাহের জন্ত গিরুজায় বাইবার সময় জীগণ
পশ্চিমব্ধে সচরাচর অপহৃত হইত। সেই জন্ত বিবাহযাত্রায় লোকজনের সশস্ত্র
যাওয়া রীতি হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আক্রমণসম্ভাবনার ভ্রাস করিবার উদ্দেশে
বিবাহকার্য্য প্রায়শঃ নিশাকালে সম্পাদিত হইত। গণলগ্নের অন্তঃপাতী
হুসাবি নগরেব গিরুজায় কতকগুলি প্রাচীন বর্ষা রক্ষিত হইয়াছে, তাহা
আলোকাধারসম্বিত। শুনা যায়, পূর্বকালে ববযাত্রিগণ কর্তৃক ঐ সকল অস্ত্র
ব্যবহৃত হইত। আলোকদান এবং আশ্রয়লা, এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত
যে এই প্রণালীর বর্ষার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপবর্গের
উত্তরাংশে, বরের বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যাহারা সর্কাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও বিক্রম-
শালী, তাহারাই বিবাহযাত্রার সঙ্গিকপে গৃহীত হইত, এবং সেই জন্তই তাহা-
দিগকে 'বেস্ট মেন' (best men) বলিত। ইংরেজদের বিবাহে আজিও একজন
'বেস্ট ম্যান' থাকে; * ইহা কি রাক্ষসবিবাহের লোপাবশেষ? আমাদের
'নিত্য বর'ও কি তাই?

এইরূপে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল খণ্ডেই রাক্ষসবিবাহ প্রচলিত
আছে বা এক কালে ছিল,—যাহারা অসভ্য তাহাদের মধ্যে এখনও আছে;
যাহারা সভ্য, তাহাদের মধ্যে যে এক দিন ছিল, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে,
প্রাচীন সাহিত্যে এবং প্রচলিত বৈবাহিক অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়। তবে এ-
কথাও বলিয়া রাখা উচিত যে, বলপূর্বক স্ত্রীহরণমাত্রই রাক্ষসবিবাহ নহে।
যেখানেই বলপূর্বক স্ত্রীহরণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেইখানেই যে
হরণব্যাপারকে রাক্ষসবিবাহের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, এমন কোন
কথা নাই। অনেক স্থলে তাহা ইচ্ছিতৃপ্তির উপকরণসংগ্রহমাত্র। যুদ্ধে জয়-
লাভ হইলে বিজিতদিগের জীগণকে অন্তান্ত সামগ্রীর জায় লুণ্ঠ করিয়া লওয়া
এবং তাহাদিগকে উপপত্নীরূপে ব্যবহার করা, অনেক অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য
জাতির সনাতন ও সমাজানুমোদিত প্রথা। কিন্তু উপপত্নীসংগ্রহের স্থল
সকল বিচারপূর্বক বাদ দিয়াও, প্রকৃত রাক্ষসবিবাহের স্থলও এত অধিক অব-

* বিবাহের পর বরকন্টার বিদায়কালে তাহাদের প্রতি পুতানন জুতা প্রভৃতি সিক্কেপ
করা ইংরেজদিগের একটি রীতি। পূর্বপ্রচলিত রাক্ষসবিবাহেব নিদর্শন বলিয়া মনে না
করিলে, এই রীতির জন্ত কোনও প্রকার সমীচীন ও সমস্ত ব্যাখ্যা দেখা যায় না।

শিষ্ট থাকে যে, তাহার একটা সমীচীন ও বিজ্ঞানমূলক ব্যাখ্যার প্রয়োজন।
যে প্রথা একপ বহুপ্রচলিত, তাহার সূক্ষ্মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে দেখাইতে
হইবে যে, মনুষ্যজাতির আদিম অসভ্য ও জীবনপ্রণালীতে এমন কিছু ছিল,
যাহাতে রাক্ষসবিবাহ প্রয়োজনের হইয়া উঠিয়াছিল।

ম্যাকলেনান সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রথম আলোচনা হয়।
তিনি বলেন যে, বহির্বিবাহের নিয়ম হইতে রাক্ষসবিবাহের উৎপত্তি হইয়াছে।
এমন অনেক জাতি বা সম্প্রদায় এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, যাহাদের
মধ্যে অন্তর্বিবাহ, অর্থাৎ স্বজাতীয় বা সম্প্রদায়ভুক্ত কন্ডার সহিত বিবাহ,
একেবারে নিষিদ্ধ। জঁতরাং জঁলিভের জন্তু তাহাদিগকে অপর জাতি বা সম্প্র-
দায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু অসভ্যদিগের, যে কেহ আপনার দল-
ভুক্ত নহে, সেই শত্রু—“যে ঘরে বাস করে, সেই শত্রু”; “যে নিকটে বাস করে,
সে অরণ্য ও শত্রু”। কাজেই দলান্ত বা সম্প্রদায়ান্তর হইতে জীলাভ সহজে এবং
কিনা বলপ্রয়োগে হয় না—চুরি বা ডাকাতি করিয়া লইতে হয়।

কিন্তু এই বহির্বিবাহনিয়মের কারণ কি? ইহার একটা কারণ ম্যাক-
লেনান সাহেব এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন;—পবন বা নিকটবর্তী জাতি বা
সম্প্রদায়ের মধ্যে কণহ বিবাদ অসভ্যদিগের স্বাভাবিক অবস্থা। তাহাদের
স্বাভাবিক কলহপ্রবণতাবিধানই হটক, অথবা আহাৰ্য-আহরণ প্রতিযোগিতা-
নিবন্ধনই হটক, যুদ্ধবিগ্রহ, সর্বদাই তাহাদের মধ্যে লাগিয়া থাকে। নিভা-
যুদ্ধ করিবা তাহাদিগকে বাচিতে হয়; অথবা অরিতে হয়। আহাৰ্য-আহরণ
এবং যুদ্ধ; এই দুইটিই অসভ্য জীবনের প্রধান কার্য—কেবলমাত্র কার্য।
বলিলেও, অতুলি হয় না। জীলোক যুদ্ধ করে না, যুদ্ধকার্যে সাহায্যও করে
না; উপরন্তু যুদ্ধব্যাপারে অনেকটা বিষয়রূপ হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্ত
কন্ডাসম্মানহত্যার প্রথা অসভ্যদিগের মধ্যে বহু প্রচলিত। কাজেই ইহাদের
অপন সমাজে বিবাহের জন্ত জীলোকের বড়ই অগ্রতুল হইয়া পড়ে। একপ
অবস্থার অগ্র সমাজ হইতে জী-আহরণ ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু
অসভ্যদিগের পক্ষে আশ্চর্য সমাজমাত্রই শত্রুসমাজ, স্ততরাং তাহাদের ভিতর
হইতে জী-আহরণ সহজে বা সম্ভবে হয় না—কোনলে বা বলপূর্বক করিতে
হয়। অর্থাৎ চুরি বা ডাকাতি করিয়া লইতে হয়।

বহির্বিবাহনিয়ম হইতে রাক্ষস-বিবাহের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতের
বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, মেওরি, আহং প্রভৃতি অনেক অসভ্য জাতি

বহির্বিবাহপরাধ নহে, অথচ রাক্ষসবিবাহপরাধ। ইহারা আপন সমাজের তিতরেই বিবাহ কবে, অথচ বলপূর্ব্বক জীহরণ করাই ইহাদের প্রচলিত রীতি। সুতরাং বহির্বিবাহনিয়ম হইতেই যে রাক্ষসবিবাহের উৎপত্তি হইরাছে, এমন কথা বলা রাঙ্গ না—অস্বতঃ সকল স্থলে খাটে না। তবে, কল্পনাত্মক নিবন্ধন আপন সমাজে জীসংখ্যার প্রভুতা যে রাক্ষস-বিবাহের অন্যতম কারণ, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

রাক্ষসবিবাহের আর একটি কারণ হার্বাট স্পেন্সার নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বলপূর্ব্বক জীহরণের কারণ, আকাজিক জীলোকের লজ্জা, বা সহজে আত্মসমর্পণে অনিচ্ছা। এই লজ্জা বা অনিচ্ছা প্রকৃতও হইতে পারে, কৃত্রিমও হইতে পারে। এই অল্পমান যে অনেক স্থলে সম্ভব, তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, কস্তার অভিমানক বা আত্মীয়েরা কোন পুরুষের সহিত তাহার বিবাহ দিতে সম্পূর্ণ সন্মত, এবং কস্তা নিজেও হৃৎ তাহার পক্ষপাতিনী, অথচ বিবাহকালে আত্মসমর্পণ করিতে সে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রদর্শন করে, এবং বরের হাত এড়াইবার জন্য বিধিগত ও সাধ্যমত চেষ্টা কবে। একপ কবির উদ্দেশ্য, লজ্জাশীলতার সূচ্যোতি বজায় রাখা বা বৃদ্ধি করা। বিবাহ ব্যাপারে কিছুমাত্র ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইলে পক্ষসমর্পণগোলুপ বলিয়া পাহে তাহার অপবাদ হয়; এই জন্য সে তাহাতে প্রাণপণে বাধা দেয়। পুরুষ কাছেই তাহাকে বলপূর্ব্বক আরক্ত করিতে বাধ্য হয়, এবং এতদ্বিবন্ধন অনেক স্থলেই শোণিতপাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অবোকানীয় ও ইউপে চাঁতির কথা পূর্ব্বক উল্লেখ করিয়াছি। গ্রীনলন্ডের পূর্ব্ব-উপকূলবাসী অসভ্যদিগের সম্বন্ধে ডাক্তার নান্সেন বলেন যে; ইহাদের বিবাহকার্য্য কস্তার আত্মীয়দিগের সম্মতিক্রমেই হইয়া থাকে, কিন্তু রীতি এই যে, বর আসিয়া কস্তার কুটীবে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার চুল ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। কস্তা আত্মমুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে—আঁচড়ায়, কামড়ায়, চীৎকার কবে, প্রহাৰ করে, এবং পক্ষান্তরে নিষ্ঠুরভাবে প্রহারিত হয়। এতটা পৈশাচিক কাণ্ড চক্ষের উপর হইয়া যায়;—কস্তার আত্মীয় স্বজনবা অমানুষে ও বিনা বাক্যব্যয়ে দাঁড়াইয়া দেখে। একপ এবং এতদধরূপ অবস্থায়, কস্তার প্রকৃত বা কৃত্রিম লজ্জাশীলতা ও অনিচ্ছাপ্রদর্শনই যে পুরুষের পক্ষে বলপ্রয়োগের কারণ, একপ নির্দেশ অসম্ভব বলা যায় না। তবে একটা কথা এই যে, এই ব্যাখ্যা সকল স্থলে খাটে না। যে স্থলে ত্রি

বা শত্রু সমাজ হইতে বলপূর্ব্বক জী গৃহীত হয়—মনে রাখিতে হইবে যে সেই-রূপ স্থলই অধিক—সে স্থলে এই ব্যাখ্যা অপ্রযোজ্য ।

ফিনলণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক এডোয়ার্ড ওরেষ্টার মার্ক্স-রাক্সস বিবাহের আর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন ! বিবাহতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বিদ্বৎসমাজে আদৃতও হইয়াছে । তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা আপাততঃ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব । তিনি বলেন যে, নিকট সম্পর্কীয়ের সহিত বিবাহে মনুষ্যজাতির চিরবিরাগ । অন্তর্বিবাহপরায়ণ নিত্য অন্তর্জাতিগণের মধ্যেও এই বিরাগ প্রবল দেখা যায় । রাক্সসবিবাহ প্রধানতঃ এই বিরাগ হইতে উৎপন্ন । এই ব্যাখ্যার সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, অসন্তোষ নিকট আত্মীয় যখন লইয়া এক একটি দল বা ক্ষুদ্র সমাজ সংগঠন করে, এবং তদ্রূপ অন্তর্জাত ক্ষুদ্র সমাজ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করে । এই সকল ক্ষুদ্র সমাজের প্রত্যেকটির অন্তর্ভুক্ত লোক সকল প্রায়শঃ অস্বাভিকপরিমাণে শোণিতযুক্ত সম্পর্কযুক্ত । শোণিত-সম্পর্কহীন লোক একেবারে থাকে না, এরূপ নহে ; কিন্তু অধিকাংশের মধ্যেই নিকট বা দূর জাতিগণ বা কুটুম্ব থাকে, এবং অবস্থা বিবেচনা করিলে থাকাই স্বাভাবিক । কাজেই প্রত্যেক সমাজের লোককে জীলাভের জন্য অন্ত সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয় । কিন্তু অন্ত সমাজ হইতে জীলাভ সম্ভাবে হওয়া দুর্ঘট ; অন্ততঃ কস্তার পিতা বা অভিভাবকে ক্ষতিপূরণরূপ কিছু না দিলে কস্তা পাওয়া যায় না । কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ কবা অসম্ভাব্যের পক্ষে সুসাধ্য নহে । যাহা সহজে হয় না, তাহা কোশলে বা বলে সাধিতে হয় । এইরূপে রাক্সসবিবাহের উৎপত্তি । সামাজিক পরিণতির সেইরূপ অবস্থায় রাক্সসবিবাহ প্রচলিত হয়, যখন পারিবারিক বন্ধন অনেকটা দুর্ব্ব হইয়া অস্বাভিক-শোণিত-সম্বন্ধযুক্ত লোকের সমবায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ বিনিময়ের ভার উদ্ভিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । অসত্য সমাজ সকল পরস্পরের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে বলিয়া এই প্রণালীর বিবাহ সহজেই বন্ধমূল-হইয়া উঠে । কিন্তু কোন সমাজের কোন অবস্থায় যে ইহাই একমাত্র বিবাহপ্রণালী ছিল, এরূপ বোধ হয় না ।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ।

মাধবতটে-চিলামুরামের মহাস্তূপচ্ছায়ার নৈশগগনতলে অনাবৃত ভূমিশযায়
তৈলাপ নিশি যাপন করিতেছিল। এখন নিশাবশেষ, কিন্তু তখনো নীত-
লাকী ধনশী স্পর্শেও তৈলাপের নয়ন নিদ্রাহীন, কপোল স্বেদবিন্দুলাহিত, অধর
তুর্বার্ত। আগরণেই স্বপ্ন দেখিতেছে, কি দিগন্তব্যাপী অভ্রভেদী রূপচ্ছটা।
স্বস্তের পর স্বস্ত, সারি সারি কঠিন নিয়মবদ্ধ রূপের অরণ্য। তার কাছে
এই ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাস, শতপত্তপক্ষিদেবগুরুর্গুণীভিত পাথরের খেলাঘর।
তৈলাপের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু নবীন প্রতিভার নির্মল
জ্যোতিঃ সেই নবীন হৃদয় মুহূর্তের জ্ঞাত বিভাবিত করিয়া শরীর মন নবীন
আশার পুলকিত করিয়া আবার ধীবে ধীরে নিবিয়া আসিতে লাগিল। শত
বৎসর ধরিয়া শিল্পশ্রোত যে ধারায় বহিয়া আসিতেছে, কি শক্তির প্রভাবে
আজ তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে, এই সকল স্তূপাকার উচ্ছ্বাস প্রস্তররাশি
লইয়া আবার নূতন করিয়া মন্দির গড়িয়া তুলিবে।

আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, সেই নবীন মন্দিরের মাঝখানে, সেই রূপ-
অরণ্যের প্রাণস্বরূপিণী কি অপূর্ণ দেবীমূর্তি! তৈলাপের হৃদয়ে আর স্থান
রহিল না। প্রভাতসমীরণভাঙিত শিশিরমুক্ত একটি কুসুম তৈলাপের অঙ্গে
ধসিয়া পড়িল। সেই কোমল স্পর্শে চকিতের ভ্রায় তৈলাপ উঠিয়া বসিল। স্বে-
স্পর্শ না জানি কত মধুর, উন্মত্তকারী। আর সেই দেবীমূর্তি, তৈলাপ কোথায়
রাখিবে, হৃদয়মন্দিরে, কি প্রস্তরমন্দিরে। দূরে জুগন্তীর অম্বরশি, কি জানি
কি উত্তর দিল।

মহাসভা করিয়া রাজাধিরাজ চালুক্যবংশাধিপ কীর্তিবন্দী বসিয়া আছেন।
চৌদিকে অমাত্যবর্গ, দক্ষিণ পার্শ্বে পরাশর শেখর ব্রাহ্মণকুলতিলক সচিবশ্রেষ্ঠ।
পরশর বলিলেন, “মহারাজ। এই অপরিণামদর্শী বালকের হস্তে এ স্বরূপের
ভার সমর্পণ করা বিধেয় নয়। সত্য বটে, তৈলাপ পুরুষাত্মক শিল্পবৃত্তি
করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার আত্মাভিমানগর্ভিত ওজস্বিতা ব্রাহ্মণকুলেই
খোঁজা যায়; নীচ বৈশ্যকুলোদ্ভব প্রকাণ্ডকিহীন যুবর প্রভি আমার একটু-

মাত্র বিধান হয় না। ভাল, তাহাব মুখেই শুনা যাক, রাজচরণে তাহার ভিক্ষা কি।”

রাজাচ্ছা প্রাপ্ত হইয়া তৈলাপ অগ্রসর হইয়া ঘোড় হস্তে দাঁড়াইল। “মহা-
রাজাধিরাজ, রাজচরণে শিল্পব্যবসায়ী বৈষ্ণৱ তৈলাপের শতকোটা প্রণাম। আমি
বাজচরণে কিম্বা ভ্রাম্যণে অশ্রদ্ধাবান নহি। আপনার মন্দিরাজ্জায় জন্মগ্রহণ
করিয়াছি, আপনার মন্দিরচিন্তাতেই আমার দিবানিদি কাটিয়া যায়, অস্ত
চিন্তার অবসর নাই। রাজাচ্ছা প্রাপ্ত হইলে জীবন ব্রত সাধিত করি।”

রাজা। তুমি কি করিতে চাও।

তৈলাপ। যদি প্রয়োজনীয় রাজকোষ ও রাজশিল্পিগণ দাসের অধীনে
রক্ষিত হয়, তাহা হইলে এক শত বৎসরেও যে মন্দির সম্পূর্ণ হইল না, তাহা
দশ বৎসরে সম্পূর্ণ করিতে পারি।

মন্ত্রী ব্যঙ্গ হাসিয়া, বাজার দিকে একটু হেলিয়া বসিয়া ভাঁ কুঞ্চিত করিয়া
বলিলেন, “মহারাজ ! বুঝা কালহরণ হইতেছে, আপনার বশে আকৃষ্ট বহুদেশ-
বাসী বহুতর শিল্পী রাজাচ্ছাপালন আশায় বহিয়াছে, এই কুপমণ্ডুক গর্ক্সাদ্ধ
বালককে বিদায় দিন।”

কিন্তু মহাবাজা সেই আরক্তবর্ণাং, বস্পিতাধর, নবীনতমালজী যুবকের
জ্যোতির্ময় নয়নে কি একটা অপূর্ণ বিনয়গম্ভীর তেজঃপূর্ণ ভাষা গুলিড়েপাইতে
ছিলেন, মন্ত্রীর কথা তাঁহাব কর্ণে প্রবেশও করিল না। মহারাজা বলিলেন, “যে
রাজসাহাব্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহা, প্রাপ্ত হইয়া যদি দশ বৎসরের মধ্যে
মন্দির সম্পূর্ণ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাব কি দণ্ড বিধান হইবে?”

তৈলাপ। আপনার যে দণ্ড মনোনীত হয়, তাহাবই বিধান করিবেন,
নিফলকাম অভিশপ্ত জীবনভার, কে বহন করিতে চায় ? জীবনদণ্ড বিধান
করিলেই দাসকে কৃতার্থ করিবেন। কিন্তু রাজকুপা যদি আমার তাগো সত্যই
ঘটে, তাহা হইলে বাজচরণে আমার আর দুইটি ভিক্ষা আছে, আচ্ছা পাইলে
নিবেদন করি।

রাজা। আর কি ভিক্ষা আছে, বল।

তৈলাপ। রাজচরণে আমার এই ভিক্ষা যে, যদি এই মন্দিরের নির্মাণভার
দয়া করিয়া দাসকে প্রদান করেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ নুতন করিয়া মন্দির
নির্মাণ করিব। আর যে দেবী-পূজার জন্ত মন্দির গঠিত হইবে, তাহার
দেবীমূর্তিও আমিই বেন-নির্মাণ করিতে পাই।

মন্ত্রী তৈলাপের প্রতি স্তুতি কটাক্ষ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন, “মহারাজ! এ সভায় মন্ত্রী অনাবশ্যক, স্বয়ং রাজাই মন্ত্রী ও রাজা, শ্রীচরণে আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করি।”

রাজা। মন্ত্রী, অধীব হইও না, আমি সহায় করিতেছি; তৈলাপ; এই বহুবায়সাধ্য পূর্বপুরুষচেষ্টিত পুরাতন মন্দির অসম্পূর্ণ রাখিয়া নূতন মন্দির নির্মাণ করিতে সম্মত হইতে পারি না। এ মন্দির ত একরকম সম্পূর্ণ হইয়া আছে, কেবল মন্দিরের ছাদে মহাপ্রস্তর যোজন করা হয় নাই; আমার জ্ঞানাবধি কেহ তাহা পারিল না। তুমি যদি প্রথমে এই পুরাতন মন্দির এক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে পার, আর চৌদিকে যেমন বহুমূর্তিতে মন্দির শোভিত হইয়াছে, মন্দিরাগ্রভাগও তেমনি সুন্দর করিয়া মূর্তিগম্য করিতে পার, তাহা হইলে অভিনব মন্দির নির্মাণ করিতে তোমার যাহা প্রয়োজন, সকলই গ্রাহ্য করিব।

তৈলাপ বিনীত প্রণাম করিয়া বলিল, “আমি স্বীকৃত হইলাম।” মহারাজা বলিলেন, “এ কথাও স্মরণ রাখিও, বৎসরান্তে মন্দির অসম্পূর্ণ থাকিলে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।”

তৈলাপ বলিল “অবশ্য স্মরণ রাখিব।”

৩

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর কাণ্ড-অতিবাহিত হইয়া গেল। চৌদিকে বালুকাস্তূপ নির্মাণ করিয়া, অসামান্য বুদ্ধিকোশলে দুই এক মাসের মধ্যেই মন্দিরছাদে সুবহু প্রস্তরখণ্ড যোজিত হইল। তার পরে মূর্তিগঠন আরম্ভ হইল।

পঞ্চ সহস্র হস্ত উর্দ্ধে মন্দিরচূড়ায় ক্ষীণ বংশভারায় একটি ক্ষুদ্র মঞ্চ নির্মাণ করিয়া শিল্পী শিল্পাচিনা করে। এক বৎসর সম্পূর্ণ হইবার দুই দিন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু একটি মূর্তিমাত্র গঠিত হইতেছে, তাহাও সম্পূর্ণ হয় নাই। এত দিন নিশিদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া কি গড়িল, আজ বুঝি তাহাই দেখিতে আসিয়াছে।

নিশি জিয়ামা, গভীরা, পূর্ণেন্দুবিভাষিতা। রজনীব নিগূঢ় প্রাণকোরকে, বসিয়া, মধুমত্ত ভ্রমরবৎ তৈলাপ সেই নিরুপমা প্রস্তরপ্রতিমার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। চাবি দিকে দিগন্ত মহাশূন্য, পদতলে অতিদূরে ফেনিমাগরবসনা ধরণী নিথরা, নিদ্রাগয়া।

তৈলাপ চিন্তামগ্ন। যাহা অন্তবে ও যাহা বাহিরে, যাহা ধ্যানে ও যাহা

কার্যে, তাহারই ভুলনা করিতেছিল। বার বার আকাশের দিকে চাহিয়া, শুভ্র উৎফুল্ল মহাব্যসনোন্নত সাগরের দিকে চাহিয়া, কোটি অনির্বচনীয় তারকার দিকে চাহিয়া, আবার তাহারি বিচার করিতেছিল।

তিন দিবসের পর প্রাণদণ্ডের আশঙ্কা। সে আশঙ্কা তৈলাপের হৃদয়ে এক-বারও আসিল না। শুধু এক অল্প মহত্তর আশঙ্কা কাল মেঘের মত তাহার সমস্ত হৃদয়াকাশ ক্রমে ক্রমে ছাইরা ফেলিতেছিল। তবে কি বুধাই উত্তম, বুধাই প্রাণপণ চেষ্টা? যে পরমা প্রীতি, পরমা শান্তি দারুণ পরিশ্রমের পর হৃদয়ে রাখিবে মনে করিয়াছিল, সে দেবীর চরণপ্রভাগও বৃত্তি স্পর্শ করিতে পারিল না। তবে বুধা মানবজীবনের অর্থ কি, এই মহাভ্রোতি বিভাষিত অনন্ত গগন ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ কি?

সকলুপ নিখাস ফেলিয়া নয়ন মুদিত করিয়া মস্তক নত করিল। সহসা হৃদয়ের মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া কি অপূর্ণ চম্ভিকার বিকাশ হইল। কি অপূর্ণ দেবীমূর্তি! সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত বিবশ হইয়া উঠিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারি দিকে মহাশূন্য যেন ঘুরিতে লাগিল। সম্ভোরে বংশ-নঞ্চ দুই হস্তে নুচ করিয়া ধরিল। “হে বিধাতা! তবে কি জীবনের পথ ভুল বুঝিয়াছি, প্রাণময়ী দেবীর অনাদর করিয়া ছায়া পূজা করিয়াছি?”

৪

নির্মলতোয়া কাবেরীর স্ত্রী কুলে শশ্পাশনে যুবক যুবতী কসিয়াছিল।

যুবতী। মিছে কথার আর কাজ নাই, বিলম্বে বিগদের আশঙ্কা। আমি সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। শূঙ্গরাজ আমার বিশ্বাসী ভৃত্য,—নৌকা আর অস্ত্র অস্ত্র পাথের সমস্তই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। এস, আর বিলম্ব করিও না।

যুবক। কোথায় বাইব, রাজ্যজ্ঞা পালন না করিয়া রাজ্যে কোথায় লুকাইলে রাজ্যরোয় হইতে পরিভ্রাণ পাইব।

যুবতী। সে ভার আমার উপর, জগতে রাজ্য রাজ্য একটি নাই; কোটি কোটি। এত বড় জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে দুইটি মানবের স্থান অনেক হইবে। সে সব কথার এখন কাজ কি? আমি ভাবিয়াছিলাম, এ সব কথা অনেক দিন স্থির করিয়াছি।

যুবক। স্থির কিছুরই নাই, আমার সমস্তই অস্থির, কিন্তু প্রিয়তমে! আর একদিন! এখনো ত আমার আর একদিন আছে।

স্ববতী। ছি, তুমি যে এত কাপুরুষ, তাহা আমি জানিতাম না। কাল রবি অস্ত গেলে ত তোমার মরণদণ্ড, নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কি বাঁচিবার আশা কর ?

বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ যেন সহসা রবিতেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, রমণীর বদন-মণ্ডলে যেন সহসা তড়িৎপ্রভা সঞ্চারিত হইল। দুই জনে উঠিয়া দাঁড়াইল। রমণীর কম্পিত হস্তে হাত দিয়া, অতি করুণ কোমল কটাক্ষে চাহিয়া যুবা বলিল, “প্রিয়তমে, তুমি ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে প্রাণ কিছুতেই স্বীকৃত হয় না। কাপুরুষ ? যে দিন তোমায় দেখিয়াছিলাম, যে দিন তোমাতে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, সেই দিন হইতেই ত সমস্তই বিসর্জন করিয়াছি। মরণে ভয় ! মরণ কি তুচ্ছ, তোমার প্রেমবলে তোমার বিরহ—তাহাও সহ্য করিতে বুক বাধিতেছি, কিন্তু—”

রমণী। তৈলাপ, দাসীর অপরাধ মার্জনা কর। তোমার সত্য পালন কর, যাহাতে স্থগী হও, তাই কর। সংসারে আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি জানি—কুল মান লজ্জা, রমণীর যাহা কিছু,—সব গিয়াছে, শেষে তুমিও বাইতে চাও, কিন্তু ব্রাহ্মণকূলে আগার জন্ম, মরিতে ভয় পাইব না।

অশ্রু আসিয়া কণ্ঠ বন্ধ করিল। যে গিলন কথার, নয়নে, রূপে, যৌবনে দুটি প্রাণ কিছুতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছিল না, সে আজ সহসা কি জানি কোথা হইতে গগনবিচ্যুত শুভ্র পারিজাতকুম্বের মালার মত, দুইটি নবীন কণ্ঠে আপনি জড়াইয়া গেল।

সহসা বৃক্ষছায়ার অন্ধকার হইতে আর একটি মনুষ্যমূর্তি আসিয়া দুই জনের সম্মুখে দাঁড়াইল। চমকিত হইয়া উভয়ে প্রথমে তাহার ছায়া, তার পর সেই মূর্তির দিকে চাহিয়া দেখিল।

দর্শনমাত্র রমণী হতচেতন হইয়া পিতার পদপ্রান্তে গতিত হইল। কিন্তু সেই বিশালকার পুরুষের নয়নে অগ্নি জ্বলিতেছিল, এক মুহূর্তের জন্তও পদ-লুপ্তিত রমণীর দিকে চাহিয়া দেখিল না। পিশাচকর্কশ কণ্ঠে বলিল, “কলঙ্কী, চোর, তৈলাপ, ব্রাহ্মণের কূলে এই কলঙ্ক দিলি, এই মনঃখেদ রহিল। পিপীলিকার মত ভোকে এনি চরণতলে দলিত করিতাম, কিন্তু শূদ্রসম্পর্কে ব্রাহ্মণের হস্ত কলুষিত করিব না, কাল বধ্যভূমিতে রাজদণ্ডে চণ্ডালের হস্তে তোকে নরকে প্রেরণ করিব।”

তৈলাপের শরীর মন জড়পিণ্ড প্রস্তরের মত নিশ্চল হইয়া গেল। ক্ষেত্রসম্পন্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ধরণী তাহার জন্ত বিদীর্ণ হইল না।

পরশুর কন্ডাকে দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া, দ্রুতপদে অদূরস্থতি নিজ প্রাসাদের দিকে চলিয়া গেল ।

আকাশের কোটী তারা তেমনি চাহিয়া বহিন, পূর্ণিমার চাঁদ একটুও মলিন হইল না । দূরে কাবেরীতে একটা নৌকার মাস্তুল দেখা যাইতেছিল, আর প্রাসাদের গুল প্রাচীর পরে চন্দ্রালোকে দুইটি কাল ছায়া ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছিল ।

সহসা কোটী বৃশ্চিক দংশনের মত একটা হুতীর জালা, তৈলাপের কেশ হইতে নখাগ্র পর্যন্ত সর্বদিক দহন করিতে লাগিল । ঘোর উন্মাদে তাহার বাহু জ্ঞান লুপ্ত হইল । সেই নীতল নিশীথ সমীরণ ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ বেগে উন্মত্ত যুবা প্রাসাদের অভিমুখে ধাবিত হইল ।

পরশুর কন্ডাকে ভূমিতে নামাইয়া রাখিয়া তৈলাপের দিকে ধুবিয়া ঝাঁড়াইল । বিদ্যুৎ সিংহ যেমন শৃগালকে মুহূর্তের মধ্যে অবসন্ন করে, তৈলাপেব প্রচণ্ড আক্রমণে সেই মহাকায় বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ নিমেষেব মধ্যে বিকল হইয়া পড়িল । রমণী ঝাঁড়াইয়া উঠিল, ক্রোধে বেদনায় প্রায় জ্ঞানশূন্য, পিতাকে দুই হস্তে অতি যত্নে উঠাইল ; একবার ফিবিয়া চাহিল, দ্বির কণ্ঠে বলিল, “তৈলাপ ! এখন কিরিয়া যাও ।” পরমুহূর্তেই প্রাসাদের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া দেবী-মূর্তি অন্তহিত হইল ।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে মাত্র, সেই সময় হইতেই বহুতর লোক মন্দিরের চতুর্দিকে সমবেত হইতেছে । সকলেরই নয়ন উর্ধ্বে সন্মুখ । কৌতূহলবিস্তারিত, মঞ্চোপরি সেই একটি মূর্তি লইয়াই শিল্পী ব্যাবৃত । নীচে জনতা ক্রমে বাড়িতেছে, চীৎকার গোলমাল বাড়িতেছে, কিন্তু তৈলাপের নয়ন প্রস্তরে সন্মুখ ।

এদিকে প্রভাত হইতেই রাজার মহা অশান্তিতে সময় কাটিতেছিল । প্রভাতে দৌৰাবিক আসিয়া সংবাদ দিল, মহাকালের প্রধান পুরোহিত রাজাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন । আশীর্বাদের পরে পুরোহিত বড় গুরুতর সংবাদ প্রচাব করিলেন ;—মহাকালী স্বয়ং স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আদেশ করিয়াছেন যে, রৈখ্য তৈলাপের হস্তে ব্রাহ্মণের অবমাননা হইয়াছে । তাহার শোণিতে পূজা না হইলে, রাজা ও রাজ্য ধ্বংস হইবে । মহারাজ কাতরবচনে মহাকালীর পুরোহিতের কাছে সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহতির প্রার্থনা করিলেন ।

মুহূর্ত আকণ্ঠতবে শুভ্র স্নৈকততটে মহা রাজসভা । মন্ত্রী পরশুর বলিলেন—

সুখ্যাস্ত পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবার ত কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না, গান্ধার বিশ্বকর্মা অবতীর্ণ হইলেও সন্ধ্যার পূর্বে মন্দির যথানথকূপে সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন না। আর যে মূর্ধের একটা পুতুল গড়িতে এক বৎসর কাটিয়া গেল, তাহার উপর বিশ্বাস বিড়ম্বনা মাত্র।”

রাজা রক্ষস্বরে উত্তর দিলেন, “মন্ত্রী, তৈলাপ একটা পুতুল ছাড়া আরও কি গড়িয়াছে, আর সেই পুতুল বা কি প্রকার, তাহা না দেখিয়া তৈলাপের নিন্দা করা বিধেয় নহে।”

মন্ত্রী একবার পুরোহিতের দিকে কটাক্ষ করিলেন। পুরোহিত উঠিয়া রাজাব দিকে ফিরিয়া তার স্বরে বলিলেন, “রাক্ষরাজেশ্বর! মহাকালীর আজ্ঞা স্বরণ থাকে মেন।”

তখন সন্ধ্যার দু এক দণ্ড বিলম্ব আছে মাত্র। রাজা একবার তৈলাপের দিকে, তার পর মন্ত্রীও দিকে চাহিয়া একটু মুহূ হাসিলেন। তার পর সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ রাজবেদীর উপর আরোহণ করিয়া, সেই অসংখ্য জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মুহূৎ, প্রজা ও অমাত্যবর্গ! তে দৈবজন্মা শিল্পী এক বৎসরের মধ্যেই এই অসামান্য মন্দির প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন, এবং যাহার বধের জন্ত ঐ উচ্চভূমি আমরা স্থাপিত করিয়াছি, তিনি বৈষ্ণব নহেন, শূদ্র নহেন, তিনি ব্রাহ্মণ; আমি বিশেষ অনুমোদন করিয়া জানিতে পারিয়াছি, সগন্ধদেশীয় বলরাম শর্ম্মার পুত্র তৈলাপ; সে অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া বৈষ্ণব আশ্রয়ে প্রতিপালিত ও বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হয়।

মহা গৌণযোগ পড়িয়া গেল, বাত্যাভাঙিত সনুজের মত সেই মহতী জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। তৈলাপ শূদ্র নর, ব্রাহ্মণ, এ সংবাদ বিছাৎ বেগে মুখে-মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনই মন্ত্রী দাঁড়াইয়া উঠিলেন। “চালুক্য-পতি, অমাত্যবর্গ ও চালুক্য প্রজাগণ! মহাকালী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া এই তৈলাপের শোণিত আদেশ করিয়াছেন। সে ব্রাহ্মণপুত্র হইলে কি তাহার জগদগণী নয়নে তাহা অবিদিত থাকিত? এ কথা সত্য কি না, পুরোহিতশ্রেষ্ঠ তাহা বিদিত করিবেন। কোনও প্রবঞ্চক ধূর্ত রাজাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।” পুরোহিতশ্রেষ্ঠ উঠিয়া মন্ত্রীর সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন, “এ কার্যে অধিক বিলম্ব করিলে রক্ত কোপানলে সমগ্র রাজ্য ধ্বংস হইবে।”

রাজা বলিলেন, “অমাত্যবর্গ! তৈলাপের দণ্ডবিধান যদিও সকলেব অভি-

শ্রেত হয়, তবুও কি মূর্তি এই এক বৎসর কাল ধরিয়া সে নির্মাণ করিল, তাহা না দেখিয়া দণ্ডবিধান করা উচিত নহে ।”

সকলে সম্মুখে রাজার এ আজ্ঞা মনোনীত করিল । রাজা আশ্রয় হইয়া ছ এক জন অপর লোকের সাহায্যে তৈলাপ সেই মূর্তি শুভ্র বসনে মণ্ডিত করিয়া নীচে নামিয়া আসিল ।

যেখানে তৈলাপের বধ্যভূমি নিরূপিত হইয়াছিল, সেই উচ্চ ভূমির উপর সেই আবৃত মূর্তি স্থাপিত হইল । সমভূমিতে স্থাপিত হইলে কেহই দেখিতে পায় না । রাধা সিংহাসনপরিভ্রমণ করিয়া মূর্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, মন্ত্রী ও আর সকলে দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল ।

হিরণ্যদ্বিপক্ষেপে নিজের বধ্যভূমির উপর আরোহণ করিয়া তৈলাপ মূর্তি অনাবৃত করিল ।

কি এক অদ্ভুত ইচ্ছাজালে সেই কোটী মানব এক মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধ, রিমুখ, মায়াবদ্ধ হইয়া রহিল । অস্তাচলগামী সোহিত রবিকিরণ সেই শুভ্র, মনোমোহিনী মন্দির রমণীমূর্তির উপর পতিত হইয়া তাহাকে জীবিত, রক্তিম করিয়া তুলিল ।

সেই সময় সকলে আশ্চর্য হইয়া দেখিল, রাজার পার্শ্বে সচিবের সর্বাক্রম ক্রম্পিত হইতেছে, তিনি কণ্ঠে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; তিনি ক্ষীণ ভগ্নবরে বলিলেন, “মহারাজ ! যে মনোমোহী এই দেবীমূর্তি গড়িতে পারে, সে কখনই বৈষ্ণব নহে ; আপনি তৈলাপকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার তাহাতে কোনও বাধা নাই ।” সেই মহাসমুদ্রতীর মধ্যে মন্ত্রীর সেই জীর্ণ কণ্ঠ শ্রবণে শিশুর ক্রন্দনের মত শ্রুত হইল ।

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তৈলাপ ! তুমি কি করিয়া জানিলে তুমি বৈষ্ণবসন্তান ? অমাত্যবর্গ ও প্রজাবর্গকে নির্ভীকচিত্তে তোমার পিতা মাতার যথার্থ নাম বল ।”

তৈলাপ একবার মাত্র সেই পারাণমূর্তির দিকে চাহিয়া দেখিল । অস্তগামী রবির স্নিগ্ধ কিরণে সেই মধুর স্নিতাধর একটু কুণ্ঠিত, একটু গম্ভীর রাগে রঞ্জিত হইল । তৈলাপ নয়ন ফিরাইয়া রাজার দিকে চাহিল ;—

“মহারাজ ! আপনি দয়াজ্ঞানদয়, আমার পিতৃভূমি । কিন্তু আমি নির্ভীক-চিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমার জন্মদাতার নাম বাসবদত্ত, গর্ভধারিণী কঙ্ককী, আমি বৈষ্ণবুলোকভূত বৈষ্ণবমাত্র ; প্রাণ ভিক্ষা পাইলেও অস্ত্র কিছু হইতে চাহি না ।”

কথা শেষ হইতে না হইতে চক্ষের নিমেষে পরাশব জ্বলিত শার্দূলের মত সেই উচ্চভূমিতে লাকাইয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই শাপিত অসি আমূল তৈলাপের হৃদয়ে বিদ্ধ কবিল,—সেই প্রচণ্ড আঘাতেই সে হৃদয় বিনীত হইল। অসি নিজাক্ত করিয়া “রাক্ষসী, পিশাচী, ব্রাহ্মণকুহোর কলঙ্কিনী” বলিয়া বিকৃতের ছায় বিকট চীৎকার করিতে করিতে সেই মূর্ত্তির উপর আঘাত করিতে লাগিল। অসি ছই খণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু গুহগর্ভরময়ীর আদে দাগ পর্যন্ত স্পর্শ করিল না।

প্রথমে সকলে এই অলৌকিক লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পলক কেলিবার অবসর পাইলে রাজা অসি নিজাক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে তাড়না করিতে ধাবিত হইলেন। কিন্তু পুৰোহিত রাজার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া কেলিল, অত্র অত্র অমাত্যবর্গ “ব্রহ্মহত্যা! ব্রহ্মহত্যা!” বলিয়া রাজাকে নিবৃত্ত করিল। চারি দিকে ভুমূল কলয়ব হইতে লাগিল।

কিন্তু রাজা পবম ধার্মিক সভ্যপ্রিয়, সহজে বিরত হইলেন না। আগাদের পরমপবিত্র সনাতন ধর্ম্মানুসারে, শত্রুবধের অপরাধে ব্রাহ্মণের পঞ্চ কাৰীপণ কণ্ডবিধান করিলেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ৭৩৪।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

জ্যোতিষিক অনুমান।

বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী সফলতা সচরাচর দেখা যায় না; দেখা যায়, ইহা অনেক সময়েই ভবিষ্যদ্বক্তাব নিজেব হানিকর ও তাঁহার সনোগত উদ্দেশ্যসিদ্ধিব অন্তরাব হয়। বৃদ্ধ হইতে কলপতন ও মৃত ভেকের ঈষৎ পদকম্পন ইত্যাদি সনোবেব সহজ দৃষ্ট প্রাত্যহিক ঘটনাবলী হইতে যে শাস্ত্রের উল্লেখ আরম্ভ হইয়াছে, কোন প্রত্নতিব লোক ও কোন ঘটনা দ্বারা ভাষার পূর্ণ বিকাশ ও উন্নতি হইবে, এ সম্বন্ধ একটা সঠিক অনুমান করা, সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও, ইহা যে অতি কঠিন ও বিশেষ বিবেচনা মাণে'ক কার্য, তাহাতে জাব সন্দেহ নাই। সম্ভ্রতি প্রিন্সটন কলেজের প্রধান গণিতাতার্বা চার্লস ইয়ঙ্গ, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পূর্বাগর ইতিহাস আলোচনা কবিয়া, বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসবে কি কি নূতন জ্যোতিষিক আবিষ্কারেব বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা স্থির করিয়াছেন। ইয়ঙ্গের সকল অনুমানই সম্ভবগুর ও সম্পূর্ণ আশ্রয়ণি বর্জিত,—বর্তমান বিজ্ঞানসিবিগণের অমু-সন্ধান পূর্ববৎ সোৎসা'হে চলিলে এবং কোনও অভাবনীষ আবিষ্কার দ্বারা তাঁহাদের দৃষ্টি বিঘ্নাস্তবে আকৃষ্ট না হইলে, সাহেবেব সকল অনুমানেবই সিদ্ধিব বিশেষ সম্ভাবনা।

এখনেই ইনি পৃথিবীসম্বন্ধে যে সকল নবাবিকার সম্ভবপর, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। আর কয়েক বৎসর হইতে অগ্নিনি প্রদেশের উত্তরাংশের অক্ষাংশ (Latitude) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, বৈজ্ঞানিকগণ বহু চেষ্টাতেও এই পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন দৃষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই।

এই অক্ষাংশপরিবর্তনের পরিমাণ নির্দিষ্ট দেখা যায় না, কখন ইহা অর্ধ সেকেন্ড পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কখনও বা ঠিক সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর অক্ষাংশের স্থানচ্যুতি বা পৃথিবীর বা বায়ু আবরণের অবস্থাপরিবর্তনজনিত বায়ুপ্রবেশকালীন দূর্ব্যালোকগতির কোন প্রকার পরিবর্তন (Refraction) এই দুটির মধ্যে একটি অক্ষাংশ-বিজ্ঞাটের কারণ বলিয়া গণিতগণ অনুমান করিতেছেন। পৃথিবীর অক্ষরেখার স্থানচ্যুতি ইহার প্রকৃত কারণ হইলে, সেই হিসাবে সকল প্রদেশেরই অক্ষাংশের পরিবর্তন দৃষ্ট হইত, কিন্তু নানা অনুসন্ধানের অপব্যবহারে কোনই অনৈক্য দেখা যাইতেছে না—ইহাতে এখনটি কিছুতেই ইহার প্রকৃত কারণ হইতে পারে না বলিয়া অনেক গণিতজ্ঞই সতর্কপ্রকাশ করিয়াছেন; এখন দ্বিতীয় কারণটির সত্যতা পরীক্ষায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। বাহা হউক, বিজ্ঞানবিদগণ যে প্রকার সোৎসাহে বিষয়টির অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই, ইহার একটা নীমাসো হইবা অক্ষাংশ-পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীসম্বন্ধে, আবার দুই একটি আবিষ্কারের আশা করা যায়। যুক্তিকার স্বল্প ভূপৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্রাভিমুখে কি অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং পৃথিবীর প্রকৃত আকারই বা কি,—এই দুইটি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ভূতত্ত্ববিদ গণিতগণ ইহাদের নীমাসোর্থে বিশেষ চেষ্টা আছেন; হুতবাং শীঘ্রই যে প্রশ্ন দুটির প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহা আশা করা নিতান্ত বায়োজিক নয়।

কয়েক বৎসর হইতে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতিষী বরুন্ (Boys) তাঁহার নবোদ্ভাবিত তাপমাত্রা বস্তু (Radio-micrometer) বস্তু দ্বারা, চন্দ্রমণ্ডলের তাপনির্দ্ভাবণে চেষ্টা করিতেছেন, এবং কলাপরিবর্তন দ্বারা এই উক্ততার পরিমাণ কি প্রকার পরিবর্তন হয়, তাহাও আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন। এখন যাইতেছে, বরুন্ পরীক্ষাধিতে আংশিক সফলতাও লাভ করিয়াছেন,—বাহা হউক, পরীক্ষা শেষ হইলে, চন্দ্রমণ্ডলসম্বন্ধে যে অনেক নতুন কথা জানা যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত কোটোগ্রাফি সাহায্যে চন্দ্রের মানা অবস্থার ছবি তুলিয়া, যে সকল পর্যবেক্ষণাদি চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, শীঘ্রই চন্দ্রের উপরিভাগের ক্রমিক পরিবর্তনাদিসম্বন্ধে, মানা অজ্ঞাত সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

এই যে গেল পৃথিবী ও চন্দ্রের কথা,—গ্রহরাজ দূর্য্য সম্বন্ধেও নানা বিষয় এই সময়সমধ্যে আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা। আগামী ১৮৯৬, ১৮৯৮ ও ১৯০০ অব্দে, সাইবেরিয়া, ভারতবর্ষ ও যার্কিন প্রদেশে যথাক্রমে তিনটি সর্বগ্রামী দূর্য্যগ্রহণ হইবে; সকল স্থানেই ভ্রমতের সর্বপ্রধান জ্যোতির্বিগ্গণের সমাগম হইয়া বিবিধ পর্যবেক্ষণাদি হইবে,—এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ চলিতেছে। কিন্তু এই মহাবোজনের ফল কি হইবে, তাহার স্থিরতা নাই,—গ্রহণকালে আকাশের আবহাওয়ার উপর সকলই নির্ভর করিতেছে। দুই মিনিট কাল স্থায়ী, এক ঘণ্টা ক্ষুদ্র মেঘ, জ্যোতির্বিগ্গণের দীর্ঘপোষিত আশা ও বিপুল আরোজন ব্যর্থ করিয়া, সৌর-রহস্ত রহস্যের জন্ম ভাবিত রাখিতে পারে। বাহা হউক, আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকিলে, জ্যোতির্বিগ্গণ-বেক্ষণোপযোগী নবোদ্ভাবিত নানা যন্ত্রাদির সাহায্যে যে অনেক সৌর-গ্রহণের সমাধান হইবে,

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সৌরবর্ণচ্ছত্র (Solar-spectrum) কৃষ্ণ রেখা (dark-lines) সকলের উৎপাদক, প্রকৃতই সূর্যের বাষ্পাবরণ কি না, এবং উক্ত বাষ্পাবরণেরও বাস্তব ঘনত্ব আছে কি না,—এ সকল গ্রহণপৰ্য্যবেক্ষণ দ্বারা, এগুলির একটা সীমাসা হইবে, আশা হইতেছে; এবং সূর্যের ছটা-মুকুটেবও (Corona) প্রকৃত সিদ্ধান্তটি আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। আজ কাল, আমেরিকা ও যুরোপে বর্ণচ্ছত্র লইয়া যে প্রকার পরীক্ষাদি চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, সৌরবর্ণচ্ছত্র কৃষ্ণ রেখাগুলির সহিত রাসায়নিক পদার্থের প্রকৃত সম্বন্ধটি আর অজ্ঞাত থাকিবে না, এবং পার্শ্বি ঘটনার সূর্যমণ্ডলস্থ কৃষ্ণ চিহ্ন (Dark spots) গুলির প্রভাবসম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শীঘ্রই প্রচারিত হইবে।

অন্য দিন হইল সিয়াপেবেলি নামক জনৈক ইটালীয় জ্যোতিষী বুধ (Mercury) গ্রহের নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং চিবিদিনই যেমন চল্লিশমণ্ডলের একাংশ পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে, বুধমণ্ডলের একই ভাগ, সেই প্রকার নিম্নতই সূর্যের দিকে থাকে, ইহাও গণনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন। সিয়াপেবেলি এই আবিষ্কার দ্বারা জ্যোতিষিমণ্ডলে এক মহা আন্দোলন স্রোত উদ্ভিত হইয়াছে;—তাহার আবিষ্কারের সভ্যতাপরীক্ষার্থে যে প্রকার আয়োজন ও চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বুধগ্রহ সম্বন্ধে শীঘ্রই একটি সর্ববাদিসম্মত বিবরণ পাওয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত শুক্রগ্রহের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনসম্বন্ধে ঠিক চন্দ্রের মত বলিয়া যে একটি কথা উঠিয়াছে এবং মঙ্গল গ্রহের আকস্মিক পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রতিদিনই যে সকল নূতন নূতন সিদ্ধান্তের কথা শুনা যাইতেছে, ইহাদেরও একটি শেষ সীমাসা অচিরাৎ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। বুধমণ্ডলস্থ যে সকল রক্তবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, বর্তমান শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসর মধ্যে, সম্ভবতঃ সেগুলিও যুদ্ধকালে পরীক্ষিত হইয়া, তদুৎপাদক প্রকৃত কারণটি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

অধ্যাপক ষ্ট্রুভ (Struve) প্রমুখ কয়েকটি জ্যোতিষী শনৈশ্চরের উপগ্রহমালা ও অজস্র পৰীক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রয়াস আংশিক সফলও হইয়াছে,—ইহাতে বোধ হইতেছে, অল্প দিন মধ্যেই শনিব উপগ্রহাদিসম্বন্ধে অনেক নূতন বিষয় জানা যাইবে; তা ছাড়া বুথানস্ গ্রহের দ্রুতগতি দৈনিক পতি-রহস্তও বোধ হয় শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

এই অল্প সময় মধ্যে উল্কাপিণ্ড ও ধূমকেতু সম্বন্ধে কোনও নবাবিষ্কার সম্ভবপর কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। শতবর্ষব্যাপী আকাশ পর্য্যবেক্ষণে যে ফললাভ হ্রস্ব, একটি ধূমকেতুর উদয়ে তাহা সকলই সফল হইতে পারে,—তবে লিঙ্ক স্নানমন্দিরাদিতে যে সকল বৃহৎকার দূরবীক্ষণ নিৰ্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, পর্য্যবেক্ষণের অল্প সুযোগ ঘটিলেই, সহজে নানা তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়া পড়িবে। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, আগামী ১৮৯৮ ও ১৯০০ বৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পৃথিবীতে ভীষণ উল্কাবর্ষণ হইবে,—এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলে, উল্কাচক্রবিষয়ে আশানুরূপ ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

এই ত গেল সৌর পরিবারের কথা। এই অল্পকাল মধ্যে দাম্পত্য জ্যোতিষেরও বিশেষ উন্নতি হইতে বলিয়া বিবেচনা হয়। ফোটোগ্রাফি ও বর্ণিনির্বাচন যন্ত্র দ্বারা নক্ষত্রগণের প্রকৃতিসম্বন্ধে আজ কাল অনেক নূতন কথা জানা যাইতেছে; ইহাতে আশা করা যাইতে পারে, নব শতাব্দী আৰম্ভের পূর্বে অল্প বিষয় আবিষ্কার না হউক, পরিবর্তনশীল তারকা-শ্রেণীর (Variable stars) বিচিত্রতার কাণ এবং আরও কতকগুলি অপৰ্য্যবীক্ষিত নক্ষত্রের দূরবাদি নিশ্চয়ই নির্দ্বিধিত হইবে। ফোটোগ্রাফির ক্রমোন্নতি ও আধুনিক পর্য্যবেক্ষণ কার্যে ইহা বহুল ব্যবহার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, ইহাতে বোধ হইতেছে, অতি অল্পকাল

মধ্যেই দুবগীকর্ণের ক্যামেরাও পর্যবেক্ষণ কার্যের একটি অপবিভাজ্য অংশ হইয়া পড়িবে । নীহারিকামণ্ডল ও ছায়াপথ সম্বন্ধে অনেক তরঙ্গ জাজ কাল কেবল ফোটোগ্রাফির সাহায্যেই জানা যাইতেছে,—তাঁহাতে আশা করা যায়, নীহারিকামণ্ডলের বিকৃতি ও অবস্থানাদির বিষয় এবং ইহাদের সহিত নিকটবর্তী নক্ষত্রের সম্বন্ধ প্রভৃতি অতি জটিল ব্যাপারগুলি শীঘ্রই বোধায়ত্ত হইবে ।

একটি নূতন কথা ।

কয়েক বৎসর গত হইল অবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ মার্ক ডারউইন, নাক্ষত্রিক পৰিণতি বিষয়ে একটা নূতন সিদ্ধান্ত প্রচাৰ করিয়া, জ্যোতির্বিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছেন, অনেকের মতে গত চল্লিশ বৎসর মধ্যে, জ্যোতির্বিগণের প্রশংসা অসমাহান আবিষ্কার দেখা যায় নাই । ডারউইন বলেন, সৃষ্টির আদিমকালে পৃথিবী ও চন্দ্র একত্র হইয়া এক গ্রহাকারে বিদ্যমান ছিল; কালক্রমে ইহা ভরল এবং পদার্থাবস্থার উপনীত হইলে, পৃথিবীর ফিরদাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি হয় । ভ্রমশূন্যই শিশু চন্দ্র মহাবিশ্বে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কবিত্তে আরম্ভ করে, কিন্তু ভরল শৈশবের সে গতি স্থায়ী হইল না । পৃথিবী ও চন্দ্রেব এই তবলাবস্থায়, পবম্পর আকর্ষণ দ্বারা উভয়েই তীব্রণ বেলা উৎপন্ন হইত,—ইহারই ফলে চন্দ্র ক্রমে সহ-গতি হইয়া পৃথিবী হইতে অনেক দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহাব আকর্ষণবর্তন্যতিরও হ্রাস হইয়া, ক্রমে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে, ইহাকে একবারমাত্র পূর্ণাবর্তন করিতে দেখা যাইতেছে । ডারউইন বলেন, ইহারই ফলে চন্দ্রের একাংশ সকল সময়ই পৃথিবীর অভিমুখে উন্মুক্ত থাকে ।

এই অত্যন্ত গতি কেবল চন্দ্রেরই আছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা ছিল, কিন্তু আজ তিন চারি বৎসর হইল, সৌর-পরিবাসস্থ শুক্র ও বুধেব একই অংশ নিরন্তর সূর্য্যোত্তিমুখে থাকে বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে । ডারউইন বলেন, সূর্য্যেব অতি নিকটবর্তী এই গ্রহযুগলের গতি বেলা দ্বারা ক্রমিতে ক্রমিতে, আনাদের চন্দ্রের দ্বারা উপনীত হইয়াছে ।

ডারউইন প্রচাৰিত, এই জোড়ার ভাটার সিদ্ধান্তট দ্বারা, বনক ভাবকাব (Double or Binary Stars) গতি ও অবস্থানাদির কারণবিষ্কারেব চেষ্টা হইতেছে । বাসিনের হুপ্রসিদ্ধ গণিতবিৎ সী সাহেব, ডারউইনের সিদ্ধান্ত অবলম্বন কবিয়া, বিশ্বগঠনসময়ে নানা কুট বহুস্তেব উদ্ভেদ কবিত্তেছেন এবং যমক তারকা সম্বন্ধে নানা বিবর প্রাবিষ্কার কবিয়াছেন । আবিষ্কারের বিষয় বৃত্তিতে হইলে, যমক নক্ষত্র ব্যাপারটা কি, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক । সূর্য্যোপেক্ষাও বৃহত্তর দুইটি নক্ষত্র যদি এই উপগ্রহাদি পরিবার সহ তাহাদের সাধারণ ভার কেন্দ্রের চতুর্দিকে নিরন্তর পরিভ্রমণ কবে, তাহা হইলে এই ভ্রাম্যমাণ মহাসূর্য্যযুগলকে যমক তারকা বলে । যমক ভাবকাগণেব আর দুটি প্রধাণ লক্ষণ এই যে, ইহাদের প্রত্যেকের ভ্রমণপথের ব্যাসদ্বয়েব দৈর্ঘ্য অত্যন্ত অসমান থাকে অর্থাৎ সাধারণ জ্যোতির্বিগণেব ভ্রমণপথ অপেক্ষা, ইহাদের কক্ষ-অভ্যন্ত দীর্ঘায়তনবিশিষ্ট হয়, এবং প্রায়ই একটি নক্ষত্র অপরটি অপেক্ষা বহুগুণ বড় হইয়া থাকে । সী সাহেব পূর্ব্বোক্ত নূতন সিদ্ধান্ত অবলম্বন কবিয়া, যমক-নক্ষত্রগণের আকাবের বৈষম্য ও কক্ষের দৈর্ঘ্যের বেশ কাবণ প্রদর্শন কবিয়াছেন । ইনি বলেন, কোন যমক তারকাই আদিম কাল হইতে যমক নহ; সৃষ্টির সময় ইহারা এক নক্ষত্র-কারেই ছিল, পবে আবর্তনবেগেব আতিশয্যানুগতঃ সেই আদিম ভাবকা বিচ্ছিন্ন হইয়া, যমক নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছে । গণিত সাহায্যে সাহেবটি আরো দেখাইয়াছেন,—এই বিচ্ছিন্ন ভাবকাযুগলের পবম্পর আকর্ষণজনিত জোড়ান-ভাটা দ্বারা ইহাদের দূরত্ব ও ভ্রমণ পথের বক্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ।

বনক-নক্ষত্রাদি অনুসন্ধানকালে, সী সাহেব একট বড় নুতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। ইনি বলেন,—গ্রহোপগ্রহযুক্ত সৌরপরিবারকে, জ্যোতির্বিগ্ন এতাবৎ যে আদর্শ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলরূপে বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে সত্যের লেশমাত্র নাই; সৌরগ্রহদির জায় জুই জ্যোতিষ্কের সহিত, সুবোধ্য ঠায় একটা অতি বৃহৎ জ্যোতিষ্কের অবস্থান; অপর কোন নক্ষত্রপরিবারমধ্যে দেখা যায় না; আবার সৌরগ্রহাদির অগ্রগণ্য প্রায়ই বৃত্তাকার, কিন্তু অপর নক্ষত্রমণ্ডলীই একটা জ্যোতিষ্কেরও কক্ষ এ প্রকার বৃত্তাকার হইতে দেখা যায় না; ইহাতে সৌর পরিবারকে একটা সৃষ্টিছাড়া ও সম্পূর্ণ আদর্শের অনুরূপবোধী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীভিন্ন অপর কিছু বলা বাইতে পারে না। বাহা হউক, সী সাহেবের এই নুতন সিদ্ধান্ত দ্বারা অপর কিছু উপকার না হউক, ইহাতে ডাক্তার হোবেলের শিষ্যগণ, তাহাদের সাংখ্যিক সত্যের স্বপক্ষে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের যুক্তি পাইবেন এবং সৌরমণ্ডলীই যে কেবল জীববাসের উপযোগী, ও একটা সৃষ্টিছাড়া জ্যোতিষ্কপুঞ্জ, তাহা সপ্রমাণ করিতে আর অসমর্থীকর করিতে হইবে না।

বর্ণ ও আলোক।

আম্র কর্তৃক মাস হইল, বাঙ্গালার এশিয়াটিক সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক ও বিখ্যাত রসায়নবিৎ আলেকজেন্ডার, পেডলার বর্ণ ও আলোক সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন,—প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ মৌলিক। গত তিন চারি বৎসর ধরিয়া বর্ণের উপর আলোকের প্রভাবনিরূপণার্থে, নানা পরীক্ষা করিয়া এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই প্রবন্ধাকারে লিখিয়াছিলেন। পাঠক পাঠ্যকরণ দেখিয়া থাকিবেন, অনেক রঞ্জিত বস্তু কিছুদিন ব্যবহার করিলে, রৌদ্রে রাখিলে, বা অনাবৃত অবস্থায় কেলিয়া রাখিলে, কতকগুলির বর্ণ একদা লীন বিকৃত হইয়া যায় এবং কতকগুলি ক্রমে লুপ্তবর্ণ হইয়া গুরু হইয়া পড়ে,—এই বর্ণপরিবর্তন রঞ্জিত রেশম বস্ত্রাদি ও রঞ্জিত কাপড়ে প্রায়ই দেখিতে পাই। এ পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞানগ্রন্থে, এই বর্ণলোপের কারণ বিশদরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই, এবং কোন বিজ্ঞানবিদের দৃষ্টিও এই প্রত্যাহত ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয় নাই,—বাহা হউক, পেডলার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই।

সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অপর বর্ণ অপেক্ষা সাধারণ জৈবিক (organic) বর্ণ প্রায়ই বিকৃত হইতে দেখা যায়,—জৈবিকবর্ণরঞ্জিত দ্রব্যাদি বা এই বর্ণ মিশ্রিত জল, আলোকে বাহির না করিয়া, অন্ধকাবাজ্জর গৃহে বা বোতলহীন স্থানে তিন বৎসর পর্য্যন্ত রাখিলেও, তাহাদের বর্ণ অশুদ্ধ পরিবর্তিত হয় না; কিন্তু ইহাতে কয়েক দিনমাত্র সামান্য সূর্য্যকিরণ পড়িতে দিলে, অত্যুজ্জল বর্ণও একবারে লোপপ্রাপ্ত হয়। এই সকল পরীক্ষা দেখিলে, সহসা মনে হয়, সূর্য্যকিরণই বর্ণলোপের একমাত্র কারণ,—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়; পেডলার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, জৈবিকবর্ণরঞ্জিত পদার্থ বায়ুহীন স্থানে বদ্ধ রাখিয়া, উজ্জল সূর্য্যালোকে তিন বৎসর কাল উন্মুক্ত রাখিলেও, ইহাদের বর্ণবিপদ্য হয় না,—তবে যদি রঞ্জিত বস্তুগুলিও সাধারণ পুত্র বস্ত্রে জায় জৈবিকপদার্থনির্মিত হয়, তাহা হইলে কেবল, বর্ণের অত্যন্ত বিকৃতি দেখা যায়।

এক জাতীয় নির্দিষ্ট বর্ণে নানাপদার্থ রঞ্জিত করিলে, পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে বর্ণলোপ হইয়া থাকে। যে বর্ণ তরল পদার্থে মিশ্রিত হইয়া, অতি ধীরে ধীরে বিকৃত হইতে দেখা যায়, ঠিক সেই বর্ণরঞ্জিত জৈবিক পদার্থেব বর্ণ আবার দ্রুত একদালীন অদৃশ্য হইতে

দৃষ্ট হয়। এই সকল পরীক্ষা দ্বারা সাহেব স্থির করিয়াছেন,—একই বর্ষে তরল পদার্থ ও অপর এক জৈবিক বস্তু রঞ্জিত হইলে,—তবলের দ্বাং বহুকাল স্থায়ী হয় এবং জৈবিকের বর্ষ শীঘ্রই নিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আবাব উক্ত বর্ষ দ্বারা একটি অজৈবিক বস্তু রঞ্জিত হইলে, তাহার বর্ষ সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে বিনষ্ট হইতে দেখা যায়।

বর্ণনিকৃতি কার্যে আলোকের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ বলিয়া, আমবা সহজেই ইহাকে বর্ণলোপের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারি,—কিন্তু এ কার্যে জলের প্রভাবও বড় অল্প নয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, রঞ্জিত বস্তু কিঞ্চিৎ জলযুক্ত করিয়া রাখিলে, অতি শীঘ্র ইহাব বর্ণ নিকৃত হইয়া যায়। এই প্রকার নানা পরীক্ষা দ্বারা পেডলার সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—বর্ণ সকল দীর্ঘ জলসংযুক্ত বা জলীয় বাষ্প সংলিপ্ত থাকিলে, বর্ণনিকৃতি কার্যে আলোকের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সে বায়ু হিউক, এখন এই সকল বর্ণগরিবর্তনের প্রকৃত কাণ কি? শুভ্রতরে সাহেব বলেন,—ক্লোরিন বাষ্পাদি যে প্রকাব অক্সিজেন উৎপন্ন করিয়া জৈবিক বর্ণলোপ করে, জল ও আলোক কর্তৃকও ঠিক উক্ত প্রকারে বর্ণলোপক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে,—বায়ু অক্সিজেনই এই বর্ণলোপের কাণ। সম্ভ্রতি বেসানি (Von Gonup Besaney) নামক জনৈক বিজ্ঞান-বিদ, জল বায়ু মধ্যো থাকিয়া বাষ্পীভূত হইবার কালীন, অনেক ওজোন (Ozone) বাষ্প উৎপন্ন করে বলিয়া স্থির করিয়াছেন,—পেডলার বলেন, এই ওজনই জলনিজ রঞ্জিত পদার্থের প্রাপ্ত বর্ণ নিকৃতির কারণ। এতদ্ব্যতীত শুভ্র রঞ্জিত বস্তু সূর্য্যকিরণে রাখিলে, যে ইহারও বর্ণলোপ হয়, তাহার কাণও অক্সিজেন ব্যতীত আব কিছু নয়। বায়ু অক্সিজেনে আলোক পড়িয়া, ইহাকে ওজোন কিংবা অপর কোন তীব্র ক্রিয়াশীল বাষ্পে পরিণত করে,—ইহারই ফলে বর্ণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। *

শ্রীজগদানন্দ বায়।

ফুলদানী

এ জীবনে এ সমস্তা পূরিলা না মোর।

এ জীবনে এ সমস্তা পূরিলা না মোর।
যুবতী কি প্রোচা তুই? হা রে চিত্তচোব।
কখন নবীনী হয়ে,
গলা মোব জড়াইবে,
পরাণে-ভালিয়া দিস স্বপনের ঘোব।
ফুল কোটে, উৎস ছোটে,
বিহগেবা বেচে ওঠে,
মৌবন-বসন্ত সখি ফিরে আসে মোর।

কুহুমেব কোলা কোলি,
আবিরের খেলাখেলি,

প্রাণ কুদানন হয় উৎসবে বিভোব।
আবেশ-বিস্মল-বেশা,
আননে জিদিব-মেশা,
চরণে জলন্ত-বাগ, নয়নে কাছোর;
রাসলীলাময় হাস,
ফুমাংবরে সুপ্রকাশ,
এনেছ পুষ্পের রাশ; ভরিয়া আঁচোব।

* Vide proceedings of the annual-meeting of the Asiatic Society of Bengal, held on Wednesday the 6th February 1895.

তোরে, লো কুহকি,
কো দেখি, একি, একি,
গভীর তিমির-মগ্ন ছুই চক্ষু তোর ।
নবীনা চলিয়া গেছে,
বাহুগুণে বন্ধ আছে
মনধিনী ঘোষা এক—(হইবা কঁাকর,
হুধাই লো করবোড়ে—
ছলনা কোরো না মোরে)
এ জীবনে এ সমস্তা পূরিবে কি মোর ?
যুবতী কি প্রোচা তুই ? হা রে চিত্তচোর ।
২
এ জীবনে এ সমস্তা পূরিবে না মোর ।
যুবতী কি প্রোচা তুই ? হা রে চিত্তচোর ।

বনে ছিলে ক্ষুন্ন মনে—
কেন চায় নেত্রকোণে

দেখা দিল ছুই বিনু বিবাদের মোর ?
চুপি সেই অশ্রুবিন্দু
উপলিল শোক-সিক্ত ;
সোহাগে কোমলকণ্ঠবীণি বাহু তোর,
হুধাইল "বল, সখি, কি হয়েছে তোর ?
বসন্তের নব উষা
কেন তাল্লিরাছে হুধা ?

লজ্জা কি লো, বল, সখি, কি হয়েছে তোর,"
কোড়ে মোর মুখ ঢাকি,
পতাহ পুস্ত্রের লাগি,
কতই কেলিলি তুই নশনব মোর ।
সাধনা কবির কোণা,
আমারো প্রাণের ব্যথা
দেখা দিল অশ্রুজগে ; ঘামশ বহুব
পুত্রধনে লরে গেছে কুব কাল চোর—
তবু সে পোকেন ছায়া,
জুড়ি মাঝামাঝি কাণা,
বসে আছে ধাবে নারি । কোন্ মায়া ঘোর

বৈধেছে পবাণে তোব তিমিরের ভোর ?
কোড়ে লগে বসে আছি—
জানমনে ভাবিতেছি
হৃৎ হৃৎ ; হেন কালে, ছাড়ি মোব কোড়,

এবীণা উঠিয়া গেল—
দেখিলু নবীনা এল
খুকীরে লইবে কোরে পূর্ণ শশধর
ধরিবারে খুকী চায়—
"সায় চাঁদ, সায় সায়"—
নিখব গগন শুনি যুগ্ম স্বধাধব,
হাসিয়ে চলিয়া পড়ে পূর্ণ হৃৎধাকব
বহুকাপি লো কুহকি,
সত্য কবি বল, দেখি,
এ জীবনে এ সমস্তা পূরিবে কি মোর ?
যুবতী কি প্রোচা তুই ? হাবে চিত্তচোর ।

কল্পনার প্রতি কবির উক্তি ।

বল, বল, দেবকল্পা, আগার উপরে
কেন এত-দৌনাত্ম্য ভোমাব ?
এসাদি দিবার তবে এস দরজা ক'বে,
তবে কেন মুখ ভার ভাব ?
অপবের চিত্তগুহে, মন্থনগমনে যাও,
মুহুর কোমরী-রূপ ধবি ।
ধরিবা বিদ্যাং রূপ, কেন এস মোর চিত্তে ?
চমকি, প্রাণের রাজ্য বাঁধে থর ধবি ।
২

অপরের চিত্তবনে, ধীরে ফোটে ফুল—
ছিল বাঁহা পবাণের রেণু,
রবি-কর পিরে পিরে, হৃৎ সে মুকুল
হৃদীরে প্রকাশে ফুল তরু ।
হার কিস্ত মোর চিত্তে, হিন্দাজি-শিখরে যেন
অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চাব ।
পল্লবে, মুকুলে, ফুলে, হুবে পড়ে তরুলতা !
মুহুর্ত্তে একি গো রম । মর্ষ বোঝা ভার ।
৩

অপবের পার্শ্বে যাও, যেন শিশুসখি,
সাঁওতাল-প্রসূতির কোবে ।
এসব-বস্ত্রা-ব্যথা জানে না রসনী !
ভাগ্যবতী পুত্রমুখ হেবে ।

* বলা বাহুল্য এই কবিতাটি লেখকের নিজ কল্পনার উদ্দেশে রচিত হয় নাই ।

এস কিস্ত মোর পাণে, কেন এ স্তরাল বেশে ?
আম্মা মোর হোল পাড় করি।
যেন ব্রহ্মবন্ধু দিয়া, গুন শব্দে সিংসবিধা
উরিলা ব্রহ্মার বজ্রা দেবী বাণীবনী।

চল, চল, পুষ্পরথে আরোহি, পু
হরি-নাম ব্যর্থ নয় গণিকারে।

বারাঙ্গনা ।

অপবেব চিত্তে বাও, বিচিত্র উদ্যানে,
যেন কোন স্থলর ফোরাবা।
সখিব কৌচড় হ'তে, ছোট ছোট ইল্লখমু
কাড়ি লব্ধ, প্রতি স্নানবাবা।
এস কিস্ত মোর চিত্তে না এত্রা প্রপাত মত;
গঙ্গোত্রিব গঙ্গাব নতন।
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে, ভীষণ তরঙ্গরাশি।
টলমল টলমল হিমাজি-ভুবন।

গণিকা ।

"চল দেবি স্বর্গে চল," কহিলা নারদ,
হরিব মধুর নাম বীণাব বজ্রারি;
মহর্ষিব রাতুল সে পদ-ফোকনদ
নেহারি, গণিকা কহে নয়ন বিফারি,
"চারি ধারে বসদুত; ওই সারি সারি
অগ্নিকুণ্ড; আমা'র সহিত এ হলনা
কেন দেব? মর্ত্যে আমি ছিলাম বাবাঙ্গনা;
এ বোরবে মোর সম নাহি পাগাচানী।"
কহে কবি, "মনে নাই? সেই রঙ্গভূমি।
মৌপদী-বস্ত্র-হরণ অভিনয়-স্থলে
"কোথায় জীহবি" বলে ভেঁকেছিলে ভূমি,
ভাসি গেল রঙ্গভূমি নবনৈব জলে।

ধপাই মাথাই হবে কবিত লক্ষ্যতা,
এক বাচাঙ্গনা-গৃহে গিয়া উপস্থিত;
তর্জিমা এজ্জিমা কহে "রে বাববনিতা!
আমাদের হস্তে তোর মরণ নিশ্চিত।"
তস্ববের মূর্ত্তি হেরি উড়িস পবাণ;
ভয়ে বাবাঙ্গনা কহে "কোথায় ভগবান।"
"রাখু তোর ভগবান" কহিল লগাই
"আগে দে গহনা; দিন শেষেতে নোহাই।"
হেন কালে "হবি হরি" সন্দেশে উচ্চাবি,
কে যেন রে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহিল ফকারি।
বিস্ময়ে মাথাই বমে "এ বড় বালাই,
পিপ্লরের শুক দেয় হবির নোহাই।
চল বাই অস্ত্র স্থানে"—এই কথা বলি,
সসম্মানে তথা হ'তে গেল দৌড়ে চলি।
সে নিশিতে কুলটারো চমক ভাঙিল,
বেণ্যাবৃষ্টি ত্যাগ করি বোধিবী সাজিল।
কবিব এ আখিযুগ জলে গেল ভরি,
একবার সবে মিলে বল "হবি হরি"।
ভুলিস নে হরিনাম, কি স্থখে, কি হুখে;
ধূলার কুহম কোটে,
ভুব ভুব পক্ষ ছোটে;
হবিনাম ব্যর্থ নয় গণিকাবো মুখে।

মুশোরী ।

বে দিন আমি সর্বপ্রথমে পর্বতারোহণ করি; আমার জীবনের সে একটি
স্মরণীয় দিন। কারণ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া অক্লান্তভাবে পর্বতে পর্বতে
বিচরণ করার ধারান্ত্র নেই দিনে। পর্বতবিচরণের আনন্দ যেমন অতি অল্প
বারই অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এখন স্বীকার করিতে আপত্তি নাই যে, তত

ও আর কখন অনুভব করি নাই। আগল যত্নাশ্রোত কত বার জীবনের চতুর্দিকে কেনিল হইয়া উঠিয়াছে এবং বিপদের উপর বিপদ দুর্গম ও নির্জন গৈলপথে কত সময় আমার ক্লিষ্ট, ক্ষিপ্র, অবসন্ন দেহটিকে চূর্ণ করিয়া দিবার সম্ভাবনা জানাইয়াছে; অটল সহিষ্ণুতার সহিত ধীরভাবে সে সকল সহ্য করিয়াছি। তাহার পর যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমার সেই পুরাতন জীবনের অবসান হইয়াছে; জীবনের আর একটি অভিনব যুগে পদার্পণ করিয়াছি, কিন্তু সেই দিন, আমার পরিত্যক্তরোহণের প্রথম দিন, যে ভয় এবং সঙ্কোচ আমার কোতুকোদৌণ্ড হৃদয়ের মধ্যে স্বকম্প উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা অভিনব।

আমি যে দিন প্রথমে দেবাজনে বাই, সে যে খুব বেশী দিনের কথা তাহা নহে; তাহার পূর্বে পরিত্যক্তরোহণ দূরের কথা, পরিত্যক্তদর্শনও কোন দিন ঘটে নাই। মনে পড়ে বাল্যকালে হাবড়াব রেল চড়িয়া একবার বর্ধমান পর্যন্ত গিয়াছিলাম; পশ্চিমে কে কত দূর বেড়াইয়াছে, সেই কথা লইয়া বর্ষাকালে একদিন টিকিনের ছুটির সময় ক্লাসের ছেলেরদের মধ্যে ভারি তর্ক উঠিয়াছিল। সকলে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার পর আমি বলিলাম, “আমি বর্ধমান পর্যন্ত গিয়াছি,—সে অনেক দূর।” আমার এই সৌভাগ্য কয় জন বন্ধুব ব্রীতিকর হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু দুই একজন বয়োবৃদ্ধ বান্ধবের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সেই কথায় হয় ত একটি সমুন্নত গৌত সৌধ, সৌধশিখরে একটি সুসজ্জিত কক্ষ এবং সেই কক্ষস্থিত একটি অলোকহননরী রাজকন্ডার চিত্র পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল; বুঝি রত্নদীপের উজ্জ্বল আলোক তাহার সুন্দর মুখ এবং আশ্রয়স্থিত চক্ষু উপর পড়িয়া, তাহা উদ্ভাসিত করিয়াছিল; কে জানে যুবতী তখন মাল্যচর্চা করিতেছিলেন, কি কাহারও আশাপথ চাহিয়াছিলেন; বাহাই করুন, সেই বাল্যকাল হইতে আমার মনে কিন্তু উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ভ্রমণেব এতটা দুর্দমনীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, আমার নবজাগরিত কল্পনার দেখিতে পাইতাম ধূসর পরিত্যক্ত্রণী উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান বহিয়াছে, কুটিতলে মেথলার স্তায় শ্রামল তরুরাকী, উর্দ্ধে তুষারমণ্ডিত শুভ্র কিরীট, উপত্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার এবং সেই সকল কুটারপ্রান্তে ও বনাস্তরালে দণ্ডায়মান পার্শ্বত্যা অধিবাসিবৃন্দ; গৃহকোণবাসী বালকব অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহার প্রবাসের আনন্দ বিতরণ করিত। কে জানিত, এ কল্পনা একদিন সত্যে পরিণত হইবে?

কিন্তু আমার জীবনমধ্যাহ্নে সত্য মতাই এমন এক দিন আসিল, যে আমার মাতৃভূমির স্নেহময় কোড় হইতে বিচ্যূত হইয়া, সুদূর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে শান্তি এবং শৈত্য লাভের আশায় উপস্থিত হইলাম। অনেক দেশ অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের কোড়বর্তী দেৱাছন সহরের নিভৃত নিবাস অতীব মনোরম বলিয়া বোধ হইল।

দেৱাছনে আসিলাম রাত্রে, কিন্তু পৰ্ব্বতারোহণের সুখ লাভ করিতে পারিলাম না। দেৱাছনে আসিতে শিতালিক পৰ্ব্বতশ্রেণীর গথ্য দিয়া আসিতে হয়; কিন্তু শেষবাত্রে রেলের গাড়ীতে ছরস্ত শীতের মধ্যে ঘুমাইতে ঘুমাইতে পার্শ্বতাপ অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করা যায় না, তাই একদিন স্থির করিলাম, পদব্রজে গিরিপৰ্য্যটন করিতে হইবে।

দেৱাছন হইতে বেড়াইতে যাইবার প্রধান স্থান মুশোৱী সহর; মুশোৱী ইংৰাজবাজকৰ্মচারিবর্গের গ্রীষ্মাবাস; দেৱাছন হইতে অধিক দূর নহে, বার মাইল মাত্র। বিশেষতঃ প্রবাসীর নিকট তাহা একটি দেখিবার জিনিষ, সুতরাং দেৱাছনে আসিয়া তাহা দেখিবার জন্ত অধীর হইয়া পড়িলাম।

এখনও বেশ মনে আছে, এক শুক্রবারে বেলা প্রায় ১টা ব সময় মুশোৱী দেখিবার জন্ত দেৱাছন হইতে বাহির হইলাম। তখন গ্রীষ্মকাল—দেৱাছনে বেশ গরম পড়িয়াছে, সমস্ত দিনের রৌদ্রে পৰ্ব্বত যেমন ভগ্নানক গরম, রাত্রে তাহা আবার তেমনি শীতল; উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব; দেৱাছনে এই বিশেষত্বের আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করা যায়। আগি গ্রীষ্মোপযোগী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহির হইলাম, বন্ধুটির অহরোধে কিছু কিছু গরম কাপড়ও সঙ্গে লওয়া গেল। দেৱাছন হইতে একখানি ট্যাঙ্কম্ ভাড়া করিয়া রাজপুরে উপস্থিত হওয়া গেল। রাজপুর মুশোৱী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। দেৱাছন হইতে ইহা প্রায় পাঁচ মাইল, এখান হইতে সাত মাইল চড়াই অতিক্রম করিলে মুশোৱীতে উপস্থিত হওয়া যায়।

রাজপুর একটি সুন্দর সহর; বাড়ীগুলি ছোট ছোট, পথ ঘাট পরিষ্কার, অনেক ছোট বড় ইংরাজ এখানে বাস করেন। রাজপুরে আসিয়া ট্যাঙ্কম্ ছাড়িতে হইল, কারণ ট্যাঙ্কমে চড়িয়া এ চড়াই অতিক্রম করা যায় না। কাজেই এখানে আসিয়া পৰ্ব্বতারোহণের উপযোগী বানে আরোহণ করিতে হয়; এই অভিপ্রায়ে এখানে ভাণ্ডি, ঝাপান ঝোড়া এই তিন রকম যানের বন্দোবস্ত থাকে; কষ্টনহ, সবলকায় পাহাড়ীরা সেই সকল যান

আরোহী সহিত ক্ষুদ্রে লইয়া পর্বতে আরোহণ করে। যাহারা অন্ত্যন্ত পরিশ্রমী এবং পর্বতারোহণে পারদর্শী, তাহারা কোন প্রকার যানেন্ন দাহাষ্য না লইয়া পদব্রজেই মুশোরীতে যাত্রা করে; কিন্তু গোরুপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তখন পর্বতারোহণে আমার “হাতে হুড়ি”ও হয় নাই, হুতরাং সেই সাত মাইল চড়াই পদব্রজে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ করিলাম। প্রথমেই একটি যানের সন্ধান বাহির হওয়া গেল। আমরা ছুটি বন্ধুতে অনেক পথ, অনেক আড্ডা, হোটেলের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, যত দোকান ছিল, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু একখানিও যানের সন্ধান পাইলাম না। আমার বন্ধুটি একটু আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এরূপ যানের অভাব আর কখনও তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। আমি আজ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছি, হুতরাং সেই জন্তই হয় ত নিরাশ হইতে হইল ভাবিয়া আমার মন বড়ই বিষন্ন হইল; আমি কবির ভারতচন্দ্রের একটি পুরাতন কবিতার আবৃত্তিপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ রসিকতাপ্রকাশের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় বন্ধুবার তাঁহার একজন পরিচিত নাগরিকের নিকট সংবাদ পাইলেন যে, সেদিন সকালে একজন অজ্ঞাতনামা রাজা রাজপুত্রে আসিয়া দেশের সমস্ত দাণ্ডি এবং ঝাপান লইয়া দলবলের সঙ্গে মহাসমারোহে মুশোরী গিয়াছেন। আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম; দেহাচুন হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, অথচ মুশোরী না দেখিয়া ফিরিব, ইহা অসম্ভব। আবার সাত মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া সেখানে পদব্রজে যাওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অসম্ভব।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর বন্ধুটি বলিলেন, একমাত্র উপায় আছে। আমার মনে বড় আশার সঞ্চার হইল; কিন্তু যখন তিনি বলিলেন যে, “অধারোহণে যাওয়াই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব” তখন একেবারে বসিয়া পড়িলাম। ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ে উঠা—এমন অসম্ভব কথা ত কখন শুনি নাই! ভায়া রহস্ত করিতেছেন ভাবিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাঁহার দিকে চাহিলাম; কিন্তু তাঁহার ভাবে রহস্তের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। আমি সাহস করিয়া বলিলাম “ভাই! এ চতুর্পদ জন্তুগুলিতে চড়া বড়ই দুঃসাহসের কাজ। তাহাতে আবার পাহাড়ের উপর; আমার দ্বারা তাহা হইবে না।” বন্ধুটি অনেক ভরসা দিতে লাগিলেন, আমি তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলাম না। ঘোড়ার উপর উঠিয়া বসিয়া ধরিবার যদি একটা কিছু বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলেও

বিশেষ চিন্তার কোন কারণ ছিল না ; বলা বাহুল্য, অনেকবার বোড়ায় চড়িবার সখ হইলেও, এই ক্ষুদ্রতর অভাবের জন্ত সখ মিটাইতে পারি নাই, এবং “শুদ্ধিণাম্ শস্ত্রপাণিনাম্” চাণক্য পণ্ডিতের এই অতি নিরাপদ নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি ।

আমার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বন্ধু আগাধে একেবারে একটা বোড়ার আড্ডায় লইয়া উপস্থিত হইলেন । দেখিলাম, প্রকাণ্ডকায় কতকগুলি বোটক বাঁধা আছে ; যেমন দৈর্ঘ্য তেমনই বিস্তার, কালি, লাল, সাদা, নানা রকম রঙ্গের, দেখিলে বোধ হয়, সকলগুলিই উচ্চৈঃশ্রবাস বংশধর । বন্ধুবার একটি সুন্দর অশ্ব বাছিয়া লইলেন, এবং আমার জন্তও একটি মনোনীত করা হইল । সেই ষ্ঠেতবার তেজস্বী অশ্ব দেখিয়া আমি বিস্ময় ও ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম, পর্ত্তারোহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হইয়া গেল ।

যাহা হউক, যখন দেখিলাম অধারোহণ ভিন্ন আর উপায় নাই, তখন একটি ছোট রকমের অশ্বের জন্ত উমেদারী করিতে লাগিলাম ; কিন্তু সহিস বলিল যে, এ বোড়া “বহুত ঠাণ্ডা” । বন্ধু নির্ভয়ে অধারোহণ করিলেন, আমি দুই তিনবার চেষ্টার পর দুইজন সহিসের সাহায্যে বোড়ার পিঠে উঠিলাম ; আমার সৌভাগ্যবশতই হউক, কি স্বভাবতঃ শাস্ত বলিয়াই হউক, অশ্ববর কোন প্রকার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিল না । বন্ধু অগ্রসর হইলেন, আমিও ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম ; ক্রমে অল্পে অল্পে সাহসের সঞ্চার হইল ; মনে হইতে লাগিল, বাল্যকাল হইতে বোড়ায় চড়ার অভ্যাস না রাখিয়া কি অজ্ঞানই করিয়াছি ; আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটু অস্থতাপেরও উদ্বেক হইল ।

অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই, একস্থানে যাত্রীদিগকে ‘টোল’ দিতে হয় । সেখানে একটু থামিয়া টোলের পয়সা দিয়া আবার অগ্রসর হইলাম ; অশ্ব অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে, কত লোক আমার পশ্চাতে আসিয়া অগ্রে চলিয়া গেল । বন্ধুবার বেগে অশ্ব চালাইয়া দিয়াছিলেন ; তাঁহার অশ্ব কখন বেগে, কখন মন্থরগমনে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া চলিতে লাগিল, কখন বা কঠিন পাথরের উপর দুই একবার পদস্থলিত হইল ; আমি কিন্তু সমান ভাবে চলিতেছি, বন্ধু দুই একবার বক্র পার্শ্বত্যাগ পথের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া পড়েন, আবার আমাকে না দেখিতে পাইয়া অশ্ব ফিরাইয়া সতৃষ্ণনয়নে আমার অপেক্ষা করেন । পথ অত্যন্ত বন্ধুর দেখিয়া, সহিসকে সঙ্গছাড়া করিতে আমার সাহস

হয় নাই; আমার অনুরোধে সে বেচারী ক্রমাগত ঘোড়ার লেজ ধরিয়া চলিতেছে; তাহার শুষ্কশোভিত কালা গভীর মুখখানি দেখিয়া, আমার গন্দেহ হইল যে, সে প্রতিমুহূর্তে আমার মৃত্যুকামনা করিতেছে। তাহার এই নীরব অন্তিসম্পাত হইতে উদ্ধারলাভের কোনই উপায় দেখা গেল না; বাস্তবিক আমার মত আনাড়ী সওয়ার সে তাহার সহস্রজন্মে আর দ্বিতীয় দেখে নাই। তাহার এই অসম্ভব দিব্যিক্তি নিরাকরণের জন্ত আমি তাহাকে সম্ভবগত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম; তাহাতে তাহার সেই বিকট মুখ হাস্তপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ঘোড়াওয়ালার চাকর মাত্র, মাসিক বেতন ভিন্ন তাহাব অধিক কিছু প্রাপ্তির আশা ছিল না, সুতরাং বক্শিস তাহার উপরি পাওনা; অতএব আমাকে বিশেষ সন্তুর্পণে লইয়া যাইবার স্রস্ত কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইল। বক্শিসের প্রলোভনে সহস্রকে রাজী করিলাম বটে, কিন্তু ঘোটকটি এতক্ষণ পরে আমার উপর গররাজী হইয়া উঠিল, তাহাকে প্রলোভিত করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কার করিতে পারিলাম না; যতই উপরে উঠে, ততই তাহার অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বোধ করি এমন ধীরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত চলা তাহার কখনও অভ্যাস ছিল না, এমন অকর্মণ্য সওয়ারও সে কখন লাভ করে নাই। আমি তাহাকে যতই পাহাড়ের উপর পথের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করি; সে ততই গিরিগহ্বর ও অবিত্যকার দিকে ছুটিতে চায়। উপায়ান্তর না দেখিয়া সহস্রের শরণ লইলাম; সে স্মিতমুখে ক্রমাগতই বলে “কুচ ভন্-নেহি”, আমার প্রাণে কিন্তু “ডরের” অভাব ছিল না। সেই নির্ভীক কঠিনদেহ পাহাড়ীর আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্বক কোন নিঃস্রাব অনভ্যস্ত বঙ্গবীর অশ্বের উপর অটল আসন স্থাপন করিতে সক্ষম হয়? প্রতি পদক্ষেপগণেই মনে হইতে লাগিল, এইবার বুঝি আমার পতন ও মূর্ছা হয়।

এইরূপ “সসেমিরা” অবস্থায় কিয়দূর অতিক্রম করার পর দেখিলাম, ছই জন সাহেব অঝারোহণে পশ্চাৎ দিক হইতে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন; তাহাদের অশ্বস্বর সবেগে আসিতেছিল এবং তাহাদিগের উচ্চ সহাস্ত কলধ্বনিতে সেই নিভৃত পার্বত্য প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। দেখিয়া আমি সঙ্কুচিত ভাবে পথ ছাড়িয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। পশ্চাতের বোড়া ছুটির আসিতেছে দেখিয়া যে, সম্মুখের অঝারোহী একপাশে স্থিরভাবে অপেক্ষা করে, এ দৃশ্য বোধ হয় উক্ত পুরুষপুঞ্জবর্ষের নিকট অভূতপূর্ব; তাই তাহারাও

অশ্বের বেগনংবরণ করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অপরিচিত বিদেশী ভদ্রলোককে প্রমুখকোতুহলে বিরত করা নীতিসম্মত না হইলেও, আমার গন্তব্য স্থান কোথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহাদের ভেরায় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, বেলা দুইটার সময় রাজপুত্র ছাড়িয়া এই সাড়ে চারিটার সময় এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। এ কথা শুনিয়া বোধ হয় তাঁহারা বুঝিলেন যে, আমার অশ্বারোহণের সুখ পর্ত্তারোহণের সহিষ্ণুতা অপেক্ষা অল্প নহে; সুতরাং আমার ছাত্র ওস্তাদ অশ্বারোহীকে কিঞ্চিৎ বিক্রম করিবার প্রলোভন সংবরণ করা সেই রসিক খুঁটিশিল্পীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল; একজন বলিলেন, “Babu you should have started in the morning to reach the station at 5,” আর একজন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “It is better for you to go back,”—তাঁহাদের এই অবাচিত উপদেশের জন্য যথায়োগ্য ধন্যবাদপ্রদানপূর্ব্বক আমি আবার ঘোড়া চাণাইলাম; আমার সঙ্গী বহু তখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি “ঝারিপানি” নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম; বহুবর আমার জন্য এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার জন্য ভদ্রলোকের বিষম বিপদ, আমাকে কেলিয়া চলিয়া যাইতেও পারেন না, আবার আমাকে সঙ্গে লইয়া চলাও অসম্ভব। “ঝারিপানি” হইতে মুশোরী অতি নিকটে। যখন আমরা মুশোরী সহরের মধ্যে উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় অপরাহ্ন। অপরাহ্নে মুশোরী পাহাড়ের দৃশ্য অতি বিচিত্র এবং আনন্দপ্রদ। মুশোরী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজের গ্রামবাস। শিমলায় বড়লাট সাহেব গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে বাস করেন, মার্জিলিঙের রিরাগকুঞ্জে আমাদের বঙ্গেশ্বর গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন, নাইনিতাল উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের নৈদাঘ নিকেতন, আর এই মুশোরী সহর লাটদের নিম্নশ্রেণীসহ সাহেব বিবির আড্ডা। গ্রীষ্মকালেই এই আড্ডা জম্কাইয়া উঠে। এই সময় মুশোরী তথী নাগরীক স্তায় বেক্রম সুসজ্জিত হয়, অমল সুন্দর হর্ম্যাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দনকাননভূম্য, বিলাস-উপবনে যে অশ্রান্ত আনন্দ ও উচ্ছ্বসিত হর্ষের অবিরাম স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার ঠিক বর্ণনা করিতে হইলে, প্রচুর শক্তি এবং লিপি-কুশলতার প্রয়োজন। এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে, একজন নবাগত প্রবাসীর চক্ষে বিলাসিতা ব্যতীত আর কিছুই এখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই স্থির, শান্ত, নির্মল সন্ধ্যার প্রাকালে যখন পৃথিবী একটি উদার গান্ধীর্ষ্যে পরি-

হইয়া উঠে, নিম্নরূপ ধরাভল এবং অন্ধকারমাচ্ছন্ন উন্মুক্ত আকাশের মধ্যে একটি পবিত্র মিলন সংঘটিত হয়, চতুর্দিকে উন্নত পর্বত ও তাহাদের অঙ্গ-স্থিত স্তূপাকার নিম্চল বৃক্ষরাজি ক্রমবর্ণ মেঘের ছায়ার নয়ন সমক্ষে প্রতীয়মান হয়, তখন আমাদের কর্মপ্রাস্ত, অবসর হৃদয়ও ধীরে ধীরে সংযত হইয়া আসে; একটি অপার্থিব, পবিত্র এবং শাস্তিময় ভাবে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; চির-মঙ্গলময়ের উদ্দেশে আমাদের মস্তক অবনত হয়। তখন যে সঙ্গীত আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে, তাহা পবিত্র এবং শাস্তিময়, গভীর এবং প্রশান্ত মহিমা-ভোজ; দেবগায়ের শব্দচটাক্ষনি সে সময় আগাদিগকে যে সুখ এবং আনন্দ প্রদান করে, অল্প কোন প্রকার বাস্তোচ্য সে আনন্দ দানে সক্ষম নহে।

অতএব যাহারা শাস্তির অন্বেষণে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মুশোরী নহরে উপস্থিত হন, তাঁহারা কখন এখানে আসিয়া তৃপ্তিলাভ কবিতে পারিবেন না। ঐহিক সুখই এখানে সকলের একমাত্র লক্ষ্য; ইংরাজসমাজ লইয়াই এখানকার সমাজ, এখানকার অধিবাসিবৃন্দের অধিকাংশই ইংরাজ। সুদূর যেতরীপ কখন দেখি নাই, দেখিবার আশাও নাই, কিন্তু এখানে আসিয়া মনে হইল, ইংলণ্ডের পুরুষ ও ললনাগণের অধ্যুষিত কোন একটি গিরি-উপত্যকা কোন ঐন্দ্রজালিকের মোহিনী শক্তির প্রভাবে হিমালয়ের বক্ষদেশে আনীত হইয়াছে; রাজপথগুলি সুন্দর, গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবির ছায় সুদৃশ্য; বিরাম উপবন, লতাভিতানমধ্যবর্তী নিভৃত গুল্মকানন, খেলিবার মাঠ, ভ্রমণের জন্য নির্জন নেপথ্য কিছুই অভাব নাই। সন্ধ্যাকালে আলোকমালার পথগুলি আলোকিত হইয়া উঠে, গৃহকক্ষ হইতে বাতায়ন-পথে উজ্জল আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এ সময় কোন আনন্দভবন হইতে সঙ্গীতধ্বনি উথিত হয়, কোন গৃহ হইতে সুপ্রাচ্য বীণার স্বরার শুনিতে পাওয়া যায়। কোন নির্জন নিকুঞ্জে প্রেমিকযুগল কাঠামনে বসিয়া আপনাদের হৃদয়স্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, বাস্তার ধারে তিনজন যুবতী দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন এবং মুহূর্ত্তান্তরান্তিতে গল্পকে আরও মধুব করিয়া তুলিতেছেন।

এক জন সাহেব একাকীই পর্বতের পাশ দিয়া ছ হ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর একদিকে একটি ক্ষীণাঙ্গী ইংরাজললনা কৃতকগুলি ফুল হাতে লইয়া, মুহূর্ত্ত মন্দ গমনে অগ্রসর হইয়াছেন, একটি সাহেব যুবক তাঁহাকে দেখিয়া একটু সন্ত্রমের সহিত মাথা হইতে টুপি উঠাইল; রমণী স্তিমুখে একবার মস্তক নোয়াইয়া আবার অভীষ্ট পথে চলিতে আগিগেল। এখানে বেশ দারিদ্র্য দৃশ্য

নাই, কাহারও মনে বিষাদ কি কষ্ট নাই, সকলেই আনন্দোৎসব, মনে হয়, এ কি ইঙ্গুরী অথবা অপরোক্তবন !

এইরূপ নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে দৃষ্টবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আমরা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। সাহেবদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রাস্তার উপর উচ্ছ্বসভাবে ছুটিতেছে, আবার আসিয়া আবার হাত চাপিয়া ধরিতেছে ; লিভারী পরা অহঙ্কারগর্ভিত দুই একটি সাহেবের খানসামা প্রভুর শিউপুলকে ক্ষুদ্র গাড়ীতে চড়াইয়া ঠেলিয়া লইয়া বাইতেছে ; ছেলেদের কাহারও হাতে একটা বাণী, কাহারও কোলে কাপড় চোপড় পরান একটা চীনের পুতুল। রাস্তার উপরই সাহেবদের ছেলেদের অস্ত্র একটা স্থল ; কয়েকটা বগুয়াটে ছেলে সেই স্থলের পাশে দাঁড়াইয়া চুকট হুকিতেছিল ও নানা ভঙ্গিতে গল্প করিতেছিল ; দুই জন কৃষ্ণকায় অধারোহী সহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এক জন আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, "What is the time by your horse, Sir?" আমার সঙ্গী বন্ধুটি নিতান্ত কম নহেন, তিনি উত্তর দিলেন—"3 feet 5 inches, my sons"—ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া উঠিল। লাইব্রেরী বাজারের একটু দূরে একটা গির্জাবর আছে, সেখানে একটু 'উংরাই' নামিতে হয়। আমার সঙ্গী বন্ধু চারি দিক্ দেখিতে দেখিতে একটু অসতর্কভাবে চলিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার অধের সামান্য পদাঙ্গুলন হইল, আর তিনি একেবারে ভূমিসাৎ। অস্ত্র স্থান হইলে কোন আপত্তি ছিল না, লাফাইয়া উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িলেই চলিত, কিন্তু সন্ধ্যার সময় গির্জার সম্মুখে এতগুলি সাহেব বিবির জটলার মধ্যে পতন কিঞ্চিৎ কষ্টকর। তাঁহাকে পড়িতে দেখিয়া অনেকে হাসিয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয় আরি অভ্যস্ত হৃৎপিণ্ড হইলাম, আবার লাগিয়াছে ভাবিয়া যথেষ্ট ভয়ও হইয়াছিল। বাহা হউক, বন্ধুর তাঁহার অধে পুনর্বীর আরোহণ করিয়া তাহাকে এক চাবুক কশাইয়া দিলেন ; যেন তাহার অপরাধের জন্তই এমন একটা বিলাট ঘটিল ! তাঁহার জ্ঞান শিক্ষিত অধারোহীর মন এই অবস্থা, তখন আমার অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে ! বহুকষ্টে অধ বেচারীকে স্থির রাখিয়া, সন্ধ্যার সময় বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলাম।

মুশোরী সহরে বাজার ও দোকানের অভাব নাই, হোটেল বহুসংখ্যক ; রাস্তার চম্ভিত্তে চলিতে দেখিতে পাইলাম, দুই ভিনটি হোটেলের "রিলিয়ার্ড রুম" অটলোকময়, কোনটাতে খেলোয়ারগণ আসিয়া জুটিরাছেন, কোনটাতে

তখনো জুটেন নাই। এই সকল হোটেলের মধ্যে Himalayan Hotel সর্বাপেক্ষা বড়, খ্যাতিও বহুদূর বিস্তৃত।

রাত্রি বেণ স্নানিয়ার কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে কিঞ্চিৎ গাত্রবেশনা সম্বাহৃত হইল, কিন্তু তাহাতে ভ্রমণেব ব্যাঘাত ঘটিল না। একটু বেলা হইলে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে The great Trigonometrical survey আফিসের মান-মন্দির দেখিতে যাওয়া গেল; অতি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে বহুদূরবর্তী তুষারচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, দেখিলি কি! সুন্দর! শুভ্র-কঠিন তুষাররাশির উপর বিন্দু বিন্দু শিশির সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার উপর প্রভাত-সূর্যের লোহিত প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, শৈলশৃঙ্গগুলি ক্ষণে ক্ষণে নূতন বর্ণ ধারণ করিতেছে, তাহা অতুলনীয়। দূরের ছোট ছোট গ্রামগুলি কেমন শোভাময়, সেই সকল কুশাসাচ্ছন্ন বৃক্ষান্তরালবর্তী গ্রাম যেন শৈশবস্মৃতির স্মরমা শুভ্র যবনিকাব সমাচ্ছন্ন। শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, পর্বতের পর পর্বত, অল্প অল্প ব্যবধানে অনন্ত অরণ্যশ্রেণী।

অপরাত্নে বেড়াইতে বাহির হইলাম; সেই আনন্দ-উৎসব, সাহেব বিবির তেমনি অটলা, হাত্ত কোতুক; সমস্ত দ্রুংখদারিত্র্যকে ভারতের সমভূমিতে নির্বাসিত করিয়া দিয়া ইহারা দিবারাত্রি বিরাম উপভোগ করিতেছে। শ্রান্তি-কাতর অশান্ত হৃদয় লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের হর্বকোলাহল শুনিতে লাগিলাম; তাহাদের এই উৎসাহ, এই অশ্রান্ত আমোদ আমার বিষ্ময়বিমুক্ত চক্ষুর সম্মুখে একটি উৎসবপূর্ণ অভিনয়দৃশ্যের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; আমি পথপ্রান্তবর্তী নীরব দর্শক। হার, ইহারা যদি একবারও ভাবিত, এমন অভিনয়ও ফুরাইয়া যায়, এবং কালের একটি মাত্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে উৎসবের উজ্জল দীপাবলীও নির্বাপিত হয়!

শ্রীজলধর সেন।

সহযোগী সাহিত্য ।

সাহিত্য ।

বার্ণসের নীতি ।

প্রভাতের সূর্য্যকর কুসুমের ঈশদুহিত্র হৃদয়ে আলোক ঢালিয়া তাহারে বিকশিত করিয়া বাব ; আর কবিতা হৃদয়ে প্রকটস্থ ভাব সকল ফুটাইয়া বাব, হৃদয়কুমারে হৃৎপ্রায় ভাব সকল জাগাইয়া বাব । বৈজ্ঞানিক জড় জগতের সম্রাট, আর ভবি মানবের মনোবাজ্যেব অধীশ্বর ; সেখানে তাঁহার রাজত্ব । কবি আশাদিগের চিরপরিচিত দ্রব্যকে নূতন করিয়া আমাদের সম্মুখে আনিয়াছেন । তাই কবি মনোবাজ্যের সম্রাট । সমালোচক গুণ ও দোষ উভয়ই দেখেন, তবে মানবমাতারই একটা না একটা জটী থাকিয়া বাব ; সংক্ষেপে সকলেরই প্রায় পদাঙ্কনের সম্ভাবনা । বার্নসের মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার কবিতা ও জীবন লইয়া যেকণ কঠোর সমালোচনা চলিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে সকল কবির তেমন হয় না । তিনি পান্থী ও পাণ-শিক্ষক বলিয়াই চিহ্নিত হইয়াছিলেন । স্টলওয়েজ জাতীয় কবি সধুময় বোহকারী সম্রাট রচনা করিয়া জগতকে কৃতজ্ঞতাগাণে বদ্ধ করিয়াছেন । বড় সুখেব বিষয়, এখন সে শ্রোত হিদিয়াছে । “ওনেষ্টমিনিটার রিভিউ” পত্রে দ্বিষ্টার হ্যানিগান এক প্রবন্ধে বলেন যে, বার্নস একজন নৈতিক শিক্ষক ছিলেন । আমরা সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিগাম ।

এই মহাকবির মৃত্যুর পর গ্রাষ এক শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, তৎ ও পাঠক এখনও গীতবঞ্চার । সেই নক্সাতরুধার মুগ্ধ । কবি সকল মানবের সমতা গাহিয়াছেন ; তিনি নিম্পাপ দারিদ্র্যের প্রশংসা গাহিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন, ধন ও সম্মান অসার, এবং বলিষাছেন যে, স্বনয়নবাহীন নব কিছুই নহে । সে সময় সমস্ত সনাতন অসারতার পূর্ণ ছিল ; কাজেই বার্নসের কবিতা সমাজেব প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছে ।

বাহারা কঠোরহৃদয়ে তাঁহার কবিতার দৌন্দর্য্য অমুনয়ন করে, তাহার তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে, সন্দেহ নাই । তিনি হরসিক । নাটিকে সেদৃশ্য পিয়ার যেমন, সঙ্গীতে বার্নস সেইকণ । তাঁহার কবিতার দুই একটি চরণ শেলী বা বাথরগেরও উপযোগী । তাঁহার আনন্দের বর্ণনা দেখ :

তুষারপতন যেন নদী নীর প'বে,

সুহৃৎ দেখারে যেত গলে চিত্ততবে ।

পৃথিবী ও মানবের উপর তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ছিল ; তিনি রমণীর রমণীত্বই মুগ্ধ ; সকল পুরুষ তাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার হৃদয় অভ্যস্ত উদার । বার্নসের প্রকৃতি-প্রেম ওয়ার্ডসওয়ার্থের দার্শনিক গাভীয়া ছিল না, হয় ত তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সকল প্রকৃতি-প্রেম কবিতা বৃত্তিতেও পাবিতেন না । এফগুয়ে স্নেহময় পুত্র যেমন, তাকে ভালবাসে, তিনি সেইরূপ প্রকৃতিকে ভাল বাসিতেন ।

তাঁহার নিকট ভেদী, গোলাপ বা কমলেরই তুল্য ; তৎগৃহ ইন্দ্রবৎ সমাহৃত্তি পায় ; তিনি সহায়ত্বতিমব । জীবনের বাতনা সেই সহায়ত্বতিব কল । সেই মহা হইতে প্রেম আসিতে হয় । কে তাঁহার মত বাতনাগর প্রেমের বর্ণনা করিতে পারে ? প্রেমসবকে যে বাহা কিছু বলিয়াছে, তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত কর ছড়ে আছে :—

একটি ছন্দ মূহু, তা'র পরে বিদ্যার বিদ্যায়।
 তা'র পরে চিরতরে ছাড়াছাড়ি হবে দুজনায়;
 এমন আবেগে যদি ভাল নাহি বাসিতাম,
 অথ আবেগে যদি ভাল নাহি বাসিতাম,
 যদি না হইত বেধা, ছাড়া ছাড়ি না হইত আন,—
 বহিতে হ'ত না তবে দুজনার স্তম্ভ যদি ভার।

উাহাব কবিতা গভীরভাবময়; অন্তান্ত কবি যদি উদ্ধার কল্পনাবলে জগদন্তীত কোথায়ও
 গিয়া থাকেন, তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, বার্ষিক মানবের হৃদয়ের সকল স্থান দর্শন
 করিয়াছেন। তাহাই উাহার কবিতায় জীবন্ত সৌন্দর্য।

যদি কেহ উাহার কবিতায় সার্য কি জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলিতে হয় যে, তিনি সমা-
 জের সম্মান সাবশ্রুত, ধন সুখদানে অসমর্থ, এবং স্বাধীনতা ও সম্মোহনই

সার।

সুখের মূল, ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন। এই দার্শনিক তত্ত্বই উাহার

কবিতার অন্তঃসলিল প্রবাহ। তিনি বলিতেছেন;—

তোমরা ক্ষমতা পাও, সুখ তবে মর ঘুরে,
 যত সুখ চাহ তাতে তত আরো পড় ঘুরে;
 যদি নর ভালবাসে, পাও যদি ধনরাশি,

তবু পুণ্যহৃদি হাসিমুখ কবি আমি ভালবাসি।

টেনিসনও কতকটা এই মতের প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু উাহার রচনায় একটা চেষ্টা লক্ষিত
 হয়। বার্ষিক তাহা নাই, নির্বরনির্গত নির্মল নীলের স্তার উাহাব কবিতা প্রবাহিত, কারণ
 সে নীর চাতক বা কীটসের নাইটিংপেলের মত তিনি আপনি প্রকৃতির অংশ। যখনই
 দেখিবে, উাহার কোমল কবিতায় কেবল করুণাব প্রবাহ প্রবাহিত, তখনই মনে করিও,
 দরিদ্রের গৃহে ভূবারপতনের মধ্যে বার্ষিকের জন্ম। আর সাধা জীবন উাহার সুখতৃষ্ণা অতৃপ্ত।

যিনি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ শ্রেণীস্থ জীবগণের প্রতি, এমন কি, ভীষণভাবে বর্ণিত শয়তানের
 প্রতিও দয়াময়, উাহাকে কেমন করিয়া পাগলিফাদাতা বলিব? বাহার হৃদয় এত কোমল,

উাহার কি পাগলিফাদাতা সম্ভবে? তিনি মুক্তকণ্ঠে আপনার ও
 নীতি।

সমস্ত মানব জাতির পাপের দণ্ড অনুতাপ ও জ্ঞান কবিতা গিয়া-
 ছেন, কপটতার আবরণে পাপ লুকাইবার অভ্যাস উাহার ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, গুরুত্বের,
 বিশেষ রমণীর পাপ এত কঠোরভাবে দর্শন করিও না, কেন তাহারা পাপ করে?—যিনি
 প্রকৃতি, তিনিই তাহা জেনেন, তিনিই বিচারক। এই গভীরতা ও কোমলতায় জন্মই বার্ষিক
 নরহৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জনিকেতনে চিবদিন পূজা পাইবেন। তিনি প্রকৃতই একজন নৈতিক
 শিক্ষক। তিনি মানবকে মহাশিক্ষাদান করিয়া ধন্য কবিরাছেন। এতদেক কবির কাব্যেই
 শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্ট আছে; বার্ষিক আপনি দুঃখ, আলা, তাণ ভোগ করিয়াছেন, তাই
 উাহার কবিতার শিক্ষণীয় নীতি আরও অধিক।

গীতে সোপান।

বাঙ্গালা সাহিত্যের কল্যাণে বাঙ্গালী পাঠকের এই অসাধারণ প্রতিভাশালী কনাসী
 লেখকের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছে। উাহার অনেকগুলি মনোহর গল্প ইতিপূর্বে
 “সাহিত্যে” প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে “সাহিত্যে” এই লেখকের সম্বন্ধীয় একটি
 হৃদয় প্রবন্ধে একাংশ প্রকাশিত হয়। একজন কনাসী লেখকের সমালোচনা করা সকলের
 পক্ষে সম্ভব নহে, তাই এই প্রবন্ধের অংশিত ভাগের জন্ত বহুদিন অপেক্ষা করিয়াছি। গদ্যক-

শীতের এক চরণের মাঝখানে আসিরা সহসা খামিলে যেমন হয়, এই প্রবন্ধও কতকটা সেইরূপ এক স্থানে আসিরা, তাৎপৰ্য্য আর প্রকাশিত হইল না । আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক বাঙ্গালী লেখক মনে করেন যে, তাঁহারা যে বাঙ্গালায় লেখেন, সেই যথেষ্ট । কবে লেখকগণ 'ঐবন-ব্রত' মনে করিয়া দাঁড়াইয়া 'সেবার প্রাণ উৎসর্গ কবিত্তে পারিবেন? সে বাহা ইউক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক কাউন্ট টল্‌স্টোই এই লেখকের সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন । "এরিনা" পত্রে প্রকাশিত তাহার অনুবাদ হইতে আমরা সাবসংগ্রহ করিয়া দিলাম । ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে টল্‌স্টোই প্রথমে মোপাসাঁর একখানি পুস্তক (Maison Tellier) পাঠ করেন ।

পরিচয় ।

এই প্রথম পরিচয় তেমন আশামুগ্ধকর ফল প্রদান করে নাই । লেখকের মতে অনীম ক্ষমতা সঙ্কেত ইহাতে ভাল উপজ্ঞানসম্বন্ধে তিনটি গুণই দৃষ্ট হয় না ; সে তিনটি,—চরিত্রের বিবরণের প্রতি প্রকৃত ও নৈতিক টান, পরিষ্কাররূপে ভাবপ্রকাশ বা ভাল করিয়া ভাব ব্যক্ত করা এবং আন্তরিকতা । অর্থাৎ বর্ণিত বিবরণের প্রতি প্রকৃত যুগ্ম বা ভালবাসা । এই রচনায় প্রথমোক্ত গুণ ছিল না ; ভাল মনের ভেদ ছিল না । তিনি উজ্জ্বল বর্ণে পাণ চিত্রিত কবিগোষ্ঠের ও কৃষকদের পণ্ডিত বর্ণিত কবিগোষ্ঠের । অধিকাংশ ফরাসী লেখকই এসমাজীবনের জীবন ও আশা বৃত্তিতে সন্দর্ভ নহেন ; তাঁহাদের কাছে তাহা বা ! পশু ; অর্থাৎ, জোখ প্রভৃতি বস্তু চালাত । মোপাসাঁও

এই ধোঁষ পাইয়াছেন ; তাই তাঁহার বর্ণনার সাধারণ জনগণ কৃষককে ভাল জানেন,—এ অজ্ঞান দাবী করেন না । কিন্তু যে ফ্রান্সের মহাপুরুষগণ শিল্প, বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তারে এত সাহায্য কবিগোষ্ঠের, সেই ফ্রান্সের সাধারণ জনগণ যে পশুবৎ, এ কথা বিচার হয় না । ভাল ভিত্তি না পাইলে, এ সহস্র থাকিতে পারিত না । ভিত্তিহীন অট্টালিকা বস্তুতঃ মোপাসাঁর বর্ণিত পাণী সাধারণ জনগণের অন্তর্ভুক্ত বিবাসমান হওয়া যায় না ।

ইহার পরে লেখকের মত পরিবর্তিত হইয়াছিল । তিনি অনুসন্ধান হইয়া আব একখানি পুস্তক (Une Vie) পাঠ করেন । সেখানি আশ্চর্য্য হৃদয় । বোধ হয়, ফ্রান্সের জগৎবিখ্যাত উপ-

জ্ঞানসম্পন্ন উপজ্ঞান ।

লেখকের মনোযোগ ও আন্তরিকতা পরিব্যস্ত । তাঁহার অপর গ্রন্থ Bel-Ami গভীর ভাবময় । এতদুত্তরে পুরুষের পাশ্চাত্যবৃত্তিবশে সবলা রমণীর বস্ত্র-ধারণ চুঃখ ও সেই পাশ্চাত্যবৃত্তিপ্রাণের সাঙ্কেতিক জোখ দৃষ্ট হয় । দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার পর আব এ মহতী চিন্তা গৃহীত হয় না । তাঁহার পরবর্তী উপজ্ঞান, গিগ্যা ও কপটতার সেরদোহে গঠিত । চরিত্র সকল পাণময় । হৃদের বিষয়, তাঁহার ছোট গল্পে ভিন্ন ভাব ভাসমান । গল্পে

গল্প ।

নৈতিকতার উন্নতি দেখা যায়, এবং জীবনের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা পরিবর্তনও পدیدক্ষিত হয় । বাহ্যতে নৈতিক চরিত্র পরিষ্কৃত হয়, মোপাসাঁ তাহা জানিতেন । জগৎ যেমন, তেমন দর্শনই শিল্পীকে কৌশল, কিছু নুতন গঠন কৌশল নহে । তিনি ইহা জানিতেন, সেই অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার গল্পে দেখাইয়াছেন । তাই সে সকল গল্প নতুন সভ্যতাই বড় চমৎকার ।

মোপাসাঁ বুদ্ধিবাঞ্ছিনে, জীবনের চমক উদ্দেশ্য নমণী । আব কোনও উপজ্ঞানসম্বন্ধে বোধ

প্রেম ।

হয়, নমণী ও বনগীপ্রের এমন নরীক্ষণময় বর্ণনা করেন নাই । তিনি সেই আলোকময় চিত্রের অন্ধকার-ভাগও দেখাইয়াছেন ; তিনি আদর্শ উন্নত কবিত্তে সচেতন ও তাহাতে স্বাধীন কবিত্তে ব্যস্ত । বস্তু দেখিয়াছেন, ততই বুদ্ধিজীবীর বিদূষিত হইয়াছে ; তিনি মোহেব অর্থাৎ জীবনী ফল যন্ত্রণা ও হতাশার জন্ত

তাহার নিম্ন কবিবাছেন। তিনি জানিতেন, কপজ মোহ প্রকৃত প্রেমের প্রবল শত্রু। তিনি কেবল পাশবপ্রবৃত্তিতে নহে, মানবের সকল কার্যেই মানব ও পশুব মধ্যে প্রবল পবিদ্ধাব-প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন যে, এ জগৎ সম্পূর্ণ নহে। যাহা হইবার, তাহা হয় নাই। এখানে জ্ঞান ও প্রেম মেটে না। তিনি বুঝিয়াছেন যে, এই জগৎই শেষ নহে—স্বপ্ন জগদন্তীত কোনও লোকের দ্রষ্টব্য বস্তু, ব্যাকুল, ব্যথিত। প্রবন্ধে উপসংহারে লেখক বলিতেছেন যে, শৈশবসময়ের স্মরণীয় নহা হইলে, তিনি আশাশ্রিত্যে অনেক জিনিষ দান করিতে পারিতেন; সেই যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি যথেষ্ট দিবা গিয়াছেন। সেই দুঃখচিত্ত, সত্যবাদী লেখক অবশ্যই আশাশ্রিত্যের ধন্যবাদের পাত্র।

উপস্থাসবচনা।

অল্প দিনের মধ্যে কতকগুলি ইংরাজী পত্রে কথ জন উপস্থাসলেখকের কার্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তন্মধ্য হইতে কয়েকটির সারসংগ্রহ করিলাম।

“ইয়ংম্যান” পত্রে মিষ্টার গিলবার্ট পার্কীর বলিতেছেন যে, পূর্বে তিনি রাজিকালে রচনা ব্যাপৃত থাকিতেন; ইহাতে এই ফল হইত, সকালে শরীর সুস্থ থাকিত না। মানবের দেহ বড় জটিল ব্যাপাব, ইহার জন্ত যথেষ্ট যত্ন আবশ্যক। তিনি মাঝে মাঝে এক প্রকার সহসা ভ্রমণে বাহির হইতেন; লোকে ভাবে সেটা পাগলামি, কিন্তু তাহাতে পরীষ ভাল থাকে। এখন ব্রিটিশ বৎসরে তিনি একুশ বৎসর অপেক্ষা অনেক ভাল আছেন।

“কাসলস্ ক্যাবিনী ম্যাগাজিন” পত্রে প্রকাশ যে, মিষ্টার ব্যারিং গোল্ড রাজিকালে শব্দন করিয়া সেই নৈশ নিশ্চিন্তাব মধ্যে তাহার উপস্থাসের গল্পাংশ চিত্রা করেন। যেখান হইতে

গল্পাংশ নানাদিকে ঘুরিতে পারে, লিখিতে লিখিতে সেখানে আসিলে, ব্যারিং গোল্ড। তিনি যতক্ষণ গল্পব্য গথ স্থির না হয়, ততক্ষণ কেবল সেই কথাই চিত্রা করেন। এক রজনীতে বিনীত হইয়া তিনি Melahab গল্পাংশ স্থির করেন। একদিন একটা স্থান দর্শন করেন, রাজিকালে সেই স্থানই গল্পের মধ্যে স্থান পাইল। তাহার পর দিবস হইতেই রচনা আরম্ভ হইল। তিনি বৎসবে একখানা কবিতা পুস্তক লেখেন; লিখিতে ও কাটিতে কুটিতে, যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। বচনাব উপাদানের জন্ত, তিনি কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করেন।

“ইয়ং উইম্যান” পত্রে কুমারী বিখাস এডওয়ার্ডস বলেন, তিনি প্রভাতে (দ্রীক্ষকালে) সাড়ে ছয়টার সময়) প্রত্যাহার করেন। অর্ধ ঘণ্টা ভ্রমণের পর অর্ধ ঘণ্টা প্রাচীন সাহিত্য-পাঠান্তর একটা পর্য্যন্ত বচনার ব্যাপৃত থাকেন। তাহার পর আহাৰ্য্যান্তে ভ্রমণ করেন ও বন্ধু বান্ধবের সহিত একত্র চা-পান করেন। পাঁচটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত পাঠান্তর; সন্ধ্যাতের আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে তিনি বেড়াইতে বাহির হইতেন ও বৎসরে প্রায় দুই মাস ক্রান্তে থাকেন। তিনি বলেন যে, স্বপ্নের কাব্য ভিতর; যে কার্য বাহার উপযোগী, সেই কার্যের সাধন; মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক সহায়ত্বের বর্জন, এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিনাশ।

সাবা প্রাণের মত পদ্মাব্যাপ্তি লাভ সকলের হয় না, তাহার উচ্ছ্বল করণা অপ্রত্যাশিত প্রবলবাহ্যাব নত ইংরাজী পাঠকের উপর দিবা বহিরা গিয়াছে। “উইম্যান অ্যাট হোম” পত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎকারী সংক্ষিপ্ত সমাচারে সাব এই যে, সাবাপ্রাণ।

তিনি বোধ করেন যে, তাহার Heavenly twins এর মত পুস্তক, প্রকাশের সময় উপস্থিত; তিনি মনে করেন, বর্তমান সময়ে যে দোষ আছে, তিনি তাহাই

ব্যক্ত করিয়াছেন । সংশোধনোপায় প্রকাশের চেষ্টাও করিয়াছেন । লোকেও ইহা জানিত ; নহিলে সে পুস্তকের এত আদর হইত না । নির্ভীকভাবে মনোহাৰ্য্যব্যক্ত করার, অনেক ঠাহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন । পাঁচ বৎসর তিনি প্রাপ্তিতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন । জী পুরুষের সম্বন্ধে তিনি রমণীর অবনতি চাহেন না, পুরুষের উন্নতি চাহেন । তিনি তাঁহার অপ্রকাশিত পুস্তকের কোনও কথাই বহিতে রাজি নহেন ; তাহা হইলে, তাঁহার অদ্বিত মত প্রকাশিত হইলে, তাহাব নূতনত্ব নষ্ট হইবে । তিনি লভনের শ্রমজীবী রমণীদের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন । এ দিকে নাকি নারীজ্ঞানোচিত বেশভূষার পারিপাট্যে তাঁহার অসাধারণ মনোবোগ দৃষ্ট হব । সারা এণ্ডেব মতল করনা ও মত নূতন রকমের ও কৃতকটা অদ্বিত । কিন্তু তিনি ভাবেন যে, তিনি সমাজের ব্যাধির জন্ত মহৌষধের ব্যৱস্থাই করিতেছেন । ইহাই তাঁহার আপনার মত । তাঁহাব পুস্তকে তিনি সেই সকল অদ্বিত মত প্রকাশ করিয়াছেন ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ।

ভারতবর্ষে ।

দশমশে প্রত্যাবর্তনের পর অনেক ঘুরোঙ্গী এই বিপুলনারিধিপাৰে ধনধাত্মের দেখে প্রকাশের কথা লিখিয়াছেন । ইংলজ তাঁহার জাতীয় কুসংস্কারের বন্ধিন্ চশমা ছাড়ে না—তাঁহার গদ্য দিয়া ভাবতবর্ষ যেমন দেখে, সে তেমনই বর্ণনা কবে । কেহ কেহ এই প্রবাককে স্থখ-স্বভিসনাকুল বলিয়া মনে করে । সে দিন "জেন্টলম্যানন্ ম্যাগাজিন" পত্রে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম ।

দূরে যাইয়া অনেক সময় ভারতবর্ষে মফঃস্বল-ভ্রমণের স্মৃতি সম্মুখ হইয়া উঠে । প্রভাতে শ্রমাত্যাগের পর সমুখে সোহময় নাদুর্ভাব হবি, সেই শিশিরসিক্ত প্রভাত, প্রান্তরে শস্তক্ষেত্রে স্মৃতি ।
নৃত্যমন্তরমা, ব্রহ্মমুগ্ধ, সেবমুক্ত আকাশে সূর্য্যোব কিরণলালি, আর সাগরসমীপের শীতল সংস্পর্শ । হৃদয় দৈনন্দিন্য জীবনের শোক তাপ ভুলিয়া এক স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হয় । এইরূপ হৃদয় দুস্তরের মধ্যে একাকী থাকিলে, হৃদয় সহজী চিন্তার পূর্ণ হইয়া উঠে ।

ভারতবাসী সাধারণ জনগণের আচাৰ ব্যবহাবে আভাবিক সরলতা শোভমান, তাহাদের মধ্যে আসিয়া উক্ত আদর্শময় পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্ধনহীন হৃদয় শাস্তি পায় । ভারতবর্ষের ভারতবাসী ।
কুবকের সরল অভ্যাস, তাহাব পারিবারিক সহজের ধারণা, এবং ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, জীবনের এক মহান আদর্শ দেখায়, তাহার সহিত তাঁহার কঠোর শ্রমেব প্রভুত্ব প্রভেদ । দাক্ষিণাত্যের অন্তরকটিন ভূমির কর্ণপথেই হউক, আর বঙ্গদেশের জলাভূমির গভীর পক্ষে খাতরোগপথেই হউক, আব উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বালুময় ভূমি শস্তশ্রমণ করিবার জন্ত গভীর কূপ হইতে ধারিবহনেই হউক, ভারতবর্ষের কুবকের সমুদায় সর্বদাই সমুচ্ছল, তাহার সামোয়িক কার্যে তাহা সর্বদা প্রকাশমান । যদি তাঁহার এই স্বপ্ন হয়ও, তবে তাঁহার আব কিছুই থাকে না ; কাণে স্মৃতিকানিধিত পূর্ণকুটীরে নিত্যব্যবহার্য্য কমটী প্রব্য,—খান দুই কয়ল ও কমটী রাবিবান পাড় ছাড়া, তাঁহার বিলাসনামাত্রী কিছু নাই । রসনবিদগণ শিশুর কোতুকময় নয়ন ও কিছু অর্থ দিলে কৃতজ্ঞ জননীর হাত, আর অহুসেব ঔষধদানে আনন্দ, ইহা দেখিতে, স্বপ্ন হয় ।

পশ্চিম ঘাট পর্বতে একটি পথের কথা লেখক ভুলিতে পারেন নাই। দুই পার্শ্বে হরিৎ-পত্রপূর্ণ পাদপ, স্বদর্শন কলিত সম শাখার শাখা সম্বন্ধ, কোথাও বা মধুচক্র হইতে দুই এক বিন্দু মধু ত্বণের উপর পড়িতেছে। বসন্ত বাতাসে পরগাহার কমলীর কুহুমে গাছ ভরিয়া গিয়াছে; কাঠচোকরা বৃক্ষকাণ্ডে চঞ্চু আঘাত করিতেছে, আর কণিধল ঘুরিতেছে। সেই ঘন-

পশ্চিমঘাট।

বিস্তৃত বিপুল বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নে কোথাও পবিষ্কার খোলা স্থান, কোথাও বিহগ-আহার-বেষণ করিতেছে, কোথাও উরগ চলিয়া বাইতেছে, আর কোথাও বা হরিণ ছুটিতেছে। সকল শব্দ ডুবাইয়া শিলা হইতে শিলাস্তরে পতনশীল জল-ধারার গদ গদ নাদ। সেই বহু শীতল সলিলেই উপত্যকা উর্বর। কোমল ত্বণের উপর পদ-শব্দ ঞ্চত হয় না। তাই অজ্ঞমনস্ক পশু সহজেই শিকারীর বন্দুকের গুলিতে ঘুরিয়া পড়ে। বর্ষাব বারিপাতেও যথেষ্ট সৌন্দর্য। ক্রীড়ামত্ত মাতঙ্গের মত পবনতড়িত মেঘমালা পর্বত-চূড়ার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া বিপুল মেঘবাশি বর্ষণ করিয়া যাব। তরুলতা নবশোভাসম্ভব স্বদর্শন হইয়া উঠে, আর পর্বতের অঙ্গ হইতে কত স্থানে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত শিলারাশির মধ্যে সলিলোলন্দারী প্রবরণ যেন স্তম্ভোৎপন্ন হইয়া পর্বতের হ্রদের বিপুল ব্রহ্ম প্রেমবাশি ধরণীর বুকে ঢালিয়া দেয়।

ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রদেশীয় পর্বতে আরতনবৈচিত্র্য ও বিস্ময়কর বর্ণবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। পর্বতগাত্রে উরগের সত ঝাঝ ঝাঝ পথেই হউক, আর পর্বতপাদ হইতে কল কল স্ব-ব্দ নাদে প্রবাহিত জলপ্রবাহের কূলেই হউক, আর বজ্রব ভূমিতেই হউক, আব প্রবহমান পবন প্রবাহসম শৈলভূমিতেই হউক, সৌন্দর্য্যে অভাব নাই। ভারত-সহানবীধরমালা।

বর্ষের পার্শ্বত্যা দৃষ্ট প্রকৃতির পুস্তকে মণুময়ী কবিতা। বহুদূরবিস্তৃত ভ্রাম প্রান্তরে যে শোভা নাই, তাহা নহে। তবে পার্শ্বত্যা দৃষ্টে হ্রদে যে সজীবতা ও আনন্দ জন্মে, প্রান্তর দৃষ্টে তাহা নাই—সেখানে হ্রদয় গভীর ও বিবাদময় হয়। উত্তর প্রদেশে রজতবল বাসুকামর মলভূমিতে ভ্রমণ আর নিশাকালেই হয়—সেখানে হ্রদয় কেমন বিবাদ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। অথপুণে বা ডাকগাড়ীতে ক্রমাগতই পথ অতিক্রম করিয়া চল, যেন নীলাবরে কোনও উজ্জ্বল তারকা লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহাষ্টে পূর্নহান অসম্ভব। বর্ষি বিশ্রামাশায় ভ্রমণ বন্ধ কর, তবে চারি দিকে নীরব নিশ্চলতার মধ্যে কেবল ভারবাহী উষ্ট্রের কাতরধ্ব বা নদীতীরে অগোস্ত্রানন-চক্রের ঘর্ঘর শব্দ ঞ্চত হয়। সেই বিজন পথে হ্রদুর কাবুল হইতে রেশম, কলমুল প্রভৃতির বহনকারী উষ্ট্রহলের চালক বশিকদলকে দর্শন করিলে হ্রদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস উৎপন্ন হয়। সেই দীর্ঘপ্রাণধারী অহিফেনাসবী উষ্ট্রচালক বধন সহসা সেই স্বচ্ছাকারময় স্থানে উপস্থিত হয়, তখন সত্যি বড় আনন্দ হয়। সেই বিজন প্রদেশে যে অক্ষকারময় রজনীতে পথভ্রমণে সঙ্গী মিলিল, এই চিন্তার ভীতিপ্রবণ হ্রদয় অত্যন্ত শান্তিলাভ করে।

নিশাকালে জোনাকীর স্বাক্ষর য্যোতির বিস্তার কবে, যেন বৃক্ষলতার উপর অসংখ্য হীরক জ্বলিতে থাকে। কাজেই জ্যোৎস্নার আলোক না থাকিলে পথপবিক্রমণ আব সম্ভব হয় না। চন্দ্রালোকে পথভ্রমণেও বিপদ আছে। কারণ, পথে পথে বিষধব কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে। এবং পর্বতবাসীরা শত্রব আগমনা-

রজনী।

শকার দীর্ঘ তৃণদলার তলে ক্রীড়াগ বংশধর রাখিয়া দেয়, তাহাতে পথিকের পদ ছিন্ন ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা। তাহা ভিন্ন পথে বৃক্ষমূল পথরোধ কবিয়া থাকে। কাজেই পথে রাজি হইয়া পড়িলে বিরলে স্থানাবেষণ কবাই প্রেং; খানকতক বৃক্ষশাখার উপর শুক খড় বা কদলী-পত্রের ছাউনি যর করিয়া কমল বিছাইয়া শয্যাব সজ্জা স্থান করিয়া লওয়াই ভাল। তাহার পব

নিজার চেষ্টা কর। আমি নির্দোষ করিয়া, সিন্ধু বসন ত্যাগ করিয়া, উপাধানতলে পিতুল রাখিয়া নিমিত্ত হওয়াই ভাল।

সেই একমাত্র ভারতবর্ষীয় ভূতাত্ত্বিক তোমার জন্য আহাব প্রস্তুত করিবে, তোমার কৃত্য পরিষ্কার করিবে, বন্দুক সাক করিবে, দিল্লীস্থ শুকাইবে, তাহার পর আপনাই আহায়াতে আমি নির্দোষ করিয়া আগনি শয়ন করিবে। কিছুকণ চারি দিক নিশ্চল; কিন্তু পরিত্যক্ত আহায়ায়ের আত্মাণে হয় ত শীতাই একটা নেকড়ে বাঘ আসিবে ও সমুদ্রে বাহা পড়িবে লইয়া পলাইবে। ঐ শব্দ, আকাশে বৃহৎ বাদ্রুৎ কলাম্বেষণে উড়িতেছে; হরিণ মুহুরবে তাহার মলকে আকর্ষণ করিতেছে, আর ঐ ধ্বংসপ্রলিননরন শব্দ তাহার আগমনপ্রতীকার বাসবদেব অসোকা করিতেছে। বৃক্ষপত্রের মধ্যে প্রবাহিত পননের মুহুর্ত বর্ষবন্দন, মক্ষিকার পক্ষেপ্ত রব, আর অদূরে প্রবাহিত জলধারার মুহুর্ত শীতাই নিজাকর্ষণ হয়। অমণ সুখময়। ভারতের প্রবাসস্থিতি নানা নান্দ্যবীর ছবি ও সুখরম্ভে পরিপূর্ণ, — ভারতে উপভোগযোগ্য সৌন্দর্য্য যথেষ্ট।

জীবনচরিত।

ভবন মলকে।

সে দিন “ফটনাইটলি রিভিউ” পত্রোনিষ্টার হুইটম্যান, এসিক্স জার্মান সেনাপতি মলকের জীবনের কয়েকটি কাহিনী প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে মলকের মত সংগ্রাম-কুশল ও বুদ্ধিমান সেনাপতি, বোধ হয়, কেহ অগ্রগ্রহণ করেন নাই। বিপুল জার্মান সাম্রাজ্য-পটনে, তাঁহার সাহায্য নহিলে, বোধ হয়, বিসমার্কের প্রতিজ্ঞা, উইলিয়ামের কর্তৃত্বমতা, সফল হই বৃথাই বাইত।

মলকে বড় দরিদ্র ছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি আশি পাউণ্ডের জন্য পিৎতনের সেই ভীষণ পুস্তক “রোম” লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার, জন্ত অসাধারণ সহিতার আবশ্যক।

আবার পুস্তকের নয় খণ্ডের মধ্যে সাত খণ্ডের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইতেই প্রকাশকের দোকান উঠিয়া গেল, — এত অস-বৃথা গেল। তিনি সামান্য দরিদ্রের মতই জাহারাদি করিতেন। তাঁহার পরিবারে আট দশ জন ছিল, লোক তবুও পনের পাউণ্ডেই সকল খরচ চলিত।

উদ্যানে তাঁহার বড় আনুরজি ছিল। সামান্য লোকের বেশে তাঁহাকে প্রায়ই পাছ-ছাটা কাটি হাতে বাগানে দেখা বাইত। একবার তাঁহার কোনো আঙ্গুরের গৃহে অবস্থিতিকালে, একজন তাঁহাকে দেখিতে আইসেন।

আগন্তুক ব্যক্তি উদ্যানপালকের মত এক জন বৃদ্ধকে বাড়ীর ভিতর দেখিয়া, কখন মলকের সহিত দেখা হইবে, জানিতে চাহিলেন। তিনটা বেলায় সময় দেখা হইবে জানিয়া, তিনি তাঁহাকে কিছু বকসিস দিয়া গেলেন। বখাসিময়ে আসিয়া দেখিলেন, সেই চাকরই ঐ বৃদ্ধ মলকে। মলকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন “আমি তোমার বকসিস পাইয়াছি।”

মলকে অত্যন্ত দিনবী ও জসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। বুদ্ধিতে ও সংকল্পতায় তাঁহার ও সিজারের মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে। সেনাধ্যক্ষের পক্ষে কি বিশেষ আবশ্যক, তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, “প্রথমে তলাইরা বোকা, পরে সাহস করা, — বাস্তবিক, ইহাই তাঁহার সাক্ষ্যের কারণ। তাঁহার সাহস সন্ত-বাতিরিক্ত, সীমাহীন। ১৮৩৬ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মহাসমরে সংগ্রামসম্ভা বলিয়া কিছু বাস্তবিক ছিল না, আর কেহ পরিসম্ভাবিতা ছিলেন না, একমাত্র সেনাপতিই সকল কার্যের জন্য দাবী ছিলেন। করানী সময়ের পূর্বে তিনি গমনাগমনের সকল বন্দোবস্ত স্থির করেন নাই।

করিয়া ফরাসী সেনার কার্যের উপর নির্ভর কবিরাহিলেন। কনিষ্ঠার দিন চিরদিন অশ্রুনাশ করিয়াছেন। তিনি ভাবিতেন, এ সময় অবশুস্তাবী, তবে ভবিষ্যতে অশ্রু অপেক্ষা না করিয়া এখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহাতেই অধিক স্থিতি। বিষমাক্ত বসিতেন, কনিষ্ঠার সহিত সংগ্রাম করিবাব কোনও প্রয়োজন নাই। শত্রুজয়ের পর প্রাঙ্গণ আবার খাড়া হইল দেখিয়া, মলকে কিছু নিশ্চয়্যাপন্ন হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য ।

ত্রিকালজ্ঞ গোবিন্দ চেষ্টা ।

"কেনল-কোকিল" একখানি মহারাষ্ট্রীয় সচিত্র নাসিকপত্র। পূর্বে কোচী (Cochin) হইতে প্রকাশিত হইত—আজ কাল বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কোচী মালাবাবের অন্তর্গত। মালাবাবের প্রাচীন নাম "কেনল"। মালাবাব বা কেনল হইতে প্রকাশিত বলিয়া এই নাসিকপত্রের নাম "কেনল কোকিল" রাখা হইয়াছে। আজ কাল যদিও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয়, তথাপি ইহা সম্পাদন কার্য কোচীতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেনল-কোকিলের বরংএস এখন নয় বৎসর। ইহা আকার ক্ষুদ্র হইলেও, ইহা বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়। কিছু দিন হইল, এই পত্রিকার "স্বপ্রসিদ্ধ ত্রিকালজ্ঞানী গোবিন্দ চেষ্টা" প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত অধ্যয়ামিত্ব ইতিশীর্ষক এক সুবীর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই কোতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়কব বৃত্তান্ত উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের স্বলগ্নীপ্রসূত। আমবা এ স্থলে সেই প্রবন্ধের সারসংলগ্ন কবিয়া দিলাম।

পূর্বকালেব বাস নারবাদি মহর্ষিগণের ত্রিকালজ্ঞতা সম্বন্ধে সংকৃত পুরাণাদি গ্রন্থে ভূবি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু নানা কারণে সেই সকল পৌরাণিক উক্তি-উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে অনেক অনিচ্ছুক। তবে সম্প্রতি থিয়সবিষ্ট সভার চেষ্টা, মিঃ কন্যাবল্যাণ্ড কর্তৃক নানা স্থানে প্রদর্শিত অধ্যয়ামিত্বের নিদর্শন, আমেরিকাবাসী ডাঃ ডাডসেব মুহূর্ত্তমধ্যে বিনা উত্তরে ১০:১৫ বৎসরের পুত্রাতন যোগ সম্পূর্ণ জ্যোতিষ্যকরণ, এবং ইউনাইটেড স্টেটসের সেনেট সভার সমক্ষে বিদ্বানসমগঞ্জ (মানসিক বাণ্যপহারক বিদ্যা বা চৈতন্য ও জড়ের সম্বন্ধ শৃঙ্খলা—পবম্পরের উপর পরম্পরের ক্রিয়া ও তৎকার্য জগতের সম্ভাবিত উপকার প্রভৃতি বিবরণীয়ক গ্রন্থ)-সম্বন্ধে তৎপ্রদত্ত ব্যাখ্যানাদি ও মধ্যম বর্ণী-করণবিদ্যা (সেন্সোরিয়ম্) বিস্তার প্রভৃতি দ্বারা আবার এই প্রস্তুতি পরিবর্তন ঘটিতে আবশ্য হইয়াছে। আমাদেব বিশ্বাস, মাস্ত্রাজ প্রদেশের স্বপ্রসিদ্ধ কব্য-জ্যোতিষী গোবিন্দ চেষ্টা মহাশয়ই আমাদেব এই বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন বিদ্যাব—ত্রিকালজ্ঞানবিদ্যাব পুনরুজ্জীবন করিয়াছেন। আমবা তাঁহার অধ্যয়ামিত্বের পরীক্ষা করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। নিম্নে আমাদেব পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিলাম। উল্লিখিত চেষ্টা মহাশয়ের এখনও জীবিত আছেন; সুতরাং আমাদেব নর্নীর সত্যতাসম্বন্ধে ঐহাদেব সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তাহা-নিম্নকে আমবা গোবিন্দ চেষ্টার সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার এই অপূর্ণ গুণের পরীক্ষা কবিত্তে অমুবোধ কবি।

মাস্ত্রাজ প্রদেশে কুন্তলাপ নামক এক নগর আছে। উহার ঘর, মাইল পূর্বে মিকে অবস্থিত "বলিঙ্গমন" নামক গ্রামে গোবিন্দ চেষ্টা মহাশয় বাস করেন। কিছু দিন পূর্বে থিয়স-বিষ্ট পত্রিকায় "ত্রিকালজ্ঞতা ও গোবিন্দ চেষ্টার জড়ত শক্তি" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত

হয়। কিন্তু তখনও তাঁহার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। দিন পবে, আমাদের মাননীয় বন্ধু বাজসান্ন বাজশ্রী গঙ্গাধর রামকৃষ্ণ কবি (Assistant Engineer) মহাশয়ের গৃহে প্রায় চারি সহস্র টাকার চুরি হইয়া বহু চেষ্টা করি-
বাও অপহৃত দ্রব্যাদি কোনও সন্ধান না পাওয়ার, তিনি গোবিন্দ চেষ্টার নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রস্তাব দিয়া ক্রটিতে আমাদের অগ্রদূত করিয়া এক পত্র লিখেন। কিন্তু
নানা কারণে, সে সময়ে আমার গোবিন্দ চেষ্টার নিকট গমন করিবার অবকাশ ও সুবিধা
ঘটিয়া উঠিল না। এই নিমিত্ত, আমি কোটার নিকটস্থিত পল্লীবাগী কোনও এক গণকে
এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাদি আমার বন্ধুকে পত্র দ্বারা
জ্ঞাপন করিলাম। কিছু দিন পবে, 'কিবাণে'র সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি আমার বলিলেন
যে, এই গণকের প্রস্তুত উদ্ভবগুলি অধিকাংশ সত্য হইয়াছে।

তার পর এ বিবেচনায় আসে হইতে সাময়িক পত্রাদিতে সর্বত্র গোবিন্দ চেষ্টার নাম
শুনা যাইতেছে। কর্ণেল শীকর নামক একজন ইউরোপীয় আফিসার গোবিন্দ চেষ্টার সহিত
সাক্ষাৎ কবিত্তে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অত্যন্ত ক্ষমতাব পবিচর পাইয়া অতিশয়
বিস্মিত হইলেন, এবং Madras Mail ও Theosophist প্রভৃতি ইংরাজী সাময়িক পত্রে
তাঁহার পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশ করেন। “বসে সমাচার” নামক গুজরাণী (গুজরাটী)
কাগজে ও “জানচকু” নামক মহাবাঙ্গীষ সাপ্তাহিক পত্রে, কর্ণেল শীকরের প্রবন্ধেব অনু-
বাদ প্রকাশিত হয়। ইহাব পব মাস্ত্রাজ বিভাগেব উদ্ভববাণের এককেশমজাল ইঙ্গপেক্টার
মহোদয় গোবিন্দ চেষ্টার ক্ষমতা পরীক্ষা কবিবার মত্ৰ গমন করেন, এবং চেষ্টী মহাশয়ের
মনের কথা বলিবার আশ্চর্যকর ক্ষমতা দেখিয়া চমকিত হইলেন।

ইঙ্গপেক্টার মহোদয়ের পরীক্ষার ফল ইংবাজী ও মহাবাঙ্গীষ সংবাদপত্রে প্রকাশিত
হইলে, গোবিন্দ চেষ্টার অদ্ভুত ক্ষমতাব বিষয় প্রত্যক্ষ কবিত্তে আমার অতিশয় ইচ্ছা জন্মিল।
এবং আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিবার মত্ৰ তৎক্ষণাৎ কয়েকটি প্রশ্ন (কাহাকেও না জানা-
ইয়া) আমার নোটি বুক লিখিয়া রাখিলাম।

১৮৯২ সালের ২৫শে এপ্রিল, সোমবার দিবস আমি কোটা পবিভাগ করিলাম। কিন্তু
গোবিন্দ চেষ্টা এক ভানিলি ভিন্ন অপর কোন ভানি জানেন না বলিয়া এক জন বৈজ্ঞানিকের
সাহায্য ব্যতীত তাঁহার সহিত কথোপকথন করা সম্ভবপব নহে। মাস্ত্রাজে গমন করিলে, একজন
বৈজ্ঞানিক পাণ্ডয়া বাইতে পাবে, এই বিবেচনায় প্রথমতঃ মাস্ত্রাজে অভিযুগে যাত্রা কবিলাম।

আমি যে ট্রেনে উঠিয়াছিলাম, তাহা “পালবার্ট” নামক ট্রেনে আসিয়া উপস্থিত হইলে,
“বিশ্বনাথ আয়র” নামক একজন অয়ংকবজাতীয ব্রাহ্মণের সহিত আমার আলাপ পরিচয়
হইল। * * * তাঁহার সহিত ইংবাজীতে আমার কথোপকথন হইতে আশ্লিল। তিনি
* * * আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিলেন। আমি তাঁহাকে স্বীয় নাম না বলিয়া, কেবল
সংক্ষেপে স্বীয় উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম। আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া তিনি বলিলেন,—“আমি
কুম্ভকোণ নগরেবই অধিবাসী। গোবিন্দ চেষ্টা আমাদের গ্রামের সন্নিকটেই বাস করেন।
আমিও বহুদিন হইতে সোকমুখে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতাব বিষয় শুনিতেছি। কিন্তু আমার
জীবনের অধিকাংশ বিদেশভ্রমণেই অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া, এ পর্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা
প্রত্যক্ষ কবিবার সুবিধা পাই নাই। এক্ষণে চলুন, আমিও আপনাব সঙ্গে যাই। কিন্তু মাস্ত্রাজ
হইতে কুম্ভকোণ বহুদূরে অবস্থিত। ইরোড ষ্টেশন (মাস্ত্রাজ বেলগুয়ে ও সাউথ ইণ্ডিয়ান
রেলওয়েব সংশ্লিষ্ট) দিয়া গেলে, সেখানে শীঘ্র যাওয়া যাইবে।”

আমরা ইরোড ষ্টেশনে উপনীত হইলে, আমি মাস্ত্রাজের টিকিট বেলিয়া দিয়া, পরদিন

পরে ট্রেণে উঠিয়া ত্রিচিনপল্লী, তাজোব এছতি হান
কুস্তকোণে ষ্টেপনে গইছিলাম। আমার বন্ধু বিশ্বনাথ
আধারিব গৃহে কানে

পদিসমধ্যে ট্রেণে হই তি গোবিন্দ চেষ্টীর এসঙ্গ উষাপিত হইয়াছিল। এবং সেগা-
নেও অনেকের মুখেই তাঁহার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া গেল। অনেকই বলিল যে, তিনি বর্ধ-
মান ও অতীত ঘটনা বলিতে পারেন; ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন না। আমি কহিলাম,

অতীত কথা বলাও ত সহজ নহে। দেখা যাউক কি হয়।” গোবিন্দ চেষ্টীর দর্শনের ক্ষমতা
আমাকে এতদূরে আসিতে দেখিয়া কেহ কেহ আশ্চর্য্যাবিত্ত হইয়াছিলেন। কেহ তাঁহার
অপূর্ব্ব ক্ষমতা প্রশংসা করিলেন; কেহ বলিলেন, গোবিন্দ চেষ্টী কোনও দেবতাবিশেষ বা
কর্ণগিণাচ সিদ্ধ করিয়াছেন। হু এক জন একপণ্ড বলিল যে, সমস্তই তাঁহার ভণ্ডামি; তিনি
কিছুই জানেন না। এইরূপ বিবিধ সমালোচনা শুনিতে শুনিতে কুস্তকোণে উপনীত হইলাম।

১৮৯২ সালের ২৮এ এপ্রিল বৃহস্পতিবার আমার প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অতুল উৎ-
সাহ ও আনন্দের সহিত গোবিন্দ চেষ্টীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিদমন অভিমুখে
যাত্রা করিলাম। কুস্তকোণ হইতে বলিদমন পর্যন্ত যাবাব ভ্রাম পাকা বাস্তা আছে। সেই
পাকা রাস্তার ঠিক ধারেই গোবিন্দ চেষ্টীর গৃহ অবস্থিত।

গোবিন্দ চেষ্টীর গৃহ দক্ষিণাভিমুখ। বারান্দায় সকলের বসিবার জন্য বিহানাপাতা-
দ্বয়দশান্তর হইতে সমাপিত ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শনলালনায় সেখানে বসিয়াছিলেন, দেখি-
লাম। বাবান্দার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র বৈঠকখানা। সেখানে বিহানার উপর দুই তিনটি আলিস
ও ভাকিয়া পড়িয়াছিল। এইখানে গোবিন্দ চেষ্টী বসেন। আমার বন্ধন গিয়াছিল, তখন
গোবিন্দ চেষ্টী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে সমাদর-
পূর্ব্বক বাহিরের বারান্দায় বসাইলেন; এবং বলিলেন যে, “চেষ্টী মহাশয় গৃহাভ্যন্তরে আছেন,
অদ্য তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ।”

আমাদের আগমনসংবাদ পাইয়া, অল্পক্ষণ পরেই গোবিন্দ চেষ্টী বাহিরে আসিলেন।
তাঁহার শরীর বলিষ্ঠ ও প্রকাণ্ড। বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ, কৃষ্ণ শ্রবণ বিরল; বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর।
ললাটদেশে ভ্রুটীমুক্ত। মুখের ভাব অতিশয় ভয়ঙ্কর ও রোমব্যঞ্জক। তিনি ক্ষণে ক্ষণে ঘূর্ণিত-
লোচনে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; পরিধানে পাঁচ-হস্তপরিমিত একটি পরিষ্কার
বস্ত্র, উত্তরীয়ও তদনুরূপ। হস্তে (মণিবন্ধে) দুগাছি সোনার বালা। হলা অনাবশ্যক যে,
চেষ্টী মহাশয় হ্রস্বভক্ত।

একজন লোকের কতকগুলি জিনিষপত্র চুবি গিয়াছিল। সে বিষয়ে প্রঞ্জিজ্ঞাসা কবি-
বাব ক্ষমতা সে তিন দিন হইতে তাঁহার গৃহে যাতায়াত কবিতোছিল। গোবিন্দ চেষ্টী তাঁহার
দিকে রোষকবারিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া তীব্র রক্ষণবে বলিলেন, “দণ্ড টাকা দে।”
আগন্তুক দীনভাবে নিবেদন করিল যে, এত টাকা দিবার শক্তি তাহার নাই। ইহা শুনিয়া
গোবিন্দ চেষ্টী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া গেলেন। তাঁহার এইরূপ হৃদয়-
দেখিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল।

তার পর গোবিন্দ চেষ্টী আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের আগমনের কারণ
জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বনাথ আমার আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। আমার উপদেশ-
মতে তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে, “ইনি আপনার কীর্ত্তিকথা এবং কবিয়া এখানে আসিয়া-
ছেন। ইহার আগমনের অপব উদ্দেশ্য কি ও ইহার জিজ্ঞাস্তা কি কি, ও তৎসম্বন্ধে উত্তর,
ইনি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করেন। ইনি যখন কিছু বলিতে ইচ্ছুক নহেন।” কিয়ৎ

কাল (মিনিট ২৩) চিন্তা করিয়া, গোবিন্দ প্রেমের বখাষ উত্তর প্রদান করিলে, তুমি আমায় হইলে সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশে আপনাব কীর্তি প্রসাধিত করিবেন, তাহা প্রদান করিতে বখাষা চেষ্টা করিব। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে কি?” আমি উত্তরে জানাইলাম যে, “আমাব সমস্ত প্রেমের উত্তর পাইলে, এ কথার উত্তর দিতে পারিব।” “তোমার প্রশ্নগুলি কোথায়?” “নোটবুকে লিখিত আছে।” “নোটবুক কোথায়?” “আমার ব্যাগের মধ্যে।” এই বলিয়া, আমি ব্যাগের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলাম। বলা আবশ্যক যে, বিশ্বনাথ আরারের সহায়তায় আমাব পরামর্শের কথা বুঝিতে পারিতেছিলাম। তিনিই আমাদের ইন্টারপ্রেটাব।

গোবিন্দ চেট্টা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তুমি বহুদূর হইতে আসিয়াছ। আমি তোমাব নিকট কিছু পাইবার প্রত্যাশা রাখি না। আমাবে সঙ্গে আইন; তোমাব সমস্ত প্রেমের উত্তর দিতেছি।” এই বলিয়া বাস্তব অগব পার্থক্যিত একটি গৃহের অভিমুখে গমন করিলেন। সেই গৃহের মধ্যে বসিবার একটি বিশেষ স্থান আছে। সেই স্থানে একটি সাহুর পাতিয়া তাহাব উপর বসিয়া গোবিন্দ চেট্টা সকলের প্রেমের উত্তর দিয়া থাকেন—অস্বস্ত বসিয়া উত্তর দেন না। গোবিন্দ চেট্টা সেখানে গমন করিলে, আমরা সকলেই তাহার অঙ্গুগমন করিলাম। গোবিন্দ চেট্টা সাহুরের মধ্যভাগে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন; আমাবও উহার এক পার্শ্বে বসিলাম। তিনি যেখানে বসিলেন, তাহার নিকটেই তামিলী ভাষাব লিখিত কড়িগর মুদ্রিত গ্রন্থ ও দুই একটি উড়পেলি ছিল। তাহাব পেনসিলব্রের অগ্রভাগ ভগ্ন ছিল বলিয়া, আমি নিজের পেনসিলটি তাহাকে দিলাম। * * * তিনি অঙ্গুগম্য কতকগুলি কোড়ক-প্রদর্শন করিলেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বখন আমাকে একটি কড়ি, কখনও বা তাহাব তামিলিগ্রন্থের দু একটি বিশেষ অক্ষর স্পর্শ করিতে বলিতেছিলেন। কখনও বা একদৃষ্টে আমাব মুখের দিকে দেখিতেছিলেন।

অঙ্গুগম্য এই সকল কোড়কপ্রদর্শন ও নানা প্রকার বাহ্যাপারে নিপুণ থাকিয়াও তিনি আমাব অবোধা তামিলি ভাষায় আমার প্রদত্ত কাগজের উপর পেলিল লইয়া অতি ক্ষিপ্ৰহস্তে লিখিতেছিলেন। তিনি যে বিশেষ চিন্তাপূর্বক লিখিতেছিলেন, তাহা বেধে হইল না। প্রায় দুই মিনিটের মধ্যে আমার প্রদত্ত কাগজের দুই পিঠ তিনি লিখিয়া ফেলিলেন। এবং ঐ কাগজের উপর আমাকে দুই পিঠে দুইটি করিয়া স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। আমি স্বাক্ষর করিলে, তিনি কাগজখানি ভাঁজ করিয়া বিশ্বনাথ আরাবেব হস্তে প্রদান করিলেন। বিশ্বনাথ সেইখানে বসিয়াই তখনই সকলের সমক্ষে উহার ইংরাজী অর্থুবাদ করিলেন। আমি ব্যাগ হইতে নোটবুক বাহিব করিয়া উত্তরগুলি প্রেমের সহিত মিলাইতে লাগিলাম। গোবিন্দ চেট্টা বলিলেন যে, “আমার স্বাধ্য আজ একগুণ ভাল নহে যে, তোমার সকল প্রেমের উত্তর দিতে পারি।” কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি।”

আমার নোটবুকে লিখিত প্রশ্নোত্তর অগ্রে উদ্ধৃত করিয়া, পরে গোবিন্দ চেট্টার প্রদত্ত উত্তর পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

১। আমার ব্যবসায় কি?

২। আমাব সঙ্কল্পিত কবিতা কি? উঃ—“সদৈব নমিতা জীবী পদ নলাট ফেলৈ কিণে”।

৩। আমার জীর নাম কি? (আমাব জীর নাম, মন্ডাজ প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, যে কোচীতে আমি জীবনের অধিকাংশ অভিবাচিত করিয়াছি, সেই কোচীর অধিবাসিগণের মধ্যেও অতি অনসংখ্যক লোকে অবগত আছে।)

- ১। রত পুষ্প ও পক্ষীর নাম কি ? উঃ—ধনু ও ভারদ্বাজ ।
 ২। আমার জ্বর পরমায়ু কত বলিতে কোনও আপত্তি আছে কি ? উঃ—গঙ্গাধর রামকৃষ্ণ ।
 ৩। আমার প্রথমে আমি কাহার নিকট প্রবেশ করি ? উঃ—জ্ঞানচক্ষু ।
 ৪। কোন সংবাদপত্রে আমি আপনাব কীর্ত্তি প্রথম পাঠ করি ? উঃ—জ্ঞানচক্ষু ।
 ৫। গঙ্গাধর রামকৃষ্ণ কিব্যাপন অপসৃত ব্রহ্মাদি পুনঃপ্রাপ্তির আশা আছে কি না ?
 ৬। আপনাব এই অমূল্য বিদ্যা আমার শিখাইয়া দিবেন কি ?
 ৭। আপনি বোম্বাই নগরে গমন করিতে পারিবেন কি ?
 ৮। “রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রানড়ে” মহাদেব এ সময়ে কি করিতেছেন ?

গোবিন্দ চেষ্টীর প্রদত্ত উত্তর ।

গোবিন্দ চেষ্টীর প্রদত্ত উত্তরের কাগজে বিশ্বনাথ বে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ প্রশ্নের অবিকল যথার্থ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । প্রথম প্রশ্নের উত্তরস্থলে লিখিত ছিল যে, “তুমি কোনও বিখ্যাত মাসিক পত্রের সম্পাদক ।” দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—“তোমার সংকলিত কবিতার আদ্য চরণ এই— ‘সদৈব নমিতা জবী ।’ ” ৭ম প্রশ্নের উত্তরে “জ্ঞানচক্ষু”র পরিবর্তে “জ্ঞানচক্ষু” লিখিত ছিল । অপরাপর প্রশ্নের উত্তরেও আনাব সম্বন্ধে বাহা লিখিত ছিল, তাহা এই,—

তোমার নাম * * * (ঠিক মিলিয়াছে) । তোমার জন্ম চিহ্নানুসারে বৃহস্পতি বারে হইয়াছে । তোমার বয়স ৩৯ বৎসর ৩ মাস ১৩ দিন । তোমার জন্মগৃহ পূর্বে পশ্চিম গলির মধ্যে । তুমি তোমাব পিতা মাতাব শেষপুত্র । এখন তোমার ভাতা ভগিনী কেহই জীবিত নাই । তোমার কবিতাবচনার শক্তি আছে । তোমাব স্বজনগণের সহিত তোমাক নানা বিষয়ে বিবোধ ঘটে । জ্যোতিষ শিক্ষা করিবার তোমার বিশেষ ইচ্ছা আছে । তোমাক অপেক্ষা তোমার স্ত্রী অধিক দুখীলা । (এ সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য) । দুই বৎসর পরে তোমার ভাষ্যোদয় হইবে । অস্ত্রে তোমার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটবে । তোমার পবনায়ু ৬৭ বৎসর । তোমার জীব মৃত্যু অগ্রে ঘটবে । তুমি সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া সমাধি গ্রহণ করিবে । (তত্তির আমার মতাব চরিত্র সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা ও অপ্রশংসার কথা লিখিত ছিল) গঙ্গাধর কীর্ত্তিব গজে প্রথমে তুমি আমার নাম অবগত হও । তাহার চুবি ধরা পড়িবে না । অবশিষ্ট কথা অপর জ্যোতিষিগণের নিকটেই শুনিয়াছ । মহাদেব গোবিন্দ রানড়ে এ সময়ে (১৮৯২ খৃঃ ২৮ এপ্রিল প্রাতে দগটার সময়) একটি লেখ্য সম্মুখে রাখিয়া তিন জন ভক্ত-লোকের সঙ্গে অতিশয় আগ্রহের সহিত গুরুতব বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ ও আলোচনা করিতেছেন । আমার বোম্বাই বাইতে কোনও আপত্তি নাই । ”

উপসংহারে লেখক বলেন যে, তাহার আসিবার সময় ৩ টাকা গোবিন্দ চেষ্টীকে দিয়া আসিবাছেন, এবং জ্ঞানচক্ষু-সম্পাদকের দ্বারা ৩০০০ তাবিলে মহাদেব গোবিন্দ রানড়ে গোবিন্দ চেষ্টীর কথাব সত্যতা পরীক্ষার জন্য পত্র লেবা হইয়াছে । তাহার উত্তর আসিলে তাহা অবশ্যই প্রকাশিত করিব । ” কিন্তু এ পর্যন্ত মহাদেব গোবিন্দ রানড়ে মহাদেয়ের উত্তর সম্বন্ধে কেবল কোকিলে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউকর ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

সাধনা। চৈত্র। “মুক্তির পথ” গ্রন্থটি হৃদয়স্তিত ও হৃদয়স্থিত। “দিদি” একটি সুন্দর শিশুকলা কালিগ্রন্থের আদর্শ। জয়গোপালের সহিত তাহার বিবাহ হয়। শশি-জয়গোপাল যোল বৎসর একাদিক্রমে এক সঙ্গে জীবনযাপন করিতেছিল। কালীগ্রন্থের শশি ভিন্ন অল্প সন্তান ছিল না,—কিন্তু নিত্যান্ত শেষ বয়সে তিনি এক পুত্রলাভ করিলেন। ছেলের নাম হইল নীলমণি। নীলমণির আবির্ভাবে শশি ও জয়গোপাল বড় প্রীত হইলেন না।—কেন না, কালীগ্রন্থের বিবরণসম্পত্তির উত্তরাধিকারী এখন আব তাহাদের রহিল না। জয়গোপাল নিশ্চিন্তমনে একটা সামান্য চাকরী উপলব্ধ করিয়া যোল বৎসর কাটাইয়া দিয়াছিলেন,—একশ্রেণী বস্তুরের ভারী উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব দেখিয়া তিনি চাকরী করিতে আসামে চলিয়া গেলেন। জয়গোপালের মধ্যেই নীলমণি মাতৃহীন হইল। মা-মরা ছেলের প্রতিপালনের ভার অগত্যা দিদির উপর পড়িল। প্রথম এই ব্যাপারটা শশি পক্ষে বড় প্রীতিকর হয় নাই, কিন্তু পরিশেষে সর্বজনীন স্নেহ শশির রমণীহৃদয় জয় করিল,—ক্রমে ক্রমে মা-মরা ভাইটিন প্রতি শশির অত্যন্ত মায়ী জন্মিল, এবং সে নীলমণিকে অপত্যনির্ভরশেয পালন করিতে লাগিল। নীলমণির বয়স যখন দুই বৎসর, তখন কালীগ্রন্থ দেহত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধকালে শশিকে সিনিকি বিষয় লিখিয়া দিয়া গেলেন,—অবশিষ্ট অবশ্য নীলমণির রহিল। জয়গোপাল দেশে ফিরিলেন, গৃহে অল্প কোনও অভিজ্ঞতা নাই, অগত্যা তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বিষয়ে চম্বাধানে নিযুক্ত হইলেন। জয়গোপাল নীলমণিকে আদৌ দেখিতে পারিতেন না। শশি তাহা সুস্থিতে পারিত, এবং ভাইটিকে সর্বদা বসন্তে বিহ্বলতার মত আপনার স্নেহপক্ষপটে লুকাইয়া রাখিত। একদিন শশি শুনিল যে, গ্রামে জনবব, তাহার খানী নাবালাক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করিয়া নিম্নের পিস্তুলে ভাইয়ের নামে বেনামী করিয়া কিনিতেছে। গ্রামে সে এ জনববের বিশ্বাস করে নাই,—জয়গোপালকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি বলিলেন, “আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার ঘো নাই। উপেন আমার আপন পিস্তুলে ভাই; তাহার উপরে বিশ্বাসের ভাব দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কখন গোপনে খাজনা বাকী ফেলিয়া মহল হাসিলপূর্ব নিজে কিনিয়া লইয়াছে, আমি জানিতেও পারি নাই।” শশি নালিশ করিতে বলিল,—কিন্তু অর্থাত্ত প্রভৃতির ওজর করিয়া জয়গোপাল তাহা কাটাইয়া দিলেন। “আমীর কথা বিশ্বাস করা শশির পবন বর্জ্য” কিন্তু কিছুতেই সে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। এমন সময়ে নীলমণির উৎকট পীড়া হইল। শশি তার ডাক্তার আনিতে বলিল। তাহার খানী কহিল,—সহরের ডাক্তারকে পাওরা গেল না। বাজে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রাণ গেল। এতকালেই শশি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী-প্রাণকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একবারে সহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইল। সেখানে নীলমণির চিকিৎসা ব্যবস্থা হইল। পব দিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত,—ক্রোধে অগ্নি-মুক্তি—কহিলেন, এখনই বাড়ী ফিরিয়া চল। শশিও পল্ট বলিল, যদি কাটিয়া ফেল, তবুও এখন আমি ফিরিব না। জয়গোপালও বলিয়া গেল যে, তবে এইখানেই থাক, আর আমার বাড়ীমুখো হইও না। শশি তখন প্রীত হইয়া বলিল,—যদি তোমার কি। আমার ভাই-য়েবই ত যার। জয়গোপাল বলিল, আচ্ছা সে দেখা যাইবে। শশি গহনাপত্র বেচিয়া ভাইটিকে যোগদান করিল। এই সময় সে খবর পাইল যে, জয়গোপাল নীলমণির অবশিষ্ট বিষয়টুকুও যোগাড় করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। শশি আর কি করিল,—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিখ

যা তাহার জীবে ধবিল। ডেপুটি বাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। তিনি বাহিরী তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে চিঠি লিখিলেন। জয়গোপাল পত্রপাঠ আসিয়া ভালকসহ তাহার জীবে বলপূর্ব্বক নৌকাব তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল। শশি মরমে মরিয়া থাকে, এবং নীলমণি মনেব আনন্দে খেলিয়া বেড়ায়, এমন সময় একদিন গ্রামে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। জয়গোপাল তাঁবুর বাহিবে খোলা ছায়াব চাকিতে বসিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতেছে, এমন সময়ে মহাশয় সেখানে নীলমণিকে লইয়া শশি উপস্থিত;—শশি সেখানে নীলমণির সমস্ত ইতিহাস আদ্যন্ত বলিয়া গেল। সম্মুখে জয়গোপাল বসিয়া সব শুনিয়া, মধ্যে শশিব কথাব বাধা দিতে গিয়া সাহেবের ধমকানিতে নীরব হইয়া বহিল। সাহেব নীলমণিকে নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। তাহাব দ্বিধা,—এই গল্পের নায়িকা, জয়গোপালের যবে কিবিল; আবার সেই চিরপরিচিতি ঘবে পুনীজীব নিলন হইল, কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কাব্য, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রানবাসিপণ সংবাদ পাইল যে, রাজ্যে শশি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাজ্যেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে। এই দুই গল্পট যটনার ষাটপ্রতিষাতে বর্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণনার উজ্জ্বল, এবং যটনারিষ্ঠাসে মনোবন হইবাছে। বিশেষতঃ, শশিব চিত্তবৃত্তির প্রত্যেক পৰিণতি লেখক এমন উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহাতে করিয়া তাহার বহিঃপ্রকৃতির জ্ঞান অন্তঃপ্রকৃতিও সম্পূর্ণ চেনন ও গভীর হইয়া উঠিয়াছে। অন্তঃপ্রকৃতির সূক্ষ্মতম স্বভাবসম্বন্ধ বিশ্লেষণ লেখকের পর্যাাপ্ত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঐক্সকালিকের জ্ঞান প্রতিক্ষেপে এই গল্পের নায়িকাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কেলিয়াছেন, এবং সেই অবস্থায় তাহার যেরূপ মানসিক বিপরিণাম সম্ভবে, দার্শনিক ভাবে, কিন্তু কবির ভাষায় তাহা বর্ণন করিয়াছেন। এক দিকে চিরজীবনের সঙ্গী স্বামী, সমস্ত জীবনের অধিষ্ঠায় সম্বল দাম্পত্য-প্রেম,—অল্প দিকে নিবাসের অন্যতম অসহায় নিরুপায়, নিজের-হাতে-মাখুন-করা মা-মরা ছোট ভাই,—অকৃত্রিম এবং শাস্তাবিক সহজাত জাত্মপ্রেম, এক দিকে মোড়ের স্বার্থের পববন্ধনাপ্রবৃত্তি, অন্য দিকে নিরুপায় অক্ষম শিশুর সর্বনাশ,—সর্ববাস্ত,—এই দুই বিপর্যয় সমস্তাব সন্নিহলে, যেখানে শশির চিত্তে তুমুল ঝগড়া বহিরাছে, এবং যেখানে পবিশেষে সে জ্বালায়, ধর্ম্মের, স্বার্থ স্বার্থনুস্ত প্রেমের অর্থাৎ—স্বভাবের পক্ষ অবলম্বন করিতেছে, তাহা বস্তুতই মনোহর, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিচাতুরীর পর্যাাপ্ত প্রমাণ। এ অংশে গল্পটি সর্বোৎকৃষ্ট। মানবচিত্তবৃত্তির এক অবস্থার একখানি গিথুঁত ছবি, এই গল্পে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লেখক যটনারিষ্ঠাসের সময় দেশকালপাত্রের প্রতি অত্যন্ত অবহেলা করিয়া শশিকে যে ভাবে সাহেবের সম্মুখে খাড়া করিয়াছেন, তাহা শশিব চরিত্রে খাপ খায় না। যদি শশির চরিত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা হইলে আমবা ইহাকে অস্বাভাবিক মনে কবিলার অবকাশ পাইতাম না। আশা করি এবং প্রার্থনা কবি, লেখক শেষরক্ষা মনোযোগী হইবেন। “নৃত্যকলা” একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। লেখক বঙ্গসমাজে নৃত্য চালাইতে পবদর্শ দিতেছেন। সামাজিকতা তাহাব বিচার করিবেন,—আমরা এ ক্ষেত্রে একটী অবাস্তব কথা অবতারণা কবিতে বাধ্য হইতেছি। “নৃত্যকলা” শিপি কুশলী লেখক এক স্থলে বলিতেছেন,—“বাউল বৈষ্ণব প্রভৃতিরও কীর্তন করিতে করিতে নাচিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের শিদির সঙ্গীত সঙ্গায় সকল বিষয়ে কিছু অধিক গভীর হইয়া পড়িয়াছে—কোন প্রকার দেহচাকলা বা সবল মানন্দপ্রকাশ বা এমন কোন কার্য বাহাতে ছেলেমানুষী লেশ-মাত্র প্রকাশ পায় তাহাব প্রতি উহাদের সম্পূর্ণ বিবাগ দেখা যায়। একপ অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ-তাব আধিক্যবশতঃ ঘটয়াছে, তাহাও ঠিক কবিয়া বলা যায় না—বাহার। ইটি টি কটকিব

সহিত নিজ অদৃষ্টে ঘনিষ্ঠ যাবন্ধ সম্ভব কবে, এবং বাহার গবর্ণমেন্টে
 ঐহিক ও পুতুলখেলাকে পাবিত্রিক উন্নতির উপায় মনে কবে, তাহা হইবে, "মধ্যে"
 নাই বলিলে ভ্রম্য বা হয়।" এ ভাবকে সংহত ভাবা বলা যায় না। হুজুর্জিওয়ে এম্প্রেশন অফি-
 কাংশ লোক এখনও "পুতুলখেলাকে পারিত্রিক উন্নতির উপায় মনে কবে," এবং উজ্জ্বল কেহ
 উপহাস করিলে ক্ষুণ্ণ হয়। পুতুলখেলা পাবিত্রিক উন্নতির মূল কি না, সে প্রশ্ন দূরে রাখি-
 এক জন নিবাকারবারীও স্বীকার করিবেন যে, "বাহার পুতুলখেলা করিয়া পরকালের কাহ-
 কবে, তাহা হইবে মনে কষ্ট হয়,—এমন ভাষা ব্যবহার না করিলেও অনারসে চলিতে পারে।
 ধর্ম সশব্দে সহিষ্ণুতা পৃথিবীর উন্নতি, সভ্যতা, অগ্রগতিব একটা সর্বপ্রথম ও সর্বগ্রথার
 লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সেটাফে প্রতিপদে পদদলিত করিতে হইলে বর্তমান কালশ্রোতব
 উজ্জান বাহিন্য বহুব কিরিয়া বাইতে হয়। সেটা প্রাণীনি বরিয়া মনে হয় না। গন্ধান্তবে,
 ভদ্রতা একটা পুতুল নহে, তাহা বা একটা সাকাক দৃষ্টিও নাই, অতএব সকলেই সহজে সেটাকে
 মাজু কিয়া চলিতে পারেন,—তাহাতে করিয়া কোনও জাতিবিশ্বের মধ্যে আঘাত লাগিবার
 সম্ভাবনা নাই। এইকপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসাবধান মন্তব্য দ্বাবাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, উৎপত্তি
 ও ঐবুদ্ধি হয়,—ভাই এই নামাজ-বিষয়েও আসাবা, এতটা স্থান অপব্যবিত করিলাম।
 "সাদানার" ভাষা মাসিকের আবও সাবধানতা প্রয়োজন।

দাসী। এপ্রিল। “ভাগীসখীব উঃ-সংস্কানে” একটি হৃদয় প্রবন্ধ। লেখক কবিতার ভাষায়, পানেন বন্ধাব, বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব গল্পে মত বর্ণনা কবিতাছেন। “সম্পাদকের নিবেদনে” দাসীর সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—“জ্ঞান মাসের ‘সাহিত্যে’ ‘দাসী’র সমালোচনায় একটি ভুল আছে। * * * তিনি (সাহিত্য-সম্পাদক) লিখিয়াছেন যে, দাসী পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে তাহাতে কেবল সেনাবিষয়ক প্রস্তাৱাদি থাকিত। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। ১৮৯০ সালের নবেম্বর মাসের ‘দাসী’তে আনন্দ একটি প্রবন্ধে এই কথা লিখিয়াছিল যে, অতঃপর ‘দাসী’তে জনহিতৈষণা ব্যতীত অস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাৱাদি থাকিবে।’ বাহা হউক, এই ভুলের দ্রুত আশা কবিকোনও ক্ষতন ক্ষতি হয় নাই। পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক ইতরবিশেষই হউক,—তদ্বারা আনন্দের পূর্বপ্রকাশিত নতের বিষয়ে কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে না।

ভারতী। চৈত্র। "শিখ-ধর্ম-গ্রন্থ ও ধর্মনীতি" শ্রীমুক্ত হীমেন্দ্রকুমাৰ বায়েন বচনা—পাঠ-
যোগ্য। শ্রীমুক্ত হিৰেন্দ্ৰনাথ বায়েন "হাসির গান" কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এবং নব্বাঁজ্জকরণে
উপভোগ্য।

সংস্কৃত। দ্বিতীয় ভাগ; একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা একত্র। একখানি ক্ষুদ্র মালিকগত, বহুবসপূর্ণ হইতে প্রকাশিত। ত্রিযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়েব "প্রাচীন মুর্শিদাবাদ" গ্রন্থে মুর্শিদাবাদেব প্রাচীন নৌদাখিব ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। প্রবন্ধটি বেশ ইং-
 রাছে। কালীপ্রসন্ন বাবু বহু দিবস হইতে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসেব উপকরণ সংগ্রহ করিত।
 জেন,—এবিষয়ে তাঁহাব বখেণ্ড অবিকার ও অপরূপীন আছে। আশা করি, তাঁহাব সঙ্কলিত ব্রহ্ম-
 সন্দর্ভ হইবে।

জ্বরারি।

সকল প্রকার জ্বরের অব্যর্থ পরীক্ষিত ঔষধ।

ম্যালেরিয়া জ্বরের, ম্ৰীহা যকৃৎযুক্ত জ্বরের ও পুরাতন ঘূসঘূসে জ্বরের এ পর্য্যন্ত একটিও রোগনির্মূলক ঔষধ প্রচার হয় নাই, যে একমাত্র অবলম্বন বিদেশীয় কুইনাইন বা তজ্জাত মিশ্র বা বাটকা, তাহাতে কোনও কোনও স্থলে কিছু দিনের জ্বর বন্ধ হয় বাটে, কিন্তু অবশেষে এক বিঘের স্থানে দুই বিঘ একত্রিত হইয়া আমরণ মরণাধিক যন্ত্রণা দেয়। আমি ও আমার বন্ধগণ বৎসর কাল জ্বরারি ব্যবহার করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, পুরাতন ও ম্যালেরিয়া জ্বরে, ম্ৰীহা-যকৃৎযুক্ত জ্বরে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট—অনেক ডাক্তার কবিরাজ যে সকল রোগ আরাম করিতে পারেন নাই, বন্ধু রামদেব আত্মীয় স্বজন বাহার জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই প্রকার উৎকট বোগীও আমাদের জ্বরারি সেবনে একেবারে আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় সহজ শরীরে কাজ কর্ষ করিতেছে। কুইনাইনে যে জ্বর বন্ধ হয় না, জ্বরারি সেবনে সেই জ্বর মাত্র দিনেই বন্ধ হয়। জ্বরারির আর একটি বিশেষ গুণ যে, ইহা দ্বারা রোগ-একবার আরোগ্য হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ইহা জ্বর, অগ্নিউদ্দীপক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, ম্ৰীহানাশক, কুক্ষদোষ নিবারক এবং দূষিত রক্ত জন্ত বোগ নাশক ইতিবেধক।

১নং কোটা ১৪ বাটকা ৥২ প্যাকিং ১/০ আনা।

২নং " ২৮ " " ১/০ "

৩নং " ৪২ " " ২/০ " ১/২ "

ডাকমাণ্ডল চারি আনা স্বতন্ত্র লাগে।

মধ্যস্থলে নগদ কিনিলে প্রতি কোটার ১/০ অধিক মূল্য লাগে।

এক সঙ্গে এক ডজন লইলে মূল্য ১নং ৫ টাকা প্যাকিং ১১/০; ২নং ১০ টাকা প্যাকিং ১১/০; ৩নং ১৪ টাকা প্যাকিং ১১ টাকা। ভালুপেবলে লইলে মণি-জর্রাব কমিশন অধিক লাগে।

জ্বরারি পাইবার ঠিকানা;—এস, সি, সোম, জ্বরারি আগিস;

১নং চানাবাজার লেন কলিকাতা।

বোন এণ্ড কোং।

১৪৪ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফৈন্যান্সিয়াল কমিশন এজেন্টস্ ও জেনারাল
অর্ডার সাপ্লায়াস্।

শ্রদ্ধাভাজন: কলিকাতায় বিস্তৃত অরডার সাপ্লাই এজেন্সি অতি বিরল।
নিম্নোক্ত ধর্মীয় মহাজন, ভূমিদার, দোকানদার, প্রভৃতি সর্ব সাধারণের
স্বার্থার্থে উপরোক্ত এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে
পারি যে, মানাদিগের ক্রয় ও বিক্রয়ে সকলদেই সহায় হইবেন। আমরা আমাদের
বহুকাল পরিচিত নানাবিধ দ্রব্যের কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায়ীদিগের সহিত
সংক্রমণ করিয়াছি; তাঁহারাও স্বাভাবিক দ্রব্যাদি আমাদের নিকট
পাইবার দ্রবে বিক্রয় করিতে সন্মত হইয়াছেন। দ্রবদ্রব্যাদি দোকানদার
মহাজন অথবা ভ্রমলোকদিগকে অনেক সময় বিস্তার ব্যয় স্বীকার করিয়া ক্রয়
করিতে আসিতে হয় ও তাঁহারা নতুন ক্রোতা বলিয়া অনেক সময় বিলক্ষণ
খোশ হইয়া থাকেন। কলিকাতায় যে জিনিস যেখানে অল্প মূল্যে পাওয়া
যায় তাহা আমাদের অবদিত নাই। এজন্য আমরা প্রকাশ করিতেছি যে, অত্র
অত্র এজেন্সি সংস্থ অগ্রে আমাদের প্রেরিত দ্রব্যাদির মূল্য স্বল্পই
হইবে এবং কলিকাতায় আনিয়া বাহারা দ্রব্য পরিদ্রব করিয়া থাকেন, তাঁহারা
একবার আমাদের প্রদর্শন করুন, এই প্রার্থনা। আমরা সকল প্রকার দেশী
ও বিদেশী শাল, আলোরান, বেনারসী, বোম্বাই চাকাই, শান্তিপুর, কবাসডাঙ্গা,
এবং অন্যান্য নানা প্রকার বস্ত্রাদি পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের বডি, শার্ট, জামিজ,
কেট, ইত্যাদি সর্ব প্রকার জুতা, মোজা, কমাল, গারটর, তোয়ালে, বোতাম,
এসেন্স (Essence), সাদান, ছাতি, ছড়ি, গুস্তক কাগজ কলম, লিখি-
বার, বকর-ট্যাম্পের কালি, জাপান ও চীন দেশীয় খেলনা ইত্যাদি। কবিরাজি
বোতল, ছোনিওপ্যাথিক, সুপ্রাপ্যাথিক, ইলেকট্রোপ্যাথিক, হার্মিসি ওষধ ও
সর্ব প্রকার পেটেট ওষধ, টেবিল, চেয়ার (Furniture), কলকাতা বৌদ্ধদ্রব্যাদি
(Hardware), রং, বিলাতি-মাটি (Cement), ছই চাকার গাড়ী (Bicycle),
তিনচাকার গাড়ী (Tricycle), ইত্যাদি, সর্ব প্রকার কাচের দ্রব্য (Glassware),
এবং এনামেল দ্রব্যাদি, হাড়ি, আট্টা, হারমোনিয়া, ফুট বালি, দেশী ও বিলাতি
বায়ুতর এবং সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও গ্রীয়োপযোগী (Ice and
Aerated water) সরবরাহ করিয়া থাকি।

ম্যানেজার

শ্রীসনৎকুমার বসু।

N.B.—নাম ও ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিলে বাসিত হইবে।

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদির একমাত্র মহৌষধ।

লক্ষ লক্ষ লোক সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রতি-
পন্ন হইয়াছে, জ্বর, ম্যালেরিয়া রোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ ভারতে এ
পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ রাজ্যের রাজার অট্টালিকায় এবং দরজের
কুটারে, বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্জমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু-
স্থানবাসী, কি পঞ্জাববাসী,—সকলেই বিজয়া বটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজ-
জ্ঞার বিজয়া বটিকা প্রথম প্রিয় বস্তু। বহু ইংরেজ-পুরুষ এবং ইংরেজ-রমণী
বিজয়া বটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসারে
আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিজয়া বটিকার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।
মুতরাং, বাহার অরভাবের উপক্রম হইয়াছে, বাহার চক্ষু জ্বালা, হাত-পা জ্বালা
করিতেছে, বাহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, বা কোমর কামড়াইতেছে, বাহার
জ্বর হয় না, বাহার কেঁচি ধোঁলসা হয় না, বাহার কাস-সর্দি হইয়াছে,—এই-
বেলা বিজয়া বটিকা সেবন আরম্ভ করুন, ম্যালেরিয়া জরে আর ভুগিতে হইবে
না। বিজয়া বটিকার শক্তি প্রকৃতই মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্বিত।

অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যিনি অর-ম্যালেরিয়া-বস্তুতাদি রোগে
ভুগিতেছেন, হাত-পা পর্যন্ত ফুলিয়াছে, ২৪ ঘণ্টাই বাহার নাড়ীতে জ্বর আছে,—
ডাক্তার কবিরাজ বাহাকে জবাব দিয়াছেন,—এমন বোগীও বিজয়া বটিকা
দ্বারা সহজে আরাম হইতেছেন,—ঔষধের আলৌকিক শক্তি দেখিয়া, রোগী
প্রতিবেশীরা মুগ্ধ হইতেছেন। কম্পজ্বর, পালুজ্বর, আমাসের কালাজ্বর,
অমাবস্তা-পূর্ণিমায় জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, মজ্জাগত জ্বর,—সর্বপ্রকার
জ্বররোগই ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।

বিজয়া বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাকমাষ্টার	প্যাকিং
১নং কোটা	১৮	১১/০	১০	১০
২নং কোটা	৩৬	২২/০	২০	২০
৩নং কোটা	৫৪	৩৩/০	৩০	৩০

বিশেষ বৃহৎ—গাইস্থ কোটা অর্ধাং

৪নং কোটা	১৪৪	৪৪/০	৪০	৪০
----------	-----	------	----	----

বিজয়া বটিকা প্রাপ্তি-স্থান।

আদিত্যন—অর্ধাং ঔষধের উৎপত্তি স্থান বেড়গ্রাম, পোষ্ট নাদিশুব,
জেলা বর্ধমান—স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জে. সি. বহুর নিকট প্রাপ্তব্য; মথবা—
৭নং হারিশন রোড, পটমডাঙ্গা, কলিকাতা—ভারতে একমাত্র এজেন্ট—
বি. বসু ও কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

কুস্তলীন

কেশের পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও গ্রীষ্মপাদনকারী
মনোহর হৃগন্ধি তৈল।



সুবাসিত কুস্তলীন	...	...	১।
পদ্মগন্ধ কুস্তলীন	...	...	২।০
গোলাপগন্ধ কুস্তলীন	...	...	২।

উপরোক্ত সমস্ত তৈলের নমুনা বিনামূল্যে কেবলমাত্র ডাকমাওল ও
প্যাকিং খরচের জন্য ছয় আনার টিকিট পাঠাইবোই পাঠান হইবে।
বঙ্গদেশ, আসাম এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বহুসংখ্যক
সম্রাস্ত এবং উচ্চপদস্থ লোক এখন কুস্তলীন রীতি-
মত ব্যবহার করিতেছেন। কেশের জন্য কুস্ত-
লীন সর্বোৎকৃষ্ট তৈল, একবার ব্যবহার
করিয়া দেখিলে, অন্য কোন তৈল
ব্যবহারে প্রযুক্তি হইবে না।

এইচ. বসু ;

ম্যাক্সিমাক্সারীং পারসিডমার
২৩ নং মুলবাখি পাড়া লেন, কলিকাতা।

५४८ नः सः द्वाविंशतिः

সেইমানারন কামিশন এজেন্টস ও জোনারাল

ବୃତ୍ତି ଆମ୍ଭଙ୍କ

[illegible]

नामोऽस्तु ॥

শ্রীমতী বঙ্গমাতা

[illegible]

জ্বরারি।

সকল প্রকার জ্বরের অব্যর্থ পরীক্ষিত ঔষধ।

গ্যাম্‌পেরিগ জ্বরের, প্রাণাধিকৃত জ্বরের ও পুরাতন ঘূসখুসে জ্বরের এ পর্যন্ত
 একটিও বোগমিশ্র লক্ষ্য উদ্ভব প্রচাব হয় নাই, যে একমাত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদেশীয়
 কুইনাইন বা তজ্জাত, বিশেষ পাটিকা, তাহাতে কেমনও কোনও স্থানে কিছু
 গিলেব জন্ত জ্বর বন্ধ হয় বটে, কিন্তু অংশেবে এক-বিধের স্থানে দুই বিধ এক
 মিত হয়। আরও নরনাথিক মন্ত্রণা দেয়। মিঃ ও আমার বঙ্গগণ বৎসর
 কাল জ্বরারি ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক দেখেবাছি যে, পুরাতন ও গ্যাম্‌পেরিগ
 জ্বরে, প্রাণাধিকৃত জ্বরে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট—মর্যাদা ডাক্তার কবিদ্যান
 সকল রোগ জ্বরারি পরিত্যক্ত করেন নাই, বন্ধ থাকে আত্মীয় স্বজন বাহ্যিক
 জীবনের ভ্রাণ। একেবারে পরিত্যক্ত করিয়াছেন, এই প্রকার উৎকৃষ্ট বোগীও
 আমাদের জ্বরারি সেবনে একেবারে আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় সহজ শরীরে
 কাজ কর্ম করিতেছে। কুইনাইনে যে জ্বর বন্ধ হয় না, জ্বরারি সেবনে সেই জ্বর
 অল্প দিনেই বন্ধ হয়। বৈরবির আর একটা বিশেষ গুণ যে, ইহা দারা রোগ-
 একবার আরোগ্য হইলে জ্বর পুনরাবর্তি হয় না। ইহা জ্বর, অগ্নিউদ্দীপক,
 ক্ষেপিত পীড়াদাপক, প্রাণনাশক, বহুদোষনিহারক এবং ক্ষিত বস্ত্র জন্ত বোগ
 মাত্রেরই প্রতিষেদক।

১নং	কোটা	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০												
১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪	১১৫	১১৬	১১৭	১১৮	১১৯	১২০	১২১	১২২	১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮	১২৯	১৩০	১৩১	১৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৬	১৩৭	১৩৮	১৩৯	১৪০	১৪১	১৪২	১৪৩	১৪৪	১৪৫	১৪৬	১৪৭	১৪৮	১৪৯	১৫০	১৫১	১৫২	১৫৩	১৫৪	১৫৫	১৫৬	১৫৭	১৫৮	১৫৯	১৬০	১৬১	১৬২	১৬৩	১৬৪	১৬৫	১৬৬	১৬৭	১৬৮	১৬৯	১৭০	১৭১	১৭২	১৭৩	১৭৪	১৭৫	১৭৬	১৭৭	১৭৮	১৭৯	১৮০	১৮১	১৮২	১৮৩	১৮৪	১৮৫	১৮৬	১৮৭	১৮৮	১৮৯	১৯০	১৯১	১৯২	১৯৩	১৯৪	১৯৫	১৯৬	১৯৭	১৯৮	১৯৯	২০০

ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস

ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস

ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস

ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস

ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস

ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস ডাক্তার ডব্লিউ. চার্লস

কবিবরাজ শ্রীমুক্ত বিনোদবিহারী ষষ্ঠ কবিভূষণের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ।

৫০ নং হেবিসন রোড, কলিকাতা । আমহাউট ষ্ট্রীট পোস্ট অফিস ।
আয়ুর্বেদশাস্ত্রপারদর্শী শ্রীযুক্তনারায়ণ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও চিকিৎসক বিগত
প্রায় বৎসর বাবৎ প্রতিষ্ঠাতা সহিত কলিকাতা বামাপুকুর নিবাসী শ্রদ্ধাশীল
দিগন্তর নিজস্ব, এস, আই মহোদয়ের আশ্রয়স্থিত তৎপূর্ণ ৬ গিরিশ চন্দ্র মিত্রের
নামায় দাতব্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ের প্রধান চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া
আসিতেছেন । বৎসর বৎসর ভিন্ন ভিন্ন গীড়াক্রান্ত সহস্র সহস্র রোগী তাঁহার
চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইয়াছে ।

ইংরাজী ১৮৯২ সালের ২৮ জুলাই তারিখের ইতিমান মিরার ও অমৃত-
বাজার পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে যে, বামাপুকুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইহার
চিকিৎসাধীনে থাকিয়া ২৭৬৪ জন বোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে ।

এই ঔষধালয়ে সর্বপ্রকার অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া
যায় । মফঃস্বলের বোগিগণ বোগের বিবরণ আত্মপূর্বক লিখিয়া পাঠাইলে
কবিবরাজ মহাশয় ঔষধাদি বাবস্থা করিয়া থাকেন ।

বান্ধসাহিত্যে বন্ধিম ।

পুঁথি, চারণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত । মূল্য চারি আনা । বন্ধিম ভক্তগণ! আত্মম্ব
এই অপূর্ণ গ্রন্থপাঠে বন্ধিমবিবহ-দুঃখ বিদ্যত হইল । বন্ধন আব'ল-সুদ
বনিতার পাঠের স্তম্ভ মূল্য এত সুলভ । সুন্দর ছাপা ও কাগজ । প্রায়
১৯০ পৃষ্ঠা । বন্ধিমের বিচিত্র জীবনী, কোষ্ঠীবিচার ও গ্রন্থ-সমালোচনায়
উপজ্ঞাসের স্তম্ভ মনোহর এই গ্রন্থ লিখিয়া হাবাণ বাবু দুই বিরাট সজ্ঞা ৬৮
মেডেল পাইয়াছেন । ইহাও অপূর্ণ উপজ্ঞাস "মাস্তা" ১০, একটা চিত্র ১/০, "দুই
তাই" ১/০, "উদ্ভাস্ত প্রেমিক" ১/০ ও "ফুল" ১০ আনা । ভিঃ পিত্তে যাম না ।

শ্রীশঙ্করদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং করওয়ালিস্ট্রীট, কলিকাতা ।

চিকিৎসক ও সাধারণের প্রতি নিবেদন ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপযোগী সমস্ত প্রবন্ধই আমাদের নিকট অল্প
হান অপেক্ষা সুলভ পাইবেন যথা,—ঔষধ, খার্মমেটার যন্ত্র জুত, সুগারনিক,
স্নান, বায়ু পুস্তক, কাইল, প্লোবিউগ ইত্যাদি ।

যথা মাদার টিনচার	১ ড্রাম ১/০	২ ড্রাম ১/০	৪ ড্রাম ১/০
ডাইলিউশান ১২ ক্রম পর্য্যন্ত	১/০	১/০	১/০
ঐ ৫০ ক্রম পর্য্যন্ত	১/০	১/০	১/০

ইহা ছাড়া অধিক উচ্চ ডাইলিউশানের ঔষধ পাইবেন । এত সুলভ কাব
মাদার টিনচাবেব দর এক নয় । আমাদের লিখিত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী
মূল্যেও আছে, তাহার সংখ্যা অল্প । হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বিশুদ্ধতা নষ্ট
যতদূর সম্ভব সাবধান হইতে পাবি, তাহা করিতেছি ।

১১ নং নবকঙ্কের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার ; } শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।
কলিকাতা । }

✓ পুরুরবা এবং উর্দশী ।

দেশীয় ইতিহাসে পুরুরবা এক জন বিখ্যাত রাজা এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়-
গণের আদি পুরুষ । পক্ষান্তরে, কোনও কোনও যুরোপীয় পণ্ডিতের মতে,
তিনি কেবল সূর্য্য ও উষা ষটি কবিকল্পিত গল্পের এক জন নায়ক মাত্র ।
পুরুরবার দেশীয় ইতিহাসে দুই একটি অলৌকিক ঘটনা দেখা যায়, এবং
তাহা যে কবিকল্পিত, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই । কিন্তু সেই ইতিহাসকে
একবারে উড়াইয়া দিবা নিরবচ্ছিন্ন গল্পে পরিণত করাকেও আমরা কবিকল্পনা
কেন্দ্র মনে করি । আমাদের বিবেচনায়, পুরুরবার বৈদিক এবং পৌরাণিক ইতিহাসে
অনেক প্রকৃত কথা আছে ; তবে সেই প্রকৃত কথা কিয়ৎপরিমাণে আখ্যা-
য়িকার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে । যাহা হউক, প্রকৃত হইতে কাল্পনিক বাহিয়া
গিয়া এ স্থলে নিতান্ত দুষ্কর নহে ।

সহিরণ্যস্ত প ঋষি বলিতেছেন ;—

ভসমে মনবে দ্যামবশিমঃ পুরুরবসে স্কৃতে স্কৃন্তবঃ ।

ষায়েণ যৎ পিত্রোমুচ্যসে পবি আত্মা পূর্ব্বমনরমাপরং পুনঃ ॥ ঋষেধ ১।৩১।৪

“হে অগ্নি, তুমি মহাকে স্বর্গের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার পবি-
চর্য্যাকারী পুরুরবা রাজার অমৃতগ্রহের জন্ত অতিশয় শোভনফলযুক্ত কার্য্য
করিয়াছিলে । যখন তুমি অরণীষের ঘর্ষণে পরিমুক্ত হইলে, তখন তোমাকে
প্রথমে বেদীর পূর্ব্বদেশে, পরে পশ্চিমদেশে, স্থাপন করিয়াছিল ।”—এই
বিবরণে কিছুমাত্র কল্পনা আছে বলিয়া বোধ হয় না । পুরুরবা রাজা এক
জন বিখ্যাত অগ্নিপুজক ছিলেন । বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, পুরুরবার গৃহের
যজ্ঞে কেবল এক প্রকার অগ্নিতে হোম হইত ; এই রাজার সময়ে তিন
প্রকার অগ্নিতে হোমের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় । এই ত্রিবিধ অগ্নির নাম
আহবনী, গার্হপত্য ও দক্ষিণায়ি । আহবনীর অগ্নি অরণী নামক কাষ্ঠদ্বয়ে
মণ্ডন দ্বারা উৎপাদিত হয় । আর বিনি রজমান, গৃহস্থানী বা গৃহপতি, তাঁহার
গৃহস্থিত অগ্নিহোত্রের যে অগ্নি, তাহার নাম গার্হপত্য অগ্নি । দক্ষিণায়ি
ঋষিকদের অগ্নি । সাধিক ঋষিকেরা আপন আপন অগ্নিহালী লইয়া যজ্ঞস্থলে
আসিতেন । পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহারা আপন আপন অগ্নিহালী

দক্ষিণভাগে স্থাপিত করিতেন। ঋত্বিকদিগকে বাহা দান করা হইত, তাহা এই দক্ষিণাগ্নির প্রীতিকর বলিয়া তাহার নাম ‘দক্ষিণা’ হইয়াছিল—অনুমান হয়।

ইহাতে দেখা যায় যে,—গুরুবাবর পূর্বে কেবল ‘গার্হপত্য’ নামক অগ্নিতেই যজ্ঞ হোম করা হইত। গৃহপতিগণ বাটীতে এক একটি অগ্নিশালা নির্মাণ করিতেন। তথায় সর্কদাই অগ্নি পরিরক্ষিত হইত, এবং সেই অগ্নিতে গৃহপতি সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র নামক হোম প্রতিদিন সম্পাদন করিতেন। এই উপাসনায় ঋত্বিকের আবশ্যকতা ছিল না। ইহার প্রণালী ও মন্ত্র অতি সবল ছিল। প্রত্যুষে গৃহপতির গাতী সকল দোহন করা হইত। স্বর্ধ্যোদয়ে পব গৃহপতি শুদ্ধবেশে অগ্নিশালার প্রবেশ করিতেন, এবং কিঞ্চিৎ নবীন দুগ্ধ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন ;

“ভূত্বঃ স্ববে”। স্বর্ধ্যো জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ সূৰ্য্যঃ । বাহা ।”

পরে আবার সায়ংকালে গৃহপতিব গোদোহন হইলে, স্বর্ধ্যাস্তের পব তিনি কিঞ্চিৎ নবীন দুগ্ধ লইয়া অগ্নিশালার প্রবিষ্ট হইয়া তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন ;

“ভূত্বঃ স্ববে”। অগ্নিঃ জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ । বাহা” ।

বাহার সর্বাচারসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তাহাদের অগ্নিহোত্র কখনই বিচ্ছিন্ন হইত না। ইহা নিত্যকর্ম বলিয়া পবিগুণিত ছিল। ইহাব অনাচরণে দোষ হইত, এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সকলকেই আপন আপন গৃহের অগ্নিতে এই হোম সম্পাদন করিতে হইত। এখন যেমন ভদ্রলোকের গৃহে ঠাকুর বাটী নির্মিত হয়, তখন সেইরূপ ভদ্রলোকের বাটীতে অগ্নিশালা নির্মিত হইত।

এরূপ অবস্থায় কাহাকেও বিদেশে যাইতে হইলে, বিপদ উপস্থিত হইত। ফলে তাহাকে অত্যন্ত আবশ্যক দ্রব্যের স্রায় আপন অগ্নিশালী সঙ্গে লইয়া বাহির হইতে হইত ; এবং প্রবাসের সময় সেই অগ্নিশালীতে অগ্নিহোত্র সম্পাদিত হইত।

যজ্ঞক্রিয়া অগ্নিহোত্র অপেক্ষা বাহুল্যে সম্পাদিত হইত। এবং গৃহস্থ-মাত্রেরই তাহা ঋত্বিকের বিনা সাহায্যে সম্পাদন করা অসাধ্য ছিল। যখন যে গ্রামের যজমান, সেই গ্রামেরই ঋত্বিক হইতেন, অথবা যখন যজমানের গ্রাম হইতে ঋত্বিকের গ্রাম বিশেষ দূরস্থ না হইত, তখন আর ঋত্বিকের আপনায় অগ্নিশালী সঙ্গে করিয়া যজমানের বাটীতে আসা আবশ্যক

হইত না। তিনি গৃহগতি অর্থাৎ যজ্ঞমানের বাটীতে আসিয়া ভদীয় অগ্নি-শালার অগ্নিতেই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া চলিয়া যাইতেন।

কিন্তু পুরুষবার স্ত্রীর রাজা যখন মহাডুঘরে সোমধাগ বা অশ্বমেধ ধাগেব-অহুষ্ঠান করিতেন, এবং বহুদিন ব্যাপিয়া যজ্ঞ ও উৎসব চলিত, তখন দূরদেশ হইতে বিখ্যাত ও বিদ্বান ঋষিদের সমাগম হইত। তাঁহাদিগকে স্রীয় স্রীয় অগ্নিহালী সঙ্গে আনিতে হইত। ইহাতে যজ্ঞস্থলে দুই প্রকার অগ্নির সমাগম হইত,—গৃহপতির অগ্নি ও ঋষিদের অগ্নি।

তদ্বির পুরুষবা এক নূতন বিধান করিলেন যে, সচরাচর অগ্নিহোত্রের অগ্নিতে যজ্ঞীয় হবিঃপ্রক্ষেপ না করিয়া, ‘আহবনীয়’ অগ্নিকে অরণীমহনের দ্বারা আবিষ্কৃত করিতে হইবে। কাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ইহা একটি অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত ছিল। যে অগ্নির স্পর্শে কাষ্ঠ অঙ্গার হইয়া যায়, সেই অগ্নিই গুপ্তভাবে কাষ্ঠমধ্যে বাস করেন। শীতল কাষ্ঠের মধ্যেও অগ্নির অবস্থানদর্শনে অগ্নিব সর্বব্যাপকতাগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষিদের ভূরি ভূরি ঋক্ কাষ্ঠ হইতে এইরূপে অগ্নি বাহিব হইবার মহিমা খ্যাপন করে।

এই নূতন বিধান অহুসারে ঋষিগণকে যজ্ঞে আসিয়া অরণীমহনের দ্বারা আহবনীয় নামক অগ্নি প্রজ্জালিত করিতে হইত। এবং পুরুষবা এই নূতন বিধানের ব্যবস্থাপক বলিয়া, ইতিহাসে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। হিবণ্যস্থ উপাঙ্কত ঋকে এই ইতিবৃত্তেরই উল্লেখ করিতেছেন।

এই পুরুষবা রাজা মনুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় ‘মানব’ ও ‘মনুষ্য’ বলিখে ভূমণ্ডলের সমগ্র নরনারী বুঝায়,—কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ভাষায় ‘মনু’বংশীয় নরনারীগণই ‘মানুষ’ ‘মনুষ্য’ বা ‘মানব’ বলিয়া পরিগণিত হইত।—স্থানে স্থানে দস্ত্যাদিগকে যে ‘অমানুষ’ বলা হইয়াছে, (ঋগ্বেদ ১০।২২।৮) তাহার অর্থ,—They are not men, এরূপ নহে; (১) ইহার অর্থ এই যে, তাহারা ‘মনু-বংশীয়’ নহে।

বৈদিক ‘মানবেরা’ একটি জাতিমাত্র। ইহারা মনু নামক এক প্রজাপতিকে আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আপনাদের অগ্নিপূজাকে সেই মনুর ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং পৃথিবীর অন্ত্যস্ত জাতীয় লোকে যে সময়ে পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত না, তখন

তাহারা সেই তরুণ দুটুবিখ্যাসম্পন্ন ছিলেন। পিতা মনু অগ্নির নিকট হইতে স্বর্গের অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এবং মনুবাংশীয় উপাসকেরা সেই স্বর্গধামের চিত্র ও আনন্দময় দেবতা ভিন্ন বিকটাকার রাক্ষস বা পিশাচেব মত দেবতাদের পূজা করিতেন না। বস্তুতঃ, মনুবাংশীরেরা সকলেই আপনা-
 দিগকে এক এক জন 'মনু' বলিতেন। ইহা বাংশের নাম ছিল। এই জ্ঞান প্রাচীন ইতিহাসে বহুসংখ্যক মনুব নাম শ্রুত হওয়া যায়; এবং অনেক সময়ে আদি মনুকে পরবর্তী মনুদের সঙ্গে গোলমাল করিয়া ফেলা যায়।—
 মানবী অর্থাৎ মনুবাংশীয় ইলানায়ী মহিলার গর্ভে পুরুষা জন্মগ্রহণ করেন; তাহাতে তিনি ইতিহাসে "ঐল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেখা যায়, প্রাচীন কালে মাতার নামেই পুত্রের সমধিক পরিচিত হইত। অনেক সময়ে পিতা বিখ্যাত হইলে, পিতার নামেও পরিচয় দেওয়া হইত। কিন্তু পুরুষা ইতিহাসে 'ঐল' বলিয়াই সুপরিচিত। খৃস্টের পুরুষা-উর্কশী-সংবাদে (১০৯৫) তাঁহাকে 'ঐল' বলিয়াই উল্লিখিত হইতে দেখি; তাহার পিতার কোনও নামোন্মেষ দেখি না। পরবর্তী ইতিহাসে তাঁহার এক অলৌকিক পিতা কল্পিত হইয়াছেন। চন্দ্রের পুত্র বুধ তাঁহার পিতা। তৎকালে চন্দ্র একটি গ্রহ ও বুধ একটি গ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইত। চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও চন্দ্র, এবং বুধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও বুধ। এই অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত ইলাকে একদা নর ও একদা নারী সাজাইয়া, আরও গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এই সকল কথা সম্পূর্ণ উপভ্রাস বলিয়া বর্জনীয়, এবং ইহাদের মূল্যবোধে দ্বন্দ্ব করা বুধা।

মানবী ইলা, যিনি পুরুষার মাতা ছিলেন, তাঁহারও বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। হিরণ্যকুপ অতিসংক্ষেপে একস্থলে বলেন,—

"ত্বামগ্নে প্রথমায়াম্ আরবে দেবা অকুণ্ণন নহন্ত বিংশতিং ।

ইলাম অকুণ্ণন মনুষ্য শাসনীং পিতৃর্বাং প্রজোন্মমকন্ত জাযতে ॥"

এই শ্লোকের অর্থ বড় স্থাপষ্ট নহে। হিরণ্যকুপ অগ্নিবা গোত্রে উৎপন্ন হইয়া-
 ছিলেন। অগ্নিরোগণের সহিত মানবদের অতি নিকট সম্পর্ক ছিল; কিন্তু মনুবাংশে যেমন প্রবলপ্রভাপ্রাপ্ত সন্তাট সকল জন্মিয়াছিলেন,—অগ্নিরো-
 বাংশে ভেদন নহে। অগ্নিরোগণ উত্তরকালে মানবদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। এখানে হিরণ্যকুপ আপন পূর্বপুরুষ আদি অগ্নিরার উল্লেখ কবিতা বলিতেছেন যে, যখন আমার উক্ত 'পিতা' অর্থাৎ আদিপুরুষের পুত্র

জন্মে, তখন নহব রাজা এবং ইলা বর্তমান ছিলেন। নহব রাজার একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন; তিনি অগ্নির অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই নহব রাজা 'আয়বে' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইতিহাসে নহবের পিতার নাম 'আয়ু'। এবং আয়ু পুরুষবার ও উর্কশীর পুত্র। পুরুষবার

পিতার নাম 'ইলা'। হিরণ্যস্তম্ব বলেন যে, "অগ্নি ইলাকে 'মহুসের' 'শাসনী' করিয়াছিলেন।" ইহাতে বিবেচনা হয়, 'ইলা' একজন মহিমশালিনী রমণী ছিলেন, এবং তিনি মহুবংশের শাসনকর্ত্রী বা সম্রাজ্ঞী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। জীলোকের রাজ্যাধিকার একপ্রকার নিয়মবিরুদ্ধ; ইলা কিরূপে রাজ্যাধিকারিণী হইলেন, বোধ হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই, কেহ কেহ তাঁহাকে পুরুষ সাজাইয়াছেন, এবং তাঁহার জীতের ভূরি ভূবি উদাহরণ থাকায়, তিনি শাপগ্রস্ত হইয়া জীতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—এইরূপ এক অতিপ্রাকৃত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। পাঁচি বৈদিক প্রমাণে দেখা যায় যে, একদা মহুবংশে একটি অসাধারণ রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি আপন ক্ষমতায় মহুবংশীয়, বীরগণেরও শাসনকর্ত্রী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই অসাধারণ রমণীর গর্ভে পুরুষবা জন্মগ্রহণ করেন।

পুরুষবা ও উর্কশীর প্রেমকাহিনী অতি বিচিত্র, এবং তাহা ইতিহাস ও কাব্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। এরূপ প্রাচীন পুথচ বিচিত্র ও প্রসিদ্ধ ঘটনা বিবিধ উপাখ্যানে অভিহিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ইহার অলৌকিক অংশ পরিত্যাগ করিলে দেখা যায় যে, পুরুষবার অনেক পত্নী ছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি কোনও স্থানে উর্কশীকে দেখিয়া তাঁহার লাবণ্যে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। উর্কশী জাতিতে গান্ধারদেশীয় গন্ধর্ব্বী বা অম্বর ছিলেন। পুরুষবারের সমুচ্ছিত স্থানে সর্বদা বিচরণ করায়, ইহারা 'অম্বর' অর্থাৎ আকাশচারিণী, এই সংজ্ঞা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা পুরুষে উঠিয়া গলারন করিলে, তাঁহাদিগকে ধরা বড় সহজ ছিল না। গন্ধর্ব্বী উর্কশী মানব পুরুষবাকে গন্ধর্ব্বপ্রথা অনুসারে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু চিরকালের জন্য যদেব ও বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি পুরুষবাকে কতকগুলি পুত্র আদান করিলেন; তাহা এই;—তিনি কেবল একটি সম্ভান উৎপাদন পর্যন্ত পুরুষবার নিকট থাকিলেন। তখনকার রাজাদেব অনেক পত্নী থাকায় পর্যায়ক্রমে সকলকে স্বামীর নিকট আসিতে হইত; একজন স্বামীকে

ষোল আনা অধিকার করিবেন, তাহা ঘটিল না । প্রত্যেক পত্নীর প্রতি-
দিন স্বামিসন্দর্শন হইত না । কিন্তু উর্কশীর পণ বে, পুরুষকে অন্ততঃ
প্রতিদিন তিন বার তাঁহার শয়নাগারে আসিতে হইবে । অধিকন্তু উর্কশী
আপন শয়নাগার ভিন্ন অল্প কোথাও পুরুষকে বিবস্ত্র দেখিবেন না ।
যে দিন দেখিবেন, সে দিন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন ।
কলিতার্থ, উর্কশীকে বিবাহ করিয়া রাজার অল্প দ্রব্য মুখবর্শন পর্য্যন্ত অসম্ভব
হইল । গন্ধর্ব্বী তাঁহাকে একবারে একচেটিয়া করিয়া লইল । কামান্ন হইয়া
পুরুষবাণ্ডু এই সকল নিয়মপ্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেন । উর্কশীর
সঙ্গে দুইটি সুন্দর কোমলগোলাপালী গান্ধারদেশীয় উরণক বা মেঘ ছিল ।
ঐ দুইটিকে তিনি পুত্রনির্কিংশে ভালবাসিতেন, এবং রাজিকালে আপন
শয্যার নিকট রাখিতেন । তাঁহার ইহাও এক পণ যে, রাজ্যে তাঁহার ঐরূপ
আচরণে আপত্তি করিতে পারিবেন না ।

এইরূপে চারি শতকাল উর্কশী পুরুষবার গৃহে বাস করিলেন । এ দিকে
তাঁহার গন্ধর্ব্ব আশ্রয়গণ তাঁহাকে স্বস্থানে আনিতে যত্নবান্ হইল । তাহার
উর্কশীর সহিত রাজার যে সকল অঙ্গীকার-বাক্য ছিল, তাহা অবগত হইয়া,
এক কোশল অবলম্বন করিল । একদিন রাজিকাগে তাঁহার উর্কশীর শয়না-
গার হইতে সেম দুইটি অপহরণ করিয়া লইয়া গেল । উর্কশী মহাচীৎকার
আরম্ভ করিলেন । পার্শ্ববর্তী গৃহে রাজা বিবস্ত্র হইয়া শরন করিয়াছিলেন ;
তিনি উর্কশীর চীৎকাবে চোর আসিয়াছে জানিয়া, অসিহস্তে যেমন নগ্ন
অবস্থাতেই বাহির হইবেন, তমনি উর্কশীর দৃষ্টিতে পতিত হইলেন ;—এইরূপে
তাঁহার নিয়মভঙ্গ হইল ।

এখন উর্কশী আর রাজার নিকট থাকিবেন না, জানাইলেন । রাজা অতি-
শয় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং অপত্যোৎপাদন পর্য্যন্ত উর্কশী যে তাঁহার নিকট
থাকিবেন, এ কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন । উর্কশীও কহিলেন, তাঁহার গর্ভ
হইয়াছে ; সন্তান জন্মিলে, তিনি তাহাকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিবেন । এই
অঙ্গীকার করিয়া উর্কশী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । এই পুত্রের নামই আয়ু ।

রাজা উর্কশীর বিরহে উন্মত্তের স্তায় হইলেন, বৃদ্ধ বিএঁই রাজকাৰ্য্য সমুদায়
পরিত্যাগ করিলেন । অবশেষে বজ্রের অহুষ্ঠান করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, এই
বিশ্বাসবশতঃ পৃথিবীতে উর্কশীকে যদিও হারাইয়াছি, স্বর্গে যেন তাঁহার সলোকতা
প্রাপ্ত হই ; এই আকাঙ্ক্ষায় বিস্ত্র বাগযজ্ঞ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন ।

এই বিবরণে অবিবাহ করিবার কোনও কারণ নাই। পরবর্তী কবিরা উর্কশীকে স্বর্গের শাপভ্রষ্টা অপ্সরা সাজাইয়াছেন;—কিন্তু গন্ধর্ব্বী উর্কশী যে বাস্তবিক কেবল গান্ধারী রমণীমাত্র, তাহা তাঁহার মেঘঘরের কথাতাই বিলক্ষণ জানা যায়। ঋগ্বেদের ১।১২৬।৭ ঋকে এক রমণী আপনার স্বামীকে বলিতেছেন,—দেখ, “উতাহম্ অগ্নি রোমশা গংধারীগাম্ ইবাবিকা।” আমি গন্ধারী রমণীদের মেঘের স্তায় কোমললোমসংযুক্ত হইবাছি। গান্ধারের স্তনের লোমগণ মেঘ যে গংধারীগণের বড় প্রিয় ছিল, তাহা এ স্থলে দেখা যাইতেছে। উর্কশী একটি পর্কতবাসিনী স্বাধীনতাপ্রিয় গন্ধারদেশীয়া রমণী ছিলেন মাত্র;—চিরকাল একজন মহুঘোর পত্নী হইয়া থাকিতে তাঁহার রুচি হয় নাই।

এক্ষণে এই বিখ্যাত রাজা কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোনও উপায় আছে কি না? বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বংশাবলীর তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অনেক গোলাযোগ আছে। পুরুষবা হইতে অনেক ব্রাহ্মণকুল এবং অনেক ক্ষত্রিয়কুল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বংশ “ব্রহ্মক্ষত্রের বোনি” বলিয়া পরিগণিত। বিখ্যাত সুদাস রাজা এবং বিশ্বামিত্র ঋষি, উভয়েই পুরুষবার বংশ বলিয়া পরিগণিত। ইহারাই দুই জনে সমসাময়িক, কিন্তু বংশতালিকা অনুসারে ত্রয়োদশ পুরুষে বিশ্বামিত্র এবং উনচত্বারিংশে পুরুষে সুদাসকে দেখা যায়। ইহার সামঞ্জস্যের উপায় কি? যদি একপ অল্পমান করা যায় যে, পুরুষবা হইতে সুদাস পর্যন্ত রাজারা সকলেই পিতাপুত্র নহেন; তৎকালে যুদ্ধ বিগ্রহের অতীব প্রাবল্যহেতু অল্পকালেই এক রাজার পর অপর রাজা সিংহাসনে আরোহণ কবিতেন; তাহা হইলে ত্রয়োদশ পুরুষে ৩৯ রাজা পর পর রাজ্য করা অসম্ভব নয়, তাহা হইলে বরং কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য হইতে পারে। আর ইহাও অসম্ভব নয় যে, রাজাদের বংশতালিকা ত্রয়োদশপ্রিয় সভাসদগণকর্তৃক সংগৃহীত, তাহা সমধিক নিশ্চাসযোগ্য নহে। কিন্তু ঋষিদের বংশাবলী ঐ কারণে অবিবাহিত হইবার নহে। তাঁহার বিত্তাব্যবসারী। তাঁহাদের পরিষদ বা সম্প্রদায়ে তাঁহাদের বংশাবলী বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত হইত, এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নয়। তদনুসাবে বিশ্বামিত্রকে পুরুষবা হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ ধরিয়া, এক এক পুরুষে ৩০ বৎসর গণনা করিলে, উভয়ের অন্তর ন্যূনাধিক ৪০০ বৎসর হয়। বিশ্বামিত্রকে শকাব্দ-পূর্ব ১৬০০ বৎসরের ব্যক্তি ধরিলে, পুরুষবা শকাব্দপূর্ব ২০০০ বৎসরে বিদ্যমান ছিলেন, এরূপ অল্পমান করা যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

প্রতিশোধ ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বিশ্বনাথের প্রথম জীবনাংশ তেমন সর্বজনবিদিত নহে । আমরাও এ পর্য্যন্ত সে কথা কিছু বলি নাই । কিন্তু এখন বলিবার সময় হইয়াছে ।

বৈষ্ণব ধর্ম নদীয়া জেলার অস্থিমজ্জাগত । এই ধর্ম ভিতরে বাহিরে ইহার সমাজব্যবস্থাকে বেকাপ অল্পপ্রাণিত করিয়াছে, তাবিলে বিস্তৃত হইতে হয় । ছুর্ভাগ্যবশতঃ মহাপ্রভুর সে পবিত্র ধর্ম এবং উহার আদর্শ অনেক স্থলে বিধম বিকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে । কবি চণ্ডীদাস সখী রজকিনী রামীকে মধ্যবর্তিনী করিয়া বে মধুর রসে ভোর ছিলেন, নদীয়া সমাজ তাহার ভরস্কাভি-
ষাতে যেমন প্রহত হইয়াছে, আব কোথাও তেমন নহে । ইহার ফলে সর্ব শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটা উদার সহানুভূতি এবং গৃহ সংযোগের ভাব অস্তঃশিলাবহিয়া আসিতেছে; বাহিরের লোকের তাহা জানিবার উপায় নাই । এই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র এই যে, যত প্রকৃতি পুরুষ, রস তত প্রকার । এই ব্রাস্ত সংস্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতি এবং ধর্মকে কলুষিত করিয়া তোলে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু ছুই এক স্থলে ইহার প্রতিবাদ দেখিয়াছি । চণ্ডীদাস সম্প্রদায়ের এক প্রবীণা একবার আনায় বলিয়াছিলেন, “আমাব স্বর্গীয় প্রভু বলতেন, গার্হস্থ্য এবং বিবাহিত স্বামী পত্নী ছাড়া ধর্মসাধন হয় না ।” মৃত স্বামীর কথা এই ভাবে বলিতে গিয়া, বুদ্ধার উচ্ছল চক্ষে যে জল আসিয়াছিল, কখন তাহা ভুলিতে পারিব না ।

প্রথম বরসে বিশ্বনাথ এই সম্প্রদায়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল । অতিসং-
গোপনে স্বগ্রাম গাড়রাভাতছালা এবং পার্শ্ববর্তী পল্লীর অনেকগুলি পুরুষের
সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহাকে মিলিত হইতে হইত । ইহার মধ্যে আসান নগরের
প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় পাঁচকড়ি সর্দারের কন্য়ার সঙ্গে বিশ্বনাথের ঘনিষ্ঠতা জন্মিল;
এই ঘনিষ্ঠতায় বিকানের কোনও হেতু ছিল, কি না বলা যায় না; কিন্তু পাঁচকড়ি
সর্দার এক দিন মিল্লিপে বিশ্বনাথকে কন্য়ার গৃহে দেখিল, এবং ধরিয়া বাধিয়া

রাখিল। কুলকলঙ্কভরে চোব বদিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত করিতে পারিল না। পাঁচকড়ি সর্দার ভাগিনের মেগাইর সঙ্গে একত্র আসাননগরের দূরবর্তী নীলকুঠীতে পাইকের কাজ করিত। বিশ্বনাথকে বাঁদিয়া রাখিয়া সে ভাগিনেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেল। সেই অবকাশে কন্তা বিশ্বনাথের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল—মাতার অমুযোগ এবং পিতার নিষেধ গ্রাহ্য করিল না।

বিশ্বনাথ মুক্ত হইয়া সতর্ক হইল বটে, কিন্তু যে সখী নিজেব প্রাণের মারা ত্যাগ করিবা তাহাকে বাঁচাইবাছিল, তাহার আব কোনও খবর পাইল না। কিছু দিন পরে গ্রামে খবর আসিল, সর্দারের কন্তা মেগাইএর গৃহে সর্পদংশনে মারা গিয়াছে। বিশ্বনাথ বুঝিল, আসল ব্যাপারটা কি। নিজেকে নিরপরাধিনী বাকালমৃত্যুর কারণ জানিয়া সে মর্মান্বিত হইল। পাঁচকড়ি সর্দার ও মেগাইব উপব জাতক্রোধ হইল।

ইহার ফলে বিশ্বনাথের জীবনে একটা ঘোর পরিবর্তন ঘটিল, তাহার সকল সঙ্গর, সকল আশা ভরসা এক বিপরীত খাতে প্রবাহিত হইল। সেকালে ডাকাইতি একটা ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—বার যত লাঠির জোঁর, সে তত বড়লোক। বড় বড় জমীদারেরা ডাকাতির দল পুঁথিয়া যুগপৎ আত্মরক্ষা ও শত্রুনির্যাতনের উপায়বিধান কবিতেন। বিশ্বনাথ ক্রমে নিজে ডাকাইতির দল কবিল। হাট্টার সাহেবের সংগৃহীত নামের তালিকায় নির্ভর করিতে পারিলে বলিতে হয়, নলদাহা, কৃষ্ণসর্দার এবং সন্ন্যাসী, এই তিন জন বিশ্বনাথ বাবু প্রধান অমুচর। তাহাব মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিত বলিয়া ঐ নাম পাইবাছিল। নামটি নলদাহা নহে, নলডুবো। ইহার সম্বন্ধে নানা গল্প দিগুনগর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, লোকটা দিগুনগরের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার মাথায় কাঁল হাঁড়ি ধরিয়া ডুবিয়া থাকিত, এবং সুবিধামত সালফার মহিলাদের কুস্তীরবৎ অর্জমণ করিয়া মারিয়া ফেলিত। শেষে একটা হিন্দুস্থানী পালোয়ান জীবনে জলে নামিয়া এই মনুষ্য-কুস্তীর নীকার করে। তাহাকে লোহার পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, দীর্ঘির ধারে শিমুল গাছে ঝুলাইবা রাখা হয়। সে খাঁচার লৌহ আজও গুনিতে পাই শিমুলতলার বিরাজ করিতেছে। কেহ বলেন, নলডুবো বিশ্বনাথের একজন কালীর পাইক * ছিল, এবং সাতনলা দিয়া আশ্রয় কৌশলে লোক মারিতে পাবিত বলিয়া তার এত নামডাক ; জগে ডুবো থাকাব বখাটা অলীক। এই

* কালীর পাক বা পাইক—প্রধান খেলোয়াড়,—বাঁটে বন্ধা কবা ইহাদেব কাছ।

সংবাদদাতার মতে প্রথম বয়সে বিশ্বনাথের প্রধান অনুচর ছিল—পীতাম্বর ও বৈষ্ণনাথ । ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দল ছিল । খুব বড় জায়গায় ডাকাইতি করিতে হইলে, তিন দল একত্র হইত ।

ডাকাইতি দলের অধিপতি হইয়া বিশ্বনাথ মাঝে মাঝে পাঁচকড়ি সর্দারকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিত । কিন্তু ভাগিনের মেগাইএর সহায়তায় সে এরূপ অজ্ঞেয় ছিল । উভয়ের মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিয়াছিল । পাঁচকড়ি নীলকুঠির বলে বিশ্বনাথ এবং তার দলবলকে গ্রাহ্য করিত না । পাঁচকড়ি এক বার কুঠির টাকা লইয়া কৃষ্ণনগর গেল । মেগাইকে কুঠির কাজে একা রাখিয়া যাওয়ার, পীতাম্বর সুবোধে খুঁজিতে লাগিল, কিসে তাহাকে হীনবল করিতে পারে । শেষে মেগাইকে তাহার উপপত্নী-গৃহে পাইয়া ধরিয়া লইয়া যায় । চলিত গল্প এই যে, বিশ্বনাথ সদলে এক শত চাক বাজাইয়া দিবাভাগে এই মেগাই সর্দারকে আসাননগরের নিকটবর্তী পঞ্চাননতলার বলি দিয়াছিল । বছর বহুতে যাতকের কাজ করিয়াছিল । মেগাই প্রার্থনা করিয়াছিল, যাহাকে চিং করিয়া কাটা হয় । সে প্রার্থনাও গ্রাহ্য হয় নাই । ফিরিবার পাঁচকড়ি সর্দার ঢাকের শব্দ শুনিয়া দূর হইতেই বিপদ বুঝিতে পারে । এবং বটগাছে ভাগিনেয়ের ছিন্নমুণ্ড ছলিতে দেখিয়া কঠোর শপথ করে, বিশেষ ডাকাতের দল নিশ্চয় করিবে । সেই হইতে পাঁচকড়ি বিশ্বনাথের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিল । সাহেবেরা তাহার দমন জন্য বহুপরিকর হইলে, পাঁচকড়িই সকল দলের প্রধান সহায় হইল । জনশ্রুতি এই যে, জেলার মাজিষ্ট্রেট পাঁচকড়ির হাসি বিস্তার সিপাই নিযুক্ত করিয়া দেন । প্রবোধন বুঝিলে, সে নিজেই ডাকাইতদের কাঁসি দিতে পারিত ।

এই জনশ্রুতি কতটা সমূলক, বলা যায় না । যাহা হউক, অনেক দিন পরে হঠাৎ একদিন মধ্যাহ্নে পাঁচকড়ির কাছে খবর আসিল, পীতাম্বর নিকটবর্তী খোল-গাছি গ্রামে একটা জীলোকের গৃহে নিদ্রা বাইতেছে । দেবিত্যক্ত না করিয়া পাঁচকড়ি সদলে সেখানে উপস্থিত হইল, এবং বাড়ীটি ঘেরিয়া ফেলিল । দীর্ঘ শূলপি হস্তে সে নিজে ঘরের চালে উঠিল, এবং চাল কুটা করিয়া দেখিল, পীতাম্বর বোর নিদ্রায় অভিভূত । সেই ছিদ্রপথে শূলপি প্রেরণ করিয়া, পাঁচকড়ি প্রথমে নিদ্রিত পীতাম্বরের বক্ষোদেশে দ্বিগুণ স্পর্শ করিল, এবং সে জাগিয়া উঠিলে, বর্ধাকলক আমূল তাহার বক্ষে বসাইয়া দিল । পীতাম্বর বলিল,—“মরা মানুষ

মারলি ?” উত্তর—“মেগাইকে কি জীমন্ত মেরেছিলি ?” মৃত্যুর পূর্বে বস্ত্রণা বড় অধিক হওয়ার বিদ্ধ পীতাম্বর বলিয়াছিল,—“শূলপি বড় শূলচে।” প্রিয়তম ভাগিনেয়ের হত্যাকাণ্ড স্মরণ করাইয়া পাঁচকড়ি কহিল—“এত দিনে আমার মেগাইএর শূলনি কিছু কমিল।”

এই গল্প বৃদ্ধদের মুখে এখনও শোনা যায়। পাঁচকড়ির সহায়তা ব্যতীত বিশ্বনাথ কখনও ধরা পড়িত কি না সন্দেহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে কালে হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধাবে মিলিবার মিশিবার কতকগুলি অবিধা এবং স্থল ছিল। এখনও দূর পল্লীগ্রামে জাতীয় মহোৎসবের দিনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মহরমের সময় হিন্দু মুসলমানে এক হইয়া লাঠি-খেলার ধুমধাম আগেকার মত না থাকে এখনও কিছু কিছু আছে। বিশ্বনাথের প্রথম অভ্যাসের দিনে দিগুনগর অঞ্চলে একবার মহরম উপলক্ষে এইরূপ খেলার “মেলা” হইয়াছিল।

সেই মেলার দেশের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় সকল সমবেত হইয়াছিল। বশোলিপুত্র বুরকেরা দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া হিন্দু মুসলমানের সহিত বলবীর্য্যপরীক্ষার যোগ দিয়াছিল। বিশ্বনাথ সে দিন অল্প বয়সেও চাতুর্য্যে সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে এক জন হইলেও অদ্বিতীয় হইতে পারিল না।

বিশ্বনাথের বিশিষ্টতা কৌশলে যত, বলে তত নহে। সেই বিষয় দিনে উহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছিল। বিশ্বনাথ অল্প বয়সের উপর জয় করিল বটে, কিন্তু প্রেমচাঁদ ডোমকে পারিল না। সেই সমবেত গলা রাড়দের ভিতর একজনও প্রেমচাঁদের দেহে অঙ্গস্পর্শ করাইতে পারে নাই। অথচ তাহার লাঠির কাছে কাহারও ভরবারি টিকিল না। কেবল বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহার সমানে সমানে যুদ্ধ হইল। বিশ্বনাথ নিজে বুকিল, বলে সে ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে, প্রেমচাঁদ হরিণ তাড়াইয়া মারিত ; এমনি তাহার বল ও দৌড়িবার শক্তি। কিন্তু চুরী ডাকাতিতে সে কখন যোগ দিত না।

সেই পরীক্ষার পর বিশ্বনাথ তাহার সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করিল। তার সঙ্গে খুড়া-ভাইপোর সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিল। প্রেমচাঁদ বিশ্বনাথের বীরোচিত বিস্তার গুণে মুগ্ধ হইল বটে, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিতে সম্মত হয় নাই। শেষে মেগাইএর মৃত্যুর কিছু দিন পরে তাহার

সর্বপ্রধান কাপীর পাইক হইল। ইহাতে কথা উঠিল, সেগাইএর পরিণাম দেখিয়া, প্রাগভয়ে প্রেমচাঁদ বিশ্বনাথের দশে আসিতে সম্মত হইয়াছে। এখনও লোকে তাই বলে। কিন্তু সফলেই একবাক্যে স্বীকার করে, প্রেমচাঁদ কখনও জীবহত্যা করে নাই। সেই সুনাম ছিল বলিয়াই, গবর্নেন্ট তাহাকে ধরিয়া দীপান্তরিত করিয়াছিলেন; লট কাইয়া বধ করেন নাই। বুদ্ধ-বয়সে দেশে ফিরিয়া প্রেমচাঁদ গঙ্গাতীরে মরিতে পাইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই প্রেমচাঁদ ডোম এই ইতিহাসে ভগবান্ মদক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। মহাশয়েরা যদি কেহ “অলানত” তাহার দোকানের মিষ্টান্নগ্রহণকল্পনা করিয়া, জাতি হারাইবার আশঙ্কা করেন, সেই ভয় বলিতেছি, ভয় নাই। ভগবান্ মিষ্টান্নোপজীবীর বংশধর বটে। প্রেমচাঁদ তাহার গুরুদত্ত নাম। এবং সে “বলরামসম্প্রদায়” ভুক্ত বলিয়া লোকে তাহার “হাড়ি” বা “ডোম” উপাধি রটাইয়াছে।

ডাকাতের দলভুক্ত হইয়া ভগবান্ কেবল আত্মের পরিভ্রাণচেষ্টায় ক্রিয়িত। লুটতরাজকে শারীরিক দণ্ডমাত্র পরিবর্জিত করিয়া, নিতান্ত নিরাগিষ রকমের করিয়া তোলে, এই তাহার সত্য চেষ্টা। ইহাতে দলের কাহারও সঙ্গে প্রায় তাহার বিনিত না। অথচ সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। বিশ্বনাথ-নিজে রকম জুলমের বন হইলেও ভগবানের সতে মায় দ্বিতে পারিত না। যাই বলিত, “বাবা যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। ভয়ক নইলে ভিক্ষে নিলে কি?”

দলভুক্ত হইয়া পাঁচ জনের সঙ্গে, মিলিয়া বিশিয়া কাজ করিতে যে আত্ম-বিসর্জনটুকুর দরকার, ভগবানের তাহা ছিল না। সকলকেই সে বিশ্বাস করিত এবং কাহারও প্রতি একবার অবিশ্বাস হইয়া গেলে, মনের ভাব রাখিয়া চাকিয়া চলিতে পারিত না। স্বগ্রাম আড়বান্দির সম্মিহিত কোনও স্থানের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ একবার ভগবান্কে আসিয়া ধরিল, বিশ্বনাথকে বলিয়া কহিয়া তাহাকে দলভুক্ত করিয়া লওয়া হউক। গুণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বেশ বলিষ্ঠ এবং লাঠি-খেলায় সখেষ্ঠ পারদর্শী। ভগবানের অমুরোধ শুনিবা, বিশ্বনাথ বলিল, “গুড়ো, বাসুনের ছেলে ডাকতি কর্তে চান, ব্যাপারখানা কি বাপু? লোকটাকে ভাল করে জেনিস তে? তোর বাপু সরাইকে

বিশ্বাস! আগে আমিও ছিলাম তোর মতন। তাই বদে গোয়ালাকে ধর্ম-
পুত্র কবে ভুগছি!” কালীর পাইকেরা ব্রাহ্মণের বল ও অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা
শেষ করিয়া তাহাকে দলপতিব কাছে লইয়া আসিল। বিশ্বনাথ ঠাকুরটিকে
অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। সহসা দূরে একটা ঝাঁড় চরিতে দেখিয়া,
ব্রাহ্মণের হাতে এক শাপিত তরবারি দিল। বলিল, “ঠাকুব! ছুটে গিয়ে
ঝাঁড়টাকে কেটে এগা দেখি, কেমন তোমার বল শক্তি!” বিজপুত্র তাহাতেই
প্রস্তুত, মালকোঁচা মারিয়া সশস্ত্র ছুটিয়া চলিলেন। বিশ্বনাথের ইঙ্গিতে দুই
জন তাহার পাছে ছুটিল, এবং ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিল। বিশ্বনাথ ভগবানকে
লক্ষ্য করিয়া বলিল, “দেখলি বাপু তুই কেমন মানুষ চিনিস্! ব্রাহ্মণের দিকে
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, “ওরে, ঠাকুরটোর কান মোলে ভাঁড়িয়ে দেত!
ওর কোন ধর্মজ্ঞান নেই!”

দিগুনগবের চক্রবর্তী মহাশয়দের বাড়ীতে চিঠি পাঠাইয়া বিশ্বনাথ এক
বাব ডাকাইতি করিতে যায়। ভগবান জ্ঞানিত, এই পরিবার সর্বদা
সদহুষ্ঠানপ্রিয়। বিড়কে সে গৃহে দক্ষ্যতা করিতে নিবেদন করিল; কিন্তু কথা
ধাকিল না। ভগবান সে দিনকার ডাকাইতিতে নোগ না দিয়া, দিগুনগবের
বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল। এ দিকে বধাসময়ে ডাকাইতি পড়িল।
অকস্মাৎ গৃহের এক প্রান্তে যজ্ঞগার চীৎকার শুনিয়া, বিশ্বনাথ স্বয়ং লুপ্তন-
ত্যাগ করিয়া সেই দিকে ছুটিয়া গেল। মশালের আলোকে দেখিল, বৈষ্ণবনাথ
অলুলায়িতকুস্তলা, রুধিরাপ্লুতা জননীর ক্রোড়, হইতে চারি বৎসরের শিশুকে
কাড়িয়া লইতেছে; সম্মুখে কূপ দেখাইয়া বলিতেছে; “চাবি না দিস, ছেলেটাকে
এই কুয়ার ফেলে দেব!” সেই বিপন্ন মাতৃরূপে বিশ্বনাথ শৈশবকালের
ক্রীড়াসঙ্গিনী প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণতনয়াকে সহসা চিনিতে পারিল। বৈষ্ণ-
বনাথ একটু আগে পৃষ্ঠদেশে দুই স্থানে তরবারির গুরুতর আঘাত করিলেও,
মাতা তাহাতে ভ্রক্ষেপ না করিয়া প্রাণপণে সন্তানকে ক্রোড়ে বন্ধা করিতে-
ছেন! অলুলায়িতকুস্তলে শোণিতসিক্ত অসংযমিত বস্ত্র মধো অকলঙ্ক
সৌন্দর্য্য মধুর অপত্যবাৎসল্যে অপূর্ব যোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। দেখিয়া বিশ্ব-
নাথের হৃদয় মথিত হইল। শৈশবে এক দিন তার দিদিঠাক্কণ অন্নপূর্ণা
দেবী আপনার পালিত এক মাতৃহীন ছাগশিশুকে বলিদান হইতে ঠিক এমনি
ভাবে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই ছাগশিশুর বলির সময় বিড়
কর্তৃতলে চক্ষু ঢাকিয়া গ্রামের ঠাক্কণতলা হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গিয়াছিল—

সে অনেক দিনের কথা, অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল। ক্রোড়ে ঘোষে বিশ্বনাথ প্রচণ্ড বেগে বৈষ্ণবনাথের প্রতি ধাবিত হইল, এবং ধাক্কা দিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল। বলিল,—“ওরে, তুই কি মার পেটে জন্মাসুনি! ছোট ছেলের কি অপরাধ? আমার সামনেই এই, না জানি অসাক্ষাতে তুই কি জুলুম না করিস?” সহসা ব্যগ্র গভীর স্বরে ধ্বনিত হইল, “ওড়াও!” মুহূর্ত্তে লুপ্তনপর ডাকাইতদের বে যেখানে ছিল, বহির্দ্বারে ছুটিয়া চণিল, এবং দলপতির অপেক্ষার সারি দিয়া দাঁড়াইল। সেই অবকাশে বিশ্বনাথ সেই মাতৃস্বরূপিণী দেবীপ্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। বলিল, “দিদিঠাকরুণ, আমার চিন্তে পার কি? আমি জান্তাম, তোমার বিরোধেই হয়েছে, শান্তিপুত্র! এখানে তা জান্তাম না। জানলে কখন বিত্ত হতে তোমার স্বত্তরবাতীর কোনও অনিষ্ট হত না। কিন্তু যা হয়ে গেল, তার আর চারা নেই। দিদি! বিত্তর দোষ নিও না। এখন তোমার কি উপকার করতে পারি দিদিঠাকরুণ?” বিশ্বনাথ বস্ত্রমধ্যে রক্ষিত বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দিদিঠাকরুণের পদতলে রাখিল, এবং পুনরায় সজ্জলনেত্রে তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া অন্তহিত হইয়া গেল।

পথে দলের লোকদের বিদায় দিয়া, বিশ্বনাথ ক্ষুদ্রমুখে ধীরে ধীরে ভগবানের কাছে গেল। সে রাতের ঘটনা একে একে তাহার কাছে বলিতে বলিতে বিশ্বনাথ অশ্রুমোচন করিল। বলিল, “খুড়ো, আজকের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আমার দলে আমার নামে এখন কত দোরাঙ্গা হয়, কে জানে? কি ছাই ব্যবসাই করছি। মনে হচ্ছে, এ পাপ ছেড়ে দিয়ে চাববাস করে খাই!” বিশ্বনাথের সে দিনকার আশানবৈরাগ্য স্থায়ী হয় নাই; কিন্তু তাহার ফলে ভগবান দস্তাদল ত্যাগ করিল, বিশ্বনাথের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, শেষে গোবরডাঙ্গার হাটের উপর কিছু কাল দোকান করিয়া থাকিতে সম্মত হইল।

ভগবানের জী ইতিপূর্বেই মারা গিয়াছিল। কতটুকু সে নিজেই মালুম করিয়াছিল, পূর্বে তাহা বলিয়াছি। নিশ্চিন্ত হইয়া গল্পবতীরে হরিনাম করিবার ভরসা ভগবান অগ্রহারণ্য মাসে মেঘের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিল। বিশ্বনাথও তাহাকে সেই পরামর্শ দিয়াছিল।

ঐশ্বর্য
ক্রিয়া:

✓ দুই জন প্রাচীন কবি ।

৩০০ বৎসরের অধিক কাল গত হইল, পূর্ববঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে দুইটি মনস্বী কবির আবির্ভাব হয়। ইহারা পিতা, পুত্র। যজ্ঞবর সেন ও গঙ্গাদাস সেন, পূর্ববঙ্গের পক্ষে কুন্তিবাস ও কাশীদাসের স্থানীয়। পূর্ববঙ্গের পদ্মপুরাণে, রামায়ণে ও মহাভারতে ইহাদের হস্তচিহ্ন দৃষ্ট হয়। জিপুরার অঙ্গলে, কেনী নদীর তীরে, চট্টগ্রামের পাহাড়-প্রদেশে, বিক্রমপুরে, লৌহটে, সর্বত্রই হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে এই দুই কবির কীর্তিচিহ্ন বিস্তৃত। চারি খানি প্রাচীন পুঁথি খুঁজিলে অন্ততঃ দুইখানার গঙ্গাদাস সেন বা যজ্ঞবরের পদ পাওয়া যাইবে। গঙ্গাদাস তাঁহার পিতা যজ্ঞবরের নাম লইয়া গর্বপ্রকাশ করিয়াছেন। কুন্তিবাস যেমন স্বীয় নামের সঙ্গে পিতামহ মুরারি ওঝার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, গঙ্গাদাস সেনও সেইরূপ যজ্ঞবরের নাম স্বীয় নামের সঙ্গে যোজিত করিয়াছেন;—তাঁহার বর্ণনার অবগত হওয়া যায়, যজ্ঞবর স্ককবি বলিয়া বিশেষ লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। *

যজ্ঞবরের রচনা কিছু সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানগুলিতে কবিশ্বের ছটা আপনি বিকাশ পাইয়াছে। তিনি কবিশৈলিপ্সু হইয়া কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন নাই; যশোলিপ্সা তাঁহার পুত্রের কতকটা ছিল, এই জন্য পিতা অপেক্ষা পুত্রের রচনার আড়ম্বর একটু বেশী, কথার বাধুনির দিকে দৃষ্টি বেশী। যজ্ঞবর পুণ্য মহাভারতের প্রসঙ্গ লিখিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবেন, এই বলবতী ইচ্ছার বশে পুস্তক লিখিয়াছিলেন; শব্দাডম্বর কি পাণ্ডিত্যের প্রদর্শন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু তথাপি ভাবের গুণে আপনা-আপনি হু একটি অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কৃত রচনার কোনও কোনও স্থল অতি সুন্দর; সচন্দনগন্ধ সাদ্ধা মলম সগীষণ যেমন প্রীতিকর, তাঁহার বর্ণনাও তেমনই মনোহর।

“উত্তরে দক্ষিণে বহে সুবেষবী ধাব।

পৃথিবী গরেছে যেন মালতীস হার।”

এই পদে কালিদাসের “মন্দাকিনী ভাতি নংগোপকণ্ঠে” ইত্যাদি কবিতা মনে পড়ে। কিন্তু তিনি বোধ হয়, তাহা মনে করিয়া লেখেন নাই।

* পিতামহ কুলপতি পিতা যজ্ঞবর।

ডাব কীর্তি যোবে লোক সংসাধ ভিতর।

—গঙ্গাদাস সেনের অধ্যমেষ পর্ব।

যজ্ঞবর সম্পূর্ণ মহাভারত বচনা করিয়াছিলেন, একরূপ প্রমাণ পাইরাছি। কিন্তু যজ্ঞববচিৎ সম্পূর্ণ মহাভারত আমবা পাই নাই। তিনি সঞ্জয়ের আদি-কীর্তি লুপ্ত করিবা, তৎস্থলে স্বীয় মহাভারত স্থাপিত কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রাচীন গ্রন্থ নষ্ট করিতে না পারিরা, বরং একরূপে তাহাব রক্ষারই কারণ হইরাছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার রচনা সংযোজিত হওয়াতে সঞ্জয়ের কীর্তি আরও অটল হইরাছে। বস্তুতঃ, সঞ্জয়েব রচনায় প্রকৃত কবিত্ব অতি অল্প। যজ্ঞবর, গঙ্গাদাস, রাজচন্দ্র দাস প্রভৃতির কবিত্বের পরিচয়ই ‘সঞ্জয়-বচিৎ মহাভারত’-নামধেয় গ্রন্থে অধিক। শুধাপি বৃদ্ধ সঞ্জয় বয়ঃপ্রভাবে স্বীয় প্রতিপত্তি রক্ষা করিরাছেন। তদপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ কবিগণ তাঁহাব গৌরববহন করিবার জন্য আপনাদের স্বক্ষে শুকভাবে গ্রহণ করিরাছেন। পুস্তকের নাম সঞ্জয়েব মহাভারত। উহা তালের বড়াব ভায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান গ্রাস কবিবা, তালের নামমাত্র কীর্তিরই বেশী ঘোষণা কবিতোছে। নাবায়ণ দেবের পদ্ম-পুবাণ, বিজয় গুপ্তের পদ্মপুবাণ, এমন কি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধেও আংশিকভাবে এই কথাই সত্য। কোনও বস্তু প্রাচীন শুনিগেই আমরা অবনতমস্তকে গ্রহণ করি; কিন্তু তাঁহার প্রাচীনত্ব কতটুকু, জানিতে চেষ্টা করি না। তাম্রশাসন ও প্রস্তর-লিপিগুলি প্রাচীন, কিন্তু বেদ ভিন্ন কোনও গ্রন্থসম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণভাবে এ কথা বলিতে পারি না।

পূর্বেই উক্ত হইরাছে, যজ্ঞবর মহাভারত ভিন্ন রামায়ণ পদ্মপুবাণ প্রভৃতি পুস্তকেরও বচনা করিরাছিলেন; এই সব পুস্তকের বিচ্ছিন্ন অংশগুলির এখনও উদ্ধার করা যাইতে পারে। ইনি ভগদানন্দনামক এক ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিরা কাব্য লিখিতেন, উল্লেখ করিরাছেন। এই কবির বিখ্যাত পুত্র গঙ্গাদাস যদিও গর্কের সহিত পিতার নামের উল্লেখ করিরাছেন, শুধাপি বোধ হয়, ইহারই উদীয়মান যশে যজ্ঞবরের নাম তমসাবৃত হইবাছিল; কিন্তু এই পবাক্ষর সূত্রের; সর্বত্রই নিজেব যশোহানি হইলেও, পিতা-পুত্রের প্রসিদ্ধিলাভ ইচ্ছা করেন।

গঙ্গাদাসের রচনা চিত্র আকর্ষণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। কবিতাদেবী দ্রুত মুখর। মঞ্জীরবৃত্ত চরণ শিল্পনে এই কবির রচনাক্ষেত্রে বিহাব করিরাছেন। এখনও ৩০০ বৎসব পরে আমরা তাহা পড়িরা আশ্চর্য পাই ও পূর্ববঙ্গের নব-হৃদয়েন সৌন্দর্য্যানুভূতি-শক্তি স্বীকাব করিতে বাধ্য হই। কড়কগুলি বৃক্ষ ও বৃক্ষবৎ দ্রুত মনুষ্য এ দেশের অধিবাসী ছিল না। এখানেও হৃদয়ে প্রেম-পুষ্প বিকশিত হইত, ও সুবতি ছড়াইরা চাবিদিকের বায়ু আমোদিত কবিত।

কত দুব পথ গিয়া দেব গদাধব।
বিদ্যমান দেখে এক দিব্য সর্বোদয়।
হংস মাঝে ক্রীড়া করয়ে শোভিত।
নানা পুষ্প বিকশিত গন্ধে আসাদিত ॥
পঙ্কজ শীতল কুটি আছে সরোববে।
কুসুম স্থালি খাষ, হুতী ক্রীড়া কবে।
বিকট কমলে পড়ি লম্বব করে কেলি।
কাম্বুজীয়ে সঘোদিয়া বলে বনমালী ॥
দেখ প্রিবে স্ত্রীবুদ্ধি কুট ব্যবহার।

* * *

যতাবে পঙ্কজ নীচ পঙ্ক হৈতে জাতু।
কপট মলিনবুদ্ধি হৈল সেই হেতু ॥
বাহুদেব বাক্য শুনি প্রসন্নবদনে।
হাসিয়া কাম্বুজী দেবী বলিলা তখনে ॥
জ্বলকোর নাথ জান সূর্য্যদেব ভর্তা।
আমি জানি সকল পদ্মিনী পতিব্রতা ॥

কুপ্পর সনক তুল, পুত্র সে মৃগাল।
পদ্মিনী-তনয় ভূমি জানি সর্বকাল ॥
মাতৃকোলে থাকি ভ্রম করে স্তনপান।
বাণে কি বলিবে তারে দেখি বিদ্যমান ॥
যে কালে পুত্রবজ্রাতি করে পরদার।
স্রী দিয়া কদাপি নহে প্রত্যয় তাহার ॥
মনে ভাবি চাহ দেব শ্রীহরি গোপাল।
এ কর্ম পদ্মিনী বড় করিয়াছে ভাল ॥
নারী ত্যজি স্বামী যদি যায় অজ্ঞাতিত।
তথাপি বিদুব নহে স্ত্রীজাতিব চিত্ত ॥
বাজে বিরহিণী নারী পুত্র লয়ে কোলে।
সেই তাপে নিজা স্বামি নিরহেব জলে ॥
যদন আসিল গদা হবশিব হৈতে।
হবির চণ্ড ধূলি পাখালি মাঝেতে ॥
সেই ধূলি পক্ষে জাত হইল পদ্মিনী।
কেমনে পদ্মিনী দুষ্টা কহ মোরে শুনি ॥ *

এই সব রচনার সৌন্দর্য্য অমূল্যব করিতে হইলে, একটি কথা স্মরণ রাখা
কর্তব্য। ইহা তিন শত বৎসরের প্রাচীন জিনিস।

গঙ্গাদাস সেনের এক অশ্বমেধ পর্ব্বই ৬৫০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ; কাশীদাসী
মহাভারতে উক্ত পর্ব্বই ২০০০ শ্লোকমাত্র দৃষ্ট হয়।

বঙ্গীকর ও গঙ্গাদাস সেনের বাড়ী দীনার দ্বীপ বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শ্রীযুক্ত বাবু অজুরচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, এই 'দীনার দ্বীপ' ও সোণার
গাঁ'র নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান 'দিনারদি' একই স্থান।

এই সব গ্রন্থ খুঁজিয়া বাহির করিতে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, না বলাই
ভাল। অন্তিতে পাই, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ এই সমস্ত পুস্তকের উদ্ধারে ব্রতী
হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া কতদূর বাঞ্ছনীয়, সকলেই তাহার
উপলব্ধি করিতে পারেন; আমরা যে পৈতৃক ধনের উত্তবাধিকারী, তাহা
কীটোব দশনে বা অগির কবলে নিক্ষিপ্ত করিলে, জগতে আমরা অসুপ্ত বলিয়া
গণ্য হইব না। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত তৃণমুষ্টিও অসুপ্তের নিকট বহুমূল্য। এটলাস,
এণ্ডিসেব কথা বলিলে, আমাদের গর্বেয় মাত্রাবুদ্ধি হইবে না; আমাদের
নিজের ঘরে বাহা আছে, তাহা দ্বারাই আমাদের সম্মান অর্জন করিতে হইবে।

কিন্তু একজন ভ্রমণকারী কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াই, গ্রন্থদেয় এ সম্বন্ধে

* গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ পর্ব্ব। বেঙ্গল গবর্নমেন্টেব প্রাপ্ত ক্রীত, নগরবচিত, মহা-
ভাবত, ৬৩৪ পৃঃ।

নিশ্চিন্ত হওয়া বিধেয় নহে। বিদেশী দেখিলে ভয়াতুর গৃহস্থ গৃহের অর্গল বন্ধ করে; ট্যাক্সের কথা, — এমন কি, জেলে বাওরার কথা পর্য্যন্ত তাহার মনে উদ্ভিত হয়। ইনকম্ ট্যাক্সের এসেসার প্রভৃতির দ্বারা আমাদের গবর্নমেন্ট বাহাদুর দেশে এতই প্রীতি ও বিশ্বাসের উৎপাদন করিয়াছেন! অনেক স্থলে, পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি জানিয়া, নিরীহ গ্রামবাসী আমার পা জড়াইয়া কাদিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, “এই পুস্তক রক্ষা করার জন্য তাহাদের কত টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে, ও আমি কিছু লইয়া মাপ দিতে পারি কি না?” তার পর কুসংস্কার; কুসংস্কারই বা বলি কেন? এই ‘কুসংস্কারশীল’ ব্যক্তিগণই, ‘পুস্তকগুলি থাকিলে ঘরে বিপদ ঘটে না’, উহারা ‘আগুনে দহু হয় না’, ‘জলে ভিজে না’, ইত্যাদি অলৌকিকতার আরোপ করিয়া অত্যন্ত বস্ত্রসহকারে তাহা রক্ষা করিয়াছে। কুসংস্কার-বিশিষ্ট ইংরাজী-ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিগণের গৃহে ঐ সব পুস্তকের পাতা সম্বার্কজনীতাড়নার বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আমি প্রকৃতদ্বিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির বাড়ীর কথা বলিতেছি না।

কুসংস্কার ও ভয়ের দৃঢ় অনধিগম্য দুর্গে রক্ষিত প্রাচীন রত্নাবলী যে ভ্রমণ-কারী পণ্ডিত মহাশয়ের পদার্পণমাত্রেরেই গৃহস্থ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবে, একরূপ আশা করা মিথ্যা।

কোনও স্থানীর জমিদার কি শিক্ষিত ব্যক্তি এই গুরুভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলে, সুফল ফলিতে পারে। আশা করি, পরিবদ সেই ভাবে কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ ফল প্রাপ্তির আশা করা যায় না। ইহা কেবল চেষ্টাসাপেক্ষ নহে, সময়সাপেক্ষও বটে।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

মোহিনী ।

আর আমি এ বুকের আগুন বুকে চাপিয়া রাখিতে পারি না। আমাব এ কাহিনী শুনিয়া তোমরা আমাকে গালি দিবে—তা দাও। তাহাই এখন আমার কামনার জিনিস। কর্ম্মদোষে গালিও আর এখন কেহ দেয় না। যাহারা বড় ভালবাসিত, বড় মেহ করিত, তাহারা আর এখন কেহ কিরিয়াজ চাহে না। তাহাদের কাছে গালির প্রত্যাশাও আর আমার নাই।

কদাচিৎ পথে ঘাটে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বর্ণার মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। সে চলিয়া গেলে, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবি, ভাবিতে ভাবিতে কত কথাই মনে আসে, ছনয়নে জলধারা গড়াইয়া পড়ে—নরক-যাতনায় প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। হে বিদাভা, নরকে যদি এতই লোকাভাব হইয়াছিল, আর আমা ভিন্নই যদি সে স্থান পূর্ণ হইতেছিল না, তবে একেবারে জীবনাস্ত করিয়া কেন নরকে পাঠাইলে না? আমার অদৃষ্টে এ জীমস্তে নরক কেন লিখিলে?

কি বলিব, তোমরা কি বুঝিবে—এই মন্দের পরতে পরতে জলন্ত নিবন-বহ্নি অহর্নিশি ধু ধু জলিতেছে—বড় যাতনা—বড় অসহ। এ আশুতন নিভিবে না—নিভিবার নয় জানি, কিন্তু তবু যে সুহৃদের জ্ঞাও কাহারও কাছে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁটিয়া একটু শান্ত কবিব, তাহাও অদৃষ্টে নাই। হায় রে, এই বহুজনসংকুল বিপুল পৃথিবী মাঝে এমন একটিও লোক পাই না, যাহার কাছে দুই দণ্ড এ দুঃখের কথা কহিয়া প্রাণের বোঝার কতকটা লাঘব করি।

পাপী স্বর্ণার পাজ সত্য, কিন্তু এমন একজনও মহাত্মা কি নাই যে তাহাকে দয়ার পাজ বিবেচনা করে? হায়, দয়া করিয়া তোমরা কেহ একবার এ হতভাগিনীর পাগকথায় কান দিবে কি?

২

পাপ কথা! তা নহিলে, আর বলিতেছি কি? জানি না পূর্বজন্মে কি একটু স্মৃতি করিয়াছিলাম যে, সেই বলে ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। পিতা আমার বড় দেবভক্ত, নিষ্ঠাবান ও সাধুচরিত্র ছিলেন। নিত্য অতিথি-সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহারই আয়ে সংসার একরূপে নির্বাহিত হইত। পিতা অল্প কিছু করিতেন না, দিনের অধিক সময় তাঁহার গৃহাধিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলাব সেবা করিতে অতিবাহিত হইত; বাকি সময়টুকু শাস্ত্রালোচনায় ও সাংসারিক কার্যে কাটিয়া যাইত।

মা আমার পরম পতিব্রতা ছিলেন। একদিনও পিতার সমক্ষে তাঁহাকে একটুও উচ্চকথা কহিতে শুনি নাই। প্রত্যাষে উঠিয়াই গৃহকার্যে ব্যাপ্ত হইতেন, আর রাত্রি দুই প্রহর বাজিয়া না গেলে তাঁহার বিশ্রামের অবসর হইত না। হয় ত ইহার মধ্যে কোন দিন শেষ বেলায় অতিথি কুটূষ আসিলে

তাহার সে বেলার মত অন্ধাশন বা অনশন ভিন্ন হইত না। দেব দ্বিজে অচলা ভক্তি, আত্মীয় স্বত্বে অসীম দয়া, লোকেব স্নেহে স্নেহী, হৃদয়ে হৃদয়ী। পিতাকে পরম গুরুর ছায় সেবা করিতেন। বৃষ্টি গৃহবিগ্রহের অপেক্ষাও তাহাকে তিনি অধিক ভক্তি করিতেন। সফলে তাহাকে সতীলক্ষ্মী বলিয়া ধন্ত ধন্ত করিত।

হায়, সেই সতীলক্ষ্মীর গর্ভে জন্মিলাম কি'না আমি! বিধাতা, তোমার এ কিরূপ বিচার? স্বর্ণতরুতে কেন এ পুরীষপূর্ণ মাকাল ফলের সৃষ্টি করিলে?

৩

কিন্তু, জন্মিলাম তো মরিলাম না কেন? স্মৃতিকা-গৃহেও তো অনেকের মৃত্যু হয়, আমার ভাগ্যে তাহাই কেন ঘটিল না? তা, আমি বলিলে কি হইবে?—বিধিলিপি অন্তরূপ! সংসারের কোন জালা যন্ত্রণা না পোহাইয়া স্মৃতিকা-গৃহে মাতৃক্রোড়ে শুইয়া মরণে যে স্নেহ, তাহা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। আমি না মরিয়া দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলাম।

অনেক দিন পূর্বে একটি ছেলে হইয়া যারা গিয়াছিল, তার পর প্রায় আট দশ বৎসর কিছু হয় নাই। হবে না হবে না করিয়া শেষ অবস্থায় আমি হইলাম। আমার আদরের সীমা নাই। তার বিধাতা রূপ দিয়া গড়িয়া ছিলেন। স্মৃতিকা-গৃহেই আমায় যে দেখিল, সেই না কি মোহিত হইয়া গেল। সাধ করিয়া পিতা নাম রাখিলেন "মোহিনী"।

অতি শৈশবের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু যখন একটু বড় হইলাম, খেলিতে শিখিলাম, তখনকার অনেক কথা আবছায়া আবছায়া মত মনে পড়ে। মনে পড়ে, পিতার অবস্থা তত সচ্ছল না হইলেও, আমি অপরের দেখিয়া যখন যে খেলানার বাহানা লইয়াছি, তিনি তখনই তাহা কিনিয়া দিয়াছেন। মা কত যত্নেই আমার ছোট ছোট 'জয়ে' পুতুলগুলি পর্য্যন্ত এখানে ওখানে পড়িয়া থাকিলে কুড়াইয়া তুলিয়া রাখিতেন। পাড়ায় খেলাইতে গিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে তাহার মুখখানি শুকাইয়া যাইত, সংসারের সব কাজ ছাড়িয়া তিনি পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা শুনিতে পাইলে সাধের পুঁথি ফেলিয়াই ছুটিয়া যাইতেন। তাহার দিবারাত্রি আমারই চিন্তা ও আমারই কথা লইয়া যাপন করিতেন। আমি যেন তাহাদের জীবনে একটা ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমি কি থাইতে ভালবাসি, কবে আমার ভাল খাওয়া হইল না, কোন কাপড়খানি পবিলে আমায় অতি স্নন্দ

দেখায়, কবে কি কথা কহিয়া তাঁহাদিগকে হাসাইয়া মারিয়াছিলাম, এত অল্প বয়সে আমি সে সব কথা শিখিলামই বা কেমন করিয়া—এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা লইয়াই তাঁহাদের দিন রাত্রির অধিক সময় অতিবাহিত হইত। কোন দিন আমার অল্প করিলে, সে দিন পিতা যথাকালে নারায়ণসেবা পর্য্যন্ত ভুলিয়া-বাইতেন; মা গৃহকর্ম ত্যাগ করিয়া, পাগলিনীর স্থায় শিয়রে বসিয়া কেবল আমার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিতেন। আমি কতদিন ভাবিয়া দেখিয়াছি, কিঞ্চিৎ স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই, তাঁহাদের মধ্যে কে আমার অধিক স্নেহ করিতেন।

জানি না, প্রতিবেশীরাও এ হতভাগিনীকে কেন অত ভালবাসিত। দেখিতে পাই, পিতা মাতার খাতিরেই অনেকে অনেক ছেলেকে আদর যত্ন করে; পিতা মাতার সমক্ষেই অনেকে তাহাদিগকে কোলে লয় বটে, কিন্তু অসমক্ষে আবার তখনই নামাইয়া দেয়। আমার সমক্ষে কিন্তু তাহা একদিনও ঘটে নাই। যে কোলে লইত, সে আর নামাইতে চাহিত না। ক্ষুদ্র পল্লীতে বসতি অতি সামান্ত—বাহার বাড়ী যে দিন না বাইতাম, পরদিন সে ছুটিয়া আমার সংবাদ লইতে আসিত। প্রাচীন প্রাচীনারা আগায় লইয়া কত রঙ্গ করিতেন। আমার মুখে শ্লোক শুনিতে সবাই বড় ভালবাসিত। সে শ্লোক বলিতে কত কথা ওলোটপালট হইয়া যায়—তাহাতেই তাহাদের মহা আনন্দ! শুনিতে শুনিতে হাসিয়া কুটোকুটি হইত। কদাচিৎ ধূলা বা পোকা পড়িয়া আমার চোখে জল দেখা দিলে, অমনি ব্যস্ত হইয়া কোলে লইয়া ভুলাইবার জন্য কত লোকে কত চেষ্টা করিত—কেহ খেলনা দিত, কেহ মিঠাই দিত, কেহ অঞ্চল দিয়া বস্ত্রে মুছাইয়া দিত, কেহ মুখে গণ্ডে কপোলে সম্মেহে চুম্বন করিত। আমি আবার না হাসিলে কোল হইতে নামাইত না।

তাই এখন কাদিতে কাদিতে ভাবি, সেই আদরের এই খোয়ার!

৪।

বছর যায় না জল যায়। দেখিতে দেখিতে আমি আট বছরে পড়িলাম। পিতা আমাকে সেই বয়সে পাত্রস্থা করিয়া গৌরীদানের কলশাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মাতা কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। মার জেদে—আমল কথা আমার নির্বন্ধবশতই—তাহা ঘটিল না। আমার নির্বন্ধ বলিতেছি এই জন্য যে, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাতাকে আর কখনও কোন বিষয়ে অন্ত্রমত করিতে দেখি নাই। আমার নির্বন্ধেব দোষ দিই, কেন

না, সেই কৈশোরেই পরিণীতা হইলে বোধ হয় আত্ম আর এ দুর্দশা ঘটত না। বাহা হউক, পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন হইল না। আমি মাতার অঞ্চল ধরিয়া তেমনই খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ক্রমে আরও বড় হইলাম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপও বৃদ্ধি আরও বাড়িতে লাগিল। ছাই রূপ! এ রূপ লইয়া গুরুব মহলে তখন কত খোঁটাখুঁটি হইত। জানি না, কেন না, তখন বড় একটা আব, যে সে গুরুবের সামনে বাহির হইতাম না। কিন্তু মেয়ে মহলে সানের বাটের কমিটিতে নিত্য ইহা লইয়া ভুমূল আন্দোলন চলিত। কেহ বলিত—“কি রং—বেন দুখে আলতা ফলাইয়া রাখিয়াছে।” কেহ বলিত—“চুল নয় ত বেন শুমাঠাকুরগের কেশ।” কেহ বলিত—“কি গড়ন, বেন সর্কাদে ননী পিছলাইয়া পড়িতেছে।” কেহ বলিত—“আবাগীর চোখ দেখেছ, বেন পটো তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে।” এই-রূপ বাহার মনে বাহা আসিত, সে কত কথাই বলিত। ফলতঃ আমার মনে পড়ে, পারের নথ হইত মাথার চুলগাছটির পর্য্যন্ত প্রশংসা করিতে কেহ ক্রটি করিত না। শুনিয়া আমার মনে কি হইত, তাহা আমি বলিব না। কিন্তু মাতা মনে মনে বড়ই গর্ব্বিতা হইতেন। সেই সব কথা শুনিয়া আসিয়া পিতাকে আবার বলিতেন। পিতারও আনন্দের সীমা রহিত না।

কিন্তু সে আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ক্রমে এই পোড়াকপালীর ভাবনায় পিতা আকুল হইয়া উঠিলেন। একাট স্থপাত্রের জন্ত সর্কদাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন, আমি কাছছাড়া হইলে বা ঘূমাইয়া পড়িলেই পিতা মাতা উভয়ে বসিয়া এই কথারই আলোচনা করিতেন। তাঁহারা দুই জনে ঐ কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে যদি কোথা হইতে আমি সেইখানে আসিয়া পড়িতাম, তাহা হইলে লজ্জার মরিয়া বাইতাম। আমার সে ভাব দেখিয়া তাঁহারা তখন কি মনে করিতেন, জানি না; কিন্তু মনে বাহাই কখন, আমাকে সমক্ষে দেখিয়া তাঁহাদের চিন্তা বেন আরও বাড়িয়া উঠিত। বস্তুতঃ চিন্তার বিষয় বটে। শাস্ত্রমতে আমি তখন অরক্ষণীয়া। একাদশে পড়িয়া ছিলাম।

৫

আমাদের মেটেবর। সন্ধ্যার সময় উত্তরের ঘরের দাবার বসিয়া শলিতা পাকাইতেছিলাম—এখন আমি সংসারের কাজ কর্ষে বধাসাধ্য মার সহায়তা করিতাম—মা জল আনিতে গিয়াছিলেন। পিতাও গৃহে ছিলেন না। বাজীতে

আমি একা। শ্রুতি পাকাইতে পাকাইতে বোধ হয় গুণ গুণ কবিতা কি একটা অচিরশ্রুত গোবিন্দ অবিকারী গানও গাহিতেছিলাম। হঠাৎ মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখি, বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া কে এক অপরিচিত যুবক বাহিরের দরজা ঠেলিয়া উকি মারিয়া দেখিতেছে। আমি চমকিয়া উঠিলাম। জানিতে পারি, কি না পবীক্ষা কবিবার জন্য ভাল করিয়া চাহিলাম। স্পষ্ট দেখাচোখি হইল। পলক না ফিরাইতে সে ব্যক্তি উঠানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—“অতিথি।”

জন্মিষা অবধি এ ভিটার অনেক অতিথি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অতিথি তো দেখি নাই। কে জানে কেন সহসা আমি কোন কথা কহিতে পারিলাম না। আমাকে নিকন্তব দেখিয়া, সে মুহূ মন্দ হাসিতে হাসিতে আবার বলিল, “বাটার কর্তা কোথায়?” উত্তর দিব কি, আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম। বসিয়া ছিলাম, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিলাম না। মাকে গিয়া যে সংবাদ দিব, তাহাও আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। নীরবে পুতুলের স্থায় কেবল সেই এক স্থানে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলাম।

আমার দশা দেখিয়া বুঝি তাঁহার দয়া হইল। একবার আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—“কাহাকেও দিয়া বাহিরে এক খানা আসন পাঠাইয়া দিবেন। আর কোথাও গিয়া আজিকার রাত্রির জন্য বাসা লইতে পারিতাম; কিন্তু অতিথি সংকার না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে জানিতে পারিলে পাছে আপনাব পিতা আপনাব প্রতি রুষ্ট হন, তাই অল্প কোথাও গেলাম না।”

কথাগুলো কানে বাজিল। এ মুহূ ভৎসনায় কতকটা চৈতন্যও হইল। দাঁড়াইয়া ভাবিলাম—তাই ত, করিলাম কি? পরম অতিথিভক্তের কথা হইয়া অতিথির অবমাননা করিলাম? পিতা শুনিলে কি বলিবেন? চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে জল লইয়া মা গৃহে ফিবিবেন। তাঁহাকে সব বলিলাম। ভয় হইয়াছিল, না জানি কতই ভৎসনা করিবেন। কিন্তু বেশী কিছু না বলিয়া, কেবল বলিলেন—“ছি মা, কাজ ভাল কর নাই।”

তখন, তাড়াতাড়ি জলের কলস রক্ষা করিয়া মা এক খানি আসন লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে বিছাইয়া দিয়া আসিলেন। সেই অবসরে আমি একটি প্রদীপ জালিয়া সেইখানে দিয়া আসিলাম। দেখিলাম, পিতা আসিয়াছেন, অঙ্গনে

দাড়াইয়া অতিথির সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন । হয় ত আমার সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে—চুপ! করিয়া আড়ালে দাড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম । ও হরি ! এ অতিথি বলে কি ? সে পিতার নিকট আমার কত প্রশংসা করিয়া বলিতেছে, সে তাঁহার দেখা না পাইয়া কিরিয়া অন্ত্র বাইতেছিল, আমিই নাকি কত বলিয়া কহিয়া বাইতে দিই নাই ! শুনিয়া পিতা বড় কষ্ট হইলেন । আমি কিন্তু না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না । মুখে কাপড় দিয়া বাড়ী ভিতর চলিয়া গেলাম ।

৬.

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল । রাত্রিতে বিশেষ আর কোন ঘটনা ঘটে নাই । একবার মাত্র সেই অতিথির সঙ্গে দেখা হইয়াছিল । সে সেই মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে মোহন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়াছিল, আমি যদিও তখন ভাল করিয়া দেখি নাই, কিছু পরে, কপাটের আড়াল হইতে দেখিয়াছিলাম । কার্তিকের স্নায় রূপ—অতি সুললিত গঠন । যেমন মুখশ্রী, তেমনি নাক চোক কপাল ভুরু । সৰ্ব্বাপেক্ষা কি সুন্দর সেই চাহনি ও হাসি-খানি । একাদশ বৎসর বয়স—বালিকা বল, কিশোরী বল—যাহাই বল,—আমি সে রূপ দেখিয়া মজিলাম ।

সে রাত্রি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না । প্রভাতে উঠিয়া দেখি, অতিথি তখনও চলিয়া যান নাই । পিতার সহিত কি একটা কথা গইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে । অতিথি এক ছড়া বহুমূল্য হার পিতার হাতে দিয়া তাহা আমার জন্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া অনুরোধ করিতেছেন । কিন্তু পিতা কিছুতেই স্বীকৃত হইতেছেন না । শেষ অতিথিরই জ্বর হইল । পিতা হার ছড়া হাতে করিয়া বাটীর ভিতর আসিলেন । আমি উঠানেই দাড়াইয়া ছিলাম, পিতা আসিয়া আমার হাতে দিলেন । ছেলেবেলা হইতেই আমার একটা বড় কদম্ব রোগ ছিল । আমি গহনা পরিতে ও বেশভূষা করিতে বড় ভালবাসিতাম । ইতস্ততঃ না করিয়া সেই রত্নহার কণ্ঠে ধারণ করিলাম । অকস্মাৎ সৰ্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ।

ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলাম, ছয়বের কাঁক দিয়া অতিথি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । আমি বুঝিলাম, সে দৃষ্টির অর্থ কি ? এ সব কথা বুঝিতে আমরা মেয়েরা বিলম্ব পটু । পঁচিশ বৎসরের পুঙ্খ বাহা না বুঝে, দশ বৎসরের বালিকা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পাবে । বুঝিলাম, সে

দৃষ্টির অর্থ—তিনি বলিতেছেন, “কেমন? আমার হার স্বদয়ে ধারণ করিলে?”

আমি—হায় সেই সঙ্গে কেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল না—আমি ভয়
বাড় নত করিলাম। হাসিতে হাসিতে অতিথি বিদায় হইলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর। আহারান্তে ঘরের ভিতর শুইয়া আছি,—আধ ঘুমন্ত
—আধ জাগন্ত অবস্থা—এমন সময়ে একটি জীলোক মাথায় মোট লইয়া,
“মাঠাকুরুণ কোথায় গেলো!” বলিয়া ডাকিল। মা রান্নাঘরে ঠাকুরের বৈকালির
জন্ত নারিকেলসন্দেশ তৈয়ার করিতেছিলেন, বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন
—“কে গো?”

জীলোকটি আধাবরসী,—দাবায় মোট নামাইয়া বলিল,—“অনেক দূর হইতে
আসিতেছি মা, এই জিনিষ গুলি ঘরে তোল।”

মা জিজ্ঞাসিলেন—“কোথা হইতে আসিতেছ রাহা।”

যে আসিয়াছিল সে বলিল—“গোবিন্দপুরের নীলরতন বাবুর বাড়ী হ
আসিতেছি। এই সব সামগ্রী তিনি আপনাদের সেবার জন্ত পাঠাইয়া
দিয়াছেন।”

গোবিন্দপুরের নীলরতন বাবু একজন দেশবিখ্যাত লোক। সে অঞ্চলে
ছেলে বড়। মেয়ে পুরুষ সকলেই তাঁহার নাম জানিত। বিখ্যাত জমিদারী,
অগাধ ধন দৌলত, প্রভূত মানসম্মত। হঠাৎ তিনি এত লোক থাকিতে এই
দুঃখী ব্রাহ্মণপরিবারের প্রতি এরূপ রূপাবান হইলেন কেন, তাহা বুঝিতে না
পারিয়া মা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

জীলোকটি স্নতি চতুরা, স্নাতার বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া বলিল,—“বাবুর
মেজ ছেলে এক দিন পথে রাত্রি হওয়ার আগুনাদের গৃহে অতিথি হইয়া
ছিলেন, তিনি গিয়া আপনাদের কত স্নত্যাতি করিয়াছেন, তাই বাবু এই সব
সামগ্রী পাঠাইয়াছেন।” শুনিয়া মা আরও বিস্মিতা হইলেন।

কোতূহলের বলবর্তী হইয়া আমি বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়া
স্নাত্র সেই জীলোক চিত্রাপিতের জায় বিশ্ববিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।
তৎক্ষণাৎ সে ভাব সামলাইয়া বলিল—“এস, দিদিঠাকুরুণ!”

আমাকে দেখিয়া মা তাহাকে সুগ্ধ হাত ধুইবার জল দিতে বলিলেন।
কলসী হইতে জল গড়াইতে গেলাম। সে আমার জল না লইয়া বাট দেখা-
ইয়া দিতে বলিল। খিড়কীতে সচরাচর সুরিবার সত একটা ছোট ডোর

ছিল। আমি তাঁহাকে সেই দিকে নইয়া গেলাম। বাহিরে আসিয়া সে আমার পানে চাহিয়া বলিল, “এমনি করিয়াই কি একটা লোককে মারিতে হয়, দিদি?” কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমি অবাধ হইয়া তাহার প্রতি চাহিলাম।

সে এদিক ওদিক চাহিয়া একটু কাছে যেসিয়া বলিতে লাগিল,—“সত্য কথা শোন। আমি নীলরতন বাবুর নিকট হইতে আসি নাই। তাঁহার সৈন্য ছেলে সতীশ বাবু আমার পাঠাইয়াছেন। তুমি তাঁহার হার গলায় পরিয়াছ, ইহাতে তিনি চরিতার্থ হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহার বদলে একছড়া শুক্ক মালাও তো দিলে না! আচ্ছা তিনি পাগলের ভ্রাম্য হইয়া গিয়াছেন। এমন ‘বে কঁচা’ সোণার ভ্রাম্য রং, তাহা এই কয় দিনেই যেন কালি ভিয়া গিয়াছে। অতি কাভবে আমা দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এই হার ছড়াটি—(সে কাপড়ের ভিতর হইতে এক গাছি সুন্দর নক্ষত্র-তর ভ্রাম্য চেন-হার বাহির করিয়া দেখাইল)—যদি তুমি একবার গলায় দিয়া তার পর তাঁহাকে পরিতে দাও, তাহা হইলে তিনি এ জীবন রাখিবেন; নহিলে হারের বদলে ফাঁসি গলায় দিয়া হৃদয়ের আলা জুড়াইবেন।

শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মনের আবেগে তখন তাহাকে কি বলিলাম, সব কথা মনে নাই। তবে সে জীলোককে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা দিক্‌শাসা করিলাম। শুনিয়া অধিকৃতর আশ্চর্য হইলাম, তিনি নাকি অতিথি সাজিয়া যে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাহা ভাণমাত্র। আমাব কথা, আমার রূপের প্রশংসা শুনিয়া আমার দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিয়ৎ কালের জন্য একটিও কথা কহিতে পারিলাম না। সেই চতুরা জীলোকটি তখন এদিক ওদিক লক্ষ্য করিয়া সহসা সেই চেনহার ছড়া আমার গলায় পরাইয়া দিল! জানি না, তখন আমাতে আমি ছিলাম কি না। যেন কলের গুলি কলে কাজ করিতেছিলাম। ধীরে ধীরে গলা হইতে সেই হার খুলিয়া সেই জীলোকের হস্তে দিলাম। সে তাহা নইয়া অকলে বন্ধন করিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে মার আওয়াজ পাইয়া হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। হি হি হি—কি করিলাম, মালা বদল করিলাম। হার হার, অগ্র পশ্চাৎ কিছুই ভাবিলাম না—চিরকালের জন্য মজিলাম। মাথা ঘুরিতে লাগিল—সেই জীলোকের পানে ফাল ফাল করিয়া

চাহিয়া কাঠের পুতুলের জায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাকে তদবস্থা দেখিয়া সে হিড় হিড় করিয়া বাটার ভিতর টানিয়া আনিল। তার পর, জলটান খাইয়া খানিক বাজে গল্প করিয়া বেলা পড়িলে সে মাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। সেই দিন অবধি আমি হৃদয়ের শান্তি হারাইলাম।

বৈশাখ মাস। বিবাহের মাস। তার অনেক দিন ধরিয়া অকাল—এবার বিবাহের আর সংখ্যা নাই। আমাদের সামান্য গ্রাম, তাই মাস পড়িতে না পড়িতে চোলের তাকতাকিসিন, কাড়ার কড়কড়ানি, সানাইয়ের পোঁ পোঁ শব্দ ও শাঁখের আওয়াজে তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ার ভিতরই কত বর আসিল, কত বাসর জাগিলাম। আমার সঙ্গীদের মধ্যেই পাঁচ ছয় জনের বিবাহ হইয়া গেল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া পিতা মাতা আমার বিবাহের জন্য আরও অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিশেষ, একাদশ উত্তীর্ণ হয়—খোঁড়া বৎসর পড়ে—তার যে বাড়ন্ত গড়ন, দেখিলেই লোকে শিহরিয়া উঠে। পিতা নানা স্থানে সঞ্চয় দেখিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে সেই স্ত্রীলোক কখন ভাল কাপড়, কখন ভাল খাদ্যদ্রব্য লইয়া আরও অনেকবার আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল। বলিতে কি, একদিন সতীশচন্দ্র নিজেই আমাদের অন্তরের কোন ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি না—সতীশের মনে আমার বিবাহের কথা। পিতা কিন্তু কিছুতেই রাজি হইলেন না। বড় জেদাজেদির পর একদিন রাগিয়া মাকে বলিলেন—“তোমার কথার মেয়েকে এত বড় করিয়া রাখিয়া শেষে এত কষ্ট পাইতেছি, তা বলিয়া অমর কখনই দিতে পারিব না।” পিতার রাগ দেখিয়া মা আর বিরক্তি করিতে সাহস করিলেন না। আমি অকূল সমুদ্র দেখিতে লাগিলাম।

সাধিলেই সিদ্ধি। খুঁজিতে খুঁজিতে একটি পাত্র মিলিল। বড় নাকি মূল্যবান হারা, শান্ত স্বভাব, নির্মল চরিত্র, কৃতবিশ্ব, বুদ্ধিমান, সংকুলসম্বৃত পাত্র খা হইয়া গেল, তৎপক্ষীরেরা আমার দেখিতে আসিল। পাড়ার কত লোক আসিয়া আমার সাজাইয়া দিল। এক জন আমার সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, আমার বলি দিতে লইয়া বাইতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে আমি কনে দেখা দিতে গেলাম। সেই দেখাতেই পাত্র

দেখা হইয়া গেল। দিন সির হইল। আড়ষ্ট হইয়া আমি গুনিলান, সস্তাহ পরে বিবাহ।

বিধাতার কি চক্রান্ত বলিতে পারি না—পক্ষাধিক হইল, গোবিন্দপুর হইতে কোন সংবাদ পাই নাই। সে জ্বীলোক কি সতীশচন্দ্র কেহই আসে নাই—এ সংবাদ তাহারা কিছুই জানিত না। আমি ব্যাকুলচিত্তে নিত্য পথ চাহিতে লাগিলাম। এক দুই করিয়া দিন যাইতে লাগিল—কেহই আসিল না। হাজার হউক, বাগিকা—কি করিব, করিবার ক্ষমতাই বা কি? লুকাইয়া লুকাইয়া কতই কাঁদিলাম। কিন্তু সে অরণ্যেরোদনে কোনও ফল দর্শিল না। আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, কতকগুলি এয়া আসিয়া আগার গারে খানিকটা হলুদ মাথাইয়া দিল। সে দিন বাড়ীতে মহাসমারোহ হইল। সাজিয়া শুজিয়া অনেকের সঙ্গে বসিয়া আয়ুৰ্ভূত ভাত খাইলাম। হায়, তাহার অপেক্ষা বিধ খাইতে পাইলে বৃষ্টি অধিক তৃপ্তি পাইতাম। এক একবার বড় কান্না পাইতে লাগিল। এক একবার মার পা জড়াইয়া সব কথা বলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু, কুটিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। মনে মনে ছট্, ফট্ করিতে লাগিলাম। বিধাতা আমোদ দেখিতে লাগিলেন।

মাকে একটা দিন—তাহাও কাটিল। গোবিন্দপুর হইতে কেহই আসিল না। রাত্রি না পোহাইতে আত্মীর কুটন ও লোকজনে বাড়ী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বাহিরে রোসনচৌকির দল সুর ধরিয়া পাড়া মাতাইয়া তুলিল। বড় বড় খোলা আলিয়া হালুইকরেরা মাথায় গামছা বাধিয়া লুচি ভাজিতে বসিল। গ্রামের চাই মহাশয়েরা আসিয়া, নুরুকিয়ানা ও ঘন ঘন তাহাদের শ্রদ্ধ করিতে লাগিলেন। ছেলের দল সেই যে ভোরে আসিয়া আড্ডা দিয়াছে, আর বাড়ী ছাড়িতে চাহে না। গ্রামের যত কুকুর সব জড় হইয়া খিড়কি অধিকার করিয়া বিবম রব করিতেছে। তা ছাড়া, কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ পান সাজিতেছে, কেহ গহনাপরা হাতখানা ঘন ঘন নাচিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ গান মুখস্থ করিতেছে, কেহ বা অনর্থক গোল করিয়া সঙ্গিনীদের মাথা ধবাইয়া দিতেছে। উৎসবের সীমা নাই।

সবাই আনন্দ করিতেছে, আর যাহাকে লইয়া আনন্দ, সেই আমি কেবল নবমীর উৎসবে যুগবদ্ধ ছাগশিশুর জায় অন্তরে কাঁপিতেছি। আর সামলাইতে

না পারিয়া আমি একবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িলাম। দৌড়িয়া আসিয়া মা আমার কোলে তুলিয়া লইলেন। উপবাসে একপ হইয়াছে, ইহাই সকলে অনুমান করিল। একবাটা হৃৎ ও সন্দেশ আনিয়া মা আমার মুখের কাছে ধরিলেন। দেখিয়া শুনিয়া আমি আপনা হইতে আবার সামলাইয়া বসিলাম। কোন ভয় নাই বলিয়া মাকে প্রবোধ দিলাম, কিন্তু দহমান হৃদয়কে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলাম না।

হৃৎধিনীর হৃৎথে উপহাস করিয়া সূর্য্যদেব অন্তগত হইলেন। আমার শেষ আশাটুকু পর্য্যন্ত ফুরাইল। সন্ধ্যা না হইতেই আমাদের ক্ষুদ্র বাড়ীখানি আলো-ময় হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বেহারাদের হুম্ হাম্ শব্দের সহিত বর আসিয়া পৌছিলেন। বড় জোরে রোসনচৌকি বাজিয়া উঠিল। উলুধ্বনি ও শব্দধ্বনিতে বাড়ী ফাটিয়া বাইবার উপক্রম হইল। মেরেরা বর দেখিতে ছুটিল। হুই একজন সঙ্গিনী বর দেখিবার জন্য আমার টানিয়াছিল, কিন্তু তখন আমি দেখি নাই। তার পর, শুভদৃষ্টির সময় ভাল করিয়া দেখিয়াছিলাম কি না, তাহাও ঠিক মনে নাই। কিন্তু মনে আছে, যতক্ষণ আমি তাঁহার নিকট ছিলাম, ততক্ষণ এক দণ্ডের জ্ঞাতও হৃদকম্প যায় নাই। মন্ত্র-শুলাও সব পড়িয়াছিলাম কি না—অথবা কি পড়িতে কি পড়িয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। তা, সে যাই হউক, আসল কাজ বাকি থাকিল না। সম্প্রদান শেষ হইয়া গেল।

আমি মনে মনে একজনের হইয়া বাহিরে আর একজনের হইলাম।

আগামী বারে সংাপ্য।

৫৬৭

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি. আই. ই.।

বঙ্গালীর অসরলতা ও বাক্পটুতা বড়লোককে সম্মান করিবার সম্বন্ধে যত প্রকাশিত হয়, অত্ন কাজে তত নয়। বড়লোককে চিনিতে হইলে বড় হওয়া চাই। আমরা বড়লোককে চিনি না। অথচ বড়লোকের মৃত্যু হইলে যখন দু পাঁচ জন 'হা হতোহস্তি' করিতে আবদ্ধ করে, তখন আমরাও সেই সঙ্গে যোগ দি। বড়লোকের বড়ত্বের সম্মান করিতে একরূপ করি, যি আপনাদের বড়ত্ব প্রতিপাদন করিতে করি, হয় ত নিজেরাই বুঝি না।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম ভারত অপেক্ষা ভাবতের বাহিরে অধিক বিখ্যাত। Antiquities of Orissa প্রচাৰিত হইলে ভারতবর্ষে নব ধণ্ড মাত্র বিক্রীত হইয়াছিল। ফাণ্ডমন্, কনিংহাম ও হণ্টারের মত রথিগণ রাজেন্দ্রলালের তীব্র সমালোচনাব মন্তক অবনত কবিবাহিলেন। আজ রজার্ন সাহেব প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান বা দর্শন, ভারতবাসীর মৌলিক কিছুই নহে। সকলই গ্রীকদিগের অনুকরণে রচিত। আজ রিজলি সাহেব প্রতিপাদন করিতেছেন যে, ভাবতে অমিশ্র আৰ্য্য জাতি নাই। আৰ্য্যদের তরঙ্গ এখন বিপরীতমুখ। যখন ভারতবর্ষীয় দ্বিজাতিগণ আৰ্য্যজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ভারতবর্ষের সাহিত্য, দর্শন, নীতি ও ধর্ম-শাস্ত্রের উৎকর্ষ দেখিয়া প্রতীচ্য জাতিগণ মোহিত হইয়াছিল, তখন শ্বেত নীল সকল বর্ণের লোকেরা আৰ্য্যজাতির কুটুম্ব বলিয়া পরিচিত হইতে কত আগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন সে দিন নাই! ইংরাজেরাই আৰ্য্যজাতি, আর আমরা চণ্ডাল, এখন ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। প্রাচীন আৰ্য্যবাস এখন কাম্পীন্ন মাগরের তট হইতে উঠিয়া স্থানিনেবিস্যার চলিয়া গিয়াছে। দেশে একটি লোক নাই যে, ইহার প্রতিবাদ করে। অথচ রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য যে বড় গভীর ছিল না, বৈঠকে বসিয়া তোবামোদকারীদিগের সমক্ষে এ কথা বলিতে আমাদের কুণ্ঠা হয় না! রাজেন্দ্রলাল অপণ্ডিত, ইহা প্রমাণিত করিবার সঙ্গে আমাদের পাণ্ডিত্য স্বতঃই প্রমাণিত হয়।

স্বরেন্দ্র বাবুকে অত্যাচারীরা যত ভয় না করে, রাজেন্দ্রলালকে তত করিত। রাজনীতিতে মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল রাজেন্দ্রলালের শিষ্য ছিলেন। যে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভা' বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপাত করে, রাজেন্দ্রলাল তাহার প্রাণ ছিলেন। রাজেন্দ্রলালের দোষ ছিল না, এমনত নহে। তিনি বধির ছিলেন। এক দিন আমার সমক্ষে তিনি পণ্ডিত রাজনী-কান্ত গুপ্তকে বধির বৃত্তিতে পারিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ও কপাল! তুমিও কালা।" কিন্তু রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁহার প্রাচীন বন্ধু। এক দিন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভার মন্ত্রণাগৃহে দিগম্বর রাজেন্দ্রলালকে উপলক্ষ করিয়া অত্র এক জন বন্ধুর কাছে বলিতেছিলেন যে, "কালা হয় ত বাজী হবে না।" রাজেন্দ্রলাল তাহা শুনিতে পান। সেই অবধি মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রাজা দিগম্বরের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।

তাঁহার বধিরতা বিচিত্র ছিল। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পনের মিনিট চীৎকাব

করিয়া গলা ভাঙ্গিয়াছি, অথচ মস্তব্য বুঝাইতে পারি নাই। জীবাব দাবের পার্শ্বে অন্তের সহিত তিনি চুপে চুপে কি কথাবার্তা কহিতেছেন, দু হাত তফাতে থাকিয়া তাহার একটি কথাও শুনিতে পাই নাই।

রাজেন্দ্রলালের দর্প বড় ভয়ানক ছিল। যে দর্পে কোমত সকল মনীষীগণকে আপনার প্রজ্ঞা বলিয়া কর আদায় করিতে চাহিতেন, মির্টন স্বজাতীয়দিগকে অকৃতজ্ঞ ও কারলাইল প্রভারক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন—রাজেন্দ্রলালের দর্প সেই মনীষার লক্ষণ। দর্পিত সিংহের মত গ্রীবাবক্র করিয়া যখন রঙ্গক্ষেত্রে, প্রকাশ্য সভায়, মন্তব্যক্ষেত্রে বা সম্পাদকের আসনে বসিয়া তিনি বিবাকী ওজন গভীরশব্দপ্রয়োগে শত্রুকে আক্রমণ করিতেন, তখন শত্রু মিত্র স্তম্ভিত হইত। অথচ তাঁহার রহস্তপ্রিবতা অসামান্য ছিল। তবে সে কালের লোক বলিয়া বা বয়সের আধিক্য হেতু, তাঁহার রহস্তে একটু অস্বীলতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত।

যখন ২৪ পরগণার জন ব্রাউন সাহেব সংস্কৃত বাঙ্গালা অক্ষর উঠাইয়া দিয়া ইংরাজী অক্ষরে সকল গ্রন্থ ছাপাইবার আন্দোলন করেন, এবং ইহাতে ভাষা-শিক্ষার পরিপ্রসঙ্গ লাভ হইবে বলিয়া জ্ঞানরত্ন মহাশয় সে প্রস্তাবের অনুমোদন করেন, তখন রাজেন্দ্রলাল উপহাস করিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়ার্টে' একটি প্রস্তাব লিখেন। জ্ঞানরত্ন রাজেন্দ্রলালের অনেক দিনের বন্ধু। কিন্তু বিচাবের সময় রাজেন্দ্রলাল শত্রু মিত্র গণনা করিতেন না। জ্ঞানরত্ন মহাশয়কে উপহাস করিয়া পেট্রিয়ার্টের প্রবন্ধটি লিখিত হয়। এক দিন আগি ও স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে সেই প্রবন্ধের প্রকৃতিট খুলিয়া রাজেন্দ্রলাল আগাদিগকে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পড়িবার কৌশল, ক্রতঙ্গী, ও শেষে বেখানে চারি জন গাঁজাপোয়ের স্থানে মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় তাহারা মৃতদেহের ভার কমাইবার জন্য যে যে পরামর্শ করিয়াছিল, টাকা টিপ্তনীর সহিত পড়িতে লাগিলেন, তখন হাসিতে হাসিতে সরলহৃদয় রাজকৃষ্ণ বাবু চেয়ার হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সে টিপ্তনীতে একটু অস্বীলতা আছে, একজন্ত এখানে তাহা লিখিতে পারিলাম না।

দর্প শত্রুর জন্ত। সিন্বেও রাজেন্দ্রলাল অসামান্য ছিলেন। একবার ইঞ্জিনিয়ার রাধিকা বাবু বলিয়াছিলেন যে, পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরের মানচিত্র তাঁহার নিকট লইয়া রাজেন্দ্রলাল আপনার বলিয়া লোকের কাছে প্রচারিত করিয়াছিলেন। এখন বাহাই হউক, তখন শত্রুবা এই কথা উপ-

সহাধর—

ভবৎপ্রেরিত তালিকাটি প্রাপ্ত হইলাম, এবং তন্নিমিত্ত আপনাব নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমার মনে সন্দেহ হইতেছে হয় মহাশয় শত্ৰুঘর্ষের সমস্ত গুণ্ডকেব নাম প্রাপ্ত করেন নাই। আমি যত গুণ্ডক তথায় দেখিয়াছিলাম তাহার নামে তালিকা বৃহৎ হইত। লেখক এমনদ বিষয়ে ভাবিত হইবেন না। তাহা অনায়াসে এখানে সংশোধিত হইবে ইতি।

মাণিকতলা

১০ জুন ১৮৭৯

পুনঃ নিঃ

মাদলা পাঞ্জাব প্রতিলিপি পাইবার বিশেষ বাসনা আছে।

ক্রেমাঙ্গদ প্রিয় কীর্ত্তো

তোমার ভক্তি এবং প্রীতি পূর্ণ পত্র খানি পাইবামাত্র ঐযুক্ত বাজেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বাহা লিখিয়াছেন তাহা পত্রক্রোড়িত হইল। যথা-
আমি কোন সন্তেই তোমাদ্বারা ক্রটিব সম্ভা

ভবদেবকণ্ঠমুখ্যারী

ঐবদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

Maniktalla

Aug-2-79.

My dear Ranganal,

Thanks for the sight of the Head Master. I have been myself writing to the Head Master and also to Beck to whom you too had written. The replies from both sources are disappointing. I have again written to the Head Master for an outline of the figures in pencil. A true and faithful outline is all that I care about contour is of no interest to me. Will you please write for the same to the Head Master to hurry him on? Your correspondent at Bag Bazar has not answered your letters.

Yours sincerely
R. L. Mitra

সপ্রণামনিবেদনসিদ্ধ—

আমি ইতিপূর্বে জগন্নাথের ছবি পাঠাইবার জন্য মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছি। এবং আমার অভিপ্রায়ানুসারে আমার পবনবন্ধু ঐযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ জন্ত আপনাকে পত্র লিখিয়াছেন। সম্ভ্রতি আপনি রঙ্গলাল বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তিনি তাহা আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি জগন্নাথ, বলরাম স্তম্ভজা ও স্বদর্শন চক্কের ছবি প্রার্থনা করি। বিবিধ বর্ণবর্ণিত ছবিতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে আপনি এক জন চিত্রকরকে নিযুক্ত করিবেন। চিত্রকর যেন কেবল গোল্ডেন দ্বারা উক্ত চারিটি গুপ্তির ছবি অঙ্কিত করে। যথার্থ আদর্শের প্রতিকৃতি পাইলে, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যুগের ছবিতে আমার কোন আবশ্যক নাই। শুভিচাচাপু ও নীলাগ্রিমহোদয় এই দুই খানি গুণ্ডক আমার বিশেষ প্রয়োজনীয়। আপনি উহা শীঘ্র সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবা দিলে, গবম উপকৃত হইবে ইতি।
১৮৭৯ ২রা আগষ্ট } ঐরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্ত
কলিকাতা।

মহাশয়ের—

আপনার পত্র পাইয়া, পবন উপকৃত হইলাম। পত্রের লিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উপকারজনক। আপনি ঐমন্নিগে গমন কবিয়া আমার জন্ত যেরূপে পরিশ্রম স্বীকার কবিয়াছেন এতদ্বিবন্ধন বিশেষ বাধিত হইয়াছি। জগন্নাথের স্তম্ভকেব কথা মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি আপনার লিখিতানুসারে সমস্ত বর্ণন কবিব। শুভিচা ইত্যাদ্যের স্বী, তবে আপনি অনুমান কবিয়াছেন যে শুভিচা শুভিচাক্ট, ইহা হইলেও হইতে পারে।

নীলাগ্রিমহোদয়ে ভজাব হস্তের পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শনকালে ভজাব হস্ত নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব

যাহা বা ভদ্রাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয় তাহাদিগকে ক্ষিপ্রাসা করিবেন ভদ্রাব হস্ত আছে কি না? আপনার প্রেরিত নীলাজি-মহোদয়ের লোকগুলি দুই এক স্থানে পতিত বলিয়া বোধ হইল।

আমার অস্ত্র নীলাজিমহোদয় খানি বঙ্গ-ক্ষরে প্রতিলিপি করাইলেই যথেষ্ট হইবে। বোধ হয় বঙ্গাক্ষরলেখক পুরীতে অনেক নিলিবে। যদিও আমার পুস্তক (উড়িষ্যার ইতিহাস) শীঘ্রই মুদ্রিত শেষ হইবে। তথাপি উক্ত পুস্তক কিছু বিলম্বে পাইলেও তদুন্মিষিত নূতন বিষয়গুলি পরে প্রকাশ করিব। স্বন্দ-পুণ্যায় পুস্তকোত্তমসাহায্য (হস্তলিখিত ও বোধাই এদেশ মুদ্রিত) আমার দুই খানি আছে। অষ্টাধ্যায়ী পুস্তক আমার নাই। কিন্তু আমি শীঘ্রই কাশী হইতে আনাইয়া লইব। অতএব ঐ দুই খানি পুস্তক পাঠাই-বাব প্রয়োজন নাই। আমি ইতিপূর্বে 'শুভিচাচম্পু' পাই নাই। কিন্তু আপনার পত্রের ভাবে বোধ হইল, আপনি উক্ত পুস্তক খানি পাঠাইয়াছেন। সম্ভ্রতি আপনার শেষ পত্রের সঙ্গে তেড়েট পত্র লিখিত একখানি মাত্র শুভিচাচম্পু পাইয়াছি। কোণারকের সন্দি-রের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্তি স্থাপিত আছে, আমাব বোধ হয় তদুদ্ভাস্তেই পূর্বের জগন্নাথের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্তি স্থাপিত ছিল। পরে

কোন কারণ বশতঃ ঐ অশ্বমূর্তি উত্তর পূর্ব দ্বাবে লইয়া থাকিবে। অধুনা সেখানেও সে মূর্তি নাই। আপনি লিখিয়াছেন, জগমোহন ও নাটমন্দিরের মধ্যে দ্বার আছে, এক্ষণে উহাকেই জবা বিজবা দ্বার বলে, কিন্তু উহাতে অধুনা কোন মূর্তি নাই, ইহাতে এইরূপ বোধ হয় যে পূর্বের উক্ত দ্বারেই জবাবিজবাব মূর্তি সংস্থাপিত ছিল। আমাব অনুভবাস-সাবে ভোগমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্তী দ্বারে যে দুইটি মূর্তি আছে, উহাই এক্ষণে জবাবিজবাব মূর্তি বলিয়া স্থির করিতে হইবে। মাধবীকুলে প্রতি দ্বাদশ বৎসরেই কি জগন্না-থের মূর্তি সমাহিত হইয়া থাকে? কিন্তু আমি শুনিয়াছি, উক্ত কার্য্য ১০৬০ বৎসর অন্তবে সম্পাদিত হয়। আপনি এই বিষয়ের তদ্বাস-সন্ধান করিয়া লিখিবেন। আপনার ব্যব-হারের অস্ত্র পুণী ও শ্রীমন্দিরের মানচিত্র প্রেরণ কবিনাস। জগন্নাথের মূর্তি বিষয়ে আমার একটু সমেহ আছে, তাহা এই যে জগন্নাথের রূপমূল উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত অথবা সম্মুখ দেশে প্রসারিত। আপনি এই সংশয়টিব অপনোদন করিবেন। প্রেরিত চিত্রে হস্তদ্বয় উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। ইতি।

শ্রীরাঙ্গেন্দ্রলাল মিত্রস্ত।

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালা ভাষা ও জাতীয় জীবন।

কিছু দিন হইতে বঙ্গভাষার জীবন-ইতিহাসে এক নূতন পরিচ্ছেদের অব-তারণা করিবার কল্পনা হইতেছে। একটা কথা উল্লিখ্যে, বঙ্গভাষা এখন জাতীয় ভারবহনের উপযোগিতা লাভ করিয়াছে, অতএব উহার উন্নতি-কল্পে ঔদাসীন্য প্রকাশ করা আর আমাদের কর্তব্য হয় না, বরং যাহাতে উহা আপন অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া আত্মকর্তব্যসাধনে যশোলাভ কবিতে পারে, তাহাই আমাদের সর্ব্বথা করণীয়। আন্দোলন এ সম্বন্ধে কয়েক

মাসাবধি চলিতেছে। দুই একটি বক্তৃতা ও মাসিক পত্রিকায় বাদানুবাদের পর স্বরণ হইতেছে যেন এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ব্রহ্ম পঞ্চ সভ্য লইয়া পবিষদ হইতে একটি সব কমিটি গঠিত হয়—তন্মধ্যে চার জন পূর্বে হইতেই মাতৃভাবার অধিকার-বিস্তারের পক্ষপাতী বলিয়া সাধারণে পবিচিত। সম্প্রতি ত্রিযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যপরিষদের সাংসদগণের অধিবেশনে “বান্ধালা জাতীয় সাহিত্য” * নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। গত বৈশাখ-সংখ্যা “সাধনা”য় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ করি, এই প্রবন্ধসম্মিষ্টে মতামত কতক পরিমাণে পরিষদের মতামতেরই ছায়াস্বরূপ। সহকারী সভাপতির দ্বারা বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষী এবং এতদ্বিবক্ষ্যক সব কমিটির সভ্য সাংসদগণের দ্বারা বিশেষ অধিবেশনে যে প্রবন্ধ বিনা প্রতিবাদে পাঠ করিয়া সভাপতির উৎসাহ অনুমোদন এবং প্রশংসা লাভ করেন, তৎপ্রেক্ষিত মতামত সভার মতামতস্বরূপে গ্রহণ করাই, বোধ করি, সাধাবণের স্বভাবসিদ্ধ! † একরূপ অবস্থায় প্রবন্ধের মতামত অবশ্য আমাদের বিশিষ্ট প্রজ্ঞা ও সম্মানের উপযোগী।

প্রবন্ধের সারমর্ম বোধ করি এই—বঙ্গভাষা এখন আর নাবালক নাই, সে এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, আপন দ্বাষ্য সম্পত্তি এবং অধিকার বুঝিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার জন্মিয়াছে; ইংরাজী এখন তাহার নিজ সম্পত্তি-নির্দিষ্টবাদে তাহাকে ফিরাইয়া দিউক। তবে সবে মাত্র নাবালক হওয়ার পাছে কর্তব্যের গুরুভার তাহার পক্ষে দুর্ব্বল হয়, সে জন্ত স্বদেশবৎসল ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার এই মহৎকর্তব্যপালনে বাধ্যবাগ্য সহায়তা করা অবশ্য-কর্তব্য। এ কার্যে উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের জন্ত সহায়কগণেরও বিশিষ্টরূপ শিক্ষার প্রয়োজন—দাঁড়ী মাঝী বিশেষ হসীয়ার হওয়া চাই। এই কার্যাকুশলতা শিক্ষার জন্ত একটি সহজ উপায়ও প্রস্তাবিত হইয়াছে। অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের

* এ স্থলে ‘জাতীয়’ শব্দের সার্থকতা বোঝা গেল না। ‘জাতীয় সম্বন্ধ’ ইত্যাদি পদে ইংরাজী National শব্দের ভাব প্রকাশ কবে, এবং এ স্থলে ঐ ভাবই স্বভাবতঃ আকাঙ্ক্ষিত হয়, কিন্তু প্রবন্ধের মধ্যে এ জাতীয়তা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ‘তবে উত্তম নীড়’—এব দ্বায্য এই নাম যদি ইংরাজী Vernacular Literature পদের অমুবাদ হয়, তবে বলিতে পারি না। যদি এই অমুমান প্রকৃত হয় তবে বক্তব্য এই মাত্র যে ‘জাতীয়’ শব্দটাকে লইয়া অকারণ এতদূর নাড়াচাড়া না করিয়া শুদ্ধ “বান্ধালাসাহিত্য” বলিলেই কি চলিত না?—লেখক।

† ত্রিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গঠিত প্রবন্ধের মতামতের জন্ত সাহিত্য পরিষদ কেন দায়ী হইবেন? সভাপতি, সহকারী সভাপতি বা প্রত্যেক সভ্যের যত্ন মত থাকিতে পারে, —কোনও ব্যক্তিবিশেষের মত যতক্ষণ কোনও সভ্য কর্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত না হয়, ততক্ষণ তাহা সভার স্বক্কে আধোপিত করা প্রণাবিকল্প এবং অসঙ্গত মনে করি।—সাহিত্য-সম্পাদক।

প্রবেশিকাপরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অতঃপর ইংরাজীর পরিবর্তে বাঙ্গালা ভাষায় সাহায্যই হওয়া কর্তব্য। তবে ইংরাজী রাজভাষা, উহাকে একেবারে ছাটিয়া দিলে হয়ত চলে না; তাই উহাকে পরীক্ষার অন্ততম বিষয়-স্বরূপে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আপত্তিকর নহে। ইহাতে এক বাণে দুইটি নয়—অন্ততঃ পাঁচটি পক্ষী আহত হইবার সম্ভাবনা। ইংরাজী অতি দুর্লভ ভাষা, তাহাব সাহায্যে বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে বালকদিগের বিলম্ব হয়, এবং হয়ত তাদৃশ ভাল রূপ শিক্ষা করাও হইয়া উঠে না। বাঙ্গালায় শিক্ষা দিলে বিষয়গুলি সহজবোধ্য এবং অল্পশ্রমসাধ্য হইবারই সম্ভাবনা; উপরন্তু বঙ্গভাষায় অনুশীলনও হইবে, সাহিত্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার প্রতি অনুরাগও বৃদ্ধি পাইবে—এবং হয়ত গ্রন্থকারদের ভিক্ষার থলিতে কিঞ্চিৎ অর্থসমাগমেরও সম্ভাবনা হইতে পারে! শেবোক্ত পক্ষীর শিকারোদ্দেশ্যে বক্তা নিজমুখে প্রকাশ করেন নাই, বর্তমান লেখকের অনুমান মাত্র—তবে বাঁহারা গাতৃভাষার জন্ত হৃদয়ের পোষিত নিঃশেষিত করিতেছেন, তাঁহারা যদি শুদ্ধ অশরীরী যশো-লাভের পারিহেবিক ভিন্নও দুইটা সাংসারিক আয়ামলাভের উপকরণ প্রাপ্ত হন, তাহাতে কাহার আপত্তি থাকিতে পারে! কিন্তু এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্বস্ব অপহরণ জন্ত হস্তপ্রসারণ হয় ত সাধারণের পক্ষে তাদৃশ শ্রীতিকর না হইতেও পারে।

বক্তা যে কার্য সাধন করিতে বলিতেছেন তাহা যদি নিতান্ত অসাধ্যসাধন না হয়, এবং প্রকৃতপক্ষে লোকহিতকর হয়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হয় বক্তার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, এবং আমাদের বিলক্ষণ সুবিধার কথাও বটে। কাঁটা-কাটির দ্বারা ব্যাভ্রকুল নিধন করিবার সম্ভাবনা থাকিলে আর দুর্লভ ও বহু-মূল্য বন্দুক তরবারীর গুরুভারবহন করিয়া সর্বপ্রকারে ক্লিষ্ট হইবার আবশ্য-কতা কি আছে? নিতান্ত বাতুল ব্যতীত অপর কেহই এরূপ অবস্থায় তাহা করিবেন বলিয়া বোধ হয় না—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মত জ্ঞানশাস্ত্রবিৎ বুধাপরি-শ্রমপরাস্থ লোকের মধ্যে এরূপ নির্বোধ কেহ আছে বলিয়া সহসা কাহা-রও বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। অভাব মূল কথাটা এখন দাঁড়াইতেছে এই যে, বঙ্গভাষায় দ্বারা আমাদের সমস্ত জাতীয় জীবনের কার্য সুসম্পন্ন হইবাব সম্ভাবনা কত দূর? তাহা যদি থাকে, তবে ওদ্ধ প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিপরীক্ষার বিষয়গুলি পর্য্যন্ত বাঙ্গা-লায় শিক্ষা দিলেই বা ক্ষতি কি? উহাতে মঙ্গল ব্যতীত ক্ষতির আশঙ্কা ত,

দেখা যায় না। অতএব এখন দেখা আবশ্যক যে, বঙ্গভাষার দ্বারা জাতীয় কার্য সুসম্পন্ন হইবার ভরসা করা কত দূর সম্ভব।

এ বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্বপ্রথম দেখা আবশ্যক আমাদের জাতির পরিসর কত দূর, এবং তাহার সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগিতা বাঙ্গালা ভাষার আছে কি না। বাঙ্গালা ভাষার 'জাতি' শব্দ ইংরাজি Nation শব্দের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। Nation শব্দে অবশ্য এক রাজার শাসনাধীন দেশ বিশেষের অধিবাসিসমষ্টিকেই বুঝায়। অতএব 'আমাদের জাতি' অর্থে বুটিশশাসিত ভারতের সমগ্র অধিবাসিবর্গকেই বুঝিতে হইবে। এই এক-জাতীয়তা ইংরাজাধিকারের পূর্বে কখনও ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না সত্য; কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সহিত ভাবের পরিবর্তন স্বাভাবিক। আমরা সকলে এক দেশের অধিবাসী, এক রাজার শাসনভুক্ত, প্রায়ই সম আইনের অধীন; আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা প্রায় এক সমান্তরালে অবস্থিত, এবং আমাদের উন্নতি একস্থানে আবদ্ধ; অতএব ধর্মনির্বিশেষে এবং প্রদেশনির্বি-
ভেদে বুটিশশাসিত ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসিবর্গকে এক জাতি বলাই সম্ভব; এবং আধুনিক শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নিকট ভারতের জাতীয়তা এই ভাবেই গৃহীত। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভা ও ভারতবর্ষীয় জাতীয় সমিতির অস্তিত্বই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এই জাতির মধ্যে এক ভাষার প্রচলন যে হিতকর, তাহাতে, বোধ করি, কাহারও বিমত হইবার সম্ভাবনা নাই। জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে সমভাষিকতা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ভাষার দ্বারা জাতির সৃষ্টি হয় না বটে, কিন্তু জাতীয় ভিত্তি দৃঢ়সংস্থ এবং জাতীয় জীবনের উন্নতি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। একতাই যদি জাতীয় বলের মূল কারণ হয়, তবে এক ভাষার প্রচলনের দ্বারা একতাবন্ধনেব সহুপায় আর কি আছে? ভারতে এক ভাষার প্রচলনে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি এবং ভারতবাসিগণের নৈতিক মানসিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার উন্নতি সমরোপায় সাধিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; আর তাহাতে Divide and rule policyর মূলে চিরদিনের জন্য কুঠার পড়িবে।

বঙ্গভাষা বঙ্গবাসিমানুষেরই মাতৃভাষা হইলেও সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা হওয়া দূরে থাকুক, বাঙ্গালায় ছোট লাটের শাসনাধীন সমস্ত প্রদেশের পর্যন্ত ভাষা নহে। এই ভাষার দ্বারা আমাদের সুখ দুঃখ আশা ভরসা বেদনা উৎসাহ উত্তেজনা ভারতের সর্বত্র প্রচার করিবার সুযোগ নাই। আপাততঃ এ কার্য

পরিমাণে ইংরাজীর সাহায্যেই সাধিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক
 মধ্য ভবের আদান প্রদান ইংরাজীর দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে,
 ক জাতীয় সম্মিলনের কার্য ইংরাজীর সাহায্যেই সিদ্ধ হইতেছে;—

ক সময় ভারতবর্ষের জাতীয়তা এখন কতক পরিমাণে ইংরাজ্য, দ্বারাই
 গঠিত। অতএব এখন জাতীয় ভাষার সিংহাসন অধিকার করিতে হইলে
 দ্বার ইংরাজীকে পরাভূত করিয়া তবে তাহা অধিকার করিতে হইবে।

বিবেচ্য এই যে, বাঙ্গালার সে সামর্থ্য আছে কি না।

রাজাকে পদচ্যুত করিয়া জাতীয় কণ্ঠব্যাধনের ভাব বাঙ্গালার হস্তে করা প্রথমতঃ সম্ভবপর নহে—দ্বিতীয়তঃ, সম্ভবপর হইলেও হিতকর না। এমন ব্যক্তি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে পাওয়া গাইবে কি না সন্দেহ,

সুহৃদের দ্রুত ও গভীরভাবে ইংরাজী হইতে বাঙ্গালীর প্রাধান্ত প্রতিপাদন
ত সচেষ্ট হইবেন। অতএব এ সম্বন্ধে আমার অধিক কিছুই বলিবার
জন করে না; তবে দুটো কথা বলিলে বোধ করি, পাঠক অসহিষ্ণু হই-

না। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের পরিসর বাঙ্গালা হইতে অনেক অধিক ; ইংরাজী শিক্ষার অপূর বাহাই কল হউক বা নাই হউক, এইটি হইয়াছে আমরা মানবজাতিকে তাহার সমৃদ্ধিভাবে চিনিরাছি। এই মানবসমৃদ্ধির

দেশের বৃহত্তমভাগ ইংরাজীভাবাভিজ্ঞ; অতএব ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা অপূর্ণ
ন হিত যত দূর সাধিত হউক বা নাই হউক, স্বেচ্ছা মানবসমষ্টির বিশিষ্টাং-
সহিত আমাদের ভাবের আদান প্রদানের স্বযোগ ঘটান্নাছে, এবং বর্ধমান

লর সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যের সহিত, ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। অসীম দেশহিতৈ-
 ষার কুহকে পড়িয়া এ সুযোগ হারাইলে আমাদের জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা
 অনেকাংশে হ্রদ্বপরাহত হইবে, তাহা বঝিতে অধিক সময় লাগে না।

ইংরাজী শিক্ষার বলে আমাদের জাতিগত কতকগুলি কুস্বভাব বিদূরিত
 হবার সম্ভাবনা বাটতেছে—ইংরাজীর অমূল্য মন বর্ষতা প্রাপ্ত হইলে, তাহা-
 রিত হইবার সম্ভাবনা মানবচকুর সীমাবিহীনত স্বপ্নের ভবিষ্যতের গর্ভে

কৃত হইবে। আমাদের প্রকৃতি এমনি, অলস যে, আমরা প্রত্যেকের কার্য
 আমাদের দ্বারা সমাধা করিতে পারিলে ছাড়ি না, তাই আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান
 অনেক সময়েই ভ্রমসঙ্কুল দেখা যায়। প্রাচ্য অতিরঞ্জন ত' সর্বজাতির মধ্যেই

একপ্রকার 'প্রবাদবাক্য'স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দীক্ষণ-শক্তির অভাব, সত্যনির্ভরতার অভাব, বিশ্বাসের প্রবলতার অভাব, একদেশদর্শিতা, এবং

তেজোহানিকর চক্ষুর্লঙ্কার, অমণ্ডিত প্রাবল্য, সকলেরই স্বীকার্য্য। এ সকলের পরিবর্তন ইংরাজীর অভাবে হওয়া এক প্রকার অসম্ভব, বলিলেও বোঝা করি অত্যাশ্রিত হয় না। ইংরাজ যে আজ পৃথিবীর মধ্যে বড় জাতি, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। আমরা যখন ঘটনাচক্রে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছি, তখন যাহাতে তাহার মহৎ গুণাবলী বধাসম্ভব আয়ত্ত করিতে পারি, তাহার ক্ষেত্র ত্যাগ করা কখনই সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। এক্ষণ তাহার ভাষা, তাহার ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন। আমাদের ত শুদ্ধ ভাষাশিক্ষা নহে, আমাদের ইংরাজী হইতে চরিত্রগঠন পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতে হইতেছে। এই কথা স্মরণ রাখিলে আর নিউটন সেক্সপীয়র প্রভৃতির অভাবেব জন্ত ভারতবাসীকে গালাগালি করিবার অবসরের হয় ত কতকটা হ্রাস হয়।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ইংরাজীর সহিত তুলনাতেই আসিতে পারে না; প্রভূত বলশালী বীরের সহিত, গিতারগন্ত শীর্ণকায় শিশুর তুলনা, যে রূপ সম্ভবে, ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালার তুলনা তাহা অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত নহে। বাঙ্গালার ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব কোথায়? এক কথায়, বলিতে গেলে, ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্যের 'গেভেল' বাঙ্গালী হইতে অনেক উচ্চে। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা কালে আমাদের এই উচ্চ মানসিক গেভেলে উঠিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; কিন্তু বাঙ্গালী ভাষাকে জাতীয় ভাষাস্বরূপে গ্রহণ করিলে, সে সম্ভাবনার মুহূর্ত্ত কুঠারঘাত করা হইবে; দশ বৎসরে যে উন্নতি সম্ভবপর হইত, ইহাতে দশ বৎসরে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা অতি বিরল হইবে। পৃথিবীর অপর সমস্ত ভাষাপেক্ষা ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্যের পরিসর অধিক বই কোন অংশে ন্যূন নহে, এবং ইংরাজীর অনুবাদ গ্রন্থের সমষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; আধুনিক বা পুরাতন কোন সাহিত্যেই এমন দৃশ্যখানি করিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, বাহা ইংরাজীতে অনুবাদিত না হইয়াছে। অতএব এক ইংরাজী ভাষা উপযুক্তরূপে শিক্ষা করিলে সমস্ত সত্য জগতের ভাব আমরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারি—এ সম্ভাবনা শুদ্ধ বাঙ্গালী কেন, অপর কোন ভাষাতেই নাই। আমরা যে আজকাল পুরাতন ভারতের সাহিত্য দর্শনাদির এত গৌরব করিয়া থাকি, তাহা কাহার সাহায্যে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি?

আর একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ কর্তব্য যে, অপরায়ণ বিষয়ের ভ্রান্ত ভাষাও কতক পরিমাণে জাতির রাজনৈতিক অবস্থার সহিত

নিকটভাবে সম্বন্ধ। পরাধীন জাতিকে যেমন কতক বিষয়ে জেতার সুখাপেক্ষী হইতে হয়, কতক বিষয়ে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কার্য করিতে হয়; ভাষা-সম্বন্ধেও কতক পরিমাণে সেইরূপ—বিশেষতঃ আমাদের রাজা ইংলণ্ডেশ্বরী নহেন, আমাদের রাজা ইংরাজ জাতি। আমাদের আবেদন নিবেদন সমস্ত কাষেক ঘাহাতে ইংরাজ জাতির নিকটে পৌছিতে পারে, সে অন্ত ইংরাজী বঙ্গাকার প্রয়োজন; আমরা যে উন্নত রাজনৈতিক ক্ষমতালভের উপযোগী হইয়াছি, তাহার পরীক্ষা আমাদের ইংরাজী ভাষা এবং ইংরাজী ভাবেব দাহায্যেই ইংরাজ জাতিব নিকট দিতে হইতেছে। এবং যত কাল এদেশে ইংরাজশাসন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তত কাল দিতে হইবেও—অতএব ইংরাজী ব্যতিরেকে একপদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা যখন আমাদের নাই, তখন ইংরাজী ভাষা ত্যাগ করিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? এরূপ অবস্থান ইংরাজী ছাটরা দিলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা, আমাদের চরিত্রগঠনের স্ববোণ থাকে কোথায়? বাঙ্গালা যেমন চার কোটি লোকের ভাষা, তেমনি হিন্দিও তো আট কোটি লোকের ভাষা—তবে বাঙ্গালার হিন্দিকে ডিজাইরা জাতীয় ভাষা হইবার অধিকার কিসে? তাহার সাহিত্যে? হিন্দির সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার সাহিত্য যেমন উন্নত, সুনসংখ্যার প্রভেদ তেমনি বহুবিস্তৃত—তবে সে আশা কোথায়? কিন্তু প্রকৃত কারণ ইহা নহে। বাঙ্গালা অথবা অপর কোন প্রাদেশিক ভাষাই যে নিকট ভবিষ্যতে জাতীয় ভাষার স্থল অধিকার করিতে পাবিবে, এরূপ আশা করা কোনও ক্রমেই সম্ভব নহে। অপরপাশ প্রদেশের লোকেরা ইংরাজী ও আপনাপন মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া উহাকে গ্রহণ করিবে কেন? যে দিকে ক্ষীণতম বাধা, সেই পথেই জাতি অগ্রসর হয়। ব্যক্তি-বিশেষে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া অস্থ মুখে চলিতে পারে, কিন্তু জাতিকে তাহা করিতে দেখা বাব না—মুহুর্তের কোন একটা স্বার্থত্যাগ সম্ভব, কিন্তু কালব্যাপী স্বার্থত্যাগ একরূপ অসম্ভব। আর তাহা হইলেই বা কি হইত! এ সম্বন্ধে সমগ্র জাতিকে চালিত করিবার উপযোগী কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে! এতদ্ব্যতীত কালের শ্রোত ইহার বিরোধী। মুখে যিনি ঘাহাই বলুন, আমরা ইংরাজকে অন্তরে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, তাহাকে বড় মিলিয়া জানি—তাহার হাতের ছাপ ব্যক্তিরেকে কোন পদার্থকেই বড় সম্মানের চক্ষে দেখি না, ইংরাজের ভক্তির অভাবে হাজার বহুমূল্য বস্তুরও আমাদের নিকট সমাদর হয় না, আমরা সর্ব বিষয়েই ইংরাজের প্রাণসাবাদের

জন্ম লাভাশিত এবং তাহা পাইলেই যেন জীবন সার্থক জ্ঞান করি। এইরূপে আমাদের মধ্যে যে যতদূর পরিমাণে ইংরাজ হইতে পারে সে আপনাকে তত দূর কৃতার্থ মনে করে—এমন কি ভিতরে যতদূর ইংরাজ হইতে পারি বা না পারি, আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছাদি বহির্বিশয়ের আড়ম্বরে সে ক্রটিটুকু গোঁষাইরা লইতে চাই। অতএব কালশক্তি ইহার বিরোধী, এবং কংগ্রেস প্রভৃতি জাতীয় কার্যাদি হইতে দেখা যায় যে, দেশশক্তিও ইহার প্রতিকূল। আর বাকী এক রাজশক্তি—তাহা যে ইহার অমুকূল, এ কথা বোধ করি কেহ বলিবে না—তাহার ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি সমস্ত কার্যকলাপই ইহার প্রতিকূল। অতএব ইহা সম্ভব হইবে কিরূপে ?

বক্তা বলিতেছেন, “অন্ততঃ যদি এটেল ক্লাস পর্য্যন্তও বাঙ্গলাভাষায় সকল বিষয়ের শিক্ষা ও ইংরাজীকে অন্তর্গত শিক্ষণীয় বিষয় স্বরূপে গণ্য করা হয়, তবে ছাত্রগণ প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিবার অবকাশ পায় এবং শিক্ষাসমাপনের পর স্বদেশের হিতসাধন ও জীবনের মহৎকর্তব্যপালনের উপায় তাহাদের নিকট স্বগম করিয়া দেওয়া হয়।” আমার বিবেচনায় বক্তার প্রস্তাবের ফল তাঁহার আশার সম্পূর্ণ নিপরীত ভাব ধারণ করিবারই সমধিক সম্ভাবনা। এসম্বন্ধে আপত্তি দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ইহার আবশ্যকতা নাই, দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে শুভ ফল প্রসূত না হইয়া বরং মন্দ ফলই ফলিবে—অমৃতের পরিবর্তে গরলই উঠিবে।

সত্যের খাতিরে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষায় বিষয়শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থের বিশেষ অভাব। অতএব বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হইলে, প্রথমতঃ অনেক বিষয়েই ভাবশিক্ষা ইংরাজী সাহিত্যের নিকট হইতে করিতে হইবে—ভাবশিক্ষা হইলেই তবে ত ভাষার তাহা পরিচ্ছাদিত করিবে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে সে সমস্ত ভাব কোথায় ? ভাবশিক্ষা আমাদের ইংরাজীর সাহায্যে ইংরাজী সাহিত্যের নিকট হইতেই আপাততঃ কিছুকাল করিতে হইবে—তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে ভাবশিক্ষা করিলে আমাদের ভাবরাজ্যের সীমা বিশিষ্টভাবে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব বুঝা আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলিকে ধর্ম, ক্ষীণ, নিস্তেজ করিয়া জাতির লোপসাধনের সম্ভাবনা প্রসূত করিবার আবশ্যকতা কি আছে, তাহা ত বুঝা যায় না। বরং ইংরাজীশিক্ষায় আমাদের ভাবাধিকার বিস্তৃতিলাভ করিলে আমরা যদি তাহা বাঙ্গালা ভাষার

সাহায্যে দেশের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা করি, তাহাতে অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত সকল শ্রেণীরই সুবিধা হইবার কথা। প্রথমতঃ ভাব অধিকার কর, তবে ত ভাষার দ্বারা তাহা দেশে প্রচার করিবে,—কিন্তু যখন ইংরাজী ব্যতীত এ ভাবসমাগমের অন্তোপায় আমাদের নাই, যখন ইংরাজী শিক্ষা আমাদের পক্ষে একমাত্র সর্বতো-
ভাবে প্রয়োজনীয়, তখন উহার সাহায্যে বিষয়শিক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্তনের আবশ্যিকতা কি আছে? ইংরাজী এমন ভাষা যে, বিদেশীয়েদের পক্ষে ভাল-
রূপ আয়ত্ত করা অতিশয় যত্নসাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি স্থলেই সংস্থাপিত হয়, কালেজে আসিয়া বিষয় এবং সাহিত্যের শিক্ষা হইয়া থাকে মাত্র। উচ্চ শিক্ষায় ঐ পূর্বসংস্থিত ভিত্তির উপবে-
্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচি অনুসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে—
অতএব ইংরাজীর সাহায্যে বিষয় শিক্ষা না দিলে আমাদের ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি ভাদ্রশ স্তম্ভ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকিবে। মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রভৃতিরা ত ইংরাজীর সাহায্যেই বিষয় শিক্ষা করিয়া-
ছিলেন, তাহাতে কি তাঁহাদের পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কিছু-
মাত্র প্রতিবন্ধক ঘটয়াছিল? যাহারা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ
করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের পক্ষেও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বিষয়শিক্ষা অপকারী
হইবে। ভাবের সম্ভাব থাকিলে ভাষার জন্য কিছু আটক থায় না—বিশেষতঃ
বাঙ্গালার জ্ঞান শিশু মাতৃভাষার অনুশীলন বিশেষ কর্তব্যও নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, অকপটে বলিষ্ঠ বলিলে, বোধ করি, তাঁহাদের সকলকেই স্বীকার করিতে
হইবে যে, শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় নাই। আর যদি বাঙ্গালা ভাষার
সাহায্যে বিষয় শিক্ষা করিলে ছাত্রদের শিক্ষা ভাল হইত, তাহা হইলে ছাত্রবৃত্তি
এবং মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বিষয়শিক্ষা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হওয়াই
উচিত ছিল, কিন্তু বঙ্গদেশস্থ স্কুল কলেজের সম্বন্ধে যাহার অভিজ্ঞতা আছে,
তিনিই জানেন যে, এ কথা কতদূর প্রকৃত। বক্তা স্থানে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্রদের শিক্ষাসম্বন্ধে যে সকল প্রশ্নবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, যদি কখন
বক্তার প্রস্তাব আংশিকও গৃহীত হয়, তবেই তাহা কতকাংশে যথাপ্রযুক্ত হইবে।
বাঙ্গালার সাহায্যে বিষয় শিক্ষা কবিয়া পরে উচ্চ উপাধির পরীক্ষার জন্য সেই
সকল বিষয় ইংরাজীতে শিক্ষা করা কত অধিক শ্রমসাধ্য হইবার কথা, তাহা
যাহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই সহজে

অল্পমান করিতে পারিবেন। আমি ইংরাজ অধ্যাপকগণ স্কুলভেতন বিভা-
হায়ের অধিশিক্ষিত শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের, ইংরাজী ভাষায়
অজ্ঞতারশতঃ তাঁহাদের অধ্যাপনা বুঝিতে পারেন না বলিয়া অভিযোগ আরম্ভ
করিয়াছেন, তাহার উপরে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়শিক্ষা হইলে আর দুর্দশার
সীমা থাকিবে না। স্বজাতিপ্রিয় স্বদেশহিতৈষী মাতৃভাষার পক্ষপাতী-বন্ধ
মাতার স্নসন্ধানদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও শিশুকাল হইতে সন্তানদের
ইংরাজী স্কুলে প্রেরণ করিতে দেখা যায়। ইংরাজী শিক্ষার মূল্য তাহারা বিলক্ষণ
অবগত; এবং ইংরাজের দ্বারা সন্তানের নিকটও ইংরাজী মাতৃভাষারূপ হয়, এই
উদ্দেশ্যেই তাহারা এ কার্যে প্রবৃত্ত হন—তাঁহারা কি কখনও বাঙ্গালার বিষয়
শিক্ষা করিতে সন্তানদের অনুমতি করিবেন বলিয়া বোধ হয়! তবে বৃথা
এমন একটা সুলীক মাতৃভাষাবৎসলতার ঠাট প্রদ্রব করিবার প্রয়োজন
কি আছে! আমাদের যে এখনও কিছুকাল ইংরাজীর ধাতুত্বশাসনে
শিক্ষা লাভ করা একান্ত আবশ্যক, পরিবদের দ্বারা বিদ্যাজ্ঞানসম্মিলনে একরূপ
প্রস্তাবের অবতারণা ও অনুমোদন তাহার নিত্য একটা সামান্ত প্রমাণ নহে।
বালকদিগের যে বাঙ্গালাশিক্ষা ভালরূপ হয় না, তাহার কারণ স্বতন্ত্র; অতএব
রোগ স্বতন্ত্র বলিয়া তাহার ঔষধব্যবস্থাও স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। বাদ্যলা
ভাষাব প্রতি কর্তমান অনাস্থার কারণ বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষিত শ্রেণীর মস্তিষ্ক
ও হৃদয় আকর্ষণের উপযোগী উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অভাব, এবং তাহার একমাত্র
প্রতিকারের উপায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা। কৃৎকারসর্ব্বস্ব সহস্র বক্তৃতা ও
প্রবন্ধাদি অপেক্ষা একখানি উৎকৃষ্ট সাহিত্য গ্রন্থ রচনায় অধিক ফললাভেরই
সমধিক সম্ভাবনা।

পূর্বের কথা হইতে কেহ যদি মনে করেন, বাঙ্গালা সাহিত্যকে বঙ্গোপ-
সাগরে বর্জন করিতে বলাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তিনি অতিশয় ভ্রমে
পতিত হইবেন। আমার বলিবার অভিপ্রায় এই মাত্র যে, আমাদের এখন পর্য্যন্ত
ইংরাজীকে ত্যাগ করিবার সামর্থ্য জন্মায় নাই, এখনও কিছু কাল ধরিয়া
ইংরাজীর সাহায্যে আত্মোন্নতি লাভিত করা আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।
পরে যদি সুযোগ আসে, তাহা হইলে বাহাতে বঙ্গভাষা জাতীর ভার গ্রহণ করিতে
পারে, তাহার জন্য এখন হইতে সাহিত্য-প্রণয়নসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই যথামুখ্য
বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন বিধেয় সভ্য, কিন্তু শুদ্ধ এই কেন? উহা বাস্তব
অপার সহৎ উদ্দেশ্য বঙ্গভাষার দ্বারা সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এবং

তাহাই উহার আপাততঃ কর্তব্য। যাহাতে শিক্ষিত অশিক্ষিতদের মধ্যে সম্পূর্ণ মানসিক বিচ্ছেদ না ঘটে, শিক্ষিতশ্রেণীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষিত শ্রেণীরও যাহাতে মানসিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহাই প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বর্তমান কর্তব্য। আত্মকর্তব্য ত্যাগ করিয়া পরের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্ত করপ্রসারণে কোনই মঙ্গল নাই। কথামালার কচ্ছপ ও ঈগলের আখ্যান স্মরণ করিয়া যদি নিজ কর্তব্যে রত থাকি, তবে সর্বতোভাবে মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। যদি বাঙ্গালা ও অপরাপর প্রাদেশিক ভাষা বুঝা গুরু ও অভিমানের আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া এই অভিনব জাতীয় অভাব-সোচনের সামর্থ্য অর্জন করিতে থাকে, তবেই মঙ্গল, নহিলে একপ বুঝা আড়ম্বর ও আক্ষালনপূর্ণ বক্তৃতা যে: নিষ্ফল হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাষা আচার ব্যবহার পরিচ্ছদাদির দ্বারা জাতীয় স্ববিধার জন্ত, না তাহাদের জন্ত জাতি? এইরূপ অলীক-সেণ্টিমেন্টাল দেশহিতৈষিতার অহিত বৈ হিত নাই। দশ জনে মিলিয়াই জাতি; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জন যদি আপন অপোগণ্ড পুত্রকে রাজ্যভারপ্রদানের জন্ত জ্বিন্দ করিয়া বসেন, তবে তাহা কিরূপ শুনায? কিন্তু আমাদের দেশে আজকাল “সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড—গোড়া নাই আগা!”

শ্রীযোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বিদায়।

(গল্প।)

মতিলাল স্বগ্রামেই বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের পূর্বেও অনেক বার শুভদৃষ্টি হইয়াছিল, কেহ সাক্ষী হয় নাই, কিন্তু শেষ শুভদৃষ্টিটা কি শুভক্ষণেই ঘটিয়াছিল!—চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত সাক্ষী হইয়া রহিল, আত্মীয় কুটুম্ব ত দুইরকম! নিরোধ প্রেম অপ্রতিহত গতিতেই চলিতেছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিষম আসিয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া দিল। মাত্রাধিক কঠিন মাটির উপর ঘর বাঁধিবা বেশ স্থখে এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘরকন্না করে—কিন্তু কোথা হইতে একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব ঝড় আসিয়া ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিয়া দেয়। বাহ্যপ্রকৃতিতেই যে শুধু এমন হয় তাহা নহে, মানবজীবনেও একরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

অতি শৈশবকালে মতিলাল মাতৃগিহীন হইলে, তাহার মাতুল রামগোবিন্দ বাবুই তাহাকে এত দিন প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, এবং এই কার্য্য তাহার মাতৃগাহিনীর চক্ষে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হইলেও, মতিলালের স্নেহবঞ্চিত দুর্বল শিশুহৃদয় তাহার মাতুলের দীপ্ত স্নেহালোকে ক্ষুদ্র পল্লবের স্তায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তিনিই বিশেষ আড়ম্বরে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

মতিলালের মাতুল রামগোবিন্দ বাবু কলিকাতাব কোনও ব্যাক্তের কেশিয়ার ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার পার্থিব স্বার্থও এই ব্যাক্তের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত ছিল। তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত, সংসার খরচ বাদে অল্প যাহা বাঁচিত, সমস্তই ব্যাঙ্কে জমা রাখিতেন। আশ্রয় করা যায়, যে টাকাটা জমান ছিল, তাহাতেই তাঁহার বার্ষিক্য এক রকমে কাটিয়া বাইত। কিন্তু যে কথা মাথার মনে একবারও উদিত হয় না, বিধাতা বহুপূর্বেই তাহা অদৃষ্টে লিখিয়া রাখেন। হঠাৎ এক দিন ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া রামগোবিন্দ বাবুকে পথে বসাইয়াছিল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা করিল, ব্যাঙ্ক ফেল হইবার সম্ভাবনা। রামগোবিন্দের পূর্ক হইতে জানিতে বাকি ছিল না, স্মরণ্য তিনি নিশ্চয়ই বিলক্ষণ দশ টাকা সরাইয়াছেন।

কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধির অভাববশতই হউক, বা অল্প কোনও কারণেই হউক, তাঁহার গৃহে এক পরসাত্ত আসে নাই। কলিকাতায় সপরিবারে বেশী দিন বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকা চলে না, গাড়ী ঘোড়া এবং তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া তিনি পল্লীগ্রামে পৈতৃক ভিটার উপস্থিত হইলেন। বৎসর বৎসর দুর্গোৎসবের সময় যে গ্রাম তাঁহাকে মহা সমারোহে এবং উচ্ছ্বসিত প্রীতিভরে অভ্যর্থনা করিত, আজ তাঁহার এই দুর্দিনেও সে তাঁহাকে তাহার ছায়াছয় স্নিগ্ধ কোড়ে সম্মেহে গ্রহণ করিল। প্রতিদিন প্রভাতের তরুণ সূর্য্য তেমন নবীন রাগে পূর্ক দিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশপ্রান্তে উঠিতে লাগিল, তরুশাখায় বিহঙ্গের তেমন আনন্দকাকলী, গ্রামপ্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী তেমন চঞ্চল স্রোতে বহিয়া যাইতেছিল, এবং নদীতীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে রাখালের দল পূর্কবৎ গরু চরাইয়া গান গাহিয়া ফিবিতেছিল; কিন্তু রামগোবিন্দ বাবুর হৃদয়ে ঝটিকার বিরাম ছিল না।

যে সকল বদ্ধ বাক্যের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার হস্তে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে,

গৃহে তাহার ছই চারি দিন তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে মান দীপালোকে বহির্মণ্ডপের এক সতরঞ্চীব উপর বসিয়া তাত্রকূটধূমের সহিত প্রচুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু যখন তাহার বৃষ্ণিল, লোকটা বাস্তবিকই শূন্যহস্তে বসিয়া আছে, এবং পরিবার-প্রতিপালনের উপায়ান্তর না দেখিয়া বাকসূচৌকী বিক্রয় পূর্বক মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করিতেছে, তখন সেই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এবং আত্মীয় প্রতিবেশিগণ মধুহীন গধুচক্রের স্থায় তাঁহার প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন কবিত্তে লাগিল। যাহারা গোপনে তাঁহাকে ভয় করিত, তাহার। এখন প্রকাণ্ডে অসম্মান দেখাইতে লাগিল;—নকুড় ভট্টাচার্য্য বিজয়া দশমীর দিন তাঁহার দরজা দিয়া অন্ত্যস্ত বার অপেক্ষা বেশী ঘটা করিয়া ঢাক বাজাইয়া গেল। তাঁহার দরজার আসিয়া ঢাকদিগের ঢাকে কিঞ্চিৎ জ্বরে কাঠি দিবার কি আবশ্যক ছিল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া রাগগোবিন্দ বাবু অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া নিজের পূর্বকথা ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেচার। মতিলালের বিপদই সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। মাতুলের উপর নির্ভর করিয়া সে এত দিন বাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া আসিয়াছে; কোনও দিন কাহারও নিকট মস্তক অবনত করা আবশ্যক বোধ করে নাই, এবং সম্মুখে যখন যে বাধা আসিয়া পড়িয়াছে, বিলাতি জুতার তলার তাহাই নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে; আজ ক্ষুদ্রের উপেক্ষা ও সামান্য সামান্য বাধা তাহার পক্ষে অসম্ভব এবং দুর্লভ্য হইয়া পড়িল, এবং যে পর্ত্তের যুশীতল শৃঙ্খল অটল মনে করিয়া সে তাহার উপর নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি নিতান্ত উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই পর্ত্ততন্ত্রের পতনের সঙ্গে তাহার উন্নত মস্তক একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

পিতামাতার আদরের কছা বলিয়া মতিলালের স্বী সোনাগুণী অধিকাংশ সময়েই পিতৃগৃহে বাস করিত; মতিলাল দেশ বিদেশ ঘুরিয়া ছই এক মাস অন্তর যখন বাড়ী আসিত, তখন দিবসের অধিকাংশ সময় বন্ধুগৃহে তাঁস পাশা লইয়া ব্যস্ত থাকিত। রাত্রিকালে মতিলাল আপন।র প্রবাসশ্রান্ত বিরহরাস্তা হৃদয়টিকে প্রিয়তমার গভীর প্রেম, আদর এবং মান অভিমানের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিত।

মতিলালের স্বাভাবিক বিশ্বাস ছিল, তাঁহার জামাতা একটা লোকের মত লোক, ইচ্ছা করিলেই সে হাকিম হইতে পাবে, এবং সোনাগুণীকে এক রাত্রি

মধ্যে সোনা রূপায় মুড়িয়া দিতে পারে ; এমন কি, নদীতে স্নান করিতে গিয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণের কাছে জামাইয়ের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, কিন্তু জামাত্বরকে এরূপ প্রশংসামান চক্ষে দেখিবার বিজ্ঞানসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে মতিলালের বিলাতী জুতার মস্ মস্ শব্দ, টেরির নৈপুণ্য ও শার্টের বৈচিত্র্য দেখিয়া সরলা পল্লীগৃহিণীর এরূপ ধারণা হওয়া অসম্ভব ছিল না।

যাহা হউক, এইরূপ একটি সুসভ্য জামাতা লাভ করিয়া তিনি মনে মনে বিশেষ গর্ব অনুভব করিতেছিলেন। মতিলাল দিবসে বাড়ীতেই আহাৰাদি সম্পন্ন করিত, রাত্রে স্বাস্থ্যে তাহার দ্বিতলস্থ শয়নকক্ষে বোড়শোপচারে আহাৰ যোগাইতেন ; আহাৰবিষয়ে মতিলালের বাল্যকাল হইতেই সবিশেষ পারিপাট্য ছিল, দৈবাৎ কোনও ব্যঞ্জন তাহার সুনিপুণ রসনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল না হইলে তিনি অত্যন্ত হুঃখিত হইতেন, এবং প্রাণপণ শক্তিতে নিজের ক্রটি সংশোধনের চেষ্টা করিতেন।

মতিলালের স্বপ্তরের আর একটি জামাতার নাম ছিল কালাচাঁদ। সে অতি গরীব এবং লেখাপড়ারও কোনও ধার ধরিত না। সে এক উকীলের ঘুরীসিঁড়ি করিত, এবং সংসারে আর কেহ না থাকিতে বাধ্য হইয়া তাহাকে স্বপ্তরালয়েই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তাহার গারে ইক্কীকরা শার্ট ও পাম্বে বিলাতি জুতা, এ উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইত, স্তবরাং স্বপ্তরবাড়ীতেও সে তহুপযুক্ত আদর লাভ করিত। নীচের তলার একটি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে তাহার শয়ন-কক্ষ নিরূপিত হইয়াছিল, আহাৰের সময় তাহার সম্মুখে যে অন্ন প্রদত্ত হইত, তাহার কথা কালাচাঁদই ভাল বলিতে পারে।

অতএব সেই অন্তঃকরণে উদর পূর্ণ করিয়া মলিনবস্ত্রধারী চিন্তাক্রিষ্ট কালাচাঁদ বধন শস্যায় গড়িয়া অন্ধকারের মধ্যে ছারপোকায় দংশনজ্বালা অনুভব করিত, এবং আরম্ভের দল চঞ্চল পক্ষ সঞ্চালন পূর্বক সেই নিস্তব্ধ গৃহটিকে বিলক্ষণ সজাগ করিয়া তুলিত, তখন দ্বিতলের কেরোসিনের আলোকে সমুজ্জ্বল একটি সুসজ্জিত কক্ষে মতিলালের বিরামস্থত্বের নিভৃত কল্পনায় তাহার চিত্ত অত্যন্ত উৎক্লিষ্ট ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

অনেক দিন এইরূপে কাটিল, তাহার পরই উল্লিখিত বিপদ। এই বিপদের পর হইতে মতিলালের মাতুলানী মতির উপর আরও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তৎদিন তাহাকে চাকরী বাকরী সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই, হুই এক সময়

যদি তিনি সেরূপ কোন ভাব দেখাইতেন, তাহা হইলে মতিলালও এমন ভাব দেখাইত যে, সে তাহার মায়ীর পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করিতেছে না, এবং মায়ীর উপর তাহার দাবী মায়ীর দাবীর অপেক্ষা অল্প নহে। কিন্তু এখন মাতুল-দাবীর আর সে সন্দেহ নাই, তিনি একদিন প্রকাশ্যে বলিলেন, “বাবু, এতদিন আমি কে পুষ্টিলাম; এখন আর আমাদের সে দিন নাই, এখন তুমি তোমার নিজের পথ দেখ।”

মতিলালের ভারি রাগ হইল, মামী কথাটা শুনিয়া অজ্ঞায় বলিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সত্য কথাতেও অনেক সময় বড় রাগ হয়, তাহার মনে হইল, “আমি এক বেলা এক মুঠো খাই, সেটা কি এতই অসহ্য হইল। ভাল, আজ হইতে আর আমার অঙ্গস্পর্শ করিব না।” রামগোবিন্দ বাবুর কানেও কথাটা উঠিল, তাহার উপর গৃহিণী নানা অলঙ্কারে কথাটিকে বেশ সাজাইতেও ভুলেন নাই। বিপদে এবং বিবিধ প্রকার চিন্তায় রামগোবিন্দ বাবুর মন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, এদিকে তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত ষিট্‌ ষিটে হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, “হোঁড়াটা কি নিয়ম হারাম, আমি কি তাহাকে এখন এক বিন্দুও স্পর্শ করি নাই? কষ্ট দেখিয়া আজ সেও আমাকে ছাড়িতে চায়?”—তিনি মতিলালকে কোন কথাই বলিলেন না। মতিলাল ভাবিল, “সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও মামা কি একটা কথাও বলিতে পারিলেন না, অদ্যকষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমাকে এতই পর মনে করিলেন? মাতুল ও ভাগিনেয়ের মধ্যে গভীর বিচ্ছেদ ঘটিল।”

কষ্টে ও দুঃখে মতিলালের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু সে বন্ধু বাস্তবগণের নিকট তাহার কষ্টের কারণ ব্যক্ত করিল না। এখন জীই তাহার একমাত্র বন্ধু, সখী, অমাত্য, স্নেহদ, —সব। হৃদয় যখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর একখানি কোমল হৃদয়ের মধুর সহায়ত্ব এবং নীরব যাতনাই লাভ করিতে ইচ্ছা হয়; মতিলালের পক্ষে তাহার অভাব হয় নাই। মতিলাল যখন তাহার জ্বর স্বরূপে মস্তক রাখিয়া আবেগভরে বলিল, “অন্ন না, আমি আজই কাজ কর্মের সন্ধান বাহির হইব, কিন্তু হায়, তোমাকে বেশী দিন না দেখিয়া বিদেশে কেমন করিয়া থাকিব?”—তখন সোনামুখী তাহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়-বেগ কষ্টে সংবরণ করিয়া বর্জালঙ্কৃত দুখানি কোমল করপল্লবে স্বামীর অবনত মস্তক বুক চাপিয়া ধরিল, এবং বিরাট-কোমল দৃষ্টিতে তাহার মুখের

দিকে চাহিয়া বলিল, “এখন দিন কত এখানেই থাক, এমন মন লইয়া বিদেশে যাওয়া ভাল নয়। আমি এখন তোমাকে কিছুতে ছাড়িব না।”

কিন্তু কেন বলা যায় না, মতিলালের উপর স্বাভাবিক আদরও যেন কমিয়া আসিতে লাগিল। হয় ত তাঁহার মনে হইয়াছিল, জামাতার হাকিম হইবার ক্ষমতা থাকিলে সে আমার সঙ্গে কগড়া করিয়া তাঁহার ক্ষেত্রে ভর করিবে আসিবে কেন? অতএব এক দিন তিনি নিঃসঙ্কেচে পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, “ভাত হইয়াছে, মতিকে উপর হইতে ডাকিয়া আন।”

কামিনী বি অবিলম্বে দোতাকর্য্য সম্পন্ন করিল। নিজের প্রতি তখন পর্যন্ত মতিলালের অগাধ বিশ্বাস, সুতরাং মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং ক্রয়গলে বথেষ্ট বিরক্তির সঞ্চার করিয়া বলিল, “কেন, এখানে?”

বি বিদিত করিল, বামুনঠাকুর নীচে ভাত ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, মার শরীর খারাপ, দিদিমণিও ভাতের খালা টানিতে অসক্ত।

বাস্তবিক সে দিন সোনাখুঁধীর বড় অরুচি। কিন্তু নীচে গিয়া আহার করিয়া (অবশ্য স্বস্তরবাড়ীতে) মতিলালের কখনও অভ্যাস ছিল না, সুতরাং এই অনভ্যাসের কার্য্যে কেহ তাহাকে রাজী করিতে পারিল না, ত্রাশি দশটার সময় সোনাখুঁধী ক্লাস্তদেহে কাঁপিতে কাঁপিতে খালা হাতে করিয়া স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। মতিলালকে আহ্বানের ক্ষমতা অনুভব করিলে সে বলিল, তাহার ক্ষুধা নাই। সোনাখুঁধী তখন স্বামী বক্ষস্থলে তাহার অরুচির উদ্ভূত লগাটখানি স্থাপিত করিয়া রুহিল, “জবে এত ক্ষণ উঠিতে পারি নাই, তাই ভাত আনিতে বিলম্ব হইয়াছে, রাগ করিরাছ কি?”—মতিলাল সম্মুখে সোনাখুঁধীর অসংযত চূর্ণকুস্তলরাশি দীর্ঘ দীর্ঘ স্থানে বিস্তৃত করিয়া বলিল, “তোমার অস্থখ হইয়াছে, কেন কষ্ট করিয়া ভাত বহিয়া আনিলে?”—সোনাখুঁধী উত্তর করিল, “তা হোক, আমার অস্থখের জন্য তোমার খাওয়া বন্ধ হইবে? তুমি ওঠ।” মতিলাল জীর অরুচির অগ্রাহ্য করিতে পারিল না।

স্বস্তরবাড়ীতে প্রতিদিন আদর করিতেছে, মতিলাল যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এমন নহে, কিন্তু সোনাখুঁধীর গভীর ঘোহ সেই অনাদরকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখিত, সোনাখুঁধী সমস্ত বুঝিতে পারিত। এবং তাহার একটুখানি হৃদয়ের সমস্ত ব্যর্থ দিয়া স্বামীর পরিচর্যা করিত।

এক দিন বাত্রে সোনাখুঁধী রন্ধনশালায় গিয়াছে, তাহার যে বিশেষ কিছু

আবশ্যক ছিল, তাহা নহে। স্বামী জীতে মধ্যাহ্নে কথা উঠিয়াছিল, সে কালে মেয়েরা কেমন ভাত ব্যঞ্জন রাখিত, এবং রন্ধন ভাল হইলে আপনাকে কত সৌভাগ্যবতী মনে করিত, কিন্তু এ কালের মেয়েরা বড় বাবু হইয়া পড়িয়াছে, গা ধুইতে, চুল বাঁধিতে আর নভেল পড়িতেই তাহাদের সমস্ত বেলা কাটিয়া গিয়াছে। সোনামুখী বিছানার উপর সেকোপে উঠিয়া বসিল, দুই হাতে স্থলিত হইয়া জড়াইতে জড়াইতে বিস্ফারিতনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, “আচ্ছা, আমি রাখতে পারি কি না, আজ তা দেখতে পাবে—সেটা কি এতই শক্ত কাজ?”

ব্যঞ্জনাদি রন্ধন শেষ হইলে সোনামুখী বলিল, “মা, এক বার ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা দাও তো।”

মা উত্তর দিলেন “চাবী কি হবে?”

“চাট্টি বালাম চাল নোব।”

মা বলিলেন, “রাতে আর বালাম-চাল রাখবার দরকার নেই।”

সোনামুখী আর কোনও উচ্চবাচ্য করিল না। স্বামীর জন্য চাট্টি বালাম চাউল রাখিবে, তাহাতেও মায় আপত্তি! ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী হতাদর হইতে পারে?—হুঃখে অভিমানে বালিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু আজ তাহার অভিমান করিবার সময় নহে।

কামিনী কি তাহার চোখে জল দেখিতে পাইল, কিন্তু কারণ বুঝিল না, তাই হাসিতে হাসিতে বলিল, “কি গো দিদিঠাকুরণ, উনোনের ধুমোতে যে চোক দিয়ে জল বেরিয়ে পড়লো, সাধ ক’রে কি এমন বেড়ী না ধরলেই নয়?”

সোনামুখী অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিল, “যা, আর আলসিনে, ছোটো পয়সা দিচ্ছি, এক দৌড়ে হু পয়সার বালাম চাল কিনে এনে দেতো।”

কামিনী বেন আকাশ হইতে পড়িল; বলিল, “কেন, এ আবার কি রকম রং। ভাঁড়ারে ত বালাম চালের অভাব নাই।”

সোনামুখীর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, “তা থাক, রাজার ভাঁড়ারে টাকা কড়ির অভাব নেই, তাতে গরীবের কি?”

কামিনীর বিষয় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল—সে ব্যগ্রভাবে বলিল, “হ্যাঁ গো, দিদিঠাকুরণ, এমন কথা বলছো কেন?—তোমার মুখে কখন ত এমন কথা শুনি নি।”

মাতার কঠিন কথা সোনামুখী কিছুতেই দাসীপ নিকট প্রকাশ করিল না,

বুঝি আর কেহ হইলে সে কথা বলিয়া কেলিত ; কিন্তু সোনামুখী বড় চাপা মেয়ে ; তাহার আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া কামিনী বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়া দিল ।

বন্ধনশেষে সোনামুখী স্বামীর জন্ত অন্ন বাঞ্ছন লইয়া তাহার শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইল । স্বামীর চাউলের কথাটা মতিলাল শুনিতে পাইয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে সে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিতেছিল, দারিদ্র্যের মর্শ্মভেদী বহুগা মনে করিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল । সোনামুখী আহ্বারার্থ ডাকিলে মতিলাল বলিল, “আমার অসুখ হয়েছে, কিছু খাব না ।”—কিন্তু বুদ্ধিমতী জীর নিকট তাহার এ ছল নিষ্ফল হইল । সোনামুখী মতিলালের কপালে, বুকে হাত দিয়া বলিল, “না, কিছু অসুখ হয় নি, আমার মাথা ঠাণ্ড—উঠে চাউল খাও ।”

মতিলাল কিছুই খাইল না, সোনামুখীর সাধের রান্না ভাত ব্যঞ্জন শুকাইতে লাগিল, সোনামুখীও অনাহারে স্বামীর পাশে শুইয়া পড়িল ; দুঃখে কষ্টে তাহার বুক ফুলিতে লাগিল, মতিলালও গভীর চিন্তায় মগ্ন—শুধু এক একটি উচ্চ দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছিল । রাত্রি অনেক হইয়াছিল, ক্ষুদ্র গ্রাম নিঃশব্দ, সকলেই নৈশ আহার শেষ করিয়া নিরুদ্বেগচিন্তে নিদ্রার জোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল, শুধু একটি অট্টালিকার নির্জন কক্ষে এই শাস্তিহীন ব্যথিত দম্পতি বিনিমিত রজনী অতিবাহিত করিতেছিল ; দুজনের কাহারও মুখ দিয়া একটিও সাফল্যের কথা বাহির হইল না ।

মতিলাল এতদিন সহিয়া আসিয়াছে, আর অধিক সহ্য করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল ; অর্থোপার্জননের চেষ্টার বিদেশে বাইবে, স্থির করিল । গোপনে সমস্ত দিন বিদ্যারের আরোজন করিয়া মতিলাল জীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণের জন্ত সন্ধ্যাকালে স্বস্তুরবাড়ী চলিল ।

বৈশাখ মাসের সন্ধ্যাকাল । মতিলালের স্বস্তুর ভবানীচরণের অট্টালিকার সম্মুখে কপোতাক্ষ অলস শ্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, মাঝিরা নদীতীরে নৌকা বাধিয়া কোনও নৌকার গান আরম্ভ করিয়াছে, কোনও নৌকার রন্ধনের উত্তোষ করিতেছে । নদীর অপর পার হইতে দুই এক ধানি নৌকার ক্ষীণ আলোক নদীবক্ষে পড়িয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন ধানিকটা যায়গা দইয়া জলে আঙুন লাগিয়াছে ।

একখানি ভাড়াটে গাড়ী ‘থন্ থন্ ছন্ ছন্’ শব্দে রাজপথ ধ্বনিত করিয়া

বাজারের দিকে ছুটিয়া চলিল; মতিলাল স্বপ্নের অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিল।

ভিতর হইতে কি জিজ্ঞাসা করিল, “কে?”

মতিলাল অমুচ্চস্বরে উত্তর করিল, “শ্রামলাল বাড়ী আছ?”

মতিলালের স্বাণ্ডী বলিলেন, “মতি বুঝি, বল, শ্যাম বাড়ী নেই।”

মতিলাল বলিল, “তা হ’লে এখন যাই।”

কামিনী ভিতর হইতে বলিল, “দাদা বাবু এলে বোলবো, আপনি তাঁ’র খোঁজ কচ্ছিলেন।”

মতিলাল আর কোনও উত্তর করিল না। ঘরের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া রাস্তার ধারে একবার বসিল; পূর্বকথা সকল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইল, সে বাড়ীতে থাকিলে স্বপ্নরালে প্রবেশের পূর্বে সন্ধ্যার সময় কোনও দিন দরজা বন্ধ হইত না, এবং যদি দৈবাৎ কখনও তাহা বন্ধ হইত, তবে তাহার সাড়া পাইবামাত্র দ্বার খুলিয়া দিবার ক্ষণ পাঁচ মনে ছুটিয়া আসিত। হয় সে দিন!

মহা হউক, অতীত স্বপ্নের কথা মনে করিয়া ব্যথিত হওয়া বুধা,—“আর দেখা হইল না, যদি আবার ফিরিয়া আসিতে পারি দেখা করিব”—এই ভাবিয়া মতিলাল উঠিল; দুই পদ অগ্রসর না হইতেই ‘বন্’ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল, মতিলালের সে দিকে ফিরিয়া চাহিবার ইচ্ছা ছিল না, বোধ করি তখন চিন্তা-শ্রোত তাহার অতীত জীবনের উপর দিয়া ভীতবেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

কিন্তু তাহার চিন্তা সহসা অর্ধপথে অবরুদ্ধ হইল! চারিগাছি মলের মৃদু শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সোনামুখীর কোমল করতল তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল; সোনামুখী নিতান্ত ক্রুণ ও ব্যথিত স্বরে বলিল, “ওগো যেয়ো না, শোন।”

সেই অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া মতিলাল রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “এখনো ফিরিতে বলিতেছ? কোথায় ফিরিব, তোমার পিতৃগৃহে?—আজ তাহার শেষ। তোমার কাছে শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু হায়, পথে দাঁড়াইয়া বিদায় লইতে হইল। বহুদূরে যাইতেছি; কবে ফিরিব, জানি না। ঈশ্বর বেন তোমাকে সুখে রাখেন, তোমার অযোগ্য, প্রবাসী স্বামীর কথা কখনো কখনো মনে করিও।”

সোনামুখী অবনতমস্তকে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; অন্ধকার না হইলে

মতিলাল দেখিতে পাইত, সোনামুখীর চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই উচ্ছ্বসিত অশ্রু আত্মগোপন করিতে পারিল না, মতিলাল হই হস্তে তাহার হই হাত ধরিয়াছিল, অশ্রুধারে মতিলালের হাত দুখানি ভাসিয়া গেল।

মতিলাল স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “সোনামুখী, কাদিতেছ ? তুমি বাহাতে অশ্রুধী হও, এমন কোনও কাজ ত আমি করি নাই।”

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সোনামুখী উত্তর করিল, “তাহা জানি, আমার জ্ঞান তুমি অনেক সহিয়াছ ; হতভাগিনী আমি নিজের স্বপ্নের জন্ত তোমাকে অশ্রুধী করিয়াছি ; কিন্তু আমি আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিব, স্থির করিয়াছি।”

মতিলাল পত্নীর হই স্বপ্নে হস্তার্পণ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সন্নিহনে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি করিতে চাও ?”

সোনামুখী তাহার স্পন্দমান হৃদয়ের সমস্ত সাহস একত্রিত করিয়া সংক্ষেপে উত্তর করিল, “তোমার সঙ্গে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিব। এত দিন বন্দিতে পারি নাই, কিন্তু আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে ; যেখানে তোমার অনাদর, সেখানে আমি আদরের ভিখারিণী নহি। সংসারে অনেক অনাথ দরিদ্রের স্থান আছে, আমার দেও স্থান হইবে। চল, আর বিলম্ব নহে, আমার যাহা কিছু সম্বল আঁচলে বাধিয়া লইয়াছি।”

“বাড়ীতে সকলের কাছে একবার বিদায় লইবৈ না ?”

“ভগবান যদি দিন দেন, আবার আসিয়া লইব, এখন তার সময় নয়।”

স্নেহ ও প্রশংসার মতিলালের বক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হৃর্ভাগ্যের নিম্নতম সোপানপ্রাপ্তে দাঁড়াইয়াও আজ তাহার মুহূর্তের জন্ত মনে হইল, জগতে তাহার অপেক্ষা অধিক সুখী কেহ নাই। স্বামী জীর প্রেম এবং স্ত্রী স্বামীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া সেই অন্ধকার নিশীথে সংসারসমুদ্রের আবর্তের মধ্যে বাঁপাইয়া পড়িল।

উভয়ে একবার নক্ষত্রবর্ষিত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিল ; আকাশ মেঘনিম্নজ, নদীর বক্ষ দিয়া বায়ুপ্রবাহ হ হ স্বরে বহিয়া বৃক্ষশাখা কম্পিত করিতেছিল, অদূরে বনাস্তরালে শৃগালের দল একবার চীৎকার করিয়া নিবৃত্ত হইল, এবং নদীরক্ষে তরঙ্গীয়তা হইতে দিবসের পরিভ্রমে শ্রান্ত দাঁড় মাঝিরা তখনও প্রান গাহিতেছিল। মতিলাল জীর হস্ত ধরিয়া সেই অটালিকার নিকট হইতে ধীবে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিল, কেহই তাহা দেখিল না। শুধু একদি

দীর্ঘনিশ্বাস সেই অট্টালিকার প্রান্তে একটি বালিকার ব্যথিত হৃদয়ের গভীর কাতরতা নৈশ-প্রশান্তির মধ্যে বিলীন করিয়া দিল, এবং একটা জেলে একাকী বাসজালে মাছ ধরিতে ধরিতে অন্তমনে গাহিয়া উঠিল :—

“মান কবে চলে যেরো না সখা,

ওগো সখা কিরে এস।”

নিদাঘের ডালি।

গুমটু।

এক খণ্ড সেবা আমি চেয়েছে গগনে।
রৌদ্র নাই, তবু এ কি পরাণের ছালা,
আন চান কবে প্রাণ।—এই মাছি গুলা,
ভন্ ভন্ করি উড়ে বসিছে বদনে।
(মোতালের মুখে যেন।)—এত সম্ভরণে,
ভালবাস্তে সুতমুহ এত যে ব্যজন,
সকলি বৃথাই হয়। প্রাণের সবসে
কে যেন কবিতা গেছে বৃষ্টিক-দংশন।
গা'মোছা ভিজিয়ে আন; দেবিছ না দেহে
বহিতেছে ঘর্ণ, যেন প্রাণের ধারা?
ভেলে গুলা জ্বালালে যে; হাততালি দিয়া,
বারম্বার কবে গোল, উদ্‌ঘোর পাখা!
গুমটে মরিয়া গেছে চড়াই-শাবক—
টানিছে চীৎকার শব্দে তাহার পালক।

পিপাসা।

কি দারুণ তৃষা! বসি জলের কঁজার
ভাকে কাক, বরটাও তৃষাসমাকুল,
বসে গিষা সেই জলে; গীরুগিটি-কুল,
মার্জারের বর্ষবিন্দু মহা হুখে ঝার।
কি আশ্চর্য্য অতঃপব?—ছন্দ দবশনে,
পোকা ঝুকি চিবকাল আতকে শিহরে;
আজি কিন্তু সেই ছন্দ মহাসমাদবে
করে পান; দেখ দেখ, মুক্তিত লোচনে,
কি কবিছে অ-বষণ গৃহের কুঁজুর।
লেলিহান জিহ্বা ওব; ধুক ধুক কবে,
কীণ বন্ধ—রেলব্রতী ঘোর ভূবাকুর,
“পানিপাড়ো, পানিপাড়ো” বলি সক'তবে,

হব বখা দাস্ত;—দেখ, নির্বাক হইয়া,
অবসন্ন হুঁহুটি পড়িল ওইয়া।

স্মান।

ছুটিবাব আজি আমি কবিবাহি যান;
তবুও এসেছি পক্ষে, তোমার সকাশে।
নিদাঘের তীব্র বোড়ে দাববন্ধ প্রাণ
মুঞ্জরি উঠুক দেবি তোমার পরশে।
মদিদীপ্ত তোমার এ তরঙ্গ-আরাসে,
তরঙ্গের উপাধানে করিয়া শরন,
অপূর্ণ উচ্ছ্বাসে চকু মুদে মুদে আসে;
জলের তরল শব্দে বিহ্বল জীবন।
সুখের এ বিহ্বলতা!—হরজটা মাঝে,
ভাবানী-ক্ষুণ্ণ-ভঙ্গী উপহাস কপি,
আনন্দে বিহ্বল হয়ে তুমি মা শঙ্কবি,
করিতে বিহার, বখা উলঙ্গিনী সাজে।
কিষা বখা হবজালে, হাসি নব শলী,
চাহিত অবাক হয়ে, হে হব-কপসি।

এই।

এই বাধা ঘাট, এই সরসীব জল,
এই কুলে কুলে আহা প্রদোষ বিহানে,
কামিনীবি চড়াহাড়ি; অশব্দেব তল;
গ্রাম্যাদেবতার পূজা তরুর বিতানে,
দোপানের নিম্নে এই শৈবালের দল,—
উছলে পিছলে কেহ পড়ে বায় যদি,
এই বামা কর্তে উচ্ছে পবিহাস ছল,
“আর সই জলে নাহি”, মধুব ভাবতী;
এমো ও বিধবা নিম্নে, সলিলে ডুবিয়া,
আনন্দে মগন হয়ে, উঠিতে না চায়,

অঞ্চলেব্ জ্বলে কুসুম সফরী ধবিরী,
বালক বালিকা জলে ছুটিয়া বেড়াই।
এই স্থনীতল চিত্র, হেথিবা হেথিরা,
নিদাধার্তি আঁখি মোর গেল জুড়াইয়া ।
ঐশি ।

মেঘদূতে পড়িয়াছি—চোখ সেধ আসি,
(বাতায়ন দিয়া পশি) মেঘালেব গায়ে,
চিত্রগটে দেব ভ্রষ্ট কলঙ্ক সাধায়ে ।
তেমতি চোরের নত, থুলা এক রানি,
হৃৎকেননিন্ত এই শয্যাটি আমার,
কবে দিল মসীতুল্য ; প্রিয়াব মশনে
লাগাইয়া দিল শিশি ; সযজ্ঞে বামাব
অঞ্জলি লাগানে দিল খঞ্জন-নয়নে ।
বুদ্ধ মৌলবী সাহেবের যেত স্মৃতিবাজি,
দ্বিবিড় কৃষ্ণ কলপে কবিল বজ্জিত ।
ভাঙ খেয়ে, দবোয়ান, ভোলানাথ সাজি
ছিল-বসে ; “মস্ত” হাথে আবস্তিল গীত—
“স্বন্দর চুনরী !—হবি হরি বহিরা !
ভরি পাচ কাবি হবি, হোবি মচায়া ।”
প্রীতের ফল! প্রভৃতি ।
উপেন—লুকাট, লিচু পেপে, আকু শশা,
বা পাও কিনিয়া এন ; আজিকে দশমী ।
সসনার তুষ্টিকব খরসুত্র লাল সি,
অবশ্য আলিও তুমি ; দখিব দুর্দশা
মেধ, মেধা—ইহা হ’তে যোল ও আমানি

স্বখাচ্ছ ; (বড়-বউ পাতিয়াছে বুঝি ?)
এক রাশ তেঁতুল ঢেলেছে চোক বুজি,
তাই বলি ব্রজে এল কোন্ গোয়ালিনী ।
ছুইটি কুলি বরফ, হযে গেল পাখ,
রাণী বলে “আরো দাও” । বেদানার বস,
সে ববং ছিল ভাল, এ বড়-বিষম ।
জলের উপরে কোঁক হযেছে উহার,—
ধব্ ধব্—নাশটিরা ধরেছে হুবাঈ ;
বালিকা বড়াই নয় ; বালিকা-বালাই ।

কোয়ারা ।

উদ্যানের মালী কোঁধা? এখানে আসিয়া,
খুলে দিক্ এক বাব জলেব কোয়ারা ।
কি বিচিত্র দেখ দেখ । পরীমুখ দিরা,
ছুটিছে তরল নিক্স আলোকের ধারা ।
শত ইন্দ্রধনু যেন স্থজিবা স্থজিয়া,
পবী কবে ভোজবাজী । কুসুমে, পদ্মে,
তুল শাপে, শুক প্রাণ উঠিল আনিয়া ;
অঙ্গুরী-নুপুর ওই বাজিছে হুববে ।
শুন, শুন, কাণ পাতি ; নদীকল্লাগণ
কেহ নাচে, কেহ গায় ; মধুব এপ্রজ্ঞে,
সেতারে আঘাত পড়ে ; কেহ মাঝে মাঝে,
গদগদস্বরে করে সলাজে চুঘন ।
আজুব হযেছে প্রাণ ? তুখা কর দ্বব,
গিবে এ সঙ্গীত হুখা ; মধুব । মধুব ।

প্রীদেবেত্রনোথ সেন ।

সহযোগী সাহিত্য ।

সাহিত্য ।

প্রথম পুস্তক ।

স্বাধীনতা জন গ্রন্থকারের গ্রন্থ পুস্তকের রচনা ও প্রকাশের বিবরণ একত্র প্রকাশিত হই-
রাছে । ব্যাপারটা কতক নূতন । প্রথম পুস্তকের প্রতি প্রণেতার প্রবল স্নেহ থাকে । প্রথম
পুস্তক অর্ধে অনেক স্থানে প্রথম প্রকাশিত পুস্তক,—এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ সাহিত্য
ব্যবসার ও রচনা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা কহিয়াছেন । আমবা কয় জনের কথাব সারোদ্ধার
করিয়া দিলাম ।

ব্রেটহার্ট ও বডিবার্ড কিপলিং কবিতাদংগ্রহ লইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হইয়া-

এই দুটি গ্রন্থ হিন্দুস্তানী-স্থরে পাঠ কবিত্তে হইবে ।

ছিলেন। কিংলিং তখন 'ভাবতর্ক' সংবাদপত্রের সম্পাদক—পুস্তক খানা সেই সংবাদ-
 পত্রের প্রেসেই মুদ্রিত। ব্রেটহার্টের পুস্তক কতকগুলি 'কালিকর্নিবান'
 চিন জন। কবিতাসংগ্রহ। তাহা সংবাদপত্রে অতি তীব্র সমালোচনা বহু জ্বালা-
 ইয়াছিল। একটা খেলো রজ্জব বায় লইয়া একটি শিশু বস্তু ছুটিজ আঁকিতে আঁকিতে
 হুঃস্থানের প্রথম প্রস্থের উৎপত্তি।

এই সকল লেখকের কথাব মধ্যে একটা বিষয়ে আর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অনেকেই অল্প
 বয়সে হিজিবিজি কাটিয়াছেন, প্রার্থে ছুই একটা ছোট গল্প লিখিয়াছেন ও প্রকাশের পূর্বে
 প্রাবত্তে। ছুই এক খানা বাজে উপস্থাপন বচনা কবিয়াছেন। প্রকাশক 'শাকডান'
 বড় ছুফর ব্যাপার, তাই অনেকে তাঁহাদের উপর নিবন বিরক্ত।

কিন্তু দেখা যাইতেছে, অনেকে বলেন যে, তখন তাঁহারা যে উপদেশ গ্রহণ করেন, তাহা
 নব্য লেখকের ভাষা না লাগিলেও মোটের উপর বড় ভাল। ব্যবসার হিসাবে সাহিত্য দর্শন,
 সাহিত্যসেবীর উপর সাহিত্যের প্রভাব ও সাহিত্যসেবীর সাংলোভ্য কাব্য, এই সকল
 বিষয়ে লেখকদিগের মধ্যে বড় মণ্ডভেদ দৃষ্ট হয়। জন কয়েকের মতানুসারে এদিক হইল।

মিষ্টার বেসাট বলেন যে, একখানা মাঝারি গোচের উপস্থাপন লিখিতে হইলেও অন্তর
 নকল ছাড়িতে হয়, আপনি সব দর্শন কবিতা হয়, জীবন্ত সত্য নকল সর্বদা অধ্যয়ন
 কবিতা হয়, সাধারণ ধারণার বাহিরে যাইতে হয় ও মানবজাত্যের
 কেন্দ্র উচ্চ বৃত্তির উপর নির্ভর কবিতা হয়। অল্পদণ্ডে উপস্থাপন
 বেসাট।

সাক্ষাৎকারের প্রধান কাব্য এই সকল জ্ঞান দর্শন ও অধ্যয়নের প্রভাব। একজন মানবকে
 কেরন করিয়া অধ্যয়ন কবিতা হয়, তাহা আমবা বৃষ্টি না।

মিষ্টার গ্র্যাট অ্যালেন বলেন যে, ইংরাজ উপস্থাপনলেখককে ইংরাজের বিশ্বাস ও বাসনার
 পদতলে আপনাব কল্পনা, রুচি ও মত বিসর্জন কবিতা হয়। বাধ হই, বৈজ্ঞানিক উপস্থাপ-
 নেব প্রথম প্রকাশকের অভাবই এই মতের কাব্য। কুমারী কোরিল বলেন যে, তাঁহাব সাক-

চাষি জন। লোব কাব্য,—কিছু মাত্র না ভাবিয়া একেবারে আপনাব হৃদয়ের কথা
 প্রকাশ করা। মিষ্টার গ্র্যাফি উইল বলেন যে, সাংলোভ্য বস্তু কিছু

বুদ্ধি, পবিত্রত্ব, আপনাব বড়, আপনাব সমান ও সমালোচকদিগকে অসম্মান কবিবার মত
 কতকটা গর্ব ও সাধারণ পাঠক কি চাহে, তাহাই জানা চাহি। মিষ্টার বুকানন বলেন যে,
 সাহিত্যে আদব ও পবিত্রত্বের প্রয়োজন, সর্ববিষয়ে সম্মানের প্রয়োজন এবং সে জন্ত হৃদয়
 মতের বড় প্রয়োজন।

ব্যবসারের হিসাবে সাহিত্যসেবা সম্বন্ধে লেখকদিগের মতে বড় অনৈক্য দেখা যায়।

গ্র্যাট অ্যালেন বলেন যে, বাহ্যিক হাতে কিছু অর্থ আছে, সে যেন এমন কাজ না করে। কিউ
 সাহিত্য-ব্যবসায়। (৩) বলেন যে, সাহিত্যসেবা করিয়া তেমন অর্থলাভ হয় না, ভবেন্তিনি

মহব ভাল বাসেন না, সাহিত্যব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পন্নীগ্রামের
 স্কুল বায় সেবনে সমর্থ ও প্রতিদিন প্রভাতে দ্বিগুণের দৃশ্য দর্শনে সমর্থ বলিয়াই ঐ ব্যবসায়
 ভাগ করেন না।

মিষ্টার হল্‌কেন বলেন যে, সাহিত্যসেবা সহজসাধ্য সাধন নহে। কোনও দেশে বা কোনও
 সমাজে ইহাব সম্ভব লক্ষিত হইবার কাব্য নাই। ইহাব সম্ভব হৃদয়ের সমস্ত ক্ষমতাব প্রয়োজন

ইহা প্রতিভা এদীর্ঘ করে, বহু বর্জিত করে, এবং সেবকে আনন্দ
 হল্‌কেন। করে, ও শাস্তি দান করে। ইহাব সম্ভব অত্যন্ত শ্রম আনন্দক, কিং

ইহাতে ক্ষমতাবর্দ্ধিত হয়; কাজেই তিনি কোনও প্রকাষেই এই সাহিত্যব্যবসায় পবিত্র্যাস বরিতে সম্মত নহেন।

সাহিত্যসেবকের উপর সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে মিষ্টাব বুকানন বড় বিষম কথা বলেন। তিনি বলেন, সাহিত্যসেবার সেবকের অবনতি হয়; ইহাতে সহানুভূতি কমিয়া যায় ও বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু মিষ্টাব জীবোম বলেন, সাহিত্যের প্রভাব।

কেবল সাহিত্যসেবাতেই মানব আপনার বুদ্ধিব্যবসায় চালনা কবিত্তে পায়। যদি বাহিরেব কিছুতে মানব সাহায্য পায়, তবে সাহিত্যসেবা লোককে বলদান করে ও পবিত্র করে।

হেনরি উড ।

"লিসার আওয়ার" পত্রে, মিষ্টাব জ্যাপ, প্রসিদ্ধ দ্রা-ঔপন্যাসিক শ্রীমতী হেনরী উডের বিষয় কিছু লিখিয়াছেন, সেই প্রবন্ধ হইতে আমরা কবচি বিষয় সংগ্রহ কবিয়া দিলাম।

শ্রীমতী হেনরি উডের "ইষ্টলিন" নামক উপন্যাস ইতিমধ্যেই তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক—তবে তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের মত ইহাও উল্লেখ্যপূর্ণ উপন্যাস। শ্রীমতী হেনরি উডের কুমারী নাম এলেন আইস; যে বৎসব

ইষ্টলিন।

ভীষণ শীতে টেমস জমিয়া গিয়াছিল, সেই ১৮১৪ খৃষ্টাব্দেব ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ওরটাবে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মিষ্টাব টম্যাস আইস একজন ধনী দত্তানা-নির্মাতা ছিলেন। বৃহৎ গির্জার, সন্নিহিতেই তাঁহার পৈতৃক গৃহ। সাত বৎসব বয়সের সময় এলেন তাঁহার ষষ্ঠ্যবয়স্ক বালিকাদিগেব সমান বিদ্যা-ভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি কবিত্তে পারিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সেব সময় তাঁহার মেকদণ্ডে কোনও পীড়া হইয়াছিল।

শ্রীমতী উড লিখিতে ভালবসিতেন; বালিকা অবস্থায় তিনি প্রবন্ধ, গল্প এবং শৈল্পীগীতাবেব অনুকরণে নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল প্রকাশিত হয় নাই।

ক্লাসে অবস্থিতিকালে তিনি "বেটলিস মিনুনেলি" ও "কোনবার্গস

সাহিত্য।

নিউ মাহলি ম্যাপাজিন" পত্রে গল্প লিখিতেন। শেষ কালে ঈর্ষ না পাইলে আব লিখিবেন না স্থির কুমার, বৎসরে ৬০ পাউণ্ড মাত্র পাইতেন। দশ বৎসব এই বলোবস্তাই ছিল। তাঁহার পব তিনি পদ্য রচনা ছাড়িয়া একখানি তিন খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস লিখিতে ইচ্ছা করেন।

সম্পাদক দেখিলেন, উপন্যাস প্রকাশ না কবিলে লেখিকাব বচনা প্রকাশের আশা ত্যাগ কবিত্তে হয়। "ইষ্টলিন" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল। পাঠকগণ সাগ্রহে তাহা

পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রত্নাকারে প্রকাশকালে মেসার্স চ্যাপম্যান

উপন্যাস।

এণ্ড হল ইহা প্রকাশ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন তিন খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস মেসার্স বেটলি কর্তৃক প্রকাশিত হইল। নানাদেশে এই গ্রন্থ বিক্রীত হইতে লাগিল; এখনও কাটতি যথেষ্ট।

অনন্তর পুস্তকের পর পুস্তক প্রকাশিত হইতে লাগিল। কোনও কোনও খানা প্রাচীন "ইষ্টলিন" এর মতই বিক্রীত হইতে লাগিল। প্রথম পুস্তক প্রকাশের অল্প দিন পূর্বেই তিনি "লিসার আওয়ার" পত্রে একটি গল্প লিখিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বাধিবিবোধ হয়। তাঁহার স্বামী সংসারিক লোক ছিলেন। বধ্য হইয়া শ্রীমতী উড এক দিন জীবিতা ছিলেন, এবং সম্মানগণেব শিক্ষাবিধানে ও সাহিত্য-সবার সমস্ত সময় মতিবাহিত কবিতেন।

রাজনীতি ।

কংগ্রেস ।

এখন সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া যে একটা বাঞ্ছনৈতিক স্বপ্ন গঠিত হইতেছে—এক প্রান্তে আদিত্য গিলে, অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যথা জাগিয়া উঠে, তাহা কংগ্রেসের ফল। অনেক ইংরাজ কংগ্রেসের বিদ্রোহী। এই যে কংগ্রেসবিদ্রোহ,—‘সেন্ট এ্যান্ড্রুস ডিনাবের’ কোলাহল-মণ্ডিতে ইহা বীকশ, আর কতকগুলি রাজপুত্রের প্রসাদে ধানকতক ইংরাজী সংবাদ-পত্রের ভেঁড়ে ইহা প্রতিপালিত। প্রসিদ্ধ অসি ও মসীজীবী চেন্নী ইহা উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন—এখন লেখক মণ্ডের মহাধ্বজে অভিভূত। সেই আক্রমণের প্রতিবাদস্বরে “ল ম্যাগাজিন এণ্ড বিস্তিউ” পত্রে প্রকাশিত সাব বিচার্ড পার্থের প্রবন্ধের কোনও কোনও স্থানের সাবোদ্ধার কবিতা দিলাম। রাজালী পাঠকের বোধ হয় মনে আছে, সাব বিচার্ড বঙ্গীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি বলিতেছেন,—

গত কয় বৎসর ভাবতবর্ষীয় গভর্নমেন্ট যে সকল অন্ত্রায় অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তন্মধ্যে জাতীয় মহাসমিতির প্রতি কঠোর ব্যবহার তুলনার সর্বাপেক্ষা অধিক। বিলাতি সংবাদপত্র ও বিলাতি জনসাধারণকে আর কোনও বিষয়েই গভর্নমেন্টের দল এলাপ কংগ্রেসবিদ্রোহ।

ভ্রমে কেলিতে পারেন নাই। যে ভাবে তাঁহার মহাসমিতির উপর বিদ্রোহবারণ, তাহা সার জর্জ চেন্নির প্রবন্ধেই পিস্ফুটভাবে প্রকাশিত। চেন্নি ভাবত-বর্ষের একজন সম্মানিত কর্মচারী। তিনি বহুকাল ভারতগভর্নমেন্টের চাকরি করিয়াছেন, এবং কয়-বৎসর ব্যবস্থাপকসভার সভ্যও ছিলেন। তিনি গভর্নমেন্টের কার্যকলাপের সমর্থন-কারী, হতবাক তাঁহার মতামত গভর্নমেন্টের মতামতের সহিত মিলিবে, এ আশা করা যায়।

একটা জাতীয় জাতির জাতীয় স্বপ্নের আঘাত করিবার জন্য যতদূর তীব্র ও দহনকারী হইতে পারে, চেন্নির ভাষা সেইরূপ। তবে কালি, কলম, কাগজ পাইলে যাহা হউক কিছু লিখিয়া ছাপান বড় কঠিন কাজ নহে। তাঁহার মতে ভাবতবর্ষের সহিংসতার অভাব।

লোককোনও স্বাধীন ব্যাপারের উপযোগী নহে। সে বুঝি কেবল জন-বুলের জুতা বুরুশ কবিতা, আর হুগল কল ধাইয়া তিনি আঁটি ফেলিলে তাহাই চুখিয়া বলিবে—‘কি মিষ্ট’! বোধ হয়, তাঁহার মতে মুজাযদ্রের স্বাধীনতা, ব্যবহারজীবীর স্বাধীন মত প্রকাশ ও রাষ্ট্রনৈতিক মতামত সাধারণে বিচার করিবার ক্ষমতা, ইংরাজশাসনের এই তিন দানও কাড়িয়া লওয়া উচিত। তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন যে, জাতীয় মহাসমিতি ভাবতবর্ষে সাধারণের নহে—একটি স্পিষ্টাডা ব্যাপার মাত্র। আর ইহার চালাকগণ আদালতের উকিল, কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র ও দেশীয় সংবাদপত্রের লোক—তাঁহারা অসার, মুখসর্বগ, বখা, এবং তাঁহার কোনকালে কোনও ভাল বিষয়ের প্রস্তাব করে নাই। ইহা লেখকের ইচ্ছাকৃত সত্যের অপলোপ বলিয়া বোধ হয় না। ইহা অজ্ঞতা ও সহিংসতার অভাব হইতেই উদ্ভূত।

সাব বিচার্ড বলিয়াছেন যে, তিনিও এক জন পাকা রক্ষণশীল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভাবতবর্ষে আগমনকালে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই গভর্নমেন্ট আদর্শস্থানীয়; কিন্তু প্রবল প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে সে মতের পবিত্রতন কবিতা হইয়াছে। দেখিতে হইবে, এই মহাসমিতির গঠনকারী কাহালা এবং গঠনকাবিগণ এই তীব্র বাগ্‌দাদময় উপহাসের উপযোগী কি না।—মহাসমিতির প্রস্তাব অধীকার কবা যায় না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে ইহা অধিবেশন হইয়াছে। দেশের সকল স্থান হইতে সভ্যনির্বাচন হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের অধিবেশনে জিগ লক্ষ লোক ১২৩৮ জন সভ্য নির্বাচিত করিয়া

ছিলেন। রাজা, নবাব, উচ্চাংশের বংশধর, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে জমীদার, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, ধর্মযাজক, সকলেই সভ্য ছিলেন। তন্মধ্যে গাঁহাবা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু ৯৬৪ জন, মুসলমান ২২২ জন, খৃষ্টান ৩৪ জন ও জৈন ১১ জন। এখনও কি বয়স, জাতীয় মহাসমিতির চালকগণ আদালতেব 'উকিল, কলেজ-ছাত্র ছাত্র ও দেশীয় সংবাদ-পত্রের লোক। সাব রিচার্জ বলেন যে, তিনি বলিতে পারেন, বঙ্গদেশদ্বন্দ্বের ও এ কথা মিথ্যা। এই চালকদিগের অনেকে গাঁহাব গৃহ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, এবং গাঁহাবা রাজ্যের নিকট সম্মানিত। বোধ হয়, চেন্নিও লাটভবনে গাঁহাবের অনেককে দেখিয়াছেন। ইংবা বিক্রমে ইংবাজের এই বাক্য; আমবা আর কি বলিব। জাতীয় মহাসমিতি যে, সৃষ্টি ছাত্র ব্যাপার, তাহা মিথ্যা কথা। কেবল গভর্নমেন্ট ইহা প্রতি বিকণ বলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ভাবত-বাসী ইহাতে যোগ দিতে অনবর্য। সমিতির লোকদিগের প্রতি চেন্নি যে ভাবাব প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সংঘ ও ক্রীলতার গীতা অতিক্রম করিয়াছে।

জাতীয় মহাসমিতির সভ্যগণ আপনাদের ও ভাবতসাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ অস্ত্র অধিনায়ক হইয়া চিন্তা করিয়াছেন এবং সেই সকল অস্ত্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশহিতৈষী।

হেন ও গভর্নমেন্টের বনস্তোষ বহন করিয়াছেন। যে সকল ব্যাপার ভাবতগভর্নমেন্টের কলঙ্ক এবং যে সকল ব্যাপার ভাবতে ও ইংলণ্ডে জন সধারণ কর্তৃক ঘৃণিত হইয়াও পবিত্র হইয়া, তাহাও সেই সকলের দোষ বোঝাইয়াছেন। গাঁহাবিগের প্রস্তাবিত অনেক সংস্কারকাণ্ড পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, এবং ভাবতগভর্নমেন্টকে দেউনিয়ার দ্বয়ে যেলিবার উন্নয়নী ব্যৱহাৰল্যেব নিদানগে গাঁহাবা সচেষ্ট। এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য গাঁহাবা নিদনীয়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থাপকসভার আইন জাতীয় মহাসমিতির কীৰ্ত্তি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই সমিতি ইলাব সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সমিতির নির্বক্ষাতিশয়েই মিষ্টার স্প্যাঙ্কটন এই আইন পান করেন। আবার সাব জর্জ চেন্নি এই কাণ্ডের প্রভাব ভাবতগভর্নমেন্টেই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবতগভর্নমেন্ট বর্তমান দিন সংস্কার।

সমস্ত ইহা প্রতিবাদ করিয়াছেন ও পরিশেষে কেবল পার্লামেন্টের আবও উদার সম্ভ্রান্ত বখাসমস্ত বনষ্ট করিবার প্রস্তাব ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবতীয় ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে দেখিতে গেলে পূর্বে বাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। গভর্নমেন্টের বাহা ইচ্ছা, তাহাই হয়। সে দিন ভূগাব উপর ক'ব প্রস্তাবে কি হইল। সকল নির্বক্ষিত সভা গভর্নমেন্টের বিপক্ষে মত দিয়াছিলেন। এবং কোন কোন কর্তৃপক্ষী সভ্যও বাধ্য না হইলে, তাহাই করিতেন। হায়। ইহা কি ব্যবস্থাপক সভা!

বিচার ও শাসন দুই বিভাগ গৃহক করিবার জন্য জাতীয় মহাসমিতি সচেষ্ট। দুই ক্ষমতা এক জনের হস্তে সম্ভ্রান্ত থাকায় যে অবিধা, গভর্নমেন্টও তাহা জানেন। অনেকেই এই অবিধার কথা বলিয়াছেন এবং লর্ড ক্রস ও লর্ড কিংসলিও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবুও ইহা গণিত হইল না।

তাহার পর ভারতবর্ষের দুর্দশার প্রধান হেতু সৈন্তবিতরণে অসম্ভব ব্যয় নিবারণ, পুলিশ, শাসনের সংস্কার, পঞ্জাবে ব্যবস্থাপকসভা সংস্থাপন, ইচ্ছা করিলে, গভর্নমেন্টের কয়েদীর সেনানে বিচার, "হোম চার্জ" সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান, কঠক জাতীয়তাভেদ, ব্যক্তিগত নিষেধ ও ভাবতবর্ষে দৈনিক বিদ্যালয়সংস্থাপন, জাতীয় মহাসমিতির এই সকল প্রার্থনা, শ্রাব্য ও উত্তম মন্দেহ নাই। সার্বিচার্ড এই সকল প্রস্তাবের সমর্থন করেন এবং জামেন যে, পত পত শিক্ষিত ব্যক্তিও তাহাই করেন। এই সমস্ত প্রস্তাবই কার্যকাণ্ডী সভ্য দট, তিনিও

জাতীয় মহাসমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সকল প্রস্তাবের সমর্থন করেন না । কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পরিচালকদিগকে অঙ্গ বলিতে পারেন না । ভাবতবর্ষে মিলিল সানিস পলীক্সগ্রহণ তাহার অভিপ্রেত নহে ; কিন্তু তথাপি পার্লামেন্টে সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছিল ।

দেশের লোকের দাণ্ডিত্যের কথা, সারু জর্জ চেসনি মহাসমিতির দোষ দিয়া বলেন যে, সমিতির লোকেরা বুঝেন না যে, এই জন্তই গবর্ণমেন্ট কয় বৎসরে তিন কোটির অধিক দেশের দাণ্ডিত্য অর্থে ব্যয় করিয়াছেন । কংগ্রেসকর্তারা কি ইহা জানেন না ? এই ব্যয়িত অর্থ তাহাদেব ও তাহাদের বংশীয়গণের । কেবল তাহারা প্রবললোকের মত মনে করেন যে, দেশীয়দিগের মত লইয়া এই অর্থ ব্যয়িত হইলে, অনেক উপকাৰ হইত । এখন অনেক অর্থ রূথা ব্যয়িত হয় ।

প্রবন্ধের উপসংহারে সার রিচার্ড বলিয়াছেন যে, জাতীয় মহাসমিতি সর্বতোভাবে বাজ-ভক্ত । মহাসমিতির সভ্যদিগের মধ্যে বাজভক্তির অভাব নাই, এবং মহাসমিতির কার্য ও বাজভক্তির সম্পূর্ণ পরিচালক । তাহার বোধ হয় যে, মহাসমিতির কার্য নিবারণ করা অনুচিত ; কারণ ইহা দ্বারা প্রজাসাধারণের মত গণ-মের্ত জানিতে পারেন । তাহার বিশ্বাস যে, জাতীয় মহাসমিতি মত কোনও সমিতি থাকিলে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিষম বিদ্রোহবস্থিতে বহু নবনাবীব ধ্বংস হইত না ।

সমাজনীতি ।

ভারতমহিলা ।

ভাবতবর্ষে আসিয়া কুমারী বিলিংটন "ডেলি গ্র্যাফিক" পত্রে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি ভাবতমহিলাসম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন, বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন যে, বাঁহাবানিতান্ত অঙ্গ হইয়াও নিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষের অধিবাসী-দিগের প্রয়োজনীয় বিষয়ে মহানতপ্রকাশ করেন, যদি তাহাদের কতকগুলিকেও বুঝান যায় যে, বাস্তবিক ভারতবর্ষে বসনীদিগের অবস্থা যেমন শুনা যায়, তেমন মন্দ নহে, তবে লেখিকার অসুসন্ধান পণ্ডিত হইবে না । তাহার কয়টি মতের সাবসংগ্রহ প্রদত্ত হইল ।

যে হিসাবে যুবোপে শিশুবাও সংসারিক ব্যাপারে অজ্ঞান, ভাবতে তাহা নহে । এখানে তাহা মনলভাবে জীবনের অনেক গুরুতর ব্যাপারের আলোচনা করে । বাস্তবিক নৈতিক শিক্ষা ।

অবনতি তাহার কারণ নহে, পরন্তু তাহা বা ঐ সকল বিষয় জানে বলিয়াই, ঐ আলোচনা দোষাগ্রহ মনে কবে না । কুৎসাপ্রিয়তা ঐ আলোচনার মূল নহে । জ্ঞানিরা এখন আব বাধ্যপ্রাপ্ত বা অনাদৃত নহে, সমাজ এখন তাহা সহ করেন । কিন্তু আবার তাহার জন্ত বিশেষ আগ্রহও নাই । ইংলণ্ডে যে সকল রমণী গির্জার বস্ত্র তা দেন, বা নুতন রকম বেশে দ্বিচ্ছ-রথ চালান, তাহাদেব অবস্থা যেমন, ভাবতবর্ষে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাদেব অবস্থা সেইরূপ, তাহা বা সাধারণ মহিলাসমাজ হইতে যেন একটু পৃথক । দেখা যায়, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টের জ্ঞানিত বিদ্যালয়ে ৩৯৯৪ জন বালিকা অধ্যয়ন কবে । চিকিৎসাবিদ্যালয় উপর মহিলাদের স্বৈক দেখা যায় । শিল্পশিক্ষা বালিকাদিগের আগ্রহ নাই বলিলেও চলে । বেঙ্গাইয়ে দুই চাষিটি পার্শ্ব বালিকা চিত্রবিদ্যা শিক্ষা কবিতোছে ও লেপিকাকে অঙ্কিত চিত্র দেখাইয়াছে । ভাবতবর্ষে খ্যাতনামা কোন মহিলা চিত্রকবি নাই । এদেশে ললিত কলাব বাস্তবিক বড় বিষম অনাদব ।

ভারতদেশে বিবাহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মহাদেশে মহাজ্ঞান মত প্রচলিত । ধর্মযাজকদিগের

ও সামাজিক ছিদ্রাঘেদনকারীদিগের বিবরণে প্রকাশ যে, পাঁচ বা ছয় বৎসরের সময় আগ-
 নাব অপেক্ষা বহু পরিমাণে যথোক্ত পুত্রদের সহিত বালিকার
 বিবাহ হয়। স্বামী তাহাকে বেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারে ও
 তাহার প্রতি অত্যাচার ও পাশবল প্রয়োগ করে। লোকের বিশ্বাস যে, এই পাণব-বলেব
 ফল সময় সময় কল্লনাভীত ভীষণ, সে সকল লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। ইহা মিথ্যা কথা
 বিবাহ কেবল বন্ধন; পত্নীর দৈহিক বিকাশ প্রায় পূর্ণ না হইলে, অর্থাৎ তাহার বয়সীয়ে
 পৌছবার পূর্বে, তাহাকে স্বামীর ঘর করিতে হয় না। আশু বিধাসেব বর্ণবর্তী হইয়া লোকে
 ভাবতবর্ষে বিবাহবিচারে ব্যাপৃত হয়।

বোম্বাইয়ে লেখিকা সহিত দুই জন মুসলমান বয়সীর সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই স্বামী
 স্থগিত—এক জন চাকুরি করেন, অপর জন ব্যারিষ্টার। অববোধপ্রথা দুব্বাকরণের কথা
 উহারা বলিয়াছেন যে, ইহা দুব্ব করা কেন? ইংরাজ-রমণীরা বুঝেন

অবরোধ।

না যে, ইহাতে কিছু অহুবিধা নাই। আলীর স্বপ্নের সহিত দেখা
 সাক্ষাতে ত আগন্তি নাই। সময়বদ্ধ জাতাবাও সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তবে অল্প ইংবা-
 জের মত চুপন চলে না। উক্তবংশীয়া রমণীগণ অপর পুত্রদের অঙ্গ স্পর্শ করেন না—সেটা
 কেবল অভ্যাসের ফল। পরপুরুষের উচ্চ-সিংহাসনে বসিতে না পাওয়ায় ত ইংরাজ-রমণী
 কোনও অহুবিধা বোধ করেন না। অবরোধপ্রথা দুব্ব কবিত্তে তাহাদের পতিষয়ের আগন্তি
 নাই; কিন্তু পতিই ভারত-সহিলাব সর্বত্র; অথাবোহিণে বা অগ্নে মহিলাদিগেরই মত নাই।
 তাহারা পারিবারিক সম্মিলনে গমন করেন ও বান্ধবীদিগের সহিত পরিচয় করেন। এ
 দেশের সামাজিক প্রথা কি নিষ্ফল? উহারা বলেন যে, উহাদের পরিবার ধরিলে উঠে
 বিংশতি পুত্র পর্যন্ত কোনও মহিলাই বয়সীর পবিত্র নামে কলঙ্ক লেপন করেন নাই।

লেখিকা বলেন যে, ভাবতবর্ষের সামাজিক জীবনের ইতিহাস হইতে উদ্ভবিত ফল
 প্রভাব বাদ দেওয়া অসম্ভব। ভাবতবর্ষের অন্তঃপুবে এখনও সর্বত্র কুসংস্কারপূর্ণ কুলজনক
 চিকিৎসা।

প্রভূত গণিবর্জন প্রবর্তিত হইয়াছে। রমণীদিগের চিকিৎসাবিদ্যা
 শিক্ষাব এক বড় অহুবিধা আছে, লেখিকা প্রথমে মাস্ত্রাজে তাহা অনুভব করেন। বিশ্ববিদ্যা-
 লয় মহিলাদিগকে পত্রীক দিবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু রমণীদিগের অধ্যয়ন বিদ্যালয়
 নাই। পুরুষও রমণী একত্র পাঠ করেন।

বুঝাঙ্গী প্রভাব যে হিন্দু সমাজের হৃদয়স্থল স্পর্শ কবিত্তে পারে নাই, তাহা প্রমাণ
 বিধবাবিবাহ। সামান্য লেখক হইতে মাস্ত্রাজের পর্যন্ত অনেকেই বিধবাদের দুর্দশার কথা

লিখিয়াছেন, তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে,—যদি জীবনো-

বিধবাবিবাহ।
 পাণ অর্জনে সক্ষম হইলে বিবাহ হয়, তাহারা সমাজের আত্ম-
 সম্মতময় লোক হয়, কিন্তু সকল চেষ্টাই ভ্রমে ঘুতনিক্ষেপ। অনেক অভাগিনী শৈশবেই
 বিধবা হয়, বিবাহের পর পতির সহিত সাক্ষাৎও হয় না। বিধবাবিবাহের ব্যাপ্তি জ্ঞাত
 আইন হইয়াছে, কিন্তু এখন বৎ বিধবাবিবাহের নিষেধ মতই সমধিক বল সঞ্চয় করিতেছে।

ইংলণ্ডের লোক ভাবতবর্ষে শ্রমজীবিনী রমণীদিগের অনন্ত। তলাইয়া বুঝে না। তাহারা
 প্রতিদিন দুই বা তিন আনা মাত্র উপার্জন করে, শুনিয়াই লোকে শিহবিধা উঠে, এবং মনে
 কল কাবখান।

করে যে, কারখানার স্বত্বাধিকারীরা মাসব্যবসায়ী—দেখিতে গেলে
 বুঝাঙ্গী শ্রমজীবিনী বয়সীর স্থখ কিছুই অধিক নহে। অল্প এক দিন
 কাবখানার আইনে রমণীদিগের পন্থে শ্রম করা নিষিদ্ধ হইবে। লেখিকা এক জন

কলিকাতাবাসিনী মুসলমান রমণীর সুখে আদর্শ দিয়াছেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া মুসলমান রমণী বলেন—পতিকে স্থায়ী দর্শন, বন্ধন ও কার্য্য তাঁহাব সম্ভাবনক হইয়াছে। বোধ হয়, পুত্রদিগকে সৎ ও বলবান দর্শন ও কস্তাদিগকে স্থাপ্তে অর্পণই তাঁহাব সুখের আদর্শ—এ আদর্শ পর্ত্তহীন ও প্রশংসনীয়।

বোম্বাইয়ের বৃহৎ কাপড়ের বাজারে ম্যানচেষ্টার ও জার্মেনি বস্ত্র দেখিবা মনে হয়, িদেশীয় শিল্পে দেশ ছাইয়া কেলিবাছে। চেষ্টা সত্ত্বেও ভাবতবর্ষের তত্ত্বাবধ রুরোপের বৈজ্ঞানিক কল পাষাণ; কালেই বিদেশীয় শিল্পের বিধাত্ত প্রভাবে তাহাদেব বিদেশীয় শিল্প। সর্বনাশ হইতেছে, এবং বিদেশীয় বস্ত্রনির্মাণকারীদের জন্ত এত দিন গভর্নেন্ট ভাবতবর্ষে কারখানার সম্বাদিকারী ও শ্রমজীবী উভয়কেই চটাইবাছেন। ইহাতে দেশের দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হয়। কোচিনে দেশে আমিবাব জন্ত কোনও গহনা ক্রয় কবিত্তে গেলে বিফ্রতা বিলাতি আদর্শে ত্রোচ দিয়াছিল। হাব হাব। বার্মিংহামের আদর্শ এমনি সর্বনাশই কথিয়াছে। পুরুষদিগের সহিত তুলনায় ভাবতবর্ষে বম্বাই অপবাধিনীর সংখ্যা নিতান্ত সামান্ত।

লেখিকা বলেন যে, বেহাবের আশ্রব্ধে ছাপ দেশীয়দিগের ক্রোধ প্রকাশ কবিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যদি তাহা হইতে: কোনও কুমল উৎপন্ন হইত, তবে তাহা বৃটিশের কুব্যবহা ও উদ্যবতাব অভাব হইতে উৎপন্ন, বলিতে হইত। 'মুনো' আংলো ইণ্ডিয়ান। ইণ্ডিয়ান বলিবেন যে, সিভিল সাভিস পবীক্ষাব নিষম হইয়া মধ্যদাহীন মধ্য-অবস্থাপন্ন লোক ফর্ম পাইতেছে, তাই বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইতেছে। তাহা নহে। জন্ কোম্পানীর আমলে যদি মহাশয় শাসনকর্ষ্য অভাব না ছিল, তবে নাই। তবে এখন আংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় সহানুভূতিহীন। দেশের শিরদ্বাত্ত সংগ্রহ অবহা অবগত হওয়া, শ্রমজীবীদিগের কথা বুঝা, এ সকল মানসিক বিকাবগ্রস্ত ব্যক্তি বলিয়া আংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় অবজ্ঞা কবেন। এই সম্ভদয়তাব অভাব বর্ উৎপাদন করে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। বৈশাখ। "মানভঙ্গন" একটী ক্ষুদ্র সামাজিক গল্প। বিস্তৃত আমাদের তত্ত ভাল লাগিল না। "মাবাগি ও বাক্সালা" আলোচনার উপযুক্ত। লেখক উপসংহারে বলিতেছেন,— "যখন দেখিব, আমাদের সাময়িক সাহিত্যপত্রাদিতে, মাবাগি, ভক্তরাটী, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার বচিত্ত গ্রন্থ সকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আবস্ত হইবাছে, তখনই জানিব আমরা কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবাছি এবং যখন দেখিব, এক সময়ে সমস্ত রুরোপে বেকপ করানী ভাষাব আদব ছিল, সেইরূপ ভাবতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, রাজ্যলাব সাহিত্যসৌভভে আকৃষ্ট হইয়া, রাজ্যলা ভাষা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত শিদ্ধ কবিত্তেছেন, তখনই জানিব, বঙ্গীয় সাহিত্যগগনে গৌববর্যাব উদয় হইবাছে। "করজাবাদুর সমাধিমন্দিরে" লেখক সতিবেগম ও বউবেগমের ইংবাজকৃত দুর্দশাব একটু ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়াছেন। তন্ত্তির ইহাতে লেখকের কবজাবাদজমগকাহিনী ও বউবেগমের সমাধিমন্দিরের বর্ণনা স্থখপাঠ্য। "চড়ক-সংক্রান্তি" প্রবন্ধে চড়ক পার্কিনের ইতিহাস আছে। এত নিবৃত্ত না হইলেও ক্ষতি ছিল না। "বাক্সালা জাতিয় সাহিত্য" শ্রীযুক্ত বনোজনাথ ঠাকুরের

একটি বৃদ্ধতা, — প্রথম সাহিত্য 'পরিদর্শন' বাৎসরিক সম্মেলনে পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির কল্যাণ মেল্লস হুগ্গে, ইংলি বক্তব্য বিষয় সেখানকার নিবন্ধিত নহে। "সাহিত্যের" শাঠকরা স্থানান্তরে 'বাহ্যলো সাহিত্য ও জাতীয় জীবন' প্রবন্ধে, বদীন্দ্র বাবুর এই বক্তৃতার শাণোচনা, দেখিতে পাইবেন। আদর্শ নিম্ন বদীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনও মতামত আপাততঃ প্রকাশ কবিত্তে অক্ষম। বদীন্দ্র বাবু সাবানেব মত ভাষাকে ফেনাইবা প্রসঙ্গটি খুব ক্ষীণ ও বিস্তৃত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাহার যোগ্য হইবে নাই। ফেবল প্রবন্ধের উপ-সংহাৰতাল, — যেখানে, মুক্তি, তর্ক না মতনাদের কোনও সম্পর্ক নাই, — যেখানে বদীন্দ্র বাবু হবিষ্যতের আশায় উৎক্লেশ, ইহা উচ্চাঙ্গসহকারে ভাগী বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিবিষয়ে অবিস্মরণ্য করিয়াছেন। সেই অংশে পড়িয়া নিতান্ত অবসন্ন হিঙেও আশার সঞ্চার হয়।

ভাবতী। — বর্ণনা। এই সংখ্যা হইতে ভাবতীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। শ্রীমতী সর্বদাবারী দেবী বহুদিন ভাবতীর সম্পাদকতাব-ভাববহন করিয়া সম্প্রতি কল্যাণবধের হাতে সেই কল্যাণ অর্পণ করিলেন। তাঁহার সম্পাদনকাল বহুদিন ভাবতীর পূর্ণাঙ্গের অব্যাহত ছিল। — তাহার সাহিত্যচর্চায় বঙ্গসাহিত্য যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। যদিও তিনি 'ভাবতীর' সম্পাদকতা পবিত্রাণ করিলেন, কিন্তু আশা কবি, বঙ্গসাহিত্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে না। 'ভাবতীর' সম্পাদনস্থলেও অল্পপ্রকারে তিনি বঙ্গসাহিত্যের যেকোনও সেবা বিবাহ-

তাছাড়া আদর্শ চিবকাল কৃতজ্ঞস্বরূপে অংশ করিব। বাহাদুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া

এই মাসিক ব্রত দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে এক জনকে অকালে হইতে দেখিয়া 'আমরা আত্মরিক হুঃ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এই হুঃখের মধ্যেও বিবধ এই যে, 'ভাবতী' একবারে বিন্দুস্ত-হইল না। — শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী ধনী বেঙ্কট্যাপবিত্র ব্রত গ্রহণ করিলেন, আমরা প্রার্থনা কবি, তাহা সফল হউক।

হিরণ্ময়ী দেবীর "পত্নী বর্ষ ও নববর্ষ" কবিতাটি সঙ্গ হইবে নাই। শ্রীমতী কিশোরীমোহন

বাঙ্গালী ইতিহাসে বঙ্গমচন্দ্রের স্থান" প্রবন্ধের সহিত বোধ কবি অনেকের মতে

ক হইবে। বঙ্গমচন্দ্রের মত একজন প্রতিষ্ঠাশালী লেখকের বচনা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত

কোনও উৎসেপযোগ্য ও শিক্ষণীয় সমালোচনা প্রকাশিত হইল না, — কোনও কৃতী সনা

লোচক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না, — এই বিচিত্র। এই প্রবন্ধে লেখকের চেষ্টা ও

প্রবন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কোনও ফল দেখা গেল না। "কঠমলী"

মোপাসাঁর একটি ক্ষুদ্র গদ্য, শ্রীমতী যবলা দেবী কর্তৃক ইংরাজী হইতে তথুবাদিত, অনুবাদে

প্রাণী ক্ষুদ্র, — ইহাতে বাঙ্গালী বচনাপদ্ধতির প্রতি অভ্যস্ত উপেক্ষা, সেবা বায়। ভাষার

দোষে পত্রটি অপাঠ্য হইয়াছে। "শিবধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি" প্রবন্ধে শ্রীমতী দীপেন্দ্রকুমার

বায় এবার "গানকের" বিনবণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ছাপাখণ্ড" এই ক্ষুদ্র ও পূর্বচন্দ্র দণ্ডের

একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "ধবংস কাগজে অভ্যক্তি ও তত্ত্ব পরিণাম" পড়িয়া গল্পের মূলমূল

পোষা গেল না। "ধবংস কাগজে বাহাব অভ্যক্তি আছে, সেই নিমিত্ত প্রেমিত হইয়া দীডাব

না কি ? ধবংস কাগজে অভ্যক্তি" যদিও বোঝা গেল, কিন্তু তাহার পবিত্রাণমটা ত বড় সাধারণ

ও স্থানান্তরিত বলিয়া বোধ হইল না।



বিজয়া বিটিকা।

জ্বরাদির একমাত্র মহৌষধ।

লক্ষ লক্ষ লোক সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পবীকা দ্বারা প্রতি-
পন্ন হইয়াছে, জ্বর-পীড়াহাদি বোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ ভারতে এ
পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ ব্যাঞ্জেশ্বর রাজার অট্টালিকা এবং দরিদ্রের
কুঠিবে, বিজয়া বিটিকা সমভাবে বণ্টন। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু-
স্তানবাসী, কি পঞ্জাববাসী,—সকলেই বিজয়া বিটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজ-
জ্ঞার বিজয়া বিটিকা পবন প্রিয় বস্তু। বহু ইংরেজ-পুত্র এবং ইংরেজ-রমণী
বিজয়া বিটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসাবে
আব নাই বসিলে আত্মক্লিষ্ট হয় না।

বিজয়া বিটিকার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা সহস্র শরীরেও সেবনায়।
জ্বরবাৎ, বাহার জ্বরতাবের উপক্রম হইয়াছে, বাহার চক্ষু জ্বালা, হাত-পা জ্বালা
করিতেছে, বাহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, বা কোমর কামড়াইতেছে; বাহার
ক্ষুধা হয় না; বাহার কেঁচি খোলনা হয় না, বাহার কাসি, সর্দি হইয়াছে,—এই-
বেলা বিজয়া বিটিকা সেবন আরম্ভ করুন, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর ভুগিতে হইবে
না। বিজয়া বিটিকার শক্তি প্রকৃতই মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত।

অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যিনি জ্বর-পীড়া-বস্তুতাদি রোগে
ভুগিতেছেন, হাত-পা পর্যন্ত কুলিরাছে, ২৪ ঘণ্টাই বাহার নাড়ীতে জ্বর আছে,—
ডাক্তার কবিরাজ বাহাকে জবাব দিলাছেন,—এমন বোগীও বিজয়া বিটিকা
দ্বারা সহজে আরাম হইতেছেন,—ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া। বোগীর
প্রতিবেশীবৃন্দ মুগ্ধ হইতেছেন। কমলাজব, পালাজব, আসামেব, কালজব,
অমাবস্তা, পূর্ণিমা, জ্বদ, কুইনাইনে অটকান জ্বর, নজাগত জ্বর,—সর্ব প্রকার
জ্বরবোগই ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।

বিজয়া বিটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাকমাগুল	প্যাকিং
১নং কোটা	১৮	১০/০	১০	৮/০
২নং কোটা	৩৬	১৬/০	১০	৮/০
৩নং কোটা	৫৪	১১/০	১০	৮/০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কোটা অর্থাৎ

৪নং কোটা	১৪৪	৪১/০	১০	৮/০
----------	-----	------	----	-----

বিজয়া বিটিকা প্রাপ্তিস্থান।

আদিস্থান—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তিস্থান পেড়গ্রাম, গোষ্ঠী সাদিপুং,
জেলা বহুমান—স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য; অথবা—
৭২নং স্থাবিশন, রোড, পটলডাঙ্গা; কলিকাতা—ভারতে একমাত্র এজেন্ট—
বি, বসু এন্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

কুস্তলীন

কেশের পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও ত্রীস আদনকারী
মনোহর সুগন্ধি তৈল।



সুवासিত কুস্তলীন

পদ্মগন্ধ কুস্তলীন

গোলাপগন্ধ কুস্তলীন

উপরোক্ত সমস্ত তৈলের নমুনা বিনামূল্যে কেবলমাত্র ডাকমাণ্ডল ও
প্যাকিং খরচের দ্বারা ছয় আনার টিকিট পাঠাইলেই পাঠান হইবে।

বঙ্গদেশ, আসাম এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বহুসংখ্যক

সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ লোক এখন কুস্তলীন রীতি-

মত ব্যবহার করিতেছেন। কেশের জন্য কুস্ত-

লীন সর্বোৎকৃষ্ট তৈল, একবার ব্যবহার

করিয়া দেখিলে, অল্প কোন তৈল

ব্যবহারে প্রযুক্তি হইবে না।

এইচ বসু ;

ম্যানেজারীঃ পাবলিকিউমার।

২৪ নং হুগলীমানপাড়, লেন, কলিকাতা।

✓ পুরুরবার, রাজধানী।

“পুকুরবা ও উর্কনী” প্রবন্ধে, পুরুরবার আবির্ভাবকাল একরূপ নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, তিনি কোন দেশে বর্তমান ছিলেন? তিনি প্রতিষ্ঠান নগরে রাজত্ব করিতেন, উল্লেখ আছে।—সে প্রতিষ্ঠান কোথায়?

এই সম্পর্কে আমরা প্রথমে কনিংহাম সাহেবের “প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূগোল” নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি; তাহা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও তাহাতে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসগতিত অনেক-গুলি জ্ঞাতব্য কথা আছে; বিশেষ, যথায় প্রতিষ্ঠান নগর অবস্থিত ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থে সেই প্রদেশের প্রাচীনবিবরণগতিত অনেক কথা আছে; অতএব আশা করি, ইহাতে পাঠকের ধৈর্য্যহানি হইবে না।

কনিংহাম।

“হিমবান্ পর্বত, সিঙ্কনদ এবং সমুদ্র, ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সীমা। কিন্তু প্রবলপরাক্রমশালী রাজারা পশ্চিমদিকে, (১) এই সীমা অতিক্রম করিয়া প্রায়ই আপনাদের অধিকার বিস্তার করায়, কি প্রাচীন, কি নূতন, অধিকাংশ গ্রন্থকারই আফগানিস্থানের অধিকাংশকেই ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন। গ্রীনি বলেন যে, অধিকাংশ লেখকই সিঙ্কনদকে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্দেশ করেন না; তাহাদের মতানুসারে গেড্রোসী, আরাকোতি, আরিয়াই এবং পারোপামিসাদি, এই চাষিটি প্রদেশও ভারতবর্ষের অন্তর্গত, এবং কোফিস্ নদীই ভারতবর্ষের শেষ সীমা (২)। জীবোও লেখেন যে, সিঙ্কনদের সমীপবর্তী যে সকল প্রদেশ পূর্বে পারস্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভারতবর্ষীয়দের অধি-

(১) পশ্চিমদিকে সীমা অতিক্রমের কথা ঠিক বোধ হয় না। আফগানিস্থান চিরকালই আর্ধ্যাবর্তের অন্তর্গত, এবং এই প্রদেশ হইতেই যুর্ধ্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় অগ্নিকুল বহির্গত হইয়া অতিপ্রাচীন কালে ভাবতবর্ষ পবাজিত করিয়াছিল। দিধিকরের য়োত পূর্বে হইতে পশ্চিমমুখে কেবল ইংবাজের আমলেই গড়াইতেছে; তৎপূর্বে আবহমানিকাল পশ্চিম হইতেই পূর্বাভিমুখে গড়াইয়াছিল।

(২) ইহাও ঠিক নহে। কোফিসেব উত্তর দিকে হুবাঙ্গ (খাং) এবং তাহাব কবদ নদী সকলের উপত্যকা প্রাচীন গন্ধর্ব্ব বা গাকার দেশের অন্তর্গত। তাহাও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী।

কাবভুক্ত হইয়াছে। আলেকজান্দর আরিয়ানদিগকে এই সকল প্রদেশ হইতে বঞ্চিত করিয়া তথায় স্বীয় উপনিকেশ স্থাপিত করেন। কিন্তু সিলিউকস্ নিকেতর একটি বিনাহেব ধৌতুকস্বরূপ ঐ প্রদেশগুলি আবাব সম্রাজ্যত্ব সূচক প্রদান করেন, এবং তৎপরিবর্তে তাহার নিকট হইতে ৫০০ হস্তী উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। এই সম্রাজ্যত্ব উপর কেহ নহেন, মোর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তাহার পৌত্র অশোক স্বীয় সাম্রাজ্যের দিগ্দিগন্তে বৌদ্ধধর্মবিস্তারের জন্য প্রচারক-মণ্ডলী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রচারস্থানের মধ্যে “যোন” বা গ্রীক রাজধানী “আলসদের” অর্থাৎ কোকেশুস্ পর্যন্ত পাবে ‘আলিসান্দ্রিয়া’র নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীন পরিব্রাজক হিয়োনসিয়াঙ এই স্থানের নিকটে মহারাজ অশোকের আশ্রায় নির্মিত অনেকগুলি স্তূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে খ্রীষ্টাব্দ জন্মের পূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে কাবুল উপত্যকা যে ভারতবর্ষীয়গণের অধিকৃত ছিল, তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে। এই অধিকার কিরূপ সর্বোৎসাহপূর্ণ ছিল, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, খ্রীষ্টাব্দের ১০০ বৎসর, এমন কি তাহার পরেও, বাক্ত্রিয়ান গ্রীক এবং ইন্দো-সীথিয়ান রাজাদের মুদ্রায় ভারতবর্ষীয় ভাষা ব্যবহৃত হইত। এবং যা ৭ ইহার পর দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে তাহাব অল্প নিদর্শন পাওয়া যাব না, তথাপি পুনরায় আবতেলীত বা শেতহন বংশের রাজাদের মুদ্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেই ভাষা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পরবর্তী শতাব্দীতে উল্লিখিত চীন পরিব্রাজকের লেখাতে জানা যায় যে, কপিশার রাজা একজন বিশুদ্ধ হিন্দুবংশীয় কপ্তির ছিলেন। সমগ্র দশম শতাব্দী ব্যাপিয়া একটি ব্রাহ্মণজাতীয় রাজবংশ কাবুল উপত্যকায় রাজ্যশাসন করিয়াছিল। গজনবী মামুদের রাজত্বকালের শেষ-ভাগে এই রাজবংশের আধিপত্যের অবসান হয়। এতাবত বিবেচনা হয় যে, এই সময় পর্যন্ত সমগ্র কাবুল উপত্যকার সহিত আফগানিস্থানের পূর্বাংশের অধিবাসিগণ জাতিতে ভারতবর্ষীয় ছিল, এবং তাহাদের ধর্মপ্রণালী বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-গন্যমান্য ছিল। গজনবী রাজারা স্বল্পকাল পূর্বেই মহম্মদ-পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন; ঐ অভিনব মতে দীক্ষিত হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক উগ্র-ভাব প্রবল পরধর্মবিদ্বেষসংযুক্ত হইয়াছিল। প্রতিমা-পূজক বৌদ্ধগণকে নির্ধাতন করাকে এই রাজারা যুগপৎ কর্তব্যপ্রতিপালন এবং আসাদ বলিয়া ভাবিতেন। প্রতিমাপূজকেরা অল্পকালের মধ্যেই বিদূরিত হইল; এবং অবশেষে তাহাদের সহিত আরিয়ানপ্রদেশে ভারতবর্ষীয় সমাজ নির্মূল হইয়া গেল।

কাওফু বা আফগানিস্তান ।

খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এবং পরে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া সিঙ্কুনদের অপরপারস্থিত উত্তর ভাবতের যে সকল প্রদেশে ভারতবর্ষীয় ভাষা এবং ভারতবর্ষীয় ধর্ম প্রণালী প্রচলিত ছিল,—পশ্চিমে বামিয়ান ও কান্দাহার, এবং পূর্বে বোলান গিরিবন্ধ, ইহাব মধ্যবর্তী সমগ্র আফগানিস্তান তদন্তর্গত ছিল। ঐ সময়ে এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ড দশটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, এবং তন্মধ্যে কপিশা প্রদেশ সর্বপ্রধান ছিল। অপব কবেকটি প্রদেশ কপিশার করদ ছিল; তন্মধ্যে পশ্চিমে কাবুল এবং গজনী, উত্তরে লমধান এবং জেলালাবাদ, পূর্বে স্বাং এবং পেশোয়ার, উত্তর-পূর্বে বন্যু, এবং দক্ষিণে বনয়ু এবং ওপোকিয়েন। বোধ হয়, দশটিরই সাধারণ নাম “কাওফু” ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই সমগ্র ভূভাগে তিন জাতীয় লোকের বসতি ছিল বলিয়া লিখিত আছে;—যথা,— পারদ, ভারতবর্ষীয় এবং কিশিন দেশের স্ত্র বা শক। এই বিবরণ-অনুসারে দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ কান্দাহার প্রদেশ পারদগণের,—পূর্বস্থিত স্বাং, পেশোয়ার এবং বনয়ু ভারতবর্ষীয়গণের, এবং উত্তরপশ্চিমস্থ কাবুল এবং গজনী, লমধান ও জেলালাবাদ সহিত সীথীয়ান্-(শক)-দের অধিকৃত থাকা সম্ভব। নাম এবং অবস্থানের সাদৃশ্যবশতঃ কাওফু ও কাবুল অভিন্ন বলিয়া সচরাচর বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু কাবুলের সীমা পশ্চিমে পার্দিয়া এবং পূর্বে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত না করিলে, এই বিবরণকে সঠিক রাজকীয় বিভাগের বিবরণ বলিয়া গণ্য করা যায় না। চীন গ্রন্থকারেরা যাহাকে কাওফু বলেন, তাহাতে সমগ্র আফগানিস্তান তদন্তর্ভুক্ত হয়। শব্দবিচারে কাওফু ও কাবুল হই নামই এক হওয়া সম্ভব। কেন না, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে যে ‘যুচি’ বা ‘তোথারি’ জাতীয় লোকে কাবুল নগর অধিকার করিলে তন্নামে নগরের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া উক্ত হয়, তাহাদের পঞ্চ বংশেব এক বংশের নাম ‘কাওফু’। চীনদেশীয় গ্রন্থকারদের এই বিবরণ আলেকজান্ডরের ইতিহাস-লেখকগণেব লেখার সহিতও মেলে। এই শেখোক্ত লেখকের ‘অর্তোম্পানা’ নামক নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কাবুলেব কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। এই শেখোক্ত নাম সর্বপ্রথমে ভুবাগয়কে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। ‘ভুবাগয় (Ptolemy) বলেন, পাবোপাগিসিদিয়দের রাজধানীর নাম ‘কাবুরা’ ঋ ‘অর্তোম্পানা’। ইহাতে আমার নিতান্ত সম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত এই যে, অর্তো-

স্পান্না এই দেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল। গ্রীকদের বাজত্বকালে আসি সাল্লিগ্রাতে এই রাজধানী উঠিয়া যায়, এবং তাহার পরে ইন্দোসিথীয়-(শক)-বংশীয় প্রথম রাজাদের আমলে পুনর্বার প্রাচীন রাজধানী প্রবল হয়। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে আবার এই রাজধানী পরিত্যক্ত হয়; কেন না, ঐ সময়ে কাপিসীনের (কশিশার) রাজধানী ওপিয়ান নগরে ছিল।

কাপিসীন বা ওপিয়ান ।

উল্লিখিত চীনপরিব্রাজকের নির্দেশমতে কিরাপিনী বা কাপিসীনের পরিধি ৪০০০ লি, বা ৬৬৬ মাইল। যদি এই পরিমাণ মোটামুটি ঠিক বলিয়াও বলা যায়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ কাকিরস্থান, বোরবন্দ ও পাঞ্জশেরের বিস্তীর্ণ উপত্যকা-স্থয়ও উহার অন্তর্গত ছিল, বিবেচনা করিতে হয়; কেন না, এই শেষোক্ত দুইটি স্থানের আয়তন ৩০০ মাইলের বেশী নয়। আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, কিরাপিনীর চারি দিকই পর্বতবেষ্টিত। উত্তরে হিমালীমণ্ডিত (৩) (শ্বেতবর্ণ)-পর্বতমালা, নাম পো-লো-সি-না। অপর তিন দিকে কৃষ্ণবর্ণ পর্বত। জৈন্দ অবস্থায় 'পরশ' পর্বত বা 'অপরসিন্' পর্বত বলিয়া যে নাম শ্রুত হওয়া যায়, পোলোসিনা শব্দ তাহার সহিত সম্পূর্ণ মিলে। গ্রীকদের পারোগামিসস্ নাম ভারতীয় কোকেশস্ বা হিন্দুকুশ বাহার অন্তর্গত, তাহার সহিতও সম্পূর্ণ মিলে। হিয়ুয়েনসিয়াঙ আরো বলেন, রাজধানীর উত্তরপশ্চিমে কেবল ২০০ লি বা ৩৩ মাইল দূরে, একটি প্রকাণ্ড হিমালীমণ্ডিত পর্বত আছে, এবং তাহার পিছরে একটি সরসী আছে। ইহাই হিন্দুকুশ পর্বত, চরিকার বা ওপিয়েনের উত্তরপশ্চিমে উহার দূরত্ব কেবল ৩৫ মাইল মাত্র; কিন্তু আকগানিস্থানের এই অংশের যে সকল অসম্পূর্ণ বিবরণ এক্ষণে পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত পর্বতের শিখরে কোনও সরোবর থাকার বিবরণ আমি দেখিতে পাই নাই।

প্লীনিই সর্বপ্রথমে কাপিসীন প্রদেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই দেশের প্রাচীন রাজধানীর নাম কশিশা এবং সাইরস কর্তৃক তাহা ধ্বংস হইয়াছিল (৪)। তাহার আখ্যায়িকা সোলাইনস্ ঐ আখ্যায়িকাব উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি নগরটিতে 'ককুশা' বলিয়া নির্দেশ করেন।

(৩) কপিথার উত্তরে এই হিমালীমণ্ডিত পর্বত আমাদের প্রাচীন গ্রন্থকাব্যদেব হিমবান্ পর্বতেরই অংশ। প্রকৃত পক্ষে ইহাও আর্ধ্যবর্ষেই অন্তর্গত।

(৪) আমাব বোণা হয়, সাইবসের সময় হইতেই দেবানুবব সংগ্রাহকহিনীর স্ত্রপাত হইয়া থাকিবে।

ডেল্‌ফীনগরের গ্রন্থপ্রকাশকেরা 'কফুশার' পরিবর্তে 'কপিশা' লিখিয়াছেন। ইহার কিছু পরে তুরাময় লেখেন যে, কপিশা নগর পারোপামিসাদিদের দেশে এবং কাবুবা বা কাবুলের উত্তরে ২৥ অংশ দূবে, কিন্তু এই সংখ্যায় প্রায় ২ অংশ ভুল। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক বামিয়ান ছাড়িয়া পূর্বমুখে ৬০০ লি বা ১০০ মাইল হিমালীমণ্ডিত পর্বত এবং কৃষ্ণবর্ণ গিরিশ্রেণী (অর্থাৎ কোহিবাবা এবং পঞ্চমান পর্বত) অতিক্রম করিয়া কিয়াপিণী বা কাপিসীনের রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। চতুর্দশ বৎসর পরে ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি গজনী এবং কাবুল পার হইয়া কিয়াপিণীতে উপনীত হন, এবং সে স্থান হইতে উত্তরপূর্বমুখে পাঞ্জশের উপত্যকা দিয়া আন্দেরার অভিযুগে প্রস্থান করেন। এই বর্ণনাতে কপিশার তৎকালীন রাজধানী বর্তমান ওপিয়েন বা তুয়িকুস্ত স্থানে ছিল জানা যায়। * * *

কোফেন বা কাবুল।

কাবুলপ্রদেশের নাম সর্বাঙ্গে তুরাময় কর্তৃক উল্লিখিত দেখা যায়। তাহার লেখা অনুসারে জনপদবাসীদের নাম 'কাবোলিতী' এবং তাহাদের রাজধানীর নাম 'কাবুবা'—বাহার নামান্তর অর্থোপ্পানা। শেষোক্ত নাম জাবো এবং প্রীনির গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। আলেকজান্ডারের ভূমিপরিমাপক জাজীতে এবং বেতন, পরিমাপ করিয়া আরাকোশিয়া হইতে ঐ স্থানের যে দূরত্ব নিকপণ করেন, তাহাও ঐ দুই গ্রন্থকার নির্দেশ করিয়াছেন। প্রীনির কোনও কোনও প্রতিলিপিতে নামটি "অর্থোপ্পানম্" বলিয়া লিখিত দেখা যায়। হোরেনস হেম্যান উইলসন "অর্থোপ্পানমকে" কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দ্বারা "অর্থোস্থান" হইবে ধরিয়া, উহা "উর্কস্থান" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচনা করেন। উর্কস্থান অর্থাৎ উচ্চস্থিত নগর। চীনপরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াঙও কাবুল প্রদেশকে ঐ নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার ঘোর সন্দেহ হয় যে, কোনও কারণে নগর ও প্রদেশের নাম অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। গজনী ছাড়াইয়া পরিব্রাজক উত্তরমুখে ৫০০ লি বা ৮৩ মাইল গমন করিয়া 'কো-লি-শি-সা-টাং-না'তে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং ঐ প্রদেশের রাজধানীর নাম 'হু-পি-না'।

গজনী হইতে কাবুলে আসিবার দুইটি পথ বিভিন্নরূপে পরিমাপ হইয়া একটি ৮১ এবং অপরটি ৮২ মাইল নির্ণীত হইয়াছে। ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে, পরিব্রাজক যে স্থানের কথা বলেন, তাহা কাবুলই। আর এক স্থানে রাজধানী বামিয়ান হইতে ৭০০ লি বা ১১৬ মাইল দূর বলিয়া লিখিত হইয়াছে;

এবং ইহার সহিতও বামিয়ান হইতে কাবুলের সর্বাপেক্ষা সহজ পথ যে পরি-
খাপ হইয়া ১০৪ মাইল নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা মিলে ।

চীনপরিব্রাজক রাজধানীর যে নাম নির্দেশ করেন, বিবির্নেসেন্সমার্ভিন
সাহেব তাহা অনুবাদ করিয়াছেন,—‘বর্দ্ধস্থান’, এবং বিবেচনা করেন যে, ‘বর্দক’
নামক বংশ এক্ষণে যে স্থানে বাস করে, উহা সেই স্থান। অপিচ, প্রদেশটিকে
তিনি হুপিয়ান বা ওপিয়ান বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু ‘বর্দক’ বংশের নামে যে
‘বর্দক’ উপত্যকার নামকরণ হইয়াছে, তাহা লোগড় নদীর গোড়ার দিকে, এবং
তাহা কাবুলের কিয়দূর দক্ষিণে অবস্থিত, এবং তাহা গঙ্গনীর উত্তরে ৪০
মাইলমাত্র। এ দিকে হুপিয়ান বা ওপিয়ান কাবুলের ২৭ মাইল উত্তরে, এবং
‘বর্দক’ হইতে ৭০ মাইল দূরে। আমি বত দূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে
উভয় নামই কাবুলের সন্নিকটবর্তী স্থানেরই নাম বিবেচনা হয়।

অধ্যাপক লাসেন ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অপর চীনদেশীয় লেখ-
কেরা যে ‘কিপিনের’ নাম ভুরি ভুরি উল্লেখ করিয়াছেন, হিয়ুয়েনসিয়াঙ
তাহার আদৌ কোনও নির্দেশ করেন নাই। রেয়ুসাং সর্বপ্রথমে অনুমান করেন
যে, কোফিন বা কাবুল নদীর তীরবর্তী প্রদেশেরই নাম কিপিন। এবং এই
অনুমান পরবর্তী প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে সমুদায় গ্রন্থকারই সিদ্ধান্তস্বরূপ
গ্রহণ করিয়াছেন, এবং নাধারণতঃ তাহা কোফেন বলিয়া লিখিত হয়।
কিপিন শব্দের এই আকারকেই আমি হিয়ুয়েনসিয়াঙের হুপিনা বলিয়া গ্রহণ
করিতে প্রস্তাব করি। কেন না, এই প্রসিদ্ধ প্রদেশের নাম যে উক্ত পরিব্রাজক
একবারেই উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন, ইহা অসম্ভব। বিশেষতঃ, তিনি ঐ প্রদে-
শের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন, এবং ঐ নাম তাঁহার পরেও প্রায় এক
শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রচলিত ছিল। আমি ইতিপূর্বেই সন্দেহ করিয়াছি যে,
হিয়ুয়েনসিয়াঙের বৃত্তান্তে জনপদ ও নগরের নাম উল্টাপাল্টা হইয়া গিয়াছে।
যখন দেখা যায়, নাম দুইটি অদল-বদল করিয়া ব্যবহার করিলে সব গোল
মিটিয়া যায়, এবং সম্পূর্ণ অভিন্নতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন ঐ সন্দেহ প্রকৃত-
বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। এতাবত, কোফেন বা কিপিন ও হুপিনা অভিন্ন,
এবং ইহার কাবুল নদের তীরবর্তী জনপদের নাম। এবং ‘ফো-লি-শি-সা-টাং-
না’ বা উর্দ্ধস্থান, এবং প্রাচীন লেখকগণের নির্দিষ্ট এই জনপদের রাজধানী
অর্থোম্পান অভিন্ন। ইহাও আমি বলিতে চাহি যে, ‘কোফেন’ শব্দ চীন ভাষায়
লিখিতে গেলে, ঠিক হুপিনা হয়; কিন্তু হুপিয়ান লিখিলে দোষ ঘটে। কেন

না, তাহাতে একটি বর্ণ অতুষ্টি থাকিয়া যায়, এবং প, ফ-বর্ণে পরিণত হয়।
হুপিমান শব্দের অবিকল প্রতিলিপি হু-পি-মা-না হওয়া উচিত।

বিবিধেদেসেস্তমার্তিন “উর্দ্ধস্থান” শব্দের প্রতি এই আপত্তি কবেন যে, ইহা উদ্দেশ্যবিহীন আত্মমানিক শব্দগঠনগাত্র। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে আমাব এই অনুমান ঠিক মনে হয়;—প্রথমতঃ—অর্তোম্পান এই নাম কেবল পাবোপামিসাদির প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু কশ্মিরা এবং পার্শ্বদেশেও এই নাম দেখা যায়। অতএব, ইহা যে বর্দক বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। অবশ্যই ইহা সকল দেশের সমান অবস্থানসূচক সাধারণ নাম। উর্দ্ধস্থান অনুবাদে এই আকাজ্জক সুন্দর পূরণ হইতেছে; বোধ হয়, গিবিহুর্গনাত্তেরই উহা সাধারণ নাম। দ্বিতীয়তঃ—অর্তোস্থান শব্দের এক পাঠান্তর আছে যথা,—পোর্তোম্পান। পুস্ত ভাষায় পোর্তা শব্দ উচ্চ বুঝায়, এবং তাহাতে আমি যে অর্থ নির্দেশ কবি, তাহার গোষকতা করিতেছে। সাধারণ লোকে সংস্কৃত উর্দ্ধের পরিবর্তে পোর্ত শব্দই গ্রহণ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

অর্তোম্পানের অবস্থান ‘বলহিসার’ বা ‘তুঙ্গহুর্গ’ সংস্থষ্ট কাবুল নগরের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিতে প্রস্তাব কবি। ‘বলহিসার’ শব্দ অর্তোম্পান বা উর্দ্ধস্থানেরই পাবস্ত ভাষায় অনুবাদ বলিয়া জ্ঞান করি। মাকিদনী দিগ্বিজয়ের পূর্বে ইহাই ঐ প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এমন কি, দশম শতাব্দীতে কাবুল নগরে অভিযুক্ত না হইলে, কোনও রাজাই দেশেব উপযুক্ত শাসনকর্তা বলিয়া পরিগণিত হইত না।” ইতি কনি-হাম। The Ancient Geography of India. pp. ১5-35.

(লেখকের মন্তব্য)

উল্লিখিত বিবরণে গ্রীক, ইংরাজ, ফরাশী এবং চীন বসনাতে একই শব্দের কতপ্রকার উচ্চারণ সম্ভব, তাহা দেখিয়া পাঠকগণ নিশ্চয়ই কৌতুকাবিষ্ট হইবেন। আমার বিবেচনায় গ্রীকেরা যাহাকে অর্তোম্পান বা পোর্তোম্পান বলিয়া লেখেন,—এবং চীনপরিব্রাজক যাহা ফো-লি-শি-সা-টাং-না বলিয়া লেখেন, তাহা উর্দ্ধস্থানও নহে, বর্দ্ধস্থানও নহে।—ইহার প্রাচীন সংস্কৃত নাম “প্রতিষ্ঠান।” এবং ইহাই আমার বোধ হয় পুরুষবার রাজধানী ছিল। অর্তোম্পান অপেক্ষা পোর্তোম্পান এবং ফোলিশিসাটাংনাই প্রকৃত নামেব অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট প্রতিলিপি। প্রতিষ্ঠান শব্দ যবনজিহ্বাতে পোর্তোস্তানে পরিণত হইলে তাহাই আবার লিপিকরণমাদে পোর্তোম্পান হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পুন্ড্রবর্ষ ভাবতবর্ষীয় চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দের পুন্ড্র-পুন্ড্র বলিয়া দেশীয় ইতিহাসে পবিগণিত। পুন্ড্রবর্ষীয় পুন্ড্র আয়ু, তৎপুন্ড্র নহয়, তৎপুন্ড্র যযাতি, এবং যযাতির পঞ্চ পুত্র—যজু, তুর্লশ, অজু, জুহা ও পুন্ড্র যে কেবল আমাদের পুরাণ ইতিহাসেই প্রসিদ্ধ, তাহা নহে; ঋগ্বেদে ভূবি ভূরি স্থানে তাঁহাদের নামের উল্লেখ দেখা যায়। বসিষ্ঠের সময়ে যযাতির পঞ্চ পুত্রের বংশ পঞ্জাব দেশে, এমন কি, গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী স্থানেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, দেখা যায়। যেমন কোশলদেশস্থ গোড় জনপদের রাজারা উত্তরকালে পূর্বদিকে আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়া পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গোড় রাজ্য স্থাপন করেন, এবং “পঞ্চম গোড়” বাল্লালা দেশে আসিয়া পড়ে—তেমনি প্রতীষ্ঠানের মানব ক্ষত্রিয়বংশ পূর্বমুখে ক্রমশঃ আপনাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া গঙ্গানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়,—এবং উত্তরকালে গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী ভূতলে ‘কোশাঙ্গী’ নগরে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হইলে, উহাও ‘প্রতীষ্ঠান’ বলিয়া বিখ্যাত হয়।—এমন কি, পুরাণে এই স্থানই ‘প্রতীষ্ঠান’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।—কিন্তু পুন্ড্রবর্ষীয় ইতিবৃত্ত যাহা গল্পে পরিণত হইয়াছে,—তাহাতে উর্ধ্বশী ও গন্ধর্বদের সহিত তাঁহাদের যে সম্পর্ক দেখা যায়, তাহাতে তদীয় রাজধানী ‘প্রতীষ্ঠান’ যে গন্ধর্ব বা গন্ধাব দেশের সম্মুখে ছিল, তাহা অস্বাভাবিক করিবার বিশিষ্ট কারণ দেখা যায়।

গ্রীকদের উল্লিখিত ‘কোকিস্’ নদী আমাদের ঋগ্বেদের ‘কুতা’। এবং চীনপরিব্রাজকদের ‘কাওফু’ বা ‘কাওফু’ আগাদের সংস্কৃত ‘কাষো’ দেশ। পারস্ত ভাষাতেও ইহার অবিকল এই নাম। এই ‘কাষো’ বাসীরা সংস্কৃতে ‘কাষোজ’ বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্রীকেরা প্রাকৃত ‘বোন’ বলিয়া লিখিত। উচ্চারণ ‘যবন’ (যবন),—সংস্কৃত ‘যবনঃ’। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে পুন্ড্রবর্ষীয় প্রসিদ্ধ রাজধানী যে ‘প্রতীষ্ঠান’ নগরের নামমাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং পরকালবর্তী লেখকদের বর্ণনায় যাহা গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগে অবস্থিত বলিয়া আমাদের ভ্রম ছিল, এক্ষণে যবন ও চীন লেখকদের লেখা দেখিয়া তাহা কাবুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ফলতঃ, বিষ্ণুপুরাণ-লেখকের সময়ে প্রাচীন ‘প্রতীষ্ঠান’ কাষোজ বলিয়াই সমধিক পরিচিত হইয়াছিল। তাহাতে পুন্ড্রবর্ষীয় বংশীয়দের সর্বশেষ রাজত্বের স্থানই পুরাণে প্রতীষ্ঠান বলিয়া লিখিত হইয়াছে।—প্রতীষ্ঠানেরই অপভ্রংশ ‘পইষ্ঠান’ হইতে বোধ হয় ‘পায়ঠান’ বা ‘পাঠান’ জাতির নামকরণ হইয়াছে। তাহাতে পাঠানদিগকে ‘মানব ক্ষত্রিয়বংশ’ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কালের গতিতে, ইহারা বেদপন্থা হইতে দ্রষ্ট হইয়া

মূলগমান হইয়াছেন। পুরুষবার প্রতিষ্ঠানে এক্ষণে আমীব. আবদুর রহমান পাঁচ বাহাদুর রাজত্ব করিতেছেন। এবং যে গফ্ফেররা পুরুষবার প্রতিবেশী ছিল, এবং তাঁহার রাজমহিষী উর্কশীর জাতি ছিল, তাহাদেরই দেশে সুবাস্ত (স্বাৎ) নদীর উপত্যকার উগরা পাঁকে দমন করিবার জন্য সম্প্রতি মেজব জেনারেল নার রবার্ট দৌ নাহেবের সেনাগণ প্রধাবিত হইয়াছে (৫)।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বটব্যাল।

✓ মোহিনী।

১০

বিবাহের পর স্বশুববাড়ী আসিলাম। স্বশুর স্বাণ্ডী ছিলেন না; থাকিবাব মধ্যে দুই সম্পর্কের এক নন্দ। তা, পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া খুব আনুগত্য কবিল। এসব কাজে বড় একটা কাহাকেও খুঁজিতে হয় না; বিপদের সময় যাহাকে আবাদনা করিয়া পাওবা যায় না, সম্পৎকালে তিনি আপনা হইতেই আসিবা

(৫) বেদাভিজ্ঞ পাঠকগণের স্মরণ হইবে, বৎকালে কণ্ঠবংশীর সোভরি ঋষি জীবিত ছিলেন, তৎকালে অদ্যকাব এই যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুকুৎসের পুত্র এসদহ্য রাজা রাজত্ব কবিতেন।—এই রাজ্যাব যজ্ঞ করিয়া সোভরি ঋষি অশ্রুজ দক্ষিণার মধ্যে ৫০ জন ‘বধু’ বা হুল্লবী বধনী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—“অদ্যনমে পৌকুৎসঃ পঞ্চাশতং এসদহ্যবধুনঃ”। ঋগ্বেদ, ৮।১৯।৩৬। তিনি আবে বলেন—

“উত বে প্রথিযোর্ব্রিয়োঃ সুবাস্তা হধি তুগ্বনি।

তিসূগাং সপ্ততীনাং জাবঃ প্রণেতা ভুবদনহৃদিমানাং পতিঃ ॥”

ইহাব ব্যাখ্যাব যাক বলেন,—“সুবাস্ত” নদীবিশেষের নাম, এবং ‘তুগ্ব’ সেই নদীতে একটি তীর্থস্থান। এই তীর্থে সোভরি ঋষি এসদহ্যর যজ্ঞ কবিয়াছিলেন। এসদহ্যতঃ বলিতেছি, শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত এখানে সুবাস্ত শব্দের অর্থ না বুঝিয়া, ‘সুনিবাসবিশিষ্ট নদী’ বলিয়া অনুবাদ কবিয়াছেন। Arrian এই নদীকে Suastus বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, এবং হিয়োনসিংরা ওর চীন জিহাব ইহা সু-পো-কা-সু-জু হইয়াছে। ইহাই ইংবেলী সম্রাটপত্নের Swat River। আর এক কথা :—এই সোভরি ঋষি যে চিত্রনামে অতিদানশীল আব এক রাজ্যাব উল্লেখ করেন (৮।২।১।৮) তাহাব সঙ্গে ‘চিত্রলোব’ কোনও সম্পর্ক আছে কি?—সোভরি বলেন—“সরস্বতী নদীতীবে যে সকল রাজা আছেন—তাঁহার। সুত্র রাজা;—যদি কাহাকেও রাজা বলিতে হয়, তবে চিত্রই রাজা”—“চিত্র ইলাজা রাজকা ইদন্তকে যকে সবস্বতী মনু”। এস্থলে সচবাচর চিত্রকেও সবস্বতীতীবাসী বলিয়া এবা হয়। কিন্তু ইহা বিচিত্র নহ। সরস্বতী-তীর সোভরি স্বদেশ, তিনি গন্ধাব দেশে এসদহ্য ও চিত্র রাজ্যাব রাজ্যে গমন করিয়া বহুদন প্রাপ্ত হন, এবং চিত্রের প্রশংসা কবিয়া স্বদেশেব সুদ্র রাজাদের নিম্না কবিতেন। ফলতঃ, চিত্রের সহিত চিত্রলোর কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তদ্বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

মুটেন । দুইটমাত্র একতাগা কুঠারি, তাহাবই একটিতে উঠিয়া আমরা কড়ি খেলিলাম । ধুমধামেব সহিত—আমাব স্বামীব অবস্থায় যতদূর ধুমধাম হওয়া সম্ভব, তাহার অতিবিক্ত নাত্রায়ও—বোভাত, ফুলশয্যা প্রভৃতি হইয়া গেল ।

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীর সহিত প্রথম কথা কহিলাম । আমি তো কিছুতেই মুখ তুলিব না, কিন্তু তিনিও ছাড়িবার পাত্র নন—বোমটা খুলিয়া দিয়া, হাত কাড়াকাড়ি করিয়া, ছলে বলে আমায় কথা কহাইলেন । আমার মনের অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু তিনিও ছাড়েন না ; কাজেই কি করি, পাঁচ কথার চুপ করিয়া থাকিয়া একবার জবাব দিতে হইল । তিনি যেরূপ স্নেহ-মোহান আগ্রহপূর্ণ স্বরে আমার নানা প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহা যদি তখন আমার বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে বস্তুতঃ বুঝিতে পারিতাম, সেই এক দিনেই তিনি আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন । কিন্তু আমি পোড়াকপালী, তাহা বুঝিব কি, তাহার প্রত্যেক কথাই বাবপবনাই আলাতন হইতেছিলাম । যে দুই একটা কথার উত্তর দিতেছিলাম, তাহাও নিতান্ত অন্তমনস্কভাবে দিতেছিলাম । তিনি বলিলেন,—“দেখ, দরিদ্র বলিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইত, সে কষ্ট আর নাই । সাতবাজার ধন তোমাকে আমি পাইয়াছি । কিন্তু ভাবিতেছি, এই ক্ষুদ্র কুটীরে তোমায় রক্ষা করিব কি করিয়া ?”

আমি আবাকী বলিলাম, “বোধ হয়, রাখিতে পারিব না ।”

উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি আমার মুখেব দিকে চাহিলেন । তার পর বলিলেন, “তুমি বালিকা, তোমাব কথার অর্থ তুমি বুঝ না । কিন্তু দেখ, এ পৃথিবীতে আমাকে আমার বলিতে আর কেহ নাই । বড় আশায় তোমায় লইয়া সংসার পাতিতেছি । কলিজার দস্ত অপেক্ষাও তোমাকে আমি যত্নে রাখিব । তুমি আমার ভাল বাসিবে কি ?”

অশ্রুতক্ষণে আমার মুখ হইতে অঙ্গনা-আপনি বাহির হইল,—“না ।” উত্তর শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন । হঠাৎ কথাটা বাহির হইয়া গেলে, আমারও প্রশ্নটা কেমন করিয়া উঠিল । তখন প্রভাত হইয়া আসিয়াছিল, গৃহালোক নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছিল । সেই ক্ষীণালোকে দেখিলাম, তাহার মুখশ্রী কেমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বড় বড় ভাসা ভাসা চক্ষু মেলিয়া আড়ষ্ট ভাবে অর্ধশূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন । আমি আর তাহা দেখিতে পারিলাম না ; ধীরে ধীরে চক্ষু নত করিলাম ।

আট দিন পরে পিজালয়ে ফিরিয়া গেলাম। কে জানে, কেন স্বামী 'ঘোড়ে' গেলেন না। এক মাস পর্য্যন্ত আর স্বামীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। এক মাস পূরে হঠাৎ এক দিন পিতার পৃষ্ঠত্রণ হইল। পূর্ব হইতে তাঁহার বহুমূত্র ছিল। তার বয়স হইয়াছিল—সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইলেন না। মায়ে ঝিয়ে আমরা অকুল পাথারে ভাসিলাম।

পিতার অসুখ শুনিয়া স্বামী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ক্রমে অসুখের বৃদ্ধি দেখিয়া আর ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। এখন তিনি আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যথাকালে শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল। আমাব বিবাহে কিছু দেনা হইয়াছিল, সুতরাং বেণী কিছু ঘটা হইল না। বিষয়াদির বন্দোবস্ত ও সংসারের ব্যবস্থা করিতে স্বামীকে অনেক দিন থাকিতে হইল। সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে যাত্রা স্বামিসহবাস অনেক দিন ধরিয়া হইল।

স্বামীর বিজ্ঞাবুদ্ধি ও স্বভাব চরিত্র দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রশংসা করিত। শুনিয়া-মাতার বড় আনন্দ হইত। তার তিনি সদা হান্তময়, হৃদয় স্নেহের পাব্যারতুল্য। সেই স্নেহের গুণে দিনে দিনে একটু একটু করিয়া আমিও তাঁহার পক্ষপাতী হইতে লাগিলাম। বায়ুর নিকট মেঘের স্থায় ক্রমে সেই পূর্বভাব আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। বলিতে পারি না, সতীশ ও স্বামী উভয়েই উপস্থিত থাকিলে আমি এমন হইতে পারিতাম কি না। কিন্তু সতীশের কোনও সংবাদ নাই, আর স্বামী আসিয়া নিত্য অপার স্নেহরাশি ঢালিয়া দিতেছেন, হৃদয় ক্রমে ক্রমে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইবে, তাহা বিচিত্র কি?

তার, পতিব্রতাকুলেশ্বরী মা নিত্য প্রাতঃসন্ধ্যায় পতিসেবা ও পতিভক্তির অশেষবিধ উপদেশ দিতেন। সেই নীতিপূর্ণ উপদেশ শুনিতে শুনিতে অনেক সময় আমি তন্দ্রায় হইয়া পড়িতাম—আপনার প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া যাইতাম—পতির সেবায় মন দিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইতাম।

সে চেষ্টায় আমি বত দূর কৃতকার্য হইতাম, বলিতে পারি না। কিন্তু শুক্লব মহিমায় চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে আমি হৃদয়ে অনেকটা শান্তি ফিরিয়া পাইলাম।

বিধাতার কিন্তু ইহা সখ হইল না। তাঁহার সৃষ্টির কি নিগূঢ় উদ্দেশ্য ব্যর্থ

হইয়া যায়, ইহা ভাবিয়া মূল গরিয়া টান দিলেন। সেই শ্রান্তি প্রদারিনী জননীকে আমি হারাইতে বসিলাম।

মা, পিতার শোক কিছুতেই সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। দিনে দিনে ক্রমেই মলিন ও শীর্ণ হইতে লাগিলেন। এববেলা আহাৰ, তাহাও কেবল বসিতেন মাত্র। বলিলে বলিতেন, রুচি নাই। আমাদের লইয়া তিনি সংসারে মন বাধিতেন বটে, কিন্তু তবু সদাই যেন তাঁহার কি মনে পড়িত, ব্যাকুল-নেত্রে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেন—একটি নিশ্বাস বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া বাইত—নিঃশব্দে আবাব গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। মিত্য ইষ্টদেবতার আবাবনা সাজ হইলে, দেখিতাম, পিতার খড়ম ছাখানি সচন্দন পুষ্পে পূজা করিয়া কখনও মস্তকে, কখনও বা বক্ষে ধারণ করিতেন, আব ছ নমনে অবিরলগতি জলধাবা গড়াইয়া পড়িত। পতিব্রতা পতি ছাড়িয়া কয় দিন থাকিবেন? তিন মাস না বাইতেই অকস্মাৎ একদিন কি একটু মাথার অসুখ হইল, তিনি তুলসীতলায় শুইয়া ইষ্টনাম জপিতে জপিতে পতিপাণে চলিয়া গেলেন।

আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। স্বামী আমার কতই প্রবোধ দিলেন। তার পর, মাতৃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া, ঘরে চাবি দিয়া, তিনি আমাকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন। ইচ্ছা করিয়াই আমি গেলাম। পিতা মাতা হারাইয়া, আর সে ভিটার এক দণ্ডও বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। স্বামী আমাকে বারপননাই স্বত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসীম মেহে ক্রমে পিতা মাতাকে ও ভুলিতে শিখিলাম। যে নন্দদের কথা বলিয়াছি, তিনি বরাবরই সংসারে থাকিতেন—তিনিও আমাকে খুব আদর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুখে স্বামী বধর করিতে লাগিলাম।

আমার সুখ হইল বটে, কিন্তু সহসা স্বামীর এক বোরতর অসুখের কারণ উপস্থিত হইল। লোকে বলে—জীভাগ্যে ধন। তা, আমি নিতান্ত মন্দ-ভাগিনী—আমার দুষ্টিতে রাজার ভাণ্ডার পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইবাব কথা, তা যৎকিঞ্চিৎ আয়ের কথা তো সাযান্ত। তিনি কলিকাতার একটি আপিসে ৬০ টাকা বেতনে চাকরি করিতেন। বিবাহের সময় হইতেই কামাই চলিতেছে। সাহেব আর ছুটি দিতে বা বদলি লইতে রাজি নহে। একদিন হঠাৎ তাঁকে একখানি চিঠি আসিল—সাহেব তাঁহাকে জবাব দিয়াছে, তাঁহার স্বধো অল্প শোক ভর্তি করিয়াছে। বিগর্ভ মুখে চিঠিখানি লইয়া স্বামী বাড়ীর ভিতর আসিলেন। কষ্টেব সহিত তাঁহার বিপদের কথা শুনাইলেন। নন্দ

ঠাকুর—“ওমা তাই ত, কি হবে ? কি ক’বে সংসার চলিবে !” বলিয়া কান্না ধরিলেন, শেষ সাহেবকে অজস্র গালি দিতে লাগিলেন।

স্বামীর স্নান মুখ দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। তাঁহাকে ঘরের ভিতর ডুকিয়া বলিলাম, “ভা, ভাবনা কি ? বাবার বিষয় তো আছে, এতদিন তাহা-তেই তো আমাদের চলিতেছিল, এখনও তাহাতেই চলিবে।”

আমার কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইয়া, স্বামী আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তত কষ্টেও তাঁহার মুখে হাসি দেখিলাম। দীর্ঘ হাস্ত করিয়া, তিনি আমাব অধরপ্রান্তে একটা টোকা মারিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এক বৎসর কাটরা গেল। তেমন স্নেহের বৎসর আর আমার জীবনে কখনও কাটে নাই। ক্রমে আমি সংসারের অনেক কাজ শিখিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম বাটনা বাটা, কুটনা কোটা, ঘব বাঁট দেওয়া, পান সাজা, বিছানা করা—এ সব কাজ আমি নিজেই আমার উপর বরাদ্দ করিয়া লইয়াছিলাম। তার পর একবেলা করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলাম। কোনও দিন হয় ত ভাত ধরাইয়া ফেলিলাম, কোনও দিন ডালে আদৌ নুন দিতে ভুলিয়া গেলাম, কোন দিন বা এক ব্যঞ্জন ঝালে পুড়াইলাম, আমি অপ্রতিভ হইয়া আরিতাম—কিন্তু স্বামী কোনও কথা কহিতেন না—হাসিতে হাসিতে তাহা দিয়াই খুঁটিয়া ভাত খাইতেন। অবসর পাইলে স্বামীর কাছে একটু একটু কবিতা পড়িতেও শিখিতে লাগিলাম। বড় স্নেহে এক বৎসর কাটিল।

পর বৎসর বড় দুর্বৎসর পড়িল। সময়ে ভাগ বৃষ্টি হইল না। অনেক চাষার বুনন পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। নাবাল জমিতে ঘাহার কিছু হইল, তাহা আবাব কার্তিকে ভরণায় ডুবিয়া গেল। জল আবার শ্রাবণে হয় নাই বটে, কিন্তু জল আকাশ-পোরা ছিল। কার্তিকের শেষে অতিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। চাষারা মাথায় হাত মিয়া কাঁদিয়া পড়িল। পাকা ধান সকল জলে ডুবিয়া হাজিরা পচিয়া মরিয়া বাইতে লাগিল। সেবার আমার পৈতৃক জমি হইতে একটিও ফসল আদায় হইল না। অথচ, সেই জমির ধান ভিন্ন সংসার চলিবার অন্য উপায় নাই। স্বামী বিশেষ ভাবনাপন্ন হইয়া পড়িলেন। আরও ভাবনাব কারণ, আমি তখন সাত মাস অন্তঃস্বত্ব।

একদিন—তখন উপর্যুপরি তিন দিন ধার করিয়া চলিয়াছে, আব দেনা কবিত্তে স্বামী অনিচ্ছুক—একদিন বৈকালে আদায় কাছে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, “দেখ, মোহিনী, তার তুমি ছেদেমাছুষটি নও, সংসারের অবস্থা

সমস্তই বুঝিতে পারিতেছ। আর, বগিয়া থাকিলে চলি না—বিশেষ সম্মুখেই স্তম্ভকাণ্ডের বিস্তার খবচ—আমি একটি কাশের বোঁগাড় করিয়াছি। যদিও তাহাতে তেমন পরস্রা নাই, তবু বগিয়া না থাকিয়া তাহাই করিব স্থির করিয়াছি। তোমার পরামর্শ কি ?”

আমি আর পরামর্শ দিব কি, এতদিন পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া একা থাকিতে হইবে, ইহা শুনিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম,—“তা, প্রতি বৎসরই কি ভগবান্ এমনই করিবেন ? এবার অজ্ঞান হইয়াছে, এবার না হয় আমার গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া সংসার চালাও।”

স্বামী জানিতেন, আমি অলঙ্কার কত ভালবাসি। বলিলেন, “ছিঃ! ও কথা মুখে আনিও না। এই বুবা বধসে ঘটে বসিয়া জ্বর গহনা বেচিয়া থাইব ? কাল দিন ভাল, কালই আমি চাকরি করিতে বাইব।”

“কাল।”—সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলাম। তিনি বলিলেন, “প্রতি শনিবারে বাড়ী আসিব সে জন্ত ভাবনা কি ? আব বৈশাখ দূর নয়, এই কাছে—গোবিন্দপুরে নীলরতন বাবুর বাড়ী—আবশ্যক বুঝিলেই তখনই সংবাদ দিতে পারিবে।”

“গোবিন্দপুর—নীলরতন বাবু—” ছাঁৎ করিয়া প্রাণের তিতর কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ আমি কেমন হইয়া গেলাম।

স্বামী বলিলেন, “তুমি তাঁহাদের চেন নাকি ?—নীলরতন বাবুর ছোট ছেলেকে পড়াইবার জন্ত একটি মাষ্টার দরকাব। আমি সেই কাজ করিব।”

বিন্দু বিন্দু করিয়া আমার সর্বাঙ্গে বর্ষ বাহির হইতে লাগিল। একটিও কথা বলিতে পারিলাম না। কথা হিবার শক্তি তখন আমার ছিল না।

শনিবার শনিবার স্বামী বাড়ী আসেন; রবিবার থাকিয়া আবার সোমবার সূর্যোদয়ের পূর্বেই চলিয়া যান। তখনই তিনি বাড়ী আসেন, তখনই নীলরতন বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ স্বখ্যাতি তাঁহার মুখে ধরেন। তাঁহার, তাঁহাকে কত ভাল বাসেন, কত বন্দ করেন, নিতান্ত আত্মীয়ের স্থায় ব্যবহার করেন—মহাহর্ষে স্বামী সেই সব গল্প করিতে থাকেন, আর আমি তাহা শুনিতে শুনিতে অন্তবে কাঁপিয়া মরি।

এক মাস যায় যায়—হঠাৎ এক শুক্রবার বৈকালে দেখি যে, স্বামী একখানি পত্র দিয়া একটি লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন। পত্র আমার নামে আসিয়া—

ছিল—আমি নূতন পড়িতে শিখিতেছিলাম—তাহা খুব বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরেই লিখিত হইয়াছিল। বানান করিয়া করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পত্রখানি পড়িলাম। কি সর্বনাশ! বীহার ভয়ে সারা হইতেছিলাম, এ যে তাহাই। স্বামী লিখিয়াছেন,—“সোমবারে এখানে আসিয়া দেখি, বাবুর মেজ ছেলে বাড়ী আসিয়াছেন। কি সুন্দর রূপ! শাস্ত, সূশীল ও মিষ্টভাষী, আজ কয়দিন মাত্র আলাপ হইয়াছে, ইহাতেই তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্ত্রায় ভাল বাসেন। আমি তাঁহার অমায়িকতাগুণে মুগ্ধ হইয়াছি। দেড় বৎসর তিনি দেশে ছিলেন না—কানপুরে তাঁহার পিতার এক কল আছে, সেইখানে থাকিয়া তাহা দেখেন শুনেন। তবে লোকে অল্প কথা কয়—বলে, তাঁহাব স্বভাব অতিশয় খাবাপ হওয়ার তাঁহার বাপ তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়া ছিলেন—আমি কিন্তু তাহা বিশ্বাস করি না। সে বাহা হউক, তোমার সহিত তাঁহার দেখাশুনা হইল কেমন করিয়া? তোমার পিতা মাতার কৃত্ত কত হৃৎ করেন, নিত্য আমার মুখে তোমার কথা শুনিতে ভাল বাসেন, মাঝে মাঝে কত সুখ্যাতি করেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি একবার এখন তুমি কেমন গৃহিণী সাজিয়া ঘরকন্না করিতেছ তাই দেখিবেন। তাই কিছু খবচ দিয়া এই লোক পাঠাইলাম। কাল তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমি যাইব। বড়লোকের ছেলে—বেন আহাঙ্গাদি বিষয়ে কষ্ট না হয়।”—

আরও অনেক কথা লেখা ছিল—আমি কেমন আছি, গুৰ্ত্ত্ব শিশু কেমন আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি;—কিন্তু সে সব পড়িতে আর আমার শক্তি ছিল না। আমাব বকের ভিতর ছপ্ ছপ্ করিতে লাগিল, জিত আমূল শুকাইয়া আসিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল—চারি দিক্ অন্ধকার দেখিয়া সেইখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

লোক বিদায় হইয়া গেল। আমি ‘বড় অসুখ করিতেছে’ বলিয়া বিছানায় গিয়া শুইলাম। গায়ে যেন বিছার কামড় জ্বলিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক লহমার জন্তও চক্ষু বুজিল না। শব্দ্যাকটকের স্ত্রায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌কট করিতে লাগিলাম।

পরদিবস সন্ধ্যার সময় স্বামী গৃহে আসিলেন। তখনও আমি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌কট করিতেছিলাম। আমাকে অল্প দিনের স্ত্রায় দ্বারদেশে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে অনেক সামগ্রী ছিল,

সেইগুলি মেজের উপর ঢালিয়া আমার শিরবে আসিবা বসিলেন। আমার তখন বেশ সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু তবু কে জানে, মাথার ভিতর কি গোলমাল হইয়া গেল—লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম—“কে—কে তুমি—সতীশ ?”

স্বামী বলিলেন—“না, আমি ; সতীশ বাবু বাহিরে আছেন।”

আনি কিছু না বলিয়া একবার কটমট করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম। আমার রকম দেখিবা তিনি অবাক হইয়া গেলেন। এই সময়ে ঠাকুরঝি সেই গৃহে আসিলেন।-তাঁহাকে দেখিয়া আমি মাথাব কাপড় দিতেও ভুলিয়া গেলাম। বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে স্বামী মিজ্ঞাসিলেন,—“এ কি ! হঠাৎ এ কি সর্বনাশ !”

ঠাকুরঝি ইঙ্গিতে তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন—“কি জানি ? কাল হইতে এইরূপ হইয়াছে। ছেলেমানুষ, বদিলে শুনে না, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, গার মাথার কাপড় খুলিয়া থাকে—নিশ্চয়ই কোনও ‘উপরি’র দৃষ্টি হইয়াছে। তা, ভয় নাই—একটু জল পড়িয়া দিলে ও রূপো চাঁড়ালকে ডাকিয়া ঝাড়াইলেই সারিয়া যাইবে।”

স্বামীর আর হাত-পা ধোয়া হইল না। তিনি সতীশকে ভিতরে ডাকিয়া হাত মুখ ধুইবার জল দিয়া, সংক্ষেপে বিপদের কথা জানাইলেন। তাঁর পর, বিস্তর অনুবোধ করিয়া, সতীশকে জল খাইতে বসাইয়া, আপনি সেই ধূলা-পায়েই রূপো চাঁড়ালকে ডাকিতে গেলেন।

তখনও স্বামী কিরিয়া আসেন নাই, ঠাকুরঝি রান্নাবরো রান্নাবান্না লইয়া ব্যস্ত আছেন, জলবোগান্তে সতীশ একবার আমার দরজায় আসিয়া উঁকি মারিল। আমি তখন সেই দিকেই চাহিয়াছিলাম—পরস্পর চোখোচোখি হইল। চীৎকার ছাড়িয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

চীৎকার শুনিয়া ‘কি কি’ করিতে করিতে ঠাকুরঝি দৌড়িয়া আসিলেন। চোবের স্তায় সতীশ সরিয়া গেল। আচম্ভক! লাফাইয়া উঠিতে আমার উদরে বড় বেদনা লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে স্বামী ওঝা লইয়া ফিরিলেন। সে কত ঝাড় ফুক করিল, কত ঘটি ঘটি জল গিলাইল ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উদরের বেদনা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলাম।

যেখানকার অন্নব্যঞ্জন, সেইখানে পড়িবা রহিল। অন্যদ্বারে সকলের

সমস্ত রাজি বসিয়া কাটিল। কাটা কর্তৃকৃতের ভায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ভোর বেলা এক মৃত্যুৎ সন্ধান প্রসব করিলাম।

ঠাকুরঝির পাঁথের আন্তরাজে বুঝিলাম, হতভাগিনীর গর্ভে এক হতভাগ্যর জন্ম হইয়াছে। তাব পর কি হইল আর কিছুই বুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। ধীবে ধীরে সর্ব শরীর অবশ হইয়া স্তানরহিত হইয়া পড়িলাম।

কতদিন অচেতন অবস্থায় ছিলাম, জানি না; কিন্তু যে দিবস চৈতন্ত হইল, চাহিয়া দেখি, গৃহে অগ্নি জলিতেছে, পার্শ্বে বসিয়া স্বামী আমার স্তম্ভা কবিত্তেছেন, আর অদূরে দাইয়ের কোনে সারাহকমলভূল্য একটি ক্ষুদ্র শিশু শুইয়া বহিবাছে। মায়ার কি মোহিনী শক্তি, শিশুব প্রতি চাহিবামাত্র মুহূর্তের অন্তর আমার যেন সকল কষ্ট দূরে গেল। ধাত্রীর নিকট হাত পাতিয়া শিশুটিকে চাহিলাম। সে আমার আগ্রহ দেখিয়া তাহাকে আমার হস্তে দিল। অতি যত্নে এই হাতে সাপটিয়া বুকেব উপর রক্ষা করিলাম। সেই ক্ষুদ্র শিশু কি যাহ জানিত, জানি না,—ধীরে ধীরে আমার সর্বশরীরে যেন মৃতসঞ্জীবনী সূধা ঢালিয়া দিল। শিশুকে বুকে করিয়া, তাহার মুখে স্তন দিয়া নিমেষের মধ্যে আমি সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম।

সেই দিন বৈকালে ডাক্তার আসিয়া—ডাক্তার নিত্য দুইবেলা আসিতে-ছিলেন—বলিয়া গেলেন, আর তাহাকে আসিতে হইবে না, ঔষধ খাওয়াই-বার আর প্রয়োজন নাই, জৈবরূপায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি।

৩৩

১৭

দেখিতে দেখিতে আমি বেশ সারিয়া উঠিলাম। স্বামীর আহ্বানের নীনা নাই। দেখাদেখি ঠাকুরঝিরও আনন্দ ধরে না। ক্রমে শিশুর যজ্ঞপূজা হইয়া গেল। আমি আঁতুড় হইতে বাহির হইলাম। বাহিব হইয়া দেখিলাম, যে মাঝে মাঝে প্রায়ই ভাবে ভারে জ্বালাদি আসিয়া থাকে। তাহা কোথা হইতে আসে, কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া একদিন ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুরঝি বলিলেন, “আর কোথা হইতে আসিবে, দিদি? এ সব জিনিষ-প্রায় সেই সতীশবাবু পাঠাইয়া দেন। এত নিষেধ করি, কিছুতেই শুনেন না। আহা, অমন গুণের ছেলে আর দেখি নাই। তোমায় যে আবার ফিরিয়া পাইয়াছি, সে কেবল তাঁহারই অমুগ্রহে।”

কাছে বসিয়া স্বামী তাহা শুনিতেছিলেন, বলিলেন—“তা আর একবার বলিতে? সতীশের ঋণ আমি কিছুতেই শোধ দিতে পারিব না। এত খরচ-

পত্র করিয়া, এই বিপদ ঠেলিয়া উঠা কি আমাদের কাজ ? নিরুপায়ের ভগবানই উপায় করিবা দেন । নহিলে সে কেন আমাব জন্ত এত করিবে ? সতীশ আমার কে ?”

আবাব সেই সতীশ—সতীশ—সতীশ । সে যে কেন এত কবিত্তেছে, তাই বুঝিলাম । বুঝিলাম সে আঠাকাটি দিয়া আমায় ধরিবার চেষ্টা করিতেছে । কি জানি, বিধাতার মনে কি আছে ! আমি অন্তরে শিহরিয়া উঠিলাম ।

এক মাস গত হইয়া আবাব কয়েক দিন গিয়াছে, হঠাৎ স্বামী একদিন বৈকালে নীলরতন বাবু নামাক্ত একখানি পত্র আনিয়া আমায় পড়িতে দিলেন । নীলরতন বাবু স্বামীকে লিখিতেছেন,—“এই মাত্র কানপুর হইতে সংবাদ পাইলাম, সেখানকার দুই জন সরকার তহবিল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে । কত টাকা গিয়াছে, তাহার হিসাব হয় নাই । উমাচরণ (বাবুর স্মৃতিপুত্র) গীড়িত, সতীশ ছেলে মানুষ, তাহার উপর ততটা নির্ভর করিতে পারি না ; অতএব কলাই মেলাট্টেণে তোমাকে সেখানে বাইতে হইবে । দেখবেচ্ছায়, এখন তোমার বাড়ীর সংবাদ অনেক ভাল, অতএব প্রাতেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে অন্তথা করিবে না ।”

পত্র পড়িলাম, কি এক অনির্দিষ্ট অশঙ্কার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল । ব্যাকুল হইয়া বলিলাম—“তার পর ?”

স্বামী বলিলেন,—“তার পর আর কি ? প্রত্যুষেই রওনা হইব । এমন মনিবের কথা কি অবহেল্য করিতে পারি ? বিশেষ হিসাব দেখা—ভরসা করি, সপ্তাহের বেশী বিলম্ব হইবে না ।”

রাজি না পোহাইতেই স্বামী সসজ্জ হইয়া বিদায় মাগিলেন । হায় আমি অভাগী কেন বাইতে দিলাম—কেন ধরিয়া বাধিলাম না ? অগ্রে শিশুবন্ধে একটি চুষন করিয়া, আমাব অধবে একটি চুষন করিলেন । সে চুষনের কথা মনে হইলে এখনও আমি পাগল হইয়া যাই—এখনও তাহার উচ্ছ্বাস অধরে অনুভব করি—হায় সেই চুষন তাঁহার শেষ চুষন !

সপ্তাহ কাটিয়া গেল—কেবল দুইখানি চিঠি পাইলাম—স্বামী আসিলেন না । শেষপত্রে বুঝিলাম, তাঁহার আসিতে এখনও বিস্তর বিলম্ব হইবে । শিশুটি অকালে হইয়াছিল—বড় রূপ ও দুর্বল হইয়াছিল । এমন যে রং, তাহাও

কেমন কঁচাকাশে হইয়াছিল। অল্পখ একদিনও ছাড়া ছিল না। আমি তাহাকে লইয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম।

একদিন সতীশ আমাদিগকে দেখিতে আসিল। সে একেবারে বাড়ীর ভিতর আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। আমি তখন আহুড় গায়ে পুত্রকে স্তন দিতে ছিলাম। তাহাকে দেখিবামাত্র গায়ে মাথার কাপড় দিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিলাম। আমার দিকে চাহিয়া সে ঈষৎ হাস্ত করিল। সেই সর্ব্বনেশে হাসি। শিহরিয়া আমি ছুতা করিয়া ঘরের ভিতর উঠিয়া গেলাম।

তার পর হইতে সতীশ বড় ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহার সহিত ঠাকুরঝির বড় ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মনে মনে সন্দেহ হইল। সন্দেহ হইবার কারণ, একদিন ঠাকুরঝি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “হাঁ গা, বৌ, ও তোর কি রকম আক্কেল? সতীশ তোর দেওরের মত। তা, দেওরের সঙ্গে কথা কহায় দোষ কি?” আমি বুঝিলাম, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। বলিতে ফ্রি-সম্প্রতি তাহাকে ঘন ঘন দেখিতে দেখিতে, আবার ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। বুঝি আর সামলাইতে পারিলাম না। ঘরে গিয়া উর্দ্ধমুখে যুক্তকরে সজলনয়নে মাঝে মাঝে ভগবানকে কতই ডাকিতাম,—‘হে দুর্ব্বলের বলদাতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, এ দুর্ব্বলকে বল দাও, এই আশ্রয়হীনের সহায় হও।’ আমি হতভাগিনী—হতভাগিনীর প্রার্থনায় বিধাতা কর্ণপাত করিলেন না।

একদিন গীত্ৰকালে ছুই প্রহরের সময় শিশুটিকে লইয়া ঘরের মেঝের আলুখালু অবস্থায় শুইয়া ঘুমাইতেছিলাম—নিদ্রাতঙ্গ চাহিয়া দেখি, পার্শ্বে বসিয়া সতীশ ধীরে ধীরে আমার বীজন করিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। নিলজ্জ সতীশ আমার হাত ধরিল। সেই স্পর্শে আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। সর্ব্ব শরীর কেমন করিতে লাগিল, একটিও কথা কহিতে পারিলাম না। হাতের ভিতর হাতখানি ঘামিতে লাগিল।

সতীশ তাহার গাত্ৰবস্ত্র উন্মোচন করিয়া গলগল সেই চেন-হার দেখাইল। বলা বাহুল্য, অনেক দিন হইতে আমি তাহার প্রদত্ত সেই হারছড়া খুলিয়া রাখিয়াছিলাম। সে বলিল, “কতদিন আমার দেখিতে মাধ হইয়াছে, সে হার তোমার গলায় আছে কি না। তুমি তাহা অনায়াসে খুলিয়া ফেলিয়াছ, কিন্তু চাহিয়া দেখ, আমি তাহা তেমনই ঘরে কণ্ঠে রাখিয়াছি; চিতা শয্যায় না শুইলে ইহা কখনই কণ্ঠচ্যুত হইবে না।”

পূর্বকথা শ্রবণ করিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। নির্ভুর সতীশ বলিতে লাগিল—“বিধাতাব বিড়ম্বনা, তোমার বিবাহের সময় আমি দেশে ছিলাম না, নহিলে এ বিবাহ হইতে দিতাম না। কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডিবার নয়। যাহা হইবার হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমার সহিত একবারে অপরিচিতের স্ত্রী-ব্যবহার করা তোমার উচিত নয়।”

হৃদয় চিত্ত তখন বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তখন চেতন ছিলাম কি অচেতন ছিলাম, কিছুই মনে করিতে পারি না। বৃষ্টি, চোখ দিয়া আরও জল পড়িয়াছিল, বৃষ্টি, মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; সহসা আমার পতনোন্মুখ দেহ সতীশ ছই হাত দিয়া জড়াইয়া ধবিল। মাথাটা ঘুরিয়া গিয়া তাহার বুকের উপর পড়িল।

আমি আমার সর্বস্ব ধন হাবাইলাম।

১২

সতীশ ক্রমে বাড়ীবাড়ি আরম্ভ করিল। সে আর বাড়ী বাইতে চাহে না। দিন নাই রাত্রি নাই, আমাদের বাড়ীতেই পড়িয়া থাকে। ঠাকুরঝির আদুর বন্ধের সীমা নাই। সতীশ যে তাঁহাকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

কখনোখন আমার বড় আশ্বাসানি উপস্থিত হইত। ঘরে দোর দিয়া মাথা কুটিতাম, গালে মুখে চড়াইতাম, কাঁদিয়া মেঝে ভাসাইয়া দিতাম। সে সময় সতীশের নাম করিলে রাগে সর্কাজ জলিয়া যাইত। আবার কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে প্রাণের ভিতর কেমন ছটকটানি ধরিত। ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া সে আশ্বাসানিও কমিয়া আসিতে লাগিল।

পূর্বের স্ত্রী তখনও স্মৃতি মাঝে স্বামীর পত্র আসিত—পত্র আমার নামেই আসিত, আমি কিন্তু আর তাহা পড়িতে সাহস করিতাম না; পত্রের নাম শুনিলেই কেমন বুক গুরগুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। শিশু কাঁদিয়া সারা হইলেও আর তাহাকে কোলে লইতে পারিতাম না। তাহার পানে চাহিতেও যেন কি আতঙ্কে আমার শরীর শুকাইয়া যাইত। মজকে ক্ষত হইলে কুকুরী যেমন কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না, আমিও তেমনি কি করিব কিছুই ঠিকানা পাইতাম না।

এ দিকে ক্রমশঃ লোকে কাণাঘুবা আরম্ভ করিল। একদিন আড়ে আড়ে ছই একজন বেশ দীঘা ছ কণা শুনাইয়া দিল। পাড়ার ছেলের দল

সতীশকে একদিন অন্ধকার রাত্রে ঠেঙ্গাইবে বলিয়া পরামর্শ আঁটিল। গতিক দেখিয়া সতীশ আমাকে বলিল,—“সব তো শুনিতেছ, আর একরূপে থাকা অসম্ভব। চল, অতঃপর চলিয়া যাই।” প্রথমে আমি বাজি হইলাম না। ছুই একদিন বলিতে বলিতে ইতস্ততঃ করিলাম। শেষ মত দিলাম।

গোপনে গোপনে সব ঠিক করিয়া সে দিন শেষ রাত্রে আমরা উঠিলাম। পুত্রকে কেলিয়া যাইব, ইহাই স্থির করিবাছিলাম—কিন্তু যাইবাব সময় একবার তাহার মুখখানি না দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। সতীশ গহনার বাক্স লইয়া দবজার নিকট দাঁড়াইয়া—আমি চক্ষুধ্বংস মার্জনা করিতে করিতে ঘুমন্ত পুত্রের মুখখানি চূষন করিতে যাইব, এমন সময়ে হঠাৎ শিশু কাদিয়া উঠিল। ভয়ে আমি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলাম। ভয়ের কারণ, পাছে নন্দিনী আগিয়া উঠেন। তিনি আমাদের এ পলায়নের কথা জানিতেন না। তিনি সহস্র সতীশের পক্ষ অবলম্বন করুন, ইহা জানিতে পারিলে কখনই আমরা পলাইতে পারিতাম না। সতীশও সেই ভয়ে আমার হাত ধরিয়া টানিল।

নিঃশব্দে অন্ধকারে অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া আমরা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

২০

ছয় মাস হইবে কলিকাতায় আসিয়া বড় রাস্তার ধারে একটি ছোট খাট অথচ দিবা পরিষ্কার দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়া আমরা বাস করিতেছি। কলিকাতা মহর—কে কাহার সংবাদ রাখে?—তবু ছাদে উঠিয়া বাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলে, তাহারা আমাদের পতি-পত্নী বলিয়াই জানিয়াছে। সতীশ আমাকে বড় আদরে রাখিয়াছে। মুখের কথাটি না খসিতেই সে আমার ইচ্ছা পালনে প্রাণপণ করিতেছে। ছুই জন মিশনারি জীলোক আসিয়া নিতা আমাকে লেখাপড়া ও পিয়ানো বাজান শিক্ষা দেন। অল্প দিনের মধ্যে আমি বেশ পিয়ানো বাজাইতে শিখিলাম। বর্ষে দুই পুস্তক দিয়া সতীশ শিক্ষয়িত্রীকে বিদায় দিল।

ফল কথা, আমার জন্ত সতীশ অকাতরে অর্থব্যয় করিত—কিন্তু এত অর্থ সে কোথায় পাইত, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। তবে ধবচেব অভাব হইলে মাঝে মাঝে সে বাড়ী যাইত, আবার ছুই দিন না যাইতেই প্রচুর অর্থ লইয়া ফিরিয়া আসিত।

এক দিন এটা বাজিয়াছে—আপিস হইতে লোকজন বাসায় ফিরিতেছে—

সতীশ দুই দিন হইল টাকার জন্ত বাড়ী গিয়াছে—একেলা প্রাণটা বড় উড়ু উড়ু করিতেছিল—জানালার ধারে বসিয়া আমি পিয়ানো বাজাইয়া একটি গান করিতেছিলাম—হঠাৎ পিয়ানো কেমন বেহুবো বলিল, গান 'অস্তরার' এক চরণ না গাহিতেই কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধামিয়া গেল। অকস্মাৎ আমাদের সিঁড়ির উপর ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখি, হাঁপাইতে হাঁপাইতে সতীশ ছুটিয়া আসিতেছে, আর তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া দুই জন পুলিশের লোক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়া, অবাক হইয়া আমি সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আমাকে দেখিয়া, সেই পুলিশের লোকেরা বলিল, “আপনি কি এই বদ-মাবেসের স্ত্রী? আপনি গৃহে যাউন, আমরা ইহাকে ধরিয়া লইয়া বাইব।”

লজ্জাব মাথা খাইয়া আমি বলিলাম—“ইনি কি করিয়াছেন, তোমরা ইহাকে ধরিবে কি জন্ত?”

তাহারা বলিল, “এ চোর। প্রায়ই মাঝে মাঝে বেজালয়ে গিয়া, তাহাদিগকে মদ খাওয়াইয়া ধাংস করিয়া লইয়া পলায়ন করে—কাল রাত্রে সোণাগাছিতে ঐকপ এক বেজালয়ে চুরি করিয়াছে—আমরা—”

সতীশ ক্রিয়া উঠিল। বলিল, “অত কথাষ তোদের কান্না কি? আমি ধবা পড়িয়াছি, আমার থানার লইয়া চল।”

আমার নিকট তাহার বিজ্ঞাবুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ার সে বোধ হয় লজ্জা পাইরাছিল। যাহা হউক, সব বুদ্ধিতে পারিয়া আমি দুই হাতে রূপাল টিপিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলাম।

বাহিরে দরজার কাছে বিস্তর লোক জমা হইয়াছিল। সতীশকে ধরিয়া যখন বাহিরে লইয়া গেল, তখন বড় একটা গোল উঠিল। অনেক জন ধরিয়া সে গোলমাল চলিতে লাগিল। একটু সামলাইয়া আমি একবার রাস্তার দিকের খড়খড়ি টানিয়া নীচের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, সতীশের দুই হাত বাঁধিয়া পুলিশের লোকেরা টানিয়া লইয়া বাইতেছে, মাঝে মাঝে বুঝা-ঝাঝা, গুতাটা গাতাটা যে দিতেছিল না ভাস্ক নহে। সঙ্গে সঙ্গে আগু পিছু বিস্তর লোক ছুটিতেছে—কেহ গালি দিতেছে, কেহ মাঝিতে বাইতেছে, কেহ পূর্ক হইতেই তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছে। অগোমুখে মাটির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া সতীশ চলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে তাহার দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া পড়িল। বিকলহৃদয়ে

উদাসনেত্রে ইতস্ততঃ চাহিয়া আছি—এমন সময়ে দুবে রাত্তার অপব পারে
 গ্যাসেব স্তম্ভে হেলান দিয়া—শীর্ণদেহ, মলিনবসন, ক্লম্বকেশ, উন্মাদাকার—ও
 কেও ? মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। জোর করিয়া
 আবার চাহিলাম।—সেই—সেই—সেই !

মুচ্ছিতা হইয়া আমি সেইখানে পড়িয়া গেলাম।

২১

যখন চৈতন্ত হইল, তখন রাত্রি চম্ চম্ করিতেছে। সে কোলাহল, সে
 লোকের সাড়া শব্দ থামিবা গিয়াছে। স্তব্ধ নিশীথের কি এক অনির্কচনীয়া
 বিরাট গম্ভীরতা চারি দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কদাচিত্ হই এক খানা শক-
 টের ষড় ষড় শব্দ, পাহারাওয়ালার মম্ মম্ শব্দ ও নিশাবিহারী হই এক জন
 বাবুর বিকট হাস্য শ্রুত হইতেছে। তদ্বিষয় সমস্ত নীরব, নিস্তব্ধ, স্তব্ধ। ধীরে
 ধীরে উঠিলাম। তখনও ষড়ষড়ির পাখি খোলা ছিল। একবার সেই রাত্তার
 দিকে চাহিলাম—বিস্তৃত রাজপথ পথিকগণিত্যক্ত হইয়া মুচ্ছিতবৎ পড়িয়া
 রহিয়াছে। অপর পারে সারি সারি গ্যাসালোক জলিতেছে, হই এক জন
 লোকও যে দেখা বাইতেছিল না, তাহা নহে। কিন্তু যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূর
 ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া দেখিলাম—কোথাও সেই প্রাণসর্ব্বস্বের দেখা পাই-
 লাম না।

অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম।
 প্রাণেব তিতর বে ভয়ানক বাতনা হইতে লাগিল, তাহা বচনাভীত। ক্ষিপ্তার
 ভ্রায় হই হাতে চুল ছিঁড়িতে লাগিলাম, কত মাথা কুটিলাম, গালে মুখে চড়াই-
 লাম, সজোরে বুকের উপর করাঘাত করিয়া হাহাকাব করিতে লাগিলাম।
 হায় হায়, আমি কেন মবিলাম না ? কেন সেই পবনদেবতা অন্তর্ধান হইতে
 না হইতে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে এ ছাব প্রাণ ত্যাগ করিলাম না ?
 আবার কেন বাচিলাম ? কিন্তু মরিলে তো ফুরাইয়া গেল, পাপিনীর পাপের
 দণ্ড হইল কৈ, আমার দেখিয়া অপরের শিক্ষা হইল কৈ—তাই বৃদ্ধি বিধাতা
 তত শীঘ্র এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে মৃত্যু লিখিলেন না। আমি নষ্টবুদ্ধি, কাকন
 ফেলিবা কাচ লইয়া ভুলিয়াছিলাম, পবিত্র গঙ্গাধূল ত্যাগ করিয়া পঙ্কিল কূপে
 ডুবিয়াছিলাম, দেবতার অনাদর করিয়া অশ্রুবেগ পূজা কবিয়াছিলাম—আমাব
 শাস্তির এখনও হইয়াছে কি ? হে অবলার গতি, ইহপরলোকের সারসর্ব্বস্ব,
 কোথায় তুমি ? আমি মন্দভাগিনী তোমায় চিনিতে পারি নাই, তোমাব

অপার্থিব আদর উপেক্ষা করিয়াছি, সেই অসীম ভালবাসা তাচ্ছিল্য করিয়াছি, পিশাচিনী আমি,—দেবতার মহিমা কি বুঝিব? অতি সংকীর্ণ এই প্রাণ, তোমার সেই অগাধ অপরিমেয় প্রেমপারাবারের স্থান ইহাতে হইবে কেন? কলঙ্ককালিমায় এ হৃদয় পরিপূর্ণ, তোমার সেই স্নেহপ্রফুল্ল পবিত্র হাসিব পবিত্র ছায়া ইহাতে প্রতিফলিত হইবে কেনন করিয়া? হে দয়াময়, স্নেহময়, প্রেমময়—তুমি তো দাসীর প্রতি কখনও নিদয় হও নাই। দয়া করিয়া আর একবার আসিয়া দেখা দাও। তোমার সেই ছলিত চরণপ্রান্তে মাথা রাখিয়া এই পাপজীবন বিসর্জন করি।

কাদিয়া মেঝে ভিজাইলাম, কিন্তু তবু হৃদয়ে শান্তি পাইলাম না। যত কাদি—ততই সেই সব পূর্বের কথা মনে পড়ে, আব থাকিবা থাকিয়া অচিব-দৃষ্ট তাঁহার সেই উন্মাদমূর্তি চোখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়—এ মূর্তি কি আমারই জন্ত?—কি ভীষণ পবিত্বজন!—নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্রাণিত করিয়া দর দর ধাবার অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সে অমৃতপের জ্বালা বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। এক এক বার মনে মনে আত্মহত্যার কল্পনা উদ্ভিত হইতে লাগিল—কিন্তু সাহস হইল না—তাহা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিলাম। আর এক স্থানে বসিয়া থাকিতে পাবিলাম না।

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিয়াশালি লইয়া আলো জালিলাম। সামনেই একটি মেহয়ি কাঠের আলুমারি ছিল, দেখিলাম তাহা খোলা—আর তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি কতক ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে। এক ধারে গহনাব বাক্সটাও ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। একবার আপনাব অঙ্গের প্রতি চাহিলাম, দেখিলাম, হাতে বালাগাছটি প্রাণান্ত নাই। বুঝিলাম, এ সমস্তই ষি চাকরের কাজ—আমার মূর্ছাবস্থায় তাহার সন্মত লইয়া পলায়ন করিয়াছে। কিছুতেই অক্কেপ-মাত্র না করিয়া আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিলাম। সেই গভীর নিস্তরু নিলীখে জনশূন্য রাজপথে আমি একাকিনী চলিতে লাগিলাম। যে ছই এক জন সামনে পড়িল, আমার মূর্তি দেখিয়া তাহার বড় একটা কিছু বলিল না।

সুগ্ৰাহ ধরিয়া আতি পাতি করিয়া, সহরের গলি ঘূঁজি কত খুঁজিলাম। কত লোক কত কটু বলিল, দুব ছাই কবিল, কত লাজনা সহিলাম—কিন্তু এত কবিনাও কোথাও সেই সর্বশাস্তিদাতা জীবিতনাথের দেখা পাইলাম না।

কাঁদিয়া আকুল হইলাম। একবার গৃহে গিয়া অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইল। কোন্ মুখে আবাব গৃহে ফিবব, তাহা ভাবিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে কষ্টে দিনরাত্রি ধরিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া ক্ষতবিক্ষতচরণে দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল—ঘে ঘাহার গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া আপন আপন কার্যে নিযুক্ত ছিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। সেই অনতিদূরস্থ বাড়ী সন্ধ্যার অন্ধকারে বিকটমূর্তিতে দাঁড়াইয়া বেন গিলিতে আসিতেছে। সেই চিরপরিচিত গৃহের দশা দেখিয়া প্রাণ আরও কাঁদিয়া উঠিল। সহসা পুত্রের অস্ত্র বড় অস্থির হইয়া পড়িলাম। হায়, সেই ক্ষীণকায় হুর্লগ শিশু আজিও কি বাঁচিয়া আছে? আবার কি তাহাকে দেখিতে পাইব? আবার কি সে সেই প্রাণজুড়ান মধুর স্বরে মা বলিয়া ডাকিবে?—আমি তাহার অধরে চূষন করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইব? মনের আবেগে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

বোধ হয় তখন ননদিনী খিড়কীর বাহিরে গিয়াছিলেন—কাহারও সড়া শব্দ পাইলাম না। দেখিলাম, আমার সেই ঘরে একটি আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছে। কোন দিকে না চাহিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। অতি মলিন ছিন্ন শয্যাব উপর শুষ্ক পদ্মের স্ত্রার শিশু নিস্তব্ধে শুইয়া রহিয়াছে—দৌড়িয়া গিয়া সেই বিছানার উপর বসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। বুকে চাপিয়া চাপিয়া কতই চূষন করিলাম, মুখের উপর মুখ দিয়া কত রোদন করিলাম। শিশু নীরবে উর্দ্ধমুখে একবার কাতর নয়ন ছুটি তুলিয়া “মা” বলিয়া জ্বোরে একটি শব্দ করিল।

শব্দ শুনিয়া ননদিনী দৌড়িয়া আসিলেন। গৃহে ঢুকিতেই আমাকে দেখিয়া শিহরিয়া বাহিরে গেলেন। মুহূর্ত্ত পরে আবার তিনি ফিরিয়া আসিলেন—তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেখিলাম—প্রাণেশ্বর! চোখোচোখি হইল। একটা মর্ম্মভেদী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, দুই হস্তে চক্ষুর্ধ্ব আবরণ করিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা গেল—কে বেন দুই পায়ে লোহনিগড় বাধিয়া টানিয়া রাখিল। ফিরিবার কালে আর একবার দেখিবার অস্ত্র ভাল কবিয়া চক্ষু মেলিতে গেলাম—কে বেন তত্ত শলাকা দিয়া দুই চোখ বিঁধিয়া দিল।

তখন, তর্জ্জন করিয়া ননদিনী—আমাব সর্ব্বনাশেব মূল সেই ননদিনী—

“কালামুখী, আবার কি করিতে আসিয়াছিস্—দে, ছেলে দে” বলিয়া আমার

কোড় হইতে পুত্রকে কাড়িয়া হইতে গেলেন। পুত্রের গায়ে হস্তস্পর্শ হইবামাত্র তিনি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হরি হরি হরি—পুত্র নাই।

সব বুঝিলাম। ননদিনীর সঙ্গে আমিও ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে গেলাম—কান্না বাহির হইল না। হৃদপিণ্ড পুড়িয়া ছাই হইতেছিল—চোখ দিয়া এক বিন্দুও জল পড়িল না। স্বাণুবৎ নিস্তব্ধভাবে পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই মৃত্যুবিবর্ণীকৃত শিশুর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

হায়, সে কত দিন হইল, সেই অবধি আজিও ছুটিয়া বেড়াইতেছি,—আলয় নাই, আশ্রয় নাই, লক্ষ্য নাই—কক্ষত্র উৎসাপিণ্ডের জায় নানাস্থানে ঘুরিতেছি—শত্রু মিত্র, আত্মীয় অনাত্মীয়, যে দেখিতেছে, সেই সর্পিঙ্গী ভাদিয়া পথ ছাড়িয়া অত্র দিকে চলিয়া যাইতেছে—দিন নাই, রাত্রি নাই, সদা সর্বদা হৃদয়গ মধ্যে এককালে চোরাশি নরকের ভীষণ জ্বালা জ্বলিতেছে—আর কত দিন—তোমরা কেহ দয়া করিয়া বলিয়া দাও—আর কত দিন এ জীবন্তে নরক ভোগ করিব? কত দিনে যন্ত্রণাময় এ দুর্দৈব ঘণিত জীবনের অবসান হইবে?

সমাপ্ত ।

কুরুক্ষেত্র ।

(সমালোচনা)

আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু কুরুক্ষেত্র পাঠ সমাপন করিয়া প্রসঙ্গতঃ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এতদিনে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে—যাহার রসাস্বাদের জন্য বিদেশীর বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। কয়েক মাস পূর্বে ‘নব্য-ভারত’ পত্রে এক বিজ্ঞ সমালোচক ‘কুরুক্ষেত্র’ নামে এই মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন—কুরুক্ষেত্রে ‘দেখিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা নবীন-চন্দ্রের মাদকতা বা কবিত্বের মিশ্রিত হইয়া আবাদিগের স্বর্গভ্রান্তি উপস্থিত করিয়াছে। এই দুই শক্তি যদি নবীন বাবুর নিদ্রা হইত, তবে বোধ হয় মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহার অনেক পশ্চাতে যাইতেন। কুরুক্ষেত্রের মৌলিক

কল্পনায় নবীন বাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিম বাবুব নিকট ঋণী।^১ বাঙ্গালী পাঠক এখন অবগত হইয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনা ও কবিত্ব উভয়ই কবির নিজস্ব, তাহার জন্ত কাহারও কাছে তিনি ঋণ গ্রহণ করেন নাই। * অতএব নব্য-ভাবতের সমালোচকের মতে নবীনচন্দ্রের আদর্শ মধুসূদন ও হেমচন্দ্রেরও উর্দ্ধে। আমার বিবেচনায় এ সকল কথার সুমীমাংসার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সমসাময়িক কবির স্থাননির্দেশ একরূপ অসামান্য। তবে এ কথা অনিশ্চিত যে, কুরুক্ষেত্র কাব্য অমৃত কাব্য, কুরুক্ষেত্রের কবি অমর কবি। এই সমালোচনায় এ কথার প্রমাণসিদ্ধতা কতকটা প্রতিপন্ন হইবে।

কুরুক্ষেত্র কাব্য প্রধানতঃ কুরুপাণ্ডবের রণক্ষেত্র সেই ধর্মক্ষেত্রের প্রসঙ্গ লইয়া বিরচিত। এ কাব্যের অঙ্কুর কবির রৈবতক কাব্যে। ইহার উপাখ্যান-ভাগ কতক অংশে ঐ রৈবতকের সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উল্লেখ রৈবতকে। উভয় কাব্যেই নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদেবের অতিমানুষ কীর্তিকথা গীত হইয়াছে। ‘বৈবতকের ভিত্তিভূমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আত্মলীলা; কুরুক্ষেত্রের ভিত্তিভূমি, তাহার অনন্তকালস্পর্শী মধ্যলীলা’। ভগবানের অনন্তলীলা—বাহার পূর্ণবিকাশ প্রভাসক্ষেত্রে—এখনও বর্ণিত হয় নাই। স্মরণ্য কুরুক্ষেত্র সম্পূর্ণ কাব্য নহে। উপাখ্যানের বিপর্যস্ত হৃৎকলি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। কাব্যের পাত্রভূত চরিত্র সকলের এখনও চরম পরিণতি সাধিত হয় নাই। সুভদ্রা, শৈলজা, দ্রুপদাকার, ব্যাস, দুর্দাসা, বাসুকি—কবির এই সকল মানস পুত্র পুত্রীর ভাগ্যনেমি এখনও শেষবিবর্তিত হয় নাই। কাব্যের লক্ষ্য এখনও অসিদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের উত্তরচরিত্র আলোচনার সময় আমরা আবার ঐ সকল চরিত্রের সাফাং লাভ করিব, আবার বিক্ষিপ্ত উপাখ্যানসূত্রের অন্তঃসরণ করিব, আর লীলানয়ের লীলাবসানের সহিত কাব্যের চরম সিদ্ধ হইয়া কাব্য সর্বাদীন অসম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

সেই সঙ্গে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাব্য-ত্রিকের যে মুখ্য প্রতিপাদ—গীতোক্ত নবধর্মপ্রচার ও খণ্ড-ভারতে ধর্ম-বাস্তব মহাভারত স্থাপন—তাহারও সর্বতঃ পূর্ণবিকাশ হইবে। কুরুক্ষেত্রে তাহার দূবে দূরে অবিস্পষ্ট ভবিষ্যৎ ছায়ামাত্র দেখি। ধরাতে এখনও ধর্ম-রাজ্য নির্মিত হয় নাই। কিন্তু তাহার উপাদান সকলই একত্রিত হইয়াছে।

১ কুরুক্ষেত্র ও নব ভাবত—“সাহিত্য” ৪র্থ বর্ষ ১: সংখ্যা ত্রয়ব্য।

শ্রীকৃষ্ণ করনচাক্ষে তাঁহাব ভাগীশোভ। প্রত্যক্ষ করিতেছেন ; সে শোভা
'অল্পপম অতুলন, তুলার নয়ন মন ।'

উঠিল সে অগ্নি হতে ত্রিভুবন আলো কবি	বিদগ্ধ অধর্মমল বজ্রবর্ণ কলেবর
সহাস্রাবতেব মুক্তি মাঠা রাজরাজেশ্বরী ।	অর্জুনু কিরীট শিবে, আশাস্ত্র ধনুঃশর,
নবধর্ম বেদীমূলে বসিয়া দেবতাগণ	সমবাস্ত শাসনাত্ত হইয়াছে প্রোভমান,
আর্য্য অনাধ্যৈরু ধ্যানে ; বেদীবক্ষে নিবপস্	চারি ভুজে চাবি বিস্ত্রে, ত্রিনেত্রে লিকালজ্ঞান
নিষ্কাশের মহামুষ্টি ; তদুপরি বিবাজিতা	ধর্মসাম্রাজীর সুখ অনন্ত মহিমা ছবি
অননী আনন্দময়ী অতুলপ্রতিভাধিতা ।	ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শান্ত বালনবি ।

কবি যে ভাবে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান ঘটনা অভিমত্যাযব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং কুরুক্ষেত্র কাব্যের প্রতিপাত্ত ঐ অভিমত্যাযব । সেই জন্ত ঐ প্রধান ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত ঘটনা অবাস্তরভাবে কার্য্য বা কারণ বা সহকারী রূপে সাগরোদ্গিষ্ট নদীর মত গ্রহ-অঙ্গে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ইহাব ফলে, অভিমত্যাযবে বোল সর্গ নিয়োজিত করিয়া, কবি/অত্যন্ত যুদ্ধবর্ণনা এক সর্গে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন । এই অর্গসমগ্র আপত্তির বিষয় হইবার সম্ভাবনা । শ্রদ্ধাঙ্গদ বঙ্কিম বাবু ১৮৮৩ সালে কাব্য-সুচনার খসড়া দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—‘আমার মনে হয় যে তোমার সৃষ্টিত্বিতীয় কাব্য (কুরুক্ষেত্র) যেন প্রথম ও তৃতীয় কাব্যের (রৈবতক ও প্রভাসের) একটা অবাস্তরমাত্র । দেখ, দ্বিতীয় কাব্যের প্রধান ঘটনা অভিমত্যাযব মৃত্যু । ইহাতে কাব্যের প্রতিপাত্ত ঘটনা (শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ্যের প্রতিকূলে নবধর্ম-প্রচার) বা দ্বিতীয় ঘটনা (ধর্মসাম্রাজ্য স্থাপন)—ইহাদেব কি বিশেষ অল্প-কুলতা বা প্রতিকুলতা হইল ? অতএব ইহা কেবল উপগল্পমাত্র । উপগল্পে কি তিন ভাগের এক ভাগ নিয়োজিত করা উচিত ?’

বঙ্কিম বাবু কাব্যের সূচনামাত্র দেখিয়া উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-ছিলেন ;—‘কুরুক্ষেত্র’ পড়িলে বোধ হয় ভিন্ন মত প্রবলমান করিতেন । কবি-একপ স্ককৌশলে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার কাব্য পড়িয়া স্থির ধারণা হয় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অভিমত্যাযব অবাস্তর ঘটনা নহে, প্রধান মূল ব্যাপার ।

সকলেই জানেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভে রথিষ্ঠেষ্ঠ অর্জুন উভয়-সৈন্তে-সুজন দর্শন কবিতা করুণ হৃদয়ে গাণ্ডীব ত্যজিয়া যুদ্ধ কবিতা না স্থির করেন । সুস্তর সমরসিদ্ধত্ববণে অর্জুনই পাণ্ডব পক্ষে বীরগণী ; তিনিই ভীষ্ম, দ্রোণের সমকক্ষ ; কর্ণ, অশ্বখামার প্রতিযোদ্ধা । কৃষ্ণ তাঁহাকে অজুত গীতাতত্ত্ব শুনাইয়া

তবে যুদ্ধে প্রবর্তিত করেন। কিন্তু তৎকথায় বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ হয়, হৃদয় সুস্থ হয় না। অর্জুন যুদ্ধ কবেন বটে, কিন্তু সেরূপ নহে, রণ-অভিনয়।

কিন্তু নাহি জানি হাব অর্জুন হৃদয়ে

যদি কোন ঘটনার ভীষণ আঘাত

কি ককণা পাবাবাব। বাড়বারি মত

নাহি করে সে হৃদয় কুলিশ কটিন

যদিও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম জ্বলে নিবন্তব;

এইকালে দ্রোণাচার্য্য যুত্মা অভিনয়

তথাপি পার্থিব কব করণায় লগ্ন

বিভীষণ, করিবেক আব কত দিন।

সেই কুলিশসংঘাত হইল অভিমত্যাধে।

অস্ত্রায় সমবে

সেই যেথ, বাড়বারি উত্তাল সাগরে,

কবে অন্ধ কোরবের) বজ্রাগ্নিসংকার

চক্ষু নিমিষে ভস্ম হবে কুকুল।

অভিমত্যাধের পর তাহাই হইল।

ছিল যেই রেখে সিদ্ধ অর্জুনের বীর্ঘ্যানল

হৃদয়ে হইল ভস্ম দ্রোণাচার্য্য পবাক্রম।

হবিলে কোবব সেই অভিমত্যা মেহজল

হুই দিনে কর্ণ আব—কর্ণ কবে নাহি বণ

উদগীর্ণ কবিল গিবি যে গৈবিক প্রস্তবণ

এক দিবসেব যুদ্ধে হত শলা দুর্ঘোষন।

কাপাইবা কুরুক্ষেত্র আচ্ছন্ন করি গগন

ঐতিহাসিক ব্যাপাবও বোধ হয় ঐরূপই হইয়াছিল। ভীষ্মের দশদিন যুদ্ধ,

দ্রোণের দুইদিন যুদ্ধ; তাহার পর অভিমত্যাধ। তাহার অন্তে পাঁচ দিবসের

মধ্যে যুদ্ধশেষ। অতএব কবি অভিমত্যাধকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেব মূল ঘটনারূপে

প্রতিপন্ন করিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক সত্যেব কিছুমাত্র অপলাপ করেন নাই।

‘কুরুক্ষেত্র’ কৃষ্ণলীলার দ্বিতীয় খণ্ড, ‘রৈবতক’ প্রথম খণ্ড। অতএব উভয়

কাব্যের তুলনায় একটু আলোচনা করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উভয় কাব্যই তিন ভাবে তিন দিক্ হইতে আলোচিত হইতে পারে;—ইতি-

হাসেব দিক্, দর্শনেব দিক্ এবং কাব্যের দিক্ হইতে। উভয় কাব্যের ইতি-

হাসাংশ, দর্শনাংশ এবং কাব্যাংশ তুলনায় আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইতি-

হাসাংশে রৈবতক শ্রেষ্ঠ; কাব্য, কৃষ্ণচরিত্রেব বে মৌলিক তত্ত্ব, নবধর্ম্মপ্রচাব ও

ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন, আর সেই উত্তমের প্রতিদ্বন্দ্বিকপে অবস্থিত অনার্য্য ও ব্রাহ্মণেব

মিলিত শক্তির সহিত আর্য্য ক্ষত্রিয়শক্তির সংঘর্ষ—সেই মূল কল্পনার আমরা

প্রথম পরিচয় পাই-রৈবতকে। রৈবতকে কবি প্রতিভা আমাদের এক অভি-

নব বিচিত্র কুতূহলময় অথচ ইতিহাসের অবিরুদ্ধ পুর্বাত্ত-জগতে উপনীত

করে। কুরুক্ষেত্র স্বতন্ত্র কাব্য নহে, সুতরাং এখানে আমরা সেই জগতেরই

প্রকাশে অবস্থিত হই। অবশ্য এ অংশও বৈচিত্র্যপূর্ণ, কিন্তু ইহা ভিন্ন জগৎ

নহে। অতএব ঐতিহাসিকের চক্ষে রৈবতকই উচ্চতর স্থান অধিকার করিবে।

কিন্তু তাহা হইলেও কুরুক্ষেত্রে কবি কৃষ্ণচরিত্র, কৃষ্ণের সাময়িক ভারত ও

অনার্য্য জাতি, বর্ণের জন্ম ও জীবন, এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে যে

সকল অভিনব যুক্তিযুক্ত প্রমাণসিদ্ধ ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন—তাহা যে কত চিন্তাশক্তি, গবেষণা ও তত্ত্বদৃষ্টির ফল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যুগস্থানে ঐ সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে।

দর্শনাংশে রৈবতক শ্রেষ্ঠ কি কুরুক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ, বলা কঠিন। উভয় কাব্যেই সরস দার্শনিকতা, ধর্ম, নীতি, সমাজ, সৃষ্টিতত্ত্বের কবিতাময়ী আলোচনা আছে। সরসতা অংশে বা গভীরতা অংশে কোন কাব্য শ্রেষ্ঠতর, স্থির করা যায় না। রৈবতকের ধর্ম ও কর্মতত্ত্ব, অদৃষ্টবাদ, অবতাবতত্ত্ব, বিবর্তবাদ এবং বিশ্বপক্ষে বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান শ্রেষ্ঠতর, না কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসনীতি, নিষ্কামধর্ম, ভক্তিতত্ত্ব, কর্মসংগ্রাম, নিরতি, মহাযুদ্ধ, স্বর্গতত্ত্ব এবং অমঙ্গলে মঙ্গলসিদ্ধি শ্রেষ্ঠতর, কিরূপে বলিব? যুগস্থানে এই দর্শনাংশ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

কিন্তু কাব্য্যাংশে কুরুক্ষেত্রের উচ্চতর স্থান প্রাপ্য। ভাব, ভাষা, অলঙ্কার, শব্দবিভাস, ছন্দের স্বাক্ষর, রসের অবতারণা প্রভৃতিতে কুরুক্ষেত্র বৈবতক হইতে উৎকৃষ্ট। চরিত্রসৃষ্টিতে কোন কাব্যের ক্ষতি, বলা যায় না। কারণ, উভাব ও অভিমুখ্য দুইটি অতিশুদ্ধ নূতন চরিত্র সম্মিলিত থাকিলেও, কুরুক্ষেত্রের অধিকাংশ চরিত্রের উন্মেষ বৈবতকে। কিন্তু তাহা হইলেও, সেই সকল চরিত্রের সঙ্গতি ও পরিণতি এমন স্নকৌশলে সাধিত হইয়াছে যে, রৈবতকে যাহা অষ্টমীর শশী ছিল, কুরুক্ষেত্রে তাহা পূর্ণিমার চন্দ্র হইয়াছে; যাহা ক্ষুদ্রা নির্ঝরীণী ছিল, তাহা স্রোতস্বতী মহানদী হইয়াছে; যাহা বহ্নিকণা ছিল, তাহা দাক্ষণ্য দায়াগ্রি হইয়াছে।

অতএব এই সমালোচনা তিন ভাগে বিভক্ত হইবে (১) কাব্য্যাংশ (২)

দর্শনাংশ (৩) ইতিহাসাংশ। প্রথম কাব্য্যাংশের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

(১) কাব্য্যাংশ।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে কাব্যের লক্ষণ এইরূপ—কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং, রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রস শব্দটা পাবিভাষিক, বোধ হয় বাঙ্গালায় ভাব শব্দ দ্বারা উহার অর্থ অনেকটা প্রকাশ করা যায়। বাক্যের অপব নাম ভাষা। অতএব কাব্যের লক্ষণ এইরূপ হইল—ভাবাত্মক ভাষাই কাব্য। ভাব বা ভাষা স্বতন্ত্রভাবে কাব্য নহে, কিন্তু উভয়ের অপূর্ণ দৈব-রাসায়নিক

১ কুরুক্ষেত্রের স্থানে স্থানে একটা উচ্চ অঙ্গের অপার্থিন কবি আছে যে, তাহার তুলনা বঙ্গ সাহিত্যে বিবল।

সংযোগই কাব্য। যেমন আত্মা বা দেহ স্বতন্ত্রভাবে মানবপদবাচ্য নহে, কিন্তু দেহনিবদ্ধ আত্মাই মানুষ।

ভাষার প্রধান উপাদান শব্দবিশ্বাস ও ছন্দের স্বাক্ষর। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে শব্দবিশ্বাস এমন স্নন্দর, কথার কথায় সংযোগ, শব্দে শব্দের অল্পবর্তন, বাক্যে বাক্যের সাপেক্ষতা এমন নিপুণ কৌশলময়, যে তাহার আলোচনায় কাব্য-মোদীর উৎকৃষ্ট চিন্তাপ্রসাদ অল্পভূত হয়। আর শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে ছন্দের এমন একটা মধুর স্বাক্ষর আছে, এমন একটা গম্ভীর আরাব, উচ্ছল প্রবাহ উলসিত গতি আছে যে, সে কাব্য আবৃত্তিমাতেই প্রাণের কানের ভিতর দিয়ে মনমে প্রবেশিত হইয়া হৃদয় স্খলবেশে আচ্ছন্ন করে। এ স্বাক্ষর অনুকরণেব সামগ্রী নহে। ইহা উৎকৃষ্ট কবির অসাধারণ সম্পত্তি। অতএব কবি ভাষার (শব্দবিশ্বাসে ও ছন্দের স্বাক্ষরে) যে পরিমাণে সৌন্দর্যের সমাবেশ থাকে, তাহার কাব্য তত উৎকৃষ্ট।

কুরুক্ষেত্রের ভাষা কিরূপ ?

প্রথম শব্দবিশ্বাসের কথা বলি। শব্দবিশ্বাসের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণে বুঝান যায় না। বিশ্লেষণ কর দেখিবে, এই চলিত কথা—যাহা কবি অংকবি সকলেই সর্বদা প্রয়োগ করে। শব্দবিশ্বাসে সংশ্লিষ্টের সৌন্দর্য্য, বিশ্লিষ্ট তাহা কোথা পাইবে ? অতএব কুরুক্ষেত্রের শব্দবিশ্বাসের সৌন্দর্য্য দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া বুঝাই।

ঘুমন্ত প্রতিভা-অন্ধে কুটিল সৌন্দর্য্য বধ।

সংসার মরুতে ঢালিবা অমৃত

কলগাব সন্ধ্যাকিনী।

দৈবায় ঘূর্ণণে যেন চিত্র পরদুঃখ।

রবি শশি বালুকণা, পাবাবার কুণ,

বন্দীকের স্তম্ভ যেন গিবি হিমবান।

আগে মৃত্ত পিছে মক মরু চারিদিকে

হুহু কবিতোহে মক প্রাণের ভিতবে।

কি অনন্ত প্রেমতৃষা নীরব সুধরা,

কি অনন্ত স্তম্ভ হুহু কি অনন্ত ভাষা,

কি অনন্ত নিরাশায় কি অনন্ত আশা

বনবালা কিশোরীবি প্রেম

সিরিহতা ক্ষুদ্রা নিরিরিগী।

হইরাছে আজি প্রাণনাথ

মহানদী ধবা বিদ্রাবিনী।

হায় হায় যেই জলধর

চালে বিশেষ অমৃত-আসাব,

একটু তাপিতা লতাবুকে

সে কি-বন্ধ কবিল প্রহার ?

জগতের অধিতীর, বীরত্বের ববি

হইল পূর্বাঙ্কে অত, কবিতা-জ্যোৎসনা

অধিতীবা নিবিল কি শুভ্রা দ্বিতীয়।

নবলোকে নিরুপমা সঙ্গীতের বীণা

নীরবিল অলোপের প্রথম উচ্ছ্বাসে ?

প্রকৃতির অভুলিতা তুলি বিনোদিনী

পড়িল কি খসি চিত্র প্রথম আভাসে ?

আর অধিক দৃষ্টান্ত শু পীকৃত করার আবশ্যক কি ? কাব্যমোদী পাঠক বোধ হয় অনুভব করিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্রে কথার কথায় সংযোগ, শব্দে শব্দের

অনুবর্তন, বাক্যে বাক্যের সাপেক্ষতা কেমন নিপুণ সুন্দর কৌশলময় ! আর, একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি—তাহার শব্দবিজ্ঞান বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয় ।
রনি অন্ত গেলো হায় । দিবা কি থাকিতে পাবে নির্ভর হইলে শুক, ধারা হয় অদর্শন ।
অন্ত গেলো শব্দধব, লয়ে যায় জ্যোৎসনারে । প্রদীপ হইলে শুয় শিখা কি কখন বয়
পাদপ হইলে ভস্ম ছায়া কি থাকে কখন । বাচে কি নলিনী যদি শুক হর জলাশয় !

এই স্থলে অবসর পাইয়া একটা কথা বলিয়া লই । কুরুক্ষেত্রের দুই তিন সর্গে গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই । বধা—বেটা, বগড়, পিট্টান, পাজি, গেছিরে, লক্ষ্মীছাড়ি, খোঁচা, মর্দানি ইত্যাদি । গ্রাম্য বলিয়া ঐ সকল শব্দের প্রয়োগে আমার কোন আপত্তি নাই । শব্দপ্রয়োগে একমাত্র প্রাণের কানই আমাদের নিয়ন্তা ; এ শব্দ কাব্যের উপযোগী, ইহা নয়, এরূপ কোন নিয়ম আমি স্বীকার করি না । প্রয়োগেব গুণে ইংলণ্ডে গিলটান এবং এ দেশে মধুসূদন অনেক গ্রাম্য শব্দকে উন্নত করিয়াছেন । কুরুক্ষেত্রে প্রযুক্ত কোন কোন গ্রাম্য শব্দ কোনই আগন্তির বিষয় হইতে পারে না । উত্তরার মুখে পিট্টান উন্নত, হুমহাম বেশ শুনার । সুলোচনাব জিহ্বায় কালামুখী মর্দানি বেটা কিছু অনুপযোগী নহে । কিন্তু অভিমত্ব্যর মুখে রগড় অথবা বিরাটের মুখে গেছিরে প্রাণের কানে বড়ই ব্যথা দেয় । চত্রে কলঙ্ক অথবা কনলে কাঁটার মত সুব-মার রাজ্য কুরুক্ষেত্রে গোটাকয়েক গ্রাম্য শব্দ বড়ই কচি ভঙ্গ করে ।

অতঃপব ছন্দের স্বাক্ষরের কথা বলি । মধুসূদন তাহার কৃষ্ণকুমারী ব ভূমি-কায় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে যদিও অমিত্রাক্ষরেই নাটকের ভাষা ছন্দোবদ্ধ হওয়া উচিত, তথাপি তাহাকে গদ্যেই নাটক লিখিতে হইল । কারণ বাঙ্গালা নাটক অমিত্রাক্ষরে লিখিত হইবার সময় তখনও আইসে নাই । কুরুক্ষেত্র পড়িবার পর একজন প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী কবি বলিয়াছিলেন যে বোধ হয় এতদিনে অমিত্রাক্ষরে বাঙ্গালা নাটক লিখিবার ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে । যে ছন্দের স্বাক্ষর, গম্ভীর আরাবা, উচ্ছল প্রবাহ ও উলসিত গতির কথা ইতি পূর্বে বলিয়াছি, তাহার কুরুক্ষেত্রের পত্রে পত্রে সাক্ষাৎ পাই । কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে এই মধুর স্বাক্ষর, বাহা বস্তুত প্রেষ্ঠ কাব্যের অসাধারণ লক্ষণ, সেই স্বাক্ষর কাব্যগত ভাষার সহজ বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে, তাহাতে কবির কোন কৃতিত্ব নাই । তাহাদের মতে চমর জয়দেব বা বারনসের ছন্দোগত মাধুর্য্য তদানীন্তন ইংরাজি সংস্কৃত ও স্কট ভাষা সাপেক্ষ । এই রূপ মাইকেলের গম্ভীর আরাব সংস্কৃত বহুল বঙ্গভাষার ইরম্বদ কলধ মলম্বা দস্তোগি

সইয়াছেন। আর সেই সর্গ মূল্য মধুব শান্ত কাননগীতিতে মুগ্ধরিত করিয়া
দিয়াছেন। : কাব্যবসলোলুপ পাঠক এ সর্গ বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িবেন। (আমি
নির্দেশনেনব জন্ত দুই দশ ছন্দ উদ্ধৃত করি।

কি অপূর্ণ পুণ্যাশ্রম, কিবা শাস্তি নিকেতন কি স্থপে কাটিল দিন সন্ধ্যা আগমনে
মকভূমে চারু-দ্রুগভূমিকা স্বজন। কাকলি কল্লোল কিবা উঠিল কাননে
কি স্নানব সর্বোবর কিবা বন ননোহব সেই কাকলিব কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া
চাবি ধাবে বনে কিবা কুটীব স্নানব বন পুষ্প পুঞ্জীগণ গাহিবা গাহিয়া।
লতা পুষ্পে স্নানজিত চিত্র মুগ্ধকর

আব সেই সর্গে অভিমত্যা কল্পনায় যে স্নানর আশ্রম স্বজন করিয়াছেন,—
দেখিবাছি সিদ্ধুতীবে নৈল মনোহব। নির্দ্বাইব সেই নৈলে আবাস স্নানব।

সেই স্নানব কল্পনা-আবাস, যদি কখন নিপুণ শিল্পী চারু শিল্পে বাস্তবে
পরিণত হয়, তবে সে সত্য সত্যই ভূতলে স্বর্গ হইবে, কালিদাসের ভাষায়,—
‘শেষঃ পুণোহুতমিব দিবঃ কাস্তিমৎ খণ্ডমেকং’ হইবে।

কবি পঞ্চদশ সর্গে অভিমত্যা যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বীররসেব
শ্রবণ, শিরায় শিরায় বিদ্যাৎসঙ্কারী হৃদয়বিস্ফারক বোড়শবর্ষীয় শিশুর বীর-
গাথা—যাহা কালের প্রস্তরবক্ষে চিরদিন অমর অক্ষরে খোদিত রহিবে,
কবি কেমন নিপুণতাব সহিত বিবৃত করিয়াছেন। কাব্য-জগতের হিন্দুস্তান
সহ ভারতের অমৃতনিয়লিনী ওজোগবী বর্ণনা হইতে কবি চিত্তপূর্ণ কণা-
গুলি বাছিয়া কেমন শুছাইয়া বলিতেছেন।

কতরূপ মৃত্যুমিহ অস্ত্র ভবঙ্কর অনাংখ্য বিদ্যাংগতি তীব্র বিষবব
উঠিতেছে পড়িতেছে ছাইয়া গগন খেলিতেছে শমনেব কি জীড়া ভীষণ!

প্রথম সর্গে রণকোলাহলের বর্ণনা কেমন শ্রবণ কর।

অস্ত্রের নিঃশব্দ উর্দ্ধে বাত প্রতিঘাত কোদণ্ড টংকাব ঘোব শ্রবণে আমার
কালানল উল্লসীবণ, নিম্নে হাহাকাব লাগিতেছে ঘেন দূব সমুজ্জ হকাব
শিশি সিংহনাদ সহ অশনি সম্পাত বাত স্কন্ধ সহ ঘন অশনি ঝকাব।

আর রণক্ষেত্রে মহা শ্মশান সমরক্ষেত্রের কেমন স্নানর মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা।

কুরুক্ষেত্র মহাক্ষেত্র সমাকীর্ণ এবে কেহ দস্তে ভূণ কাটি আলিঙ্গি বহুধা—
বিকৃত মানব শবে—দৃশ্য করণার। পড়ে আছে হানে হানে শোণিত কর্দমে।
কেহ বা নিম্নিত যেন প্রশান্ত বদন কারো অস্ত্রক্ষেতে হাব বলকে বলকে
কেহ দস্তে ওষ্ঠ কাটি ঘূর্ণিত নয়নে এখনো শোণিতধাবা বহিতেছে বেণে
চাহি অবাণেব পানে মুষ্টিবদ্ধ কর। অস্ত্রে অস্ত্রে নানা অস্ত্র বয়েছে বিধিয়া।

কবি বসেব অবতারণায় সিদ্ধহস্ত। প্রাচীন আশঙ্কারিকদিগেব মতে বসের

উপচয়েই কাব্যের কাব্যত্ব । শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি চিত্তের যে অন্তর্নিহিত স্বভাবসিদ্ধ হারী ভাবগুলি আছে, তাহার যথোচিত উদ্বেকেই (তীহাদেব মতে) কবির কৃতিত্ব । তীহার কুরুক্ষেত্র পড়িলে রসের শত ধারায় অভিযুক্ত হইয়া বোধ হয় দিব্য কাব্যামোদ অনুভব করিতেন । শাস্ত্ররসাস্পদ আশ্রয়, বীৰরসাস্বাদক সময়স্থল এবং বীভৎসরসবহুল যুদ্ধক্ষেত্র বর্ণনার আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । এখানে অল্পাত্ম রসের প্রসঙ্গ করিব ।

হুর্কাসার নীচ হৃদয়ের হীন অস্থয়া বর্ণনা বেণ স্বাভাবিক ।

শবশয্যাগাধী ভীষ্ম ওই দেখ ওই

ওই বণ্ড খাজস্থ বক্ষে মহাদর্পে

মৃত সম্রাটব মত পড়িয়া তুতলে ।

বাড়াইয়া গোপহুতে কবিল প্রহার

ব্রাহ্মণের শিরে অসি

ভীষ্ম ও ভীকব শেষে এক পবিমান ।

ওই ভীষ্মদেব গড়ি মধুকৈব মত

দশম পূর্বে হুর্কাসার কুর জিঘাংসা ও কর্ণের স্নেহোচ্ছ্বাসিত বীৰ-হৃদয়ের
মাত প্রতিধাত বড় চিত্তাকর্ষক ।

হুর্কাসা—নহি পাবে একবর্ষা সপ্তরথী সেলি

দেব, পিতা দেবী মাতা দেবতা মাতুল

বধিলে তাহাবে ব্রণে ; বধে যেই মতে

অগভের এ দেবত্ব কবিল নিমূল

নুগেই কেলিরা জালে বনে ব্যাধগণ ।

দাতাকর্ষ নাম যার বিশ্বাসঘাতক

কর্ণ—এই ব্যাধ ধর্ম প্রভু বীৰধর্ম নয়

নবহস্তা অততায়ী সেই ছবাতার ।

পালিব না কর্ণ

কুরুক্ষেত্রে সোদরস্নেহের অবতারণা কেমন মধুর, কেমন হৃদয়গ্রাহী !
অরৎকাকুর বাসুকীস্নেহ এবং সুভদ্রার রুক্মপ্রেম একজাতীয় পদার্থ বটে ;
কিন্তু মানবীর ও দেবীর চিত্তবৃত্তি কবি বিভিন্ন ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন ।

অরৎকাকুর উক্তি—

উদাসিনী পত্নী তব, স্নেহ পাবাবাব

এক স্রোতে হাথ, আদি নিয়াছি ঢালিবা

লাভা সে বন্ধন তাব * প্রভু আমাদেব

এ জীবন, এ হৃদয়, সছোঁ রয়েহ

নাগরাজ পিতা মাতা লাভা সছোদর ।

সেই স্রোত মোই স্বর্গ !

সুভদ্রার উক্তি—

দধাষ নাহি শোক, সাধিল তোনার কর্ণ

প্রসবির অভিসম্বাদ এই মহাফল ।

পুত্র যার, তাব শোক নাহি ধরাতলে ।

সাধিযাহে যদি দেব, মানবমজদা—

সুভদ্রাভা দ্রবল প্রসবি বৃহৎ কল ।

বড় ভাগ্যবান পুত্র—তাহাব নিবর্তি পূর্ণ

তাপিত মানব প্রাণ কবে স্থীতল ;

দ্যপূর্ণ নিরতি আছে এখনও তত্ৰাব

তব পদাভিত্তা লভা, পুণ্যবতী তত্রা তথা

ধবাতনে কৃষ্ণ নাম হবনি প্রচাণ ।

নাৎসঙ্গ্য মানব-হৃদয়ের আতি অকুমাৰ বৃত্তি ; অকুমাৰ শিল্পকাব্যে সেই

জন্ত সেই বৃত্তির ভূয়সীঃ বর্ণনা থাকে। কুরুক্ষেত্রেও আছে। এক অভিমত্য়র প্রতি স্মৃদ্ধা, স্মলোচনা ও শৈলজার বাৎসল্য বর্ণনা, বর্ণপাতের তারতম্য করিয়া কবি কেমন বিচিত্র করিয়াছেন।

স্মৃদ্ধাও স্মলোচনা দেবী ও মানবী।

স্মৃদ্ধা মাঘের মেহ স্বর্গ নিবনল

স্মলোচনা মার মেহ ধরণী শীতল।

আর শৈলজার মেহ স্বর্গ ও ধরণীর অন্তরালে যে প্রশান্ত অন্তরীক্ষ—দেবী ও মানবীর সমন্বয় শৈলজার মেহ সেই অন্তরীক্ষ।

প্রেম বোধ হয় চিত্তেব মধুবতম বৃত্তি। তাই মাধুর্যের স্রষ্টা কবিব প্রেম অবশুস্তাবী অবলম্বন। অনাদি কাল হইতে প্রেম কাব্যের উপাদান। কুরুক্ষেত্রে কবি চার প্রকৃতির প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। স্মৃদ্ধার পতি-প্রেম—সে প্রেম আবাতবিস্কুর সাগরের স্তায় প্রশান্ত গভীর প্রগাঢ় ব্যাপক ও সীমাহীন। শৈলজার অর্জুনপ্রেম—যে প্রেমে সূর্য্যমুখীর সূর্য্য-উপাসনাব মত কাগনাক ছায়া আসক্তির করালতা নাই, কিন্তু নৈরাশ্রের নিরাকাজ্ঞা কল্লনার উন্মাদতা আছে—

কভু পার্ধ পতি আমি প্রেমে আত্মহারা

কভু পুত্র পার্ধ আমি বাৎসল্যে পুরিতা

কভু পার্ধ পিতা আমি ভজিতে অধীবা

কভু আমি পার্ধ, পার্ধ শৈলজা আমার

কভু পার্ধ ভাতা আমি মেহে নিমজ্জিতা

অভিন্ন উভয় কভু নদী পাবাবার।

জরৎকারক শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—যে প্রেম বরিষার বস্ত্রার স্তায় হুকুলপ্লাবী, প্রীয়াস্ত-বাত্যার স্তায় প্রচণ্ড প্রখর, উত্তপ্ত মরুভূমির স্তায় জীবনশোষক।

গিয়াছে ত প্রেম আশা; হা হত বিধাতঃ

লভিল কি দানী নাথ! এ মহা শ্মশান।

কিন্তু গিয়াছে কি প্রেম, যাব কি তা কভু।

হায সূর্য্যমুখী মত চাহি সেই রবি পানে

তুনি মম আরাধ্য ঈশ্বর

একপে জীবনবৃন্তে যাব শুকাইয়া

পড়িব চরণে আজি তব

যাব নাগবালা দংশিয়া তাহার বুকে

পিপাসায় পুড়িছে অন্তর।

বাবিব মবিব তাকে এ বুক লইয়া।

সেই নামে সেই পদে, সর্ব্বম্ব অর্পণ করি

আর অভিমত্য় উত্তরার সেই বালকবালিকার প্রেম—যে প্রেম বীচি-বিহ্বল তটিনী প্রবাহের মত ভঙ্গীময়, হাস্তময়, রহস্তময়, প্রীতিময়, উৎসবময়; যাহাতে সহস্র লীলা, সহস্র লহরী, সহস্র চূষন, সহস্র কলহ, সহস্র সম্ভাষণ; যাহা মুখে মুখে, বুকে বুকে, শিরায় শিরায়, জীবনে জীবনে; যে প্রেমে বিবাস নাই, অবসাদ নাই, অমুচ্ছাদ নাই, সন্ধীর্ণতা নাই। সে প্রেমের সর্বাদ্বীন

উপলব্ধির জন্ত পাঠককে সমগ্র কুৰুক্ষেত্র পড়িতে হইবে; তবে কতকটা আভাস—তাহাও ঐক্যদেশিক, এইখানে পাইতে পারেন।

এত স্বপ্ন এত গুণ পারিজাতহাব	মিলাইয়া বৃকে বৃকে জীবনে জীবনে।
মিলিয়াছে মম ভাগ্যে প্রত্যয় আমাব	কেন এত ভালবাসি, কেন তাব তবে
নাহি হয় পোড়া মনে। জাগ্রত শ্বশনে	প্রাণ মম নিবস্তুর এইকণ কবে।
হারালেম হাবালেম ভয় হব মনে।	ইচ্ছা কবে চিবি বৃক বৃকের ভিতর
ইচ্ছা কবে বাধি সদা নখনে নখনে	বাধি মুণ্ডখানি দেখি জঙ্গলম্বাভব।

কবি নবম সর্গে কুৰুভীষ্মসম্মিলনে ভগবানের সাক্ষাতে ভক্তের যে হৃদয়ো-
চ্ছ্বাস বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে প্রাণ ভক্তিবসামূহে আশ্রিত হয়।

সৌর সবসিদ্ধ বক্ষে উর্দ্ধে নাবাধন	হইতেছে ত্রমে স্বর্গ, স্বর্গ উচ্চতর।
বসি কুক্ষকণী মূর্তি পূর্ণ মহিমায।	জগদ্রক্ষাস্ত্রবে ভাবে ভকতবৎসল
অধুব বাণবী স্বরে ডাকিছে মানব	সেই স্বর্গে পদাযুজপ্রান্তে দিও স্থান।
আইস যে পথে পাব পাইবে আমাব।	দয়ানব হিন্ন এবে সংসার-নন্দন
দেখিতেছি পাগতাপূর্ণ রসাতল	দাও শিবে পদ, মুগে দেও কৃকনার।

কুৰুক্ষেত্র শোক-কাব্য; তাহার এক সর্গে কবি বেয়াই বিয়ানের রহস্ত্রের
প্রসঙ্গ লইয়া হস্তরস অবতারণার প্রয়াস করিয়াছেন। আমার মতে এ চেষ্টা
নিষ্ফল হইয়াছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করি—

রঙ্গরস বিনা
নাহি চলে এ মনোব।

ক্রিস্ত-বর্তমান ক্ষেত্রে এ রঙ্গরসটুকু না হইলেও চলিতে পারিত। ইহার
অনুরোধে কতকগুলি শ্রুতিকটু গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে, ক্ষত্রিয়
বীর বিরাটের মুখে—

বাবাগো বাবাগো গেছিবে গেছিবে
দুব লক্ষ্মীছাড়ি ছাড়ি।
বাবাগো বাবাগো মবেছি এবাব
মেবেছে যায়ে কি খোঁচা—

প্রভৃতি বাক্য বসাইতে হইয়াছে, আর অবশেষে বিরাটের মুখে চুণ ফাল্গি
পাইয়া সর্গ শেষ করিতে হইয়াছে। নাটকে হইলে বোধ হয় ততটা ক্ষতি
হইত না, কিন্তু কাব্যে এরূপ ভাব ভাষা ও ঘটনার সমাবেশে কাব্যধ্বের স্বর্ভাব
হয়। কিন্তু কুৰুক্ষেত্রের গুণবাণিব মধ্যে এই দোষ, শশধবে বলহু অগাধ হিমা-
চলে হিমদোষেব মত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র শোক-কাব্য। ইহার শেষ তিন সর্গে কবি যে শোকের পাথর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিষাদের শেষ সীমা স্পর্শ করিয়াছে। এই শোকের পরাকর্ষী মানবের স্রবের সোপান। ‘মানব পবিত্রকারী এই মহাশোক।’ এই শোকসৃষ্টিই গ্রীক নাটকের চরম লক্ষ্য ছিল। যেমন অগ্নিসংস্কৃত স্রবের বিস্তৃতি-সাধিত হয়, সেইরূপ এই মহাশোকবিলোড়িত মানব হৃদয় উন্নতির উচ্চতর স্তরে সমাক্রান্ত হয়। এ শোক সৃষ্টি বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল—প্রমীলার চিতাবোতরণেও এত শোক উচ্ছৃঙ্খিত হয় কি না সন্দেহ। অর্জুনের সে শোককুদ্ধ বীর-হৃদয়ের তরল শোকাগ্নিনিঃস্রাব—বীর ও করুণ রসের অপূর্ণ মিশ্রণ।

হৃদর্শন সংবন্ধিত অমৃত ভাণ্ডাব

উঠ নৎস। উঠ এই পাণ ধরাতলে

বহিল কি বুড়া আজি, হা পুত্র আশাব

এখন ত ধর্মবান্য হরনি স্থাপিত

তোমাব অচানে আজি ধরা বুড়াপুত্রী

মানব-উদ্ধার নৎস হরনি সর্গিত।

বুড়াপুত্রী স্বর্ণ আজি প্রমাণে তোমার।

আর উত্তরার সেই শোক ছবি—রহস্যের উৎস, সঙ্গীতেব স্বাক্ষর, জীড়ার প্রস্রবণ ‘ফুটন্ত হাসি ডালা’ সরলা আনন্দঘরী বালিকা (যাহার হাশ্বঘরী সৃষ্টি দ্বিতীয় সর্গে চিত্রিত দেখি) যখন উন্মাদিনী চিত্রিতা আকারে, আলুলায়িত-কেশে স্বামীর শবের পাশে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—

কহ একবার

ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তবাব ?

ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তবাব ?

তুমি উত্তবাব হাসি কত যে বাসিতে ভাল

তাহার পুতুল খেলা নাহি বুঝাইতে হার

মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তাব

বুঝাইল জীবনের খেলা কি তাহাব

ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তবাব ?

যখন স্বামী চিতাগ্নিব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুহীননবনে আকুল প্রাণে

কৃষ্ণের উদ্দেশে কাদিয়া বলে—

কোথায় বহিলে পদ্ম-পলাশলোচন হবি

বিধাতাব পূর্ণ সৃষ্টি যথস্বর্ণ উত্তবাব

এই শোক-পাবাবারে দেও নাথ পদতবি

এরূপে কি হল ভঙ্গ ? চিহ্ন বহিল না তাব ?

তখন পাষণ কাটিয়া শোকনিবিরিণী শতধারার উচ্ছৃঙ্খিত হইয়া বক্ষে, চক্ষু প্রবাহিত হয়। তুলনায় - প্রভেদ ফুটতর করা যায় ; তাই শোকের সাগর

* এইরূপ হিংসার নবক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রেও পাশে শাস্তি প্রীতিব জিদিব অভিমত্য়াব শিবিব সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধের কোলাহল এবং প্রীতিব শান্ত্যাব উত্তমই স্পষ্ট-তর হইয়াছে।

রণ ঝটিকায মস্ত বিক্ষোভিত

শোভিছে শিবিব শাস্তিব জিদিব

কুরুক্ষেত্র গর্ভে শোভাব আধাব

প্রীতি-পূর্ণ অভিমত্য় উত্তবাব।

সপ্তদশ সর্গেব পাশে কবি হাসির বাশি দ্বিতীয সর্গ সরিষিষ্ট করিয়াছেন। এই সপ্তদশ সর্গ যত বারই পাঠ করা যায়, প্রতিবারেই অশ্রুপ্রবাহ সমান বেগে উথলিয়া উঠে।

ক্রমশঃ ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ।

✓ চিকিৎসকের গল্প ।

আমার পরিচিতা কোনও মহিলার জীবনে একটা আশ্চর্য্য, রহস্যময়, করুণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি এখন মৃত্যু; আমি তাঁহার চিকিৎসক ছিলাম।

তিনি কশিয়ারবাসিনী; কাউন্টেন্স মেরী বারানোর অসাধারণ রূপ ও যথেষ্ট অর্থ ছিল। কশিয়ার লোকের চেহারা বড় সুন্দর—অন্ততঃ আমাদের মনে হয় যে, তাহারা বড়ই সুন্দর। কশীয়দের নাসিকা সুগঠিত, মুখে একটা বিশেষ সজীব ভাব, আর কাছাকাছি স্থাপিত নয়নদ্বয় নীলধূসরমিশ্র একরূপ বর্ণের—তাহার ঠিক বর্ণনা করা যায় না। তাহাদিগের সৌন্দর্য্যে কেমন একটু কঠোর ভাব আছে। তাহাদিগের চেহারায় একটু ছটামি ও আকর্ষণের ভাব, একটু গর্ব ও করুণার ভাব, একটু কঠোরতা ও কোমলতার ভাব আছে; তাহাতে করাসী মুগ্ধ হইয়া পড়ে। হয় ত কেবল উভয়ের মধ্যে প্রতিগত পার্থক্য আছে বলিয়াই করাসী কশিয়ারবাসীর চেহারায় এ সকল লক্ষ্য করে।

কয় বৎসর হইতেই কাউন্টেন্সের চিকিৎসক বুলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বৃকে কোনরূপ পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ডাক্তার তাঁহাকে শীতকালে ফ্রান্সে যাইতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কাউন্টেন্স কিছুতেই সেন্ট-পিটার্সবার্গ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃতা করেন নাই। গত বৎসর শরৎকালে তাঁহার চিকিৎসক বহুকষ্টে তাঁহাকে মেমটোনে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন।

ট্রেনে কাউন্টেন্সের কামরায় আর কেহই ছিল না—তাঁহার চাকরের। স্বতন্ত্র কামরায় ছিল। ট্রেন বেগে যাইতেছিল, আর জানালায় কাছে বুলিয়া বিধাদিতা কাউন্টেন্স সেই দেশ ও পথপার্শ্ববর্তী পদার্থাদি সকল দেখিতেছিলেন। তিনি স্বদয়ে কেমন বিজ্ঞানতা অনুভব করিতেছিলেন।

যদি কিছু আবশ্যক থাকে জানিবার জন্ত, এতোক ষ্টেশনে তাঁহার ভৃত্য আইভান তাঁহাকে আসিত্তেছিল। সে অতি পুৰাতন ভৃত্য তাঁহাকে অল্প

আবেগে ভক্তি কবিত, এবং তাঁহার সকল আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত ছিল।

ক্রমে রাত্রি হইল—ট্রেন বেগে চলিতে লাগিল। কাউন্টেস্ ঘুমাইতে পারিলেন না। তিনি আসিবার সময় যে ফরাঙ্গীদেশীয় স্বর্ণমুদ্রা আনিয়াছিলেন, তাহা গণিয়া দেখিবার ইচ্ছা সহসা তাঁহার মনে উদ্ভিত হইল। ক্ষুদ্র ব্যাগটি খুলিয়া তিনি সেই চক্চকে মুদ্রাগুলি আপনার অঙ্কে ঢালিলেন।

কিন্তু সহসা তাঁহার মুখে শীতল বাতাস লাগিল—আশ্চর্য্য হইয়া কাউন্টেস্ মুখ তুলিলেন। কামরার দ্বার মুক্ত! কাউন্টেস্ ভয় পাইয়া অকস্মিত মুদ্রারশির উপর শাল চাপা দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই এক জন লোক কামরায় প্রবেশ করিল;—তাঁহার পরিধানে সাক্ষ্যবেশ, মস্তকে টুপি নাই, এক হস্তে ক্ষতচিহ্ন। লোকটা হাঁপাইতেছিল।

সে উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিল, তাহার পর বসিয়া মহিলার দিকে চাহিল—তখন তাহার চক্ষু জ্বলিতেছিল। তাঁহার পর সে ক্রমাল দিয়া ক্ষত স্থান জড়াইয়া ফেলিল।

অভাগিনী কাউন্টেস্ ভয়ে মুর্ছিতপ্রায় হইলেন। এই লোকটা অবশ্বই তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রা গণিতে দেখিয়াছে; সে তাঁহাকে হত্যা করিয়া অর্থ অপহরণ করিতে আসিয়াছে।

আগন্তুক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হয়, কাউন্টেসের নিশ্বাসও বন্ধ হইতেছিল না—নিশ্চয়ই সে তাঁহার দিকে আসিবার উজ্জোগ করিতেছিল।

সহসা সে বলিয়া উঠিল, “ভয় করিবেন না।”

তিনি কিছুই বলিলেন না—কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি আপনাই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতেছে, আর তাঁহার কর্ণে কেমন একটা ভৌঁ ভৌঁ শব্দ হইতেছে।

আগন্তুক বলিল, “আমি কুক্ষার্ত্ত নহি।”

তথাপি তিনি কিছুই বলিলেন না। কিন্তু সহসা একটু নড়িয়া উঠাতে জাহ্নুতে আঘাত লাগিয়া নল হইতে জলের মত তাঁহার অঙ্গ হইতে স্বর্ণমুদ্রা পড়িয়া গেল।

এই অর্থরাশি দেখিয়া লোকটা অবাক্ হইয়া গেল—তাঁহার পর সে সেই পতিত মুদ্রাগুলি কুড়াইতে লাগিল।

ভীতা কাউন্টেস্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত অর্থ কার্পেটের উপর ফেলিয়া দিলেন ও বাহিবে পড়িবার জন্ত দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু লোকটা

তাহা দেখিতে পাইল,—লাকাইয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিল, এবং তাঁহার মণিবস্ত্র ধরিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে বসাইল ।

সে বলিতে লাগিল, “শুনুন ; আমি চোব নহি—প্রমাণস্বরূপ আমি আপনার অর্থ কুড়াইয়া আপনাকে দিতেছি । কিন্তু যদি আপনি এই সীমান্ত প্রদেশে অতিক্রম করিতে আমাকে সাহায্য না করেন, তবে আমার আর আশা নাই,— আমার মৃত্যু নিশ্চয় । আমি আর কিছুই বলিতে পারি না । আর এক ঘণ্টা পরে আমরা রুশিয়ার শেষ স্টেশনে উপস্থিত হইব ও আর এক ঘণ্টা ২০ মিনিট পরেই আমরা রুশিয়ার সীমা অতিক্রম করিব । আপনি সাহায্য না করিলে আমার আর কোনও আশা নাই । কিন্তু আমি নরহত্যা করি নাই, চুবি করি নাই, কোনও হীন কার্য্য করি নাই ; তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি । আমি আপনাকে আর কিছু বলিতে পারি না ।”

হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে অর্থ কুড়াইতে লাগিল—বেকের নিম্নে হাত দিয়া খুঁজিয়া, কোণ পর্য্যন্ত দেখিয়া সে কুড়াইতে লাগিল । তাহার পর ব্যাগ পূর্ণ করিয়া নিঃশব্দে কাউন্টেন্টকে ফিরাইয়া দিল, এবং কামরার অপর কোণে গিয়া বসিল ।

উভয়েই নিশ্চল—ভীতা, বাকাহীনা, গতিহীনা, ভয়ে অর্ধমুচ্ছিতপ্রাণ কাউন্টেন্ট ক্রমে ক্রমে একটু স্নহ হইতে লাগিলেন । আর সে স্থির ভাবে সমুখে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল—তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, যেন সে মৃত ! মাঝে মাঝে কাউন্টেন্ট তাহার দিকে চাহিতেছিলেন । তাহাব বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে, সে রূপবান ও দেখিতে মতাই ভদ্র লোকের মত ।

রজনীর গভীর অন্ধকারে ট্রেন ছুটিয়া চলিল—মাঝে মাঝে শব্দবধিরকর হইস্ ল্প শ্রুত হইতে লাগিল—এক একবার ট্রেনের গতি একটু মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল, আবার ট্রেন বেগে ছুটিতে লাগিল । ধীরে ধীরে গতি মন্দ করিয়া উপর্যুপরি কয় বার হইস্ ল্প দিয়া ট্রেন স্থির হইল ।

আইভান প্রভুপালীর কামরার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল । কাউন্টেন্ট মেরী শেষবার তাঁহার আশ্রয় সহযাত্রীর দিকে চাহিলেন—তাহার পব কল্পিত কণ্ঠে ভৃত্যকে বলিলেন, “আইভান, তুমি কাউন্টেন্টের কাছে ফিরিয়া যাও ; তোমার আমার সহিত বাইবার প্রয়োজন নাই ।”

আইভান অবাক্ হইয়া বড় বড় চোক তুলিয়া চাহিল ও তোতলার মত বলিল, “কিন্তু কিন্তু—”

কাউন্টেস্ বলিলেন, “তোমার আসিবার প্রয়োজন নাই। আমি আমার সমস্ত পরিবর্তিত করিয়াছি। তুমি কুশিয়ায় থাক, এই তোমার ফিরিয়া যাইবার ভাড়া। আমাকে তোমার লবেদা ও টুপিটা দাও।”

অবাক-হইয়া বৃদ্ধ ভৃত্য টুপি ও লবেদা খুলিয়া দিল। সে প্রভুপত্নীর একরূপ ধামধেমালি আজ্ঞা পালন করিয়া করিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে সে চলিয়া গেল।

ট্রেণ কুশিয়ায় সীমান্ত প্রদেশে ছুটিয়া চলিল।

কাউন্টেস্ তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, “এই তোমার পোশাক লও; তুমি আমার ভৃত্য আইভানের নামে পরিচিত হইবে। কিন্তু একটা সৰ্ত্ত আছে।

তুমি কখনও আমার সহিত কথা কহিবে না, আমাকে ধস্তাবাদও দিবে না।”

কিছু না বলিয়া সে মন্তক নত করিল।

অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ আবার থামিল। মসজ্জ রাজকৰ্মচারিগণ কামরায় আসিলেন। কাউন্টেস্ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিত কাগজগুলি দেখাইলেন, তাহার পর কামরার কোণে উপবিষ্ট সঙ্গীকে দেখাইয়া বলিলেন, “আমার ভৃত্য আইভান; এই উহার পাসপোর্ট দেখ।”

আবার ট্রেণ চলিতে লাগিল। সারা রাত্রি ছই জনে একত্র অথচ নির্বাক্।

প্রভাতে জার্মেনির একটা ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে অপরিচিত ব্যক্তি নামিয়া বলিল, “আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি প্রতিজ্ঞাস্ব করিলাম। কিন্তু আমার জ্ঞাত আপনার চাকর চলিয়া গিয়াছে; তাহার কার্য্য করা আমার উচিত। আপনার কিছু আবশ্যক আছে কি?”

কাউন্টেস্ বলিলেন, “হাও, আমার ঝিকে পাঠাইয়া দাও।”

সে চলিয়া গেল। যখনই কাউন্টেস্ কোনও আহারগৃহে প্রবেশ করিতেন, তখনই দেখিতে পাইতেন, সে দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। ক্রমে তিনি মেমটোনে আসিলেন।

একদিন আমি আমার অধ্যয়নগৃহে রোগী দেখিতেছিলাম। এক জন দীর্ঘ-কায় ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল, “ডাক্তার! আমি কাউন্টেস্ মেয়ী বারানোর সংবাদ লইতে আসিয়াছি।”

আমি বলিলাম, “তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই, তিনি আর কুশিয়ায় ফিরিবেন না।”

আগন্তুক কাদিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর উঠিয়া মাতালের মত কাদিতে কাদিতে চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি কাউণ্টেস্কে বলিলাম যে, এক জন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার খোঁজ লইতে আমার কাছে গিয়াছিল। শুনিয়া তিনি বেন ব্যথিত হইলেন ও এতক্ষণ আমি যাহা বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, “এই অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার মত আমার অনুসরণ কবে; আমি যখনই বাহিরে যাই, তখনই তাহাকে দেখিতে পাই; সে আমার দিকে আশ্চর্য্যভাবে চাহিয়া থাকে; কিন্তু সে আমার সহিত কথা কহে নাই।”

একটু চিন্তা করিয়া তিনি আবার বলিলেন, “জানালার নিম্নে চাহিয়া দেখুন।”

সোফা হইতে উঠিয়া তিনি জানালাব পর্দা সরাইলেন। দেখিলাম, আমার কাছে গিয়াছিল, সেই লোকটা বাগানে বেঞ্চের উপর বসিয়া হোটেলের দিকে চাহিয়া আছে। আমাদের দেখিতে পাইয়া সে উঠিল ও একবারও ফিরিয়া না চাহিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে আমি এই অদ্ভুত অভিনয়ে, দুই জন অপরিচিতের ভালবাসার ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম।

উদ্ধার পাইয়া সে চিরজীবন কৃতজ্ঞ ও ভক্তের মত তাঁহাকে ভালবাসিত। প্রতিদিন সে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, “তিনি কেমন আছেন?” আব প্রতিদিন সে অধিকতর দুর্ব্বলা ও পাণ্ডুবর্ণা কাউণ্টেসকে দেখিয়া কাদিত।

কাউণ্টেস আমাকে বলিয়াছিলেন, “আমি একবারমাত্র এই অদ্ভুত ব্যক্তির সহিত কথা কহিয়াছি, তবুও বোধ হয়, যেন সে আমার কত দিনের পরিচিত।”

দুই জনের দেখা হইলে সে মন্তক নত করি,—কাউণ্টেসের অধরপ্রান্তে গভীর মধুর হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিত। আমি জানিতাম, এইরূপ দৃঢ়, ভক্তিপূর্ণ, কবিশ্বময় ভালবাসা পাইয়া মরণাহতা কাউণ্টেস সুখী ছিলেন। তথাপি সেই উন্নতস্বক্লান্তস্বারে তিনি কখনও তাহাকে কাছে আসিতে দিতে, এমন কি তাহার সহিত কথা কহিতে, বা তাহার নাম জানিতেও স্বীকৃত হইতেন না। তিনি বলিতেন, “না! না! তাহা হইলে আমাদের এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব থাকিবে না। আমরা পরস্পরের নিকট অপরিচিতই থাকিব।”

আর সেও কখন তাঁহার নিকটে আসিবাব চেষ্টা করিত না। সে ট্রেনের সেই প্রতিজ্ঞারক্ষার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

সময়ে সময়ে বলহীনা কাউণ্টেস সোফা হইতে উঠিয়া জানালাব পর্দা সরাইতেন, চাহিয়া দেখিতেন, সে নিম্নে বসিয়া আছে কি না। যখন দেখিতেন,

সে নিশ্চলভাবে বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে, তখন তিনি কোঁচে আসিয়া বসিতেন—তাঁহার অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি জাগিয়া উঠিত।

একদিন প্রত্যন্ত ছয়টার সময় কার্ডিনেসের মৃত্যু হইল। আমি হোটেলের বাহিবে আসিতেই বিষাদবিকৃতবদন সেই অপরিচিত ব্যক্তি আমার নিকট আসিল;—সে ইতিমধ্যেই সংবাদ শুনিয়াছে!

সে বলিল, “আমি আপনার সমক্ষে মুহূর্তের জন্য তাঁহাকে দেখিতে চাই।”

তাঁহার হাত ধরিয়া আমি পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলাম।

মৃত্যুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া সে তাঁহার হাত তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল—সে চুম্বন কি বিলম্বিত! তাঁহার পর উন্মাদের মত সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।*

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র।

মদাম্মীরে—

পঞ্চমদিবসীর আপনার পত্রখানি পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইলাম। যে যে বিষয়ে আমার ভ্রম ছিল তাহা আপনার অনুগ্রহে প্রায় সকলই অগনোদিত হইয়াছে। এইক্ষেণে ভবসা করি যে, সংপ্রাপ্ত পুরীর বিবরণ অনেক অংশে সাধাবণের আদরণীয় হইবে। লিখিয়াছেন নীলাজিমহোদয়ে হস্তদ্বার হস্তেব উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার প্রমাণ প্রেরণ করেন নাই। সেই প্রমাণটি পাইতে বিশেষ প্রত্যাশা করি, যে হেতু সাধাবণে তদন্তাবে আমার বাক্যে আস্থা করিতে অনিচ্ছুক হইবেন, যেহেতু তাহা তাঁহাদের সংস্কারেব বিরুদ্ধে হইবেক। এই পর্যন্ত লিখিবাব পর দেখিলাম প্রমাণটি পাঠাইয়াছেন পত্রের শেষে তাহা আছে।

অষ্টাধ্যায়িমাহাত্ম্য যদি আপনি অনায়াসে প্রস্তুত কবাইতে পাবেন, তাহা হইলে আমাব বিশেষ উপকাব হইবেক। অগব পুস্তকগুলির নিমিত্ত তৃষিত আছি। পবস্ত্র বোধ কবি তাহা পাইবার পূর্বেই পূবী অধ্যায় সমস্ত মুদ্রিত হইবে। সে বাহা হউক, তৎপ্রযুক্ত মহাশব শিখিলযদ্ব হইবেন না ইতি।

মাণিকতলা

৬ই সেপ্টেম্বর

শ্রীবাজেন্দ্রলাল মিত্রস্ত।

মদাম্মীরে—

১৪ই দিবসীর ভবৎপ্রেরিত পত্রখানি এই-মাত্র পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইলাম। যে সকল বিষয়ের সংবাদ দিয়াছেন তাহা সকলই আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পরন্তু আপনি যে অনুমান-করিয়াছেন যে আমার পুস্তক প্রায় শেষ হইয়াছে, তাহা সত্য বটে। পূবী ব্রাহ্ম্যয়ের কেবল বাজ্ঞাগুলির বিবরণ ছাপিতে অবশিষ্ট আছে, অপর সকল ছাপা হইয়াছে। আব নূতন কথা; কোন স্থানে সমিবিষ্ট করিব উপায় নাই। তথাপি সাধাবণানিরূপে আমার অনুরাগেব শেষ হয় নাই। প্রকৃত পদার্থ নিদ্রিষ্ট হইলে পরিপিতে বা অন্তত প্রকাশ করিতে পারি। অতএব পুস্তকসংগ্রহে ও তথ্যানিরূপে শিখিল হইবেন না। আপনি বাহা আমাকে দিয়াছেন তজ্জন্ত আমি সর্বতোভাবে কৃতজ্ঞ আছি। আপনার সাহাব্য ভিন্ন অনেক বিষয়ে আমার ভ্রম থাকিত, এবং তন্নিমিত্ত আমি ভিন্নত্ব হইতাম। আপনার অনুগ্রহে সে তিরস্কার হইতে রক্ষা পাইয়াছি। এইক্ষেণে যে নিশা হইবে, তাহা আমার অপর ভ্রমের বাগ।

মাণিকতলা

১৯শে সেপ্টেম্বর

শ্রীবাজেন্দ্রলাল মিত্রস্ত।

* এসিদ্ধ কবাসী উপজাঙ্গিক গীর্দেমোপাসাব ইংবাজীতে অনুবাদিত একটি পত্র হইতে অনূদিত।

মদ্যাক্ষীয়ে—

৩রা দিবসের ভবনীর অনুগ্রহপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তদুপস্থিত পুস্তকখানিও হস্তগত হইয়াছে। পুস্তকখানির শেষে লিখিত আছে “ইতি শ্রীহৃৎ-সংহিতায়াঃ নীলাজি-মহোদয়ের শ্রীপূর্ববোধমন্ডিত-মাহাভ্যো অষ্ট-মাহাভ্যঃ”, ইহাতে অসংসৃত হয় যে, ইহাই নীলাজিমহোদয়, অথবা তাহার অধিকাংশ। এ বিষয়ের সংশয় আপনি নিরাকরণ করিলে উপকৃত হইব। পুস্তকখানির স্তম্ভ-কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। আমার পূর্ব অধার সমস্ত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে আব নূতন বিষয় বিবাব অবকাশ নাই। স্তম্ভ-উপ-যাত্রার বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি নিকট্যম থাকিতে হইল। পরন্তু কেবল সেটিই পরিত্যক্ত বিষয় নহে। অনেক বিষয়ে ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। পুস্তক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিতে পাবিলে, তাহার সংশোধন করিতে প্রয়াস করিব। এইক্ষণে কেবল কোণার্কের বিবরণ মুদ্রিত করিতে বাকী আছে, তাহা বিবরণে যদি কোন প্রহে বিস্তার বিবরণ দেখিতে পান, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জ্ঞাত করিবেন। সম্প্রতি আমি বোম্বাই নগর দেখিতে যাইতেছি। তিন স্তম্ভ পরে প্রত্যাগমন করিয়া মুদ্রাঙ্কন পুনরারম্ভ করিব ইতি।

শ্রীরাঙ্গেন্দ্রলাল মিত্রজ্ঞ।

১১

মদ্যাক্ষীয়ে—

তিন দিবস হইল আমি বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গত কল্যা আপনার ২ই দিবসের পত্র প্রাপ্ত হই। উক্ত পত্র পূর্ব ডাকে ১৭ই প্রেরিত হইয়াছিল। আমার অনু-পস্থিতি প্রযুক্ত উড়িষ্যার মুদ্রাকার্য স্থগিত ছিল। অদ্য কোণার্কের প্রথম শোধনীর আদর্শ পাইয়াছি।

বোধ হইল এক মাস মধ্যে মুদ্রাকার্য সমাধা হইবে। ইতোমধ্যে আপনি কোণার্কের বিষয়ে যে কোন সংবাদ দিতে পাবেন, তাহা বিশেষ উপকারজনক হইবে।

মন্দির সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া যে আমার প্রথম অনুমান হইয়াছিল তাহা বহুদিন পবিত্র্যুক্ত হইয়াছে। মন্দির সমাপ্ত হইয়াছিল ও দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু পরে জমি বসিয়া তাহা পড়িয়া যায়; এই এক্ষণে আমাব মত। এমতের বিশিষ্ট কারণ আবুল কাবুল এবং জগমোহনের অস্থিরিত স্তম্ভের পতন। শেখোক্ত ঘটনাটি জমি না বসিলে ঘটিতে পবিত্র না। ইংরাজী প্রবাদে বলে To build on sand, সেটি মিথ্যা নহে। পূর্ব মন্দির বালুকা উপর নির্মিত নহে। নীলাজি নামে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বালুকা হইলেও পূর্ব পূর্ব অটালিকার ভারে ভূমি দৃঢ় হইলে, বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়, স্তম্ভবাং বসিবার কারণ ছিল না।

আমাব মতে লাকুলীর নরসিংহই বর্তমান মন্দিরের নির্মাতা। এবং তাহা বি সমস্ত স্তম্ভের সাহেব নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এ নির্দেশের মূল মাদলা, পাঞ্জী এবং ভংকালের মাদলা পাঞ্জী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। আপনি মাদলা পাঞ্জীতে কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অথবা সেই অংশটির প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। এ অংশ দেখিলে বেন আপনি জানিতে পারিবেন যে, নরসিংহ দেবের পূর্বে তথায় প্রাচীন মন্দির ছিল। নরসিংহ এ প্রাচীন ও ভগ্ন মন্দিরের পরিবর্তে নূতন প্রস্তুত করেন।

বহিঃপ্রাচীরের ভিত্তি আমি দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার রিস্তার নিরূপিত করিতে পারি নাই; হানে হানে চিহ্ন নাই অথবা হানে করিত হইয়াছে স্তম্ভাং সমস্ত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য গ্রন্থ নিকপিত হয় নাই। বোধ হয় আপনিও এ বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই।

চিত্রগুলির রিসবে আমি বাহা লিখিয়া আনিয়াছি, তাহা বিস্তার নহে। আপনি তাহা রিসবে বিস্তার বিবরণ দিলে উপকৃত হইব।

মাণিকতলা

২২শে নবেম্বর

শ্রীরাঙ্গেন্দ্রলাল মিত্রজ্ঞ।

১২

মাণিকতলা

২৪ ডিসেম্বর ১৮৭৯

মদারাজীবেশু—

১৭ই দিবসের ভবদীপ পত্র গত পরশ প্রাপ্ত হই। তাহাতে যে বিবরণ প্রতিলিখিয়াছেন তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইলাম।

মাদলা পাঞ্জীর বিস্তারণানি বিশেষ আদরীয়, যে হেতু তাহাই প্রাচীন। সংক্ষিপ্ত খানি নব্য, তাহার বিবরণের উপব নির্ভর করা যায় না। পবস্ত আমি উত্তর গ্রহই পাইতে ইচ্ছা করি।

মাদলা পাঞ্জীর যে অংশ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা সমগ্র বৃত্তিতে পারি নাই এবং অনেক স্থলে 'বিরুদ্ধ' বোধ হইতেছে। দেউল নির্মাণ সময়ে 'দিউল কলে' শব্দ আছে; তৎপরে 'দেউল তোড়ো ধিলে' দেখিতেছি। এই তোড়ো শব্দের অর্থ কি? আমার অনুমাণে তদ্রূপ কবাই বোঝায়। অর্থাৎ অনঙ্গ ভীম প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া নতুন কবিত্ব। কোণার্কের বিষয়েও সেইরূপ। বিজয়ে বিজয় করা। সেই অর্থ সর্বত্র সংলগ্ন হয় না। মদন-রাজী শব্দ কি ঠিক লেখা হইয়াছে? কর্তৃকের এক পার্শ্বে অদ্যাপি বিভূতানী আমি আছে। উহা বারাগসীর অপভ্রংশ। ফলে বারাগসীর মনস্তত্ত্ব কবিবাব সন্তাই ভুবনেশ্বর ও কটক উৎপন্ন হয়। অনঙ্গভীমের পরামর্শের সকল কথা সমস্ত নাম সহিত অবিকল বড় মাদলা পাঞ্জীর পাঠ পাইতে ইচ্ছা করি। মেঘনাদ প্রাচীর পুস্তকোত্তম দেবের কীর্তি। তাহা অনঙ্গভীমের নামে লেখার সন্দেহ জন্মিয়াছে। বড় মাদলা পাঞ্জীতে কি এই বিবরণ আছে? মদন মহাদেব প্রথম দেউল অরিত করেন, ইহা আমি জ্ঞাত ছিলাম, এবং আমার বহিতে লিখিয়াছি। বালভোগের কথাটি আমি জ্ঞাত ছিলাম না।

কেশের কথা ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের পুস্তকোত্তমচক্রিকার আছে; এবং বাল-

ভোগেব স্থাপন ঐ রাজা করেন, তাহার উল্লেখ আছে, কিন্তু কেশের উল্লেখ বাল শব্দের ব্যবহাব এমন উল্লেখ নাই।

নবগ্রহ প্রস্তবখানি প্রবেশঘাবের উপব ছিল, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়াছি। মোহনেনব ভিতর থাকিলে কেহ তাহাকে বাহির করিত না। ঐরূপ প্রস্তর উৎকলেব সকল মন্দিরে আছে।

উত্তরপশ্চিমে যে একাত্ত সিংহ পড়িয়া আছে, তাহা মন্দিবেব গায়ে ছিল। বোধ হয় শতপাদ উর্দ্ধে ছিল। তদ্রূপ সিংহ ভুবনেশ্বরে আছে। অথ, সিংহ ও হস্তীর মূর্তি তিনদ্বারের পার্শ্বে ছিল, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। অন্তর্য থাকিলে কেহ বহু ব্যয়ে ও অনেক পরিশ্রমে আনিয়া দ্বার পার্শ্বে ফেলিয়া দিত না। আবুল ফাজল লেখেন উহা বহিঃপ্রাচীর পার্শ্বে ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বাহ্যার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া প্রস্তর লইয়া বার, তাহা বা পবিশ্রম করিয়া মূর্তিগুলি মন্দিরদ্বারপার্শ্বে আনিয়া ফেলিয়া দিত না। অপর ঐ মূর্তির নির্দিষ্ট স্থান দ্বারপার্শ্বে আছে। মন্দিরের পতন, বিবরে অনেক ভাবিয়াছি, কিন্তু মাটি বসিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন কারণ সম্ভব বোধ হয় না। ভূমিকম্পে ১৮ পাদ প্রস্থত মন্দিরের প্রাচীর পড়িবে ও মোহনেনব কোন অংশ নষ্ট হইবে না, ইহা অসম্ভব। মোহনেনব রথো ৪টা স্তম্ভ ছিল, তাহা পড়িয়াছে; কিন্তু তাহাব পতনে মোহনপ্রাচীরের কোন হানি হয় নাই, প্রত্যুত কোন দাগ লোপ নাই। সম্ভবো ভাঙ্গিলে ইহা ঘটত না। বসিয়া গেলেই ইহা সম্ভব। এ বিষয়ে আমি বহু লিখিয়াছি, তাহার সংশোধনীয় পত্র পাইলে নিকট পাঠাইব।

লাঙ্গুল নামেব আমি খোঁজ অনুষ্ঠান করি নাই। কিন্তু সেটি যে নিন্দাংগদ তাহা আমাব মনে সম্ভব বোধ হয়। ঐ শব্দের উপর নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎকার তর্ক বিবিত নহে। *

নীলাগ্রিমহোদয়ের বস্ত্র দ্রব্য হইয়াছে, তত

* উড়িয়া রাজাবা অদ্যাপি বস্ত্র দ্রব্য দীর্ঘ লাঙ্গুল প্রস্তুত করিয়া দ্রব্যারে উপস্থিত হন।

টুকু পাঠাইবেন। অবশিষ্ট প্রত্যুত্ত হইলে সমস্ত পড়িতে পারিব নাই। প্রার্থনা যে আপনি পাঠাইবেন। আপনাব পুস্তক হস্তগত হইলে সে গুলি পড়িয়া অনুবাদ শুদ্ধ করিয়া দেন। মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

আমাব অনুপস্থিতি প্রযুক্ত মুদ্রাকার্য স্থগিত ছিল। এবং প্রত্যাগমনের পরও আরম্ভ হয় নাই। অতএব কোণারকের কিছুই ছাপা হয় নাই। স্ববার আরম্ভ হইবে। পূর্বীর সম্বন্ধে একটু সঙ্কট উপস্থিত। মোহনের ধার হইতে যে বীজকের প্রতিলিপি আনিরাহিলাম, তাহার

শ্রীযুক্তেন্দ্রলাল মিত্র

স্বতঃজনন মতবাদ ।

খ্রিস্ট বৎসর পূর্ব পর্ব্যন্ত বিজ্ঞানজগতে নিকৃষ্টশ্রেণীর কতকগুলি জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক মতবাদ প্রচলিত ছিল। সেই মতবাদের নাম স্বতঃজনন মতবাদ। ইহাকে চলিত ইংরাজীতে Spontaneous Generation, বৈজ্ঞানিক ভাষায় Abiogenesis, এবং প্রাচীন রোমীয় ও গ্রীসীয় প্রকৃতিতত্ত্ববিদগণের ভাষায় Generatis Equivoca কহে। জীব ব্যতীত জীবের উৎপত্তি সম্ভব, ইহাই এ মতবাদের মূলনীতি। অতি প্রাচীন কাল হইতে আমরা এই মতবাদের প্রচলন দেখিতে পাই। গ্রীসীয় দার্শনিক অ্যারিষ্টটল জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেন যে, “সকল শুষ্ক পদার্থ আর্দ্র হইয়া এবং সকল আর্দ্র পদার্থ শুষ্ক হইয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবের উৎপাদন করিয়া থাকে।” রোমীয় মহাকবি ভার্জিল বলিতেন যে, তরুণ বৃষের অন্ত পচিয়া মোমাছি জন্মে! অবশ্য, কবি-বর এ কথা শুধুমাত্র কল্পণে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ব্যতীত আরি কবিগণও জ্ঞানিবার সম্ভাবনা নাই। ভন হেলমন্ট নামক জর্মন কৃষিকার্য্য নামা জার্মান কৃষিকর্মিষ্ট ডাক্তার বলিতেন যে, পচা জলাশয় হইতে যে ছুর্গন্ধ নির্গত হয়, সেই ছুর্গন্ধ হইতে ভেক, মক্ষিকা, জঁক, ঘাস এবং অন্যান্য জীব উৎপন্ন হয়! ভন হেলমন্টের সুবিশ্লেষণ-জননসম্বন্ধীয় মূষ্টিযোগবিধান অতীব কৌতূহলজনক। ডাক্তারপ্রবর সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন যে, সুবিশ্লেষণ উৎপন্ন করিতে হইলে, প্রথমে একটা কলসীর মধ্যে কতকগুলি খাদ্য রাখ। পরে উহার মুখ-পথ একটা মলিন পিরান দিয়া বন্ধ করিয়া দাও। তিন সপ্তাহের মধ্যে মুখ-পথস্থ মলিন পিরানের ময়লা হইতে একপ্রকার ফার্মেন্ট

জন্মিবে এবং সেই কার্শ্বেণ্ট পাত্রস্থ ধাতুর মধ্যে একরূপ এক আর্শ্বেয় পরি-
বর্তন উপস্থিত করিবে যে, তাহাতে সমুদয় ধাতু সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়া
মুখিকরূপে পরিণত হইবে। বোধ হয়, হেলমণ্ট নিজেই সন্দেহ করিয়াছিলেন
যে, সাধারণ লোক তত সহজে তাহাব এই মুষ্টিযোগের সত্যতা গ্রহণ করিবে
না। তাহা তিনি কেবল মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হন নাই। হেলমণ্ট
বলিয়া গিয়াছেন, তিনি স্বয়ং এই পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আব তিনি স্বচক্ষে
দেখিয়াছিলেন যে, “ইদ্রগুলি একেবারে খুব বড় বড় হইয়াই জন্মিয়াছিল।
ইহাদের মধ্যে পুষ্ক ও জী উভয় প্রকার ইদ্রই ছিল। স্মৃতরাং তাহাদের লইয়া
নূতন মুখিক বংশ উৎপাদন অতি সহজেই সম্পাদিত হইতে পাবিত।” আমরা
হেলমণ্টের এই পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ গম্ভীর এইমাত্র বলিয়া নিরস্ত হইব যে, উহা
তৎকালের এবং উক্ত আর্দ্রাণ র্যালকেমিষ্ট ডাক্তারপ্রবরেরই উপযুক্ত ছিল। এ
দেশেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্নেদ, ক্লেদ, কদম ও নানা পচিত পদার্থ
হইতে যে নানাবিধ কীট, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মশক ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে,
সেই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে ॥ অতএব অতি প্রাচীন কাল হইতেই সত্য
মানবজগতে জীব বিনা জীবোৎপত্তি সম্ভব, এইরূপ একটা মতবাদ যে
প্রচলিত ছিল, ইহাই আমরা দেখিতে পাই।

স্বতঃজনন মতবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,
খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে সর্বপ্রথমে ইহার অজ্ঞাততা সম্বন্ধে
আপত্তি উত্থাপিত হয়। ইটালীর একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ অতি সহজ মগচ
অর্থাৎ সুন্দর একটি পরীক্ষা দ্বারা সর্বপ্রথমে স্বতঃজননসম্বন্ধীয় কল্পিত প্রত্যক্ষ
জ্ঞানের ধাঁধা সূচাইয়া দেন। কোনও প্রকারের জন্তব পদার্থ—জন্তুদেহ বা
ঐতিহাসিক পদার্থ পচিলেই তন্মধ্যে কীট জন্মে, ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা সচরাচর
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, এবং তাহা হইতেই সাধারণ ধারণা যে, পচিত পদার্থ
হইতেই অর্থাৎ পদার্থ পচিয়াই কীট উৎপন্ন হয়। উক্ত ইটালীয় প্রকৃতিতত্ত্ববিদ,
পচনশীল মৃত পদার্থের উপর কেবল একরূপ স্বল্প বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া কীট-
জনন রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বল্পবস্ত্রাচ্ছাদিত মাংসখণ্ড বা অপর
কোনও জৈবিক পদার্থ পচিয়া গেলেও যে তন্মধ্যে কীট উৎপন্ন হইবে না, ইহার
কারণ এই যে, বস্ত্রাচ্ছাদিত বলিয়া মক্ষিকাগণ সাক্ষাৎভাবে পচনশীল জন্তব
পদার্থের উপর বসিতে পারে না। স্মৃতবাং উহাদের অণ্ডও মাংস বা জন্তব
পদার্থের উপর পতিত হইতে পার না, এবং সেই জন্যই পচনশীল পদার্থ স্বল্প-

বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া বাথিলে, তন্মধ্যে পোকা জন্মে না । অনাচ্ছাদিত পচন-শীল পদার্থের উপর মক্ষিকাগণ অনায়াসেই অণ্ড প্রসব করিয়া যায় বলিয়াই, উহাতে কীট উৎপন্ন হয় ; পচিতপদার্থমধ্যস্থ কীটগণ এই সমুদয় মক্ষিকা-প্রসূত অণ্ডজ কীট বই আর কিছুই নহে । বাস্তবিক, যদি মাংস-আচ্ছাদিত বস্ত্রখণ্ড ভাঙ্গ-করিয়া দেখা যায়, ইহার উপর মক্ষিকা-প্রসূত অনেক অণ্ড পরিলক্ষিত হইবে । ইহার সাক্ষাৎভাবে মাংসের উপর পতিত হইতে পায় না বলিয়া, ইহাদের মধ্যস্থ শিশু-কীট অনাহারে মরিয়া যায় ; সুতরাং পচিত পদার্থ কীটশূন্য থাকে । যে প্রকৃতিতত্ত্ববিদ উল্লিখিত এই অতি সহজ অথচ অতীব স্নন্দর পরীক্ষা দ্বারা সর্বপ্রথম স্বতঃজনন মতবাদেব বিরুদ্ধ মত প্রচাৰ করেন তাঁহার নাম রেডি ।

এই ভ্রান্তিপ্রদর্শনের অব্যবহিত পবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয় । অণুবীক্ষণ যন্ত্র এক সম্পূর্ণ নূতন লিলিপুটিয়ান জীব-রাজ্য মানবচক্ষের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছিল । এই নবাবিষ্কৃত অমিত অগণ্য জীবাণু পরিদর্শন করিয়া স্বতঃজনন-মতবাদিগণ পুনরায় ধূম তুলিলেন যে, যদিও মুসিক, মক্ষিকা বা অন্যান্য ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলেও এই যে অসংখ্য অসংখ্য আণুবীক্ষণিক জীবাণু (যেমন ব্যাক্টেরিয়া প্রভৃতি) ইহারা স্বতঃজননসম্মত ; তাহা ভিন্ন আবহির্কপে ইহাদের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে ? স্বতঃজনন স্বীকার না করিলে, সুত পচা উদ্ভিদ বা জন্তু-দেহ মধ্যে যে অসংখ্য অসংখ্য ব্যাক্টেরিয়া বা উদ্ভিদাণু জন্মিয়া পচনকার্য্য সম্পন্ন করে, তাহাদেব বিভ্রমাতা ও প্রচুর বংশবৃদ্ধির সমস্তা আর কিরূপে নীমাংসিত হইতে পারে ? খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই আণুবীক্ষণিক জীবাণুদিগের স্বতঃজনন সমস্তা লইবা, তৎকালীন স্বাভাবিকমণ্ডলীর মধ্যে যাহা প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ছিলেন, তাঁহারা ঘোর বিতণ্ডা করিতেন । ইংলণ্ডীয় ও ইটালীয় রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত দুই পুরোহিত এই তর্কদ্বন্দের প্রধান অধিনায়ক ছিলেন । ইটালীয় স্বাভাবিক স্বতঃজনন মতবাদের বিবোধী, এবং ইংরাজী স্বাভাবিক উহার স্বপক্ষ ছিলেন । এখানে বলা আবশ্যক, স্বতঃজননবিরোধী মতবাদই প্রকৃত সত্য মতবাদ, এবং ইহা দুই বার ইটালীয় ব্যক্তি দ্বারা ই সর্বপ্রথমে সাধাবণে প্রচাৰিত হয় ।

ইহার অনূন এক শতাব্দী পরে, জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক পোষে (Pouchet) স্বতঃজনন মতবাদ পুনরুজ্জীবিত করেন । পোষে রোঁ নগরী

‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মিউজিয়মের’ অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এক বক্তৃতায় স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি আণুবীক্ষণিক জীবাণু বীজ (germ) ব্যতীত উৎপত্তি সম্বন্ধে অকট্য প্রমাণ পাইয়াছেন। সুতরাং অসংখ্য অসংখ্য এই জীবাণু যে আপনাদের জায় জনক-জননী ব্যতীত আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পোষের এই বক্তৃতার পর হইতেই, ফ্রান্স, জার্মানি, ও ইংলণ্ডের প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের মধ্যে স্বতঃজনন-সমস্তা লইয়া পুনরাব এক মহা আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইল। এই আন্দোলনপ্রবাহ প্রায় বিংশতি বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়া, অবশেষে স্বতঃজনন-মতবাদে রূপান্তরিত এবং নিঃসন্দেহরূপে উহার প্রাতিপ্রদর্শনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে আজও স্বতঃজনন মত-পক্ষীয় এক মহারথী জীবিত আছেন, এবং তিনি এখনও স্বীয় মত পরিভাষা করিতে প্রস্তুত নহেন। এই স্বতঃজনন-মতবাদীর নাম (Dr. Bastian) ডাঃ ব্যাষ্টিয়ান।

আজ আমরা হয় ত অতি সহজে আমাদের পাঠকবর্গের নিকট স্বতঃজনন মতবাদের প্রাতি প্রদর্শন করিয়া উহার অসারতা নিশ্চিতরূপে দেখাইতে পারিব। কিন্তু পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন, বিংশতি বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপিয়া অতি বোঝা অবিশ্রান্ত তর্ক ও আলোচনা, অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পর, উহার প্রাতি প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এই মহা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদিগের নামোল্লেখ করিলেই পাঠকেরা বুঝিবেন, সে যুদ্ধ নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। ইংলণ্ডে—চার্লস ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, হক্‌সলী, টিণ্ডেল, বোর্ডেন সাওয়ার্থসন, রে ল্যাক্সেয়ার, ব্যাষ্টিয়ান প্রভৃতি; ফ্রান্স—পোষ, ডুমা (Dumas), বিও (Biot) ব্যালার্ড (Balard), দো-সেনারমোঁ (de Senarmont), জোলী (Joly), গে লুসাক (Gay Lussac) প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, ইহারা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানরাজ্যের এক একজন দিগ্বিজয়ী মহারথী। তৎকালে বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ, সর্ববিধ সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের স্তম্ভ উভয়পক্ষীয়দিগের বিরুদ্ধ মতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা, উত্তর ও প্রত্যুত্তরে পরিপূর্ণ থাকিত। অধিকাংশ প্রবন্ধ ও বক্তৃতা, পুস্তক ও পুস্তিকা, এই গভীর বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বের বিবরণ লইয়া প্রকাশিত হইত। আমাদের সমক্ষেই এক্ষণে “নাইটিঙ্ক সেঞ্চুরী” মাসিকপত্রে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের এক সংখ্যায় প্রকাশিত Dr Bastian-এর স্বতঃজনন-মতবাদের সমর্থক একটি প্রবন্ধ পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যাষ্টিয়ান স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া অধ্যাপক টিণ্ডেল

ও অন্তান্ত বিপক্ষদিগকে উত্তর দিতেছেন। ইংলণ্ডে ব্যাণ্টার্নিন যেকোন স্বতঃ-জনন-মতবাদের প্রবল পোষক, ফ্রান্সে পোষে সেইরূপ। সুবিখ্যাত পাষ্টর সর্ব-প্রথমে পোষের স্বতঃজনন-মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য অগ্রসর হন। যখন পাষ্টর এই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে যান, তখন অনেকেই উহাকে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পাষ্টর তাহা না শুনিয়া, স্বীয় কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া গভীর তর্কবুদ্ধি প্রবেশ করেন, এবং বলা বাহুল্য যে, তাঁহার বিবিধ পরীক্ষার নিঃসংশয়িত প্রমাণ দ্বারা স্বতঃজনন-মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে নানা পরীক্ষার মধ্যে দুই একটির সারাংশ দিলাম।

আমাদিগের চতুর্পার্শ্বস্থ বায়ুরাশির মধ্যে অসংখ্য জীবাণু অবলম্বিত থাকে। পাষ্টর প্রথম হইতেই এই এক অভিজ্ঞান লইয়া স্বতঃজনন-মতবাদসম্বন্ধে সন্দেহের বিতণ্ডার প্রবৃত্ত হন। দধিবীজ, শিকাবীজ প্রভৃতির আলোচনার সময়, তিনি বিশেষরূপে দেখিয়াছিলেন যে, ঐ সকল বীজ বায়ুতেই অবলম্বিত থাকে, এবং পরে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইয়া উপযুক্ত আহাৰ্য্যের সাহায্যে অতিসংখ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া ফার্মেন্টেশন কার্য সম্পন্ন করে। পাষ্টর সেই নিমিত্ত তাঁহার স্বতঃজননসম্বন্ধীয় সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে ঐ অভিজ্ঞান সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া কার্য করিতেন। স্বতঃজনন-মতবাদের পক্ষীয় পণ্ডিতগণের পরীক্ষায় হ্রিজাঘেবণ করিতে গিয়া তিনি কেবল দেখিতেন, সেই পরীক্ষার মধ্যে কোনরূপে বাহিরের বায়ু কিম্বা বায়ুমিশ্রিত ধূলিকণা বা বীজাণু প্রবেশের অধিকার পাইয়াছে কি না। আর স্বয়ং সেই পরীক্ষার ভ্রমপ্রদর্শনকালে বীজাণু প্রবেশের পথ রোধ করিবার জন্য বোধোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষদিগকে পরাজিত করিতেন।

স্বতঃজনন-মতবাদী পোষে একটি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, বাহিরের বাতাসের পরিবর্তে যদি কৃত্রিম বায়ুও ব্যবহার করা যায়, (বাহার সহিত germ থাকিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই) তাহা হইলেও জীবাণু অল্প উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং সে পরীক্ষা দেখিয়া লোককে স্বতঃজনন মতবাদ মাত্র করিতেই হয়। তাঁহার পরীক্ষাটি এই—একটি শূন্য বোতলকে বায়ুশূন্য করিবার জন্য উহা জলপূর্ণ করা হইল। পরে ঐ জলপূর্ণ বোতলটিতে যে সমস্ত বীজাণু অবলম্বিত থাকি, সম্ভব তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য ঐ জল উত্তাপসহযোগে ফুটাইয়া লওয়া হইল। যখন বোতলের মুখদেশ দিয়া ফুটন্ত জল হইতে বাষ্প নিঃসৃত হইতেছে, তখন অতিসাবধানে উহার মুখপাখি এক-দ্বারে এমন করিয়া বন্ধ করিয়া ফেলা হইল যাহাতে বাহিরের বায়ু কোনও মতে

উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। এই অবস্থাপন্ন বোতলটিকে অতঃপর একটা পারদপূর্ণ পাত্রমধ্যে উবুড় করিয়া রাখা হইল। যখন বোতলের জল সম্পূর্ণরূপে শীতল হইল, তখন পারদের মধ্যে উহার গলদেশ ভাঙ্গিয়া উহার মধ্যে খানিকটা অল্পজন বাষ্প প্রবেশ করান হইল। এই অল্পজন বাষ্পই বাহিরের বায়ুর কার্য্য করিবে। আমরা জানি, জীবসাধারণের জীবনধারণের জন্য যে বায়ুর আবশ্যকতা, তাহা বায়ুনিহিত অল্পজন বাষ্পেরই জন্য। অল্পজন ব্যতিবেকে আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না, কোনও জীবই পারে না। তাই জীবাণুব সঞ্চার জন্য বায়ুনিহিত অল্পজনের পরিবর্তে উক্ত বোতলমধ্যে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত অল্পজন বাষ্প প্রবিষ্ট করান হইল। এক্ষণে বোতলের মধ্যে বিদ্যমান জল ও খানিকটা অল্পজন বাষ্প ব্যতীত আর কিছুই নাই। পোষে ইহার পূর্বে একগাছি ঘাস অথবা একটি ছিপিবদ্ধ বোতলের মধ্যে পুরিয়া, এক-শত ডিগ্রি শতাংশী উত্তাপ অপেক্ষাও অধিকতর উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া রাখা ছিলেন। ঘাসগাছটিকে একরূপ ভাবে উত্তপ্ত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উহাতে সংলগ্ন হইয়া যে বীজাণু (germ) থাকিতে পারে, তাহারও এই প্রবল-উত্তাপে একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পোষে এই বীজাণুশূন্য ঘাসটি জলপূর্ণ বোতলের মধ্যে প্রবেশিত করিয়া কিয়দ্বিবস রাখিয়া দিলেন। এই পরীক্ষায় যদিও দেখান হইল যে, পরীক্ষাধীন বোতলের মধ্যে বীজাণুপ্রবেশের পথ যেন সর্বতোভাবেই রুদ্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তৎসঙ্গেও আট দিবসের পর দেখা গেল যে, উক্ত বোতলের মধ্যে জীবাণুর সঞ্চার হইয়াছে। পোষে, এই আপাত-দৃষ্ট নিখুঁত পরীক্ষা দেখাইয়া স্বতঃজ্ঞান মতবাদের বিজয়ে মহা জয়োন্মাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই জয়োন্মাদ স্থায়ী হয় নাই।

পাঠের দেখাইলেন যে, পোষের উক্ত পরীক্ষায় বীজাণুপ্রবেশের রোধার্থে অল্প সকল সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বিত হয় নাই। সেটি পারদের সহিত ধূলিকণার মিশ্রণ, এবং তাহার সহিত বীজাণুপ্রবেশ সম্ভাবনার রোধ। বায়ুর সহিত অগণ্য অগণ্য ধূলিকণা মিশ্রিয়া থাকে। সহজ চক্ষে তাহা দেখিতে না পাইলেও যখন উহার মাধ্যম-কর্ষণপ্রভাবে ঝরিয়া ঝরিয়া টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি গৃহসজ্জার উপর জমিয়া থাকে, তখন আমরা উহাদের অস্তিত্ব অনুধাবন করি। কিন্তু ধূলিকণানিচয় কেবল মৃত্তিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নহে। উহাতে অল্প নানাবিধ পদার্থেব সূক্ষ্মতম অংশ মিশ্রিত থাকে। অতীত-সূক্ষ্ম পদার্থেব মধ্যে জীবাণুও বায়ুবাশিতে

ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত থাকে। মাধ্যাকর্ষণপ্রভাবে বায়ু-অবলম্বিত ধূলিকণা যেমন আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর উপর পতিত হয়, বীজাণুরও সেইরূপ পড়িবার সম্ভাবনা। অতএব যে পারদেব মধ্যে গোবের পরীক্ষাটি সিদ্ধ হইয়াছিল, সেই পারদের সহিত যে বীজাণু ধূলির সঙ্গে মিশিয়া ছিল না, তাহা কে বলিবে? অথবা সেই বীজাণু নষ্ট করিবার জন্যই বা কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল? আমরা জানি, পোষে এ সময়ে কোনও সতর্কতাই অবলম্বন করেন নাই। পারদের সহিত ধূলিকণার মিশ্রণ কিরূপে হয়, পাঠের অতি সুন্দর কৌশলে তাহা দেখাইয়া, এবং ঐ পারদস্থ ধূলিকণার সহিতই যে গোবের পরীক্ষিত বোতলের মধ্যে বীজাণু প্রবিষ্ট হইয়া জীবগুব সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অবিসংবাদিতরূপে দেখাইয়া সকলকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছিলেন। পারদের উপর ধূলি জমে এবং সেই ধূলির সহিত যে বীজাণু পারদ মধ্যে থাকিতে পারে, ইহা পাঠ্যের পূর্বে অল্প কাহারও মনে উদ্ভিত হয় নাই।

পাঠের স্বয়ং এ সময়ে একটি সুন্দর পরীক্ষা করেন। তিনি লম্বা গলাবিশিষ্ট একটি কাচপাত্র (Bulb) লইয়া, উহার গলাকে একটু বাকাইয়া একটা প্লাটিনম নলের সহিত সংযুক্ত করিলেন। প্লাটিনম নলটির চতুর্দিকে আর্গন জ্বলিতে লাগিল। অনন্তর ঐ কাচের মধ্যে ধানিকটা অতি সহজপচ্য দ্রব্য, (যেমন হুত্র) স্থাপন করিয়া, উহাকে কয়েক মিনিট উত্তপ্ত করিয়া, পরে শীতল হইতে দিলেন। বলয়স্থ হুত্র শীতল হইবার কালে, ধানিকটা বায়ু উন্মুক্তমুখ প্লাটিনম নল দিয়া বলবের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু প্লাটিনম নল জলন্ত আগুণে পরিবেষ্টিত বলিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। সুতরাং যে বীজাণুর বায়ুর সহিত বলব মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা, তাহা মরিয়া যায়। এই জন্য এখানে পচনশীল হুত্রের সহিত যদিও সাক্ষাৎভাবে বায়ুর সংযোগ হইল বটে, উত্তপ্ত প্লাটিনম নলের পথ দিয়া আসিবার সময় বায়ু বীজাণুশূন্য হইয়া পড়ে বলিয়াই, উক্ত বলবস্থ হুত্র বিকৃত হইতে পারে না, অর্থাৎ পচে না। সুতরাং, জীবগুবও সঞ্চার হয় না। এই পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, বায়ু সংশ্লিষ্ট বীজাণু প্রবেশাধিকার না পাইলে কখনই পচনশীল পদার্থের মধ্যে নূতন জীবগুব অভ্যুদয় সম্ভব নহে।

এক্ষণে পাঠ্যের বিকল্পমতবাদীরা বলিতে লাগিলেন, বায়ুর সহিত যে অসংখ্য অসংখ্য জীবগুব অবলম্বিত থাকে, তাহার প্রমাণ কি? আর যদি বাস্তবিকই এত অসংখ্যপরিমাণ জীবগুব বিস্তারিত থাকে, তাহা হইলে তাহার কৃষ্ণাটিকার

জায় চতুর্দিক অন্ধকার করিয়া থাকিবে। পোবে স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "They would form a thick fog as dense as iron." তাঁহারা আরও বলিতে লাগিলেন যে, কে বলিল, জীবাণুর উৎপত্তির জন্ত জীবাণুরই প্রয়োজন? যখন পাঠরকৃত পূর্বোক্ত পরীক্ষায় উত্তম প্লাটিনম নলের ভিতর দিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখন যে বায়ুসংশ্লিষ্ট জীবাণু মরিয়া গেল, আর সেই নিমিত্তই স্ত্রমধ্যে নূতন জীবাণুর আবির্ভাব হইল না, এ কথাই বা বলি কেন, হয় ত বায়ুর মধ্য এমন কোনও একটা শক্তি কি এমন কোনও কিছু—যেমন চুম্বকশক্তি, কি বৈদ্যুতিক শক্তি অথবা ওজোন (এক বিশেষ অবস্থাপন্ন অম্লজন বাষ্প) থাকে, যদ্বারা উপযুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সঞ্চার হয়। প্লাটিনম নলের অভ্যন্তর দিয়া আসিবার কালে, সম্ভবতঃ বায়ু সেই শক্তি বা সেই কোনও কিছুব জীবনসঞ্চারিণী ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়া যায়। তন্নিমিত্ত পাঠরের পরীক্ষাধীন স্ত্র বিকৃত হয় নাই, অর্থাৎ উহার মধ্যে জীবাণু আবির্ভূত হয় নাই। মহামতি পাঠর এ প্রতিবাদের খণ্ডনেও সত্ত্বর অগ্রসর হইলেন।

হুই-মুখ-খোলা! একটা কাচনলের এক প্রান্ত খানিকটা তুলা দিয়া বন্ধ হইয়া, অপর প্রান্তে মুখ দিয়া টানিলেন, তুলার ভিতর দিয়া বাহিরের বায়ু অনায়াসেই মুখে প্রবেশ করিতে পারে। ক্ষণকাল এইরূপ করিয়া বায়ু টানিলে দেখা যাইবে যে, তুলার বাহিরংশে খানিকটা ধূলা জমিয়াছে। বায়ু-মিশ্রিত ধূলিকণিকা তুলা দ্বারা ছাঁকা হইয়াই ঐরূপে তুলার গায়ে জমিয়া যায়। যদি তুলাসংলগ্ন এই ধূলিকণা একটু জল দ্বারা ধুইয়া লইয়া, এক বিশুদ্ধ জল অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিব,—কেবল রেণু নহে, রেণু সহ অল্প নানাবিধ পদার্থেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু—যেমন অজীবকণিকা, পশম, রেশম বা কাপাসের অতি ক্ষুদ্র অংশ এবং পরাগ-রেণু, নানা ঔষুতিক বীজাণু, নানা ক্ষুদ্র জীবের অণু প্রভৃতি—সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই সামান্য পরীক্ষা দ্বারা আমরা সহজেই দেখি যে, ধূলিকণার সহিত জীবাণুও থাকে।

এখন বিবেচ্য, কত পরিমাণে জীবাণু বায়ুরাশিতে সংশ্লিষ্ট আছে। প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই বীজাণুবা অতিসূক্ষ্ম আপনাদিগের বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। এমন কি, প্রত্যেক ১৫২০ মিনিটের মধ্যে ইহাদের এক এক বংশের আবির্ভাব হয়। সুতরাং, প্রথম বীজের জন্ত অধিক-সংখ্যক বীজাণুব আবশ্যক নাই। হুই একটি হইতেই হুই ঘণ্টার মধ্যে কত

সহস্র সহস্র নূতন জীবাণু উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং ঘন কুয়াসার জ্বাশ বায়ুপথ রোধ করিয়া থাকিবার ইহাদের কোনও আবশ্যকতাই নাই। বাস্তব পক্ষেও পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়, কেবল নগর, জনপদ ও পল্লীর বায়ুই অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে জীবাণু দ্বারা পূর্ণ থাকে। পৰ্ব্বতের উপর জীবাণুর সংখ্যা অনেক অল্প। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগর ও সহরের বায়ুতে অনেক অধিক পরিমাণে জীবাণু অবলম্বিত থাকে।

পাষ্টর এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর পরীক্ষা করেন। কিন্তু বাহুল্যভয়ে এখানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।

এক্ষণে আমরা একটি পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিব, যদ্বারা বায়ুনিহিত কোনও শুষ্ক ও অজ্ঞাত শক্তি—যেমন তড়িত, চুম্বক বা ওজোন,—যে আণুবীক্ষণিক জীবাণু বিকাশের কোনও সহায়তা করে না, তাহাই প্রমাণিত হইবে। পাষ্টর একটি কাচের বল্‌বের মধ্যে খানিকটা পচনশীল পদার্থ রাখিয়া, উহার গলদেশ ব্লোপাইপ সাহায্যে লম্বা করিয়া লইবা, অল্পহ্রিৎকাল আর্ক বা কাঁ নলের মত করিলেন। নলের মুখ ধোলাই রহিল। বল্‌বের নীচে উত্তাপ প্রদান করিয়া উহার মধ্যস্থ পচনশীল পদার্থ হইতে খানিকটা জলীয় অংশ বাহির করিয়া দিলেন। বল্‌বের মধ্যে যে বায়ু থাকে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা তৎসমুদয় বাহির হইয়া যায়, এবং যে বীজাণু থাকে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। এখন যদি পচনশীলপদার্থসম্মিত এই বল্‌বকে শীতল করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মাস বৎসর কাটিয়া গেলেও উক্ত পদার্থের কিছুমাত্র পরিবর্তন হইবে না। কেবল তাহাই নহে। ইহাকে নাড় চাড়, নানা জলবায়ুর মধ্যে রাখ, ৩০.৪০ ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যে রাখ, কিছুতেই উহার কোনও পরিবর্তন হইবে না, স্ফর্ষাৎ পচিবে না। ইহার কারণ এই—যদিও প্রথমে উত্তাপ দিয়া বল্‌বের অভ্যন্তর ও পচ্য পদার্থকে জীবশূন্য করা হইয়াছে, তথাপি বল্‌বের নলমুখ উন্মুক্ত থাকায় উহার মধ্যে অনায়াসেই বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু নলের বক্রতা নিবন্ধন বীজাণু বা অপর কোনও কঠিন পদার্থকণিকা বক্রপথ অনুক্রম করিয়া বল্‌বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের বলে স্থূল পদার্থ কোনমতেই উর্দ্ধগামী হইতে পারে না। সেই জন্যই বক্র নলপথে বাইবার সময়, বায়ুমিশ্রিত রেণু বা জীবাণু প্রথমতঃ নলের গায়ে ঠেকিয়া বাধা পায়, পরে মাধ্যাকর্ষণনিয়মে ঝরিয়া ঝরিয়া নিম্নে পতিত হয়। বল্‌বের অভ্যন্তরে কোনমতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই পরীক্ষার

পচনশীল পদার্থ সহ সাক্ষাৎভাবে বাহিরের বায়ুর সংযোগ হইতেছে বা তথাপি নলপথের বক্রতা নিবন্ধন বীজাণু সেখানে পৌঁছিতে পারিতেছে না। সেই জন্য উহাতে জীবাণু সঞ্চার হইল না। অতএব এই পরীক্ষার পর, চুষকশক্তি, বা ওকোনের, জীবাণুসঞ্চারসম্বন্ধে যে কোনও কর্তৃক আছে—সঞ্চার আর কোনও সারবত্তা রহিল না।

ইহা পরীক্ষাও আর একটি অতি সহজ ও সুন্দর পরীক্ষা দ্বারা ইংলণ্ডের স্বতঃজনন-মতবাদী ও বিবোধী পক্ষের মধ্যে এ বিষয় সমস্তার শেষ মীমাংসা হয়। অধ্যাপক হক্সলী ও টিশেল, ডাঃ ক্যাস্পিরনের যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য এই পরীক্ষাটি প্রদর্শিত করেন। পরীক্ষাটি সংক্ষেপতঃ এই—দুটি সমান্তরন কাচস্থালীর মধ্যে সমান পরিমাণে খানিকটা মাংসের ঘূষ জন্ত করা হইল। পরে উত্তাপসহযোগে ঐ ঘূষ কিয়ৎক্ষণ ফুটাইয়া লওয়া হইল। ফুটাইবার তাৎপর্য এই যে, যে কোনও বীজাণু ঘূষের সহিত পূর্ব হইতে মিলিয়াছিল, তাহারা বিনষ্ট হইবে। অতঃপর উক্ত দুইটি কাচস্থালীর একটির মুখ খোলাই রহিল, অপরটির মুখের উপর খানিকটা তুলা এমন করিয়া রাখা হইল যে, বাহিরের বায়ু অনায়াসেই তুলার ভিতর দিয়া স্থালীর অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিতে পাবে। তুলা স্থালীমুখে জন্ত করিবার পূর্বে, উহাতে উহা জীবাণুশূন্য হয়, তৎসম্বন্ধে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। এই অবস্থার স্থালী দুটি কিয়দ্দিবস রক্ষিত হইলে পর দৃষ্ট হইল যে, যে স্থালীর মুখদেশে একটু তুলা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার অভ্যন্তরস্থ ঘূষ অবিকৃত রহিয়াছে, অর্থাৎ উহার মধ্যে কোনও জীবাণুর সঞ্চার হয় নাই। আর উন্মুক্তমুখ স্থালীর ঘূষ অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ব্যাক্টেরিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ফল হইবার কারণ এই;—যে পাত্রের মুখদেশে তুলা ছিল, তাহার ভিতরে যদিও বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিতেছিল বটে, তাহা হইলেও বায়ুসংশ্লিষ্ট জীবাণু সকল তুলা দ্বারা আটকাইয়া বাইতেছিল। সুতরাং যে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল, তাহা নিতান্তই জীবাণু বা মুক্ত। এই নিমিত্ত উক্ত স্থালীর ঘূষ বায়ুশূন্য হইয়াও পচিল না। আর উন্মুক্ত স্থালীর মধ্যে সবীজ বায়ু প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, তাই উহার মধ্যস্থ ঘূষ বিকৃত হইল, অর্থাৎ উহাতে জীবাণুর সঞ্চার হইল।

এক্ষণে এই সকল পরীক্ষার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অনেকেই হয় ত মনে করিতে পারেন যে, তবে স্বতঃজনন-মতবাদ নিতান্তই এক আকাশকুহুম। কিন্তু

পাঠক মনে রাখিবেন, বিজ্ঞান আজও এ সম্বন্ধে অপর্যাপ্ত সাবধানতা সহকারে মত ঘোষণা করেন। বিজ্ঞান বলেন, বহু দূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বর্তমানে জীব বিনা জীব বিকাশ, অথবা কোনও জীবের স্বতঃজ্ঞান হয় তা নয় না। বৃহৎ জীবের পক্ষে স্বতঃজ্ঞান নিশ্চয়ই অসম্ভব—তাহা বর্তমানেই হউক আর অতীত কালেই হউক; কিন্তু অতিশয় ক্ষুদ্র জীব বা জীবাণু সম্বন্ধে যৌর অতীত কালে কি হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। যখন ক্রমবিকাশবাদ মতে স্থল জড় পদার্থ হইতেই ক্রমশঃ জীবের বিকাশ হইয়াছে,—ইহা বিজ্ঞানকে মনিত্তে হয়; তখন অতি যৌর অতীত কালের বিষয় চিন্তা করিলে সহজেই স্বীকার করিতে হয় যে, অন্ততঃ সে সময়ে জড় হইতে, অর্থাৎ নির্জীব পদার্থ হইতেই প্রথম বা আদিম জীবের বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং যদিও বর্তমান স্বতঃজ্ঞান অসম্ভব হয়, দূর দূরতম অতীতের মধ্যে এ পৃথিবীর পৃষ্ঠে নিশ্চয়ই জড় হইতে জীব সঞ্চার হইয়াছে। অবশ্য সে অতি আদিম প্রামাণিক অবস্থাপন্ন ক্ষুদ্রতম জীব বা জীবাণু। স্থল জড় হইতে যে কিরূপে ক্রমে ক্রমে জীব-বিকাশ হইল, সে সম্বন্ধে ক্রমবিকাশ মতবাদ আমাদের কি শিক্ষা দেয়, আমরা ভবিষ্যতে তাহার আলোচনা করিব।

ক্রীতীপতিচরণ রায়

প্রতিশোধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

খাল পারা হইয়া বৈষ্ণনাথ উল্লুখাসে গৃহাভিমুখে ছুটিল। বাগদেবীর খাল হইতে ক্রকপূর অনেক দূর। দলপতির হাতে পড়িবার ভয়ে সে বাকা পথে বন জঙ্গলের অন্তরালে পলায়নপর শূগালের ত লুকাইয়া লুকাইয়া চলিল। আপনার কথা যে রাখিতে পারে না, অন্তের স্বীকারবাক্য সম্পূর্ণ নির্ভর করা তাহার পক্ষে শক্ত। বৈষ্ণনাথ বিক্রমসিংহের কাছে অভয় পাইয়াছিল। বটে, কিন্তু তার উপর তেমন ভরাস্তর করিতে পারিল না। বাড়ী গিয়া সে নিজের বিশ্বস্ত গোয়েন্দাকে বিশ্বনাথের প্রতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য পাঠাইল। দুই দিন গোয়েন্দা আসিয়া বিক্রমসিংহের মৃত্যুসংবাদ দিল,—দলপতির কথা বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না।

ইহাতে বৈষ্ণনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে দ্বির জানিত; ফের বিশ্বনাথের হাতে পড়িলে তাহার আর রক্ষা নাই। এ বাজলা মূলুকে পলাইয়া তাহার

হাতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। চিত্তের ব্যাকুলতার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সে বিশ্বনাথের শত্রুপক্ষের আশ্রয়ালুসন্ধানে চলিল।

ধর্মপুত্র বলিয়া বৈষ্ণবনাথ দলপতির ঘরের বাহিরের যত খবর জানিত, আর কেহ তত নহে। কৃষ্ণ সর্দারের তাহা জানা ছিল। সে বৈষ্ণবনাথকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিল।

দুর্গোৎসবের আর দেরি নাই। পূজার কর দিন গরিব দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র-দান এবং দম্যগণের চিরন্তন প্রধামন্ত বিজয়া দশমীর দিন সকল দলের সম্মিলন উপলক্ষে মহোৎসব, বিশ্বনাথের জীবনে একটা প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইত। এবার কিছু টানাটানির মহল—অস্ত্রান্ত্র-বহরের মত পূজার অনতিপূর্বে লুট ভরাজে ভ্রমণ মনঃসংযোগ করা হয় নাই। বিক্রমসিংহের মৃত্যুর পরদিন গোয়েন্দা আসিয়া বিশ্বনাথকে খবর দিল, বৈষ্ণবপুরের নন্দীবাবুরা তাঁহাদের কালনার গদীতে সম্রাতি দশ হাজার টাকা পাঠাইতেছেন। মেথাকে সদলবলে নৌকাপথে পাঠাইয়া নিজে বিশ্বনাথ সরলার অলুসন্ধানে গেল। বদনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এইজন্ত দলপতি কালনার অভিমুখে ছুটিয়াছিল।

সেখানে গজার অপরপারে ভরা ভাজের ধর প্রোত দূরে রাখিয়া কসাড-বনাকীর্ণ চরের অন্তরালে মেঘা সদলবলে অপেক্ষা করিতেছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাহাবীর কল্ কল্ শব্দ শব্দ গতি-শব্দ ছাড়া আর বড় কিছু শোনা যায় না—কচিং দূরে মৎস্যজীবীর উচ্ছ্বসিত আনন্দসঙ্গীতের শেষ তানটুকু বড় মধুর শুনাইতেছিল। এমন সময়ে দলেব লোকে উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া, রূপায় কেহ ক্রম আসিতেছে। দলপতির আগমনপ্রতীক্ষায় সকলে সারি দিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু আগন্তুক ত দলপতি নহে। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, ভগবান্ মদক, মণালের আলোকে তাহার স্বদেশিক মুখমণ্ডলে উষ্মের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। বিস্মিত মেঘা কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে ভগবান্ তাহার হাত ধরিয়া তফাতে লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ভগবান্, বৈষ্ণবনাথের শত্রুদলে প্রবেশের সংবাদ পাইয়াছে। এবং বিশ্বনাথকে অবিলম্বে সাবধান করা অবশ্যকর্তব্য ভাবিয়া নিজে আসিতে দেরিমাত্র করে নাই।

প্রথমটা মেঘা ভগবানের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু অবিশ্বাসের স্থল ছিল না। শেষে মেঘা বলিল, “ময়রার পো, বিত্ত বরারর

আমায় বলে আসচে; বদে থেকে তাব সর্বনাশ হবে! দেখুচি তাই হতে চলল! এখন উপায় ?”

পশ্চাৎ হইতে বিশ্বনাথ হাঁকিল—“উপায়, মা কালী! যা কবেন তিনি!”
দূর হইতে মশালের আলো দেখিয়া বিশ্বনাথ নিঃশব্দে আসিয়া পৌছিয়াছিল।
এবং কসাড় বনের অন্তরালে দাঁড়াইয়া উভয়ের বিশ্রুতলাপ শুনিতেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বিশ্বনাথ বলিল, “খুড়ো, অনেক দিন আমার মতে চলিস্ নি, আজ একবার চল। বুঝতেই পার্চিস্, বুড়ো বাপের অস্তিম কাল উপস্থিত! গঙ্গাভীরে মুখাঘিটা করে যা!”

ভগবান বুকিল, বিস্ময়াজ্জিকার ডাকাতিতে যোগ দিতে অমুরোধ করি-
তেছে। বলিল, “বিস্ম! এ ছাই কাজ আজ আমার নাই করলি! এখন থেকে একটু সাবধান হওয়াই ভাল। বড় মানুষগুলোকে আর বাঁটিয়ে কাজ নেই। শত্রু আর বাড়াস্ নে।”

বিশ্বনাথ বলিল, “তুই কি কব্তে বলিস্? বদের ভয়ে কুকুরের মত নীজ শুটিয়ে কালুর গাঙ থেকে ফিরে যাব?”

ভগবান। বদের ভয়ের কথা বল্চি নে। কিন্তু এখন থেকে কৃষ্ণ সর্দার-
দের চাল চলনে রাত দিন আমাদের নজর করতে হবে। আচম্কা কটল
ফেলতে না পারে।

বিশ্বনাথ একটু ভাবিল। হাসিয়া বলিল, “খুড়ো তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু
আজকের দশ হাজারের লোভ সামলান বাগ্‌দীর ছেলের কর্ম নয়। আমি
বাপু আজ একটা গোয়ারতুমি করতে চাই। কিন্তু মেঘা আর তুই ছাড়া হবে
না। আবও ছ একটা বাছা বাছা সড়কীওয়ালাকে সঙ্গে নেব। বাকী সব
কালনার গঞ্জে ছড়িয়ে থাকবে।”

ভগবান চুপ করিয়া রহিল। মেঘা বেশী কথা বলে না, তথাপি কহিল,
“চার জনে ইচ্ছে করে বিগদে পড়তে যাওয়ার দরকার? ডাকাতি করতে হয়,
দল নিয়ে চল। এ সহর কালনা, কাঁড়ি পুলিশের নাকের ওপর একটু হুঁসিয়ার
হয়ে যাওয়াই ভাল। আর দশ দশ হাজার টাকা—বাবু কি নাকে তেল দিয়ে
ঘুমুচ্ছে বিস্ম?”

দলপতি হাসিল। “মেঘ, নেবাব আগে শিদিম একবার জলে ওঠে জানিস্

তো ? আজ আমি অসাধ্য সাধন করব। থাকে ফাঁড়া যাবে উত্তরে। নবাব বাদসারী দরকার হলে এক এক বার কোজগলোকে সাজিয়ে শুজিয়ে কাণ্ড-রাজ করায়, দেখিবে বিদ্রোহীদের ভয় দেখানব জন্তে। আমরাও আজ তাই করব, কি বলিস্ খুড়ো ? তুই যে বড় কথা কচ্ছিস্ নে ?”

খুড়ো বলিলেন, “বিশ্ব, ধন্তি তোর সাহস! কিন্তু বাপু, আমাদের এত জড়াস্ নে ! তুই ত জানিস্, প্রতিজ্ঞা করেছি, ডাকাতি আর করব না !”

বিশ্ব। তোকে বাপু, ডাকাতিতে ডাকবে কে ? আজ একবার হরিণের মত দৌড় দিতে হবে ! পাব্বিনে তা ?

ভগবান্ জয়ৎ হাসিল, কোনও উত্তর দিল না। তখন বিশ্বনাথ নিশ্চিত হইয়া মেঘাব সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিল।

প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। দারোগা মেহেববান খাঁ আহালাদি করিয়া সুবাসিত তামাকু সেবন করিতেছিলেন—শয়নে ঘাইবার বড় দেরি নাই। সুকোমল শয্যার অর্ধশয়ানাবস্থায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়া খাঁ সাহেব গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, আয়েস্ মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। একটু একটু নাসিকা-ধ্বনি আরম্ভ হইরাছিল। সহসা কেহ আসিয়া তাঁহার বৈঠকখানার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কতকটা বোধ্বেশ, অজ্ঞের ঝন্ঝনার দারোগা সাহেব শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন ; চক্ৰ মুছিয়া দীপালোকে দেখিলেন, সম্মুখে ভয়ানক মূর্তি !

আগন্তুক দক্ষিণ হস্তে পিস্তল উঠাইয়া বামহস্তাঙ্গুলি ওষ্ঠে স্থাপন করিল। খাঁ সাহেব গলদ্বন্দ্ব হইলেন—বুঝিয়া কোন গোল করিলেন না। তারপর আগন্তকের ইঙ্গিত মত যে অবস্থায় ছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় এবং সেই বেশে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। পথে আর দুই ভীমমূর্তি তাঁহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। অন্ধকারে অপথে মার্জ্জারকবলিত মুখিকবৎ “দারোগা সাহেব” কলের পুতলীর মত চলিলেন।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথ দিব্য নিরীহ বাবুটির মত নোকার বসিয়া ক্ষীণ প্রদীপালোকে লেখা পড়া করিতেছে। মাঝে মাঝে কুণ্ডলীকৃত আলবোলায় রৌপ্যমণ্ডিত নল অথরোষ্ঠে স্পর্শ করিয়া ঘোর বিষমীর মত চিস্তাময়ের ভাব দেখাইতেছে। ভীষণমূর্তি অপবিচিত্র তিন জন সেইখানে দারোগা সাহেবকে লইয়া গেল ; সশস্ত্র অগ্রগামী ব্যক্তি বিশ্বনাথকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “হকুম তামিল।

হবেছে ; ইনিই দারোগা সাহেব !” বিশ্বনাথ দারোগা সাহেবকে আদর করিয়া বসাইল এবং হিন্দুতে স্বাগতকুশল জিজ্ঞাসা করিল ।

শ্রী সাহেব তখনও সামলাইতে পারেন নাই । এমন অভাবনীয় বিপদের ভিতর বিশ্বনাথের সমাদরটুকু কঠোর বিক্রপ বলিয়া মনে হইতেছিল । তিনি কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না ।

বিশ্বনাথ দারোগার মনোভাব বুঝিল । ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “বিশেষ ডাকাতের নাম শুনে থাকবেন । এ অধম সেই বিশেষ ডাকাত । সামান্ত একটু কাজের জন্তে, আপনাকে তথলিফ দেওয়া হয়েছে । “মেহেরবান শ্রী বহিমদৃষ্টিতে বিশ্বনাথের আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, ক্রোধ এবং উবেগ সংযত করিয়া বলিলেন, “আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট বোধ করি কখন হয় নি । আমাকে এ ভাবে বেইজ্জত করার কি মতলব ?”

বিশ্বনাথ বলিল, “ডাকাতিতে আইন ইজ্জত কিছুই ঠিক থাকে না । সেটা স্বাক করবেন । অতি সামান্ত কাজের জন্ত আপনাকে আনা হয়েছে ; আজ আমি নন্দী বাবুদের গদী লুট করব । আপনাকে তাতে একটু “মদৎ” করতে হবে ।”

বলিতে বলিতে বিশ্বনাথ নিজের মস্তকস্থ বাস্ক হইতে কাগজ বাহির করিয়া দারোগা সাহেবের সম্মুখে রাখিল । কলমদান সরাইয়া দিয়া বলিল, “কোন লোক জনের মদৎ নয়—কেবল একটু একরাবনামা লিখে দেওয়া । লিখুন, এই ডাকাতি আপনাব যোগ সাযোগে হয়েছে ।”

কি সর্বনাশ ! দারোগা চক্ষু স্থির করিয়া বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া রহিলেন । পশ্চাতে কে বিকৃতকণ্ঠে ইঁাকিল—“ছকুম তামিল কবো জলদি !”

শ্রী সাহেব করঘোড়ে বিশ্বনাথকে বলিলেন, “শুনেছি আপনি গরীব হুংধীর মা বাপ ! আমাব ইজ্জৎ নিয়েচেন, চাকরীটুকু নিয়ে কি আপনার লাভ হইবে ? এই একরাবনামা লিখে নেওয়াও যা, আমার রুজি মারাও তা !”

বিশ্বনাথ হাসিল । “এই একরাবনামায় আপনার যদি চাকরী যায়, আমি তাঁর জবাবদিহি করব । আপনি কৈফিয়ৎ দেবেন, জোর করে আমি লিখে নিজেচি । কেহ তা অবিশ্বাস করবে না । কিন্তু সরকার বাহাদুর জেবন যে, লোকটার মাথা নেবার জন্তে তাঁদের ঘুম হচে না, সে দারোগা সাহেবদের কাছ থেকেও একরাবনামা আদায় করতে পারে ।”

দারোগা তথাপি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন । পশ্চাতে আবার সেই বিকৃত কণ্ঠ তাঁহাকে শাসাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের কনকনায় নোকা

স্পন্দিত হইল। খাঁ সাহেব বিরক্তি না করিয়া, একরার নামা লিখিলেন। বোদ্ধবশী আর কেহ নহে, মেঘা স্বয়ং। সে দারোগার লিখিত ফারসী পড়িয়া বলিল, “হয়েছে।”

বিশ্বনাথ ভগবানকে ডাকিল এবং সে ছইয়ের উপর হইতে নামিয়া আসিলে বলিল, “খুজো, দারোগা সাহেব আমাদের অতিথি। তুমি তাঁর সেবা শুশ্রূষা কর। আজকের ব্যাপারে সেই তোমার কাজ। সময় হলে গুঁকে বিদায় দিও।”
“খাঁ সাহেব ভগবানের নজরবন্দীতে রহিলেন।

তখন তিনজনমাত্র অমুচর সঙ্গে বিশ্বনাথ প্রায় মধ্যরাত্রে নন্দীদের গদী লুট করিতে বাহির হইল। বিস্তর লোক আশে পাশে থাকিলেও চারিজন-মাত্র গদীতে প্রবেশ করিয়া দশ হাজার টাকা উঠাইয়া লইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কালনার ডাকাতির খবর অচিরে দেশময় রাষ্ট্র হইল। দেশের ধনকুবের-গণ ইহাতে অতিবিস্ত্র হইয়া উঠিলেন। বিশ্বনাথের অনিষ্টকামনার গোপনে গোপনে অনেকে রাজপুরুষদের সহায়তার প্রবৃত্ত হইলেন। স্পষ্টতঃ সেই দস্যু-রাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন, তখনকার অরাজক দিনে আর কাহারও সাহসে ইহা কুলাইত না। কোম্পানি বাহাদুর নদীয়ার মাজিষ্ট্রেটের সিপাহীবল-বৃদ্ধি করিয়া বিশ্বনাথ ও তাহার সহচরদের “গ্রেফতারির” জন্য বিশেষ বন্দো-বস্ত করিলেন। কৃষ্ণ সর্দার বৈজ্ঞানাথের কাছে দলের নাড়ীনক্ষত্রের সকলই জানিয়া লইল; কিন্তু সহসা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ছড়ুরে তাহাকে উপস্থিত করিল না।

বিশ্বনাথের সর্কত্রর—এ সকলই তাহার গোচর হইল। সেখা পরামর্শ দিল, এ অবস্থায় যে কোনও প্রকারে বৈজ্ঞানাথকে হত্যা করিয়া অনিষ্টবৃদ্ধিনিবারণ করা কর্তব্য; বিশ্বনাথ সত্তোম্রত বিক্রমসিংহের অনুরোধ স্বরণ করিয়া জিহ্বায় দংশন করিল। যাহা হউক, আড্ডাগুলি পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল অজ্ঞাত-বাস অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব দলপতি নূতন নূতন আড্ডা গঠনের দিকে মন দিল। ইহার মধ্যে নাকাশিপাড়ার অদূরে ব্রাহ্মণীতলার নিবিড় জঙ্গল সর্কপ্রধান। এই জঙ্গল কিয়ৎপরিমাণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। শোনা যায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের প্রাণরক্ষার জন্য মুরশিদাবাদের দরবারে যে তিন লক্ষ টাকা উপহার পাঠান, তাহার জমাদার ভৈরবনাথের সহায়তার এইখানে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। নাকাশিপাড়ার বাবুদের ভাগ্যলক্ষীর

বুনিয়াদ ইহাই । ভাগীরথী তখন এই বনের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে বহিয়া যাইতেন, সে বৎসর বিশ্বনাথ কালনাথ গদীর টাকার ব্রাহ্মণীতলার মহা-সমাবোধে দুর্গোৎসব করিবার সঙ্কল্প করিল ।

এই পূজার আয়োজন এরূপ সজোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, বিশ্বনাথের শঙ্করণ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না । তাহাদের চক্ষে ধূলি দিবার কল্প বিশ্বনাথ স্বরূপগঞ্জের আড্ডার উদ্যোগ আয়োজন সমান রাখিল । বৈষ্ণবনাথ ক্রব জানিত, দলপতি যেখানে থাকুক, পূজার কয়টা দিন সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া সে স্বরূপগঞ্জের আড্ডায় কাটাইবে । সে খবর লইতে লাগিল, নদীয়ার কুস্তকারেরা আসিয়া বাৎসরিক প্রথমত প্রতিমা গড়িতেছে । তাহার সংবাদ-দাতা ভিখারীর বেশ ধরিয়া নিজে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, এবার ষোড়া প্রতিমা ! শুনিয়া কৃতম্ব, মনে মনে হাসিল । ভাবিল, এবারে নবমীপূজার দিন ষোড়া মহিষের সঙ্গে বিশের মাথাটা যদি কাটা না পড়ে, তবে মিছা তাহার গোয়েন্দাগিরি !

সুতরাং কৃষ্ণ সর্দার জেলার মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেবকে কৃতনিশ্চয় করিয়া আসিল । পূজার ছুটির সময় সে দস্যু ব্যাঘ্রটাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া হজুরে হাতির করিবে । সাহেব হাসিয়া “ইনাম” ও “ভরস্কির” ভরসা দিলেন ; এবং নিজে সে শীকারে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ।

স্বরূপগঞ্জের আড্ডা বিশ্বনাথের প্রিয় বাসস্থান । এখন যে প্রান্তরের এক পার্শ্বে নীলকুঠির বাঙ্গলা ঝাউ গাছের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে, তখন তাহা দুর্গম-অরণ্যে আবৃত ছিল । এখন যে ভাগীরথী-খড়িয়ার সম্মিলনক্ষেত্র প্রায় দুই ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়া কালমাহাত্ম্যাকীর্ণন করিতেছে, তখন তাহা সেন রাজাদের ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদের ভিত্তিপাদমূল চূষন করিত । বিনয়, বিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা, ভপের—কোলীন্তের সেই পুণ্য রাজগৃহ এখন “বল্লাল চিবির” স্তূপে পরিণত হইয়াছে ! বিশ্বনাথের দিনে তাহার ঐতিহাসিক চিহ্ন এতটা লোপ পায় নাই । সেই গঙ্গা-খড়িয়া-সঙ্গের অনতিদূরে অরণ্যমধ্যে পরিপাটী কুটার নির্মাণ করিয়া, বিশ্বনাথ ইদানীং বৎসরের অধিকাংশ কাল যাপন করিত

বিশ্বনাথের অহুরোধে ভগবান এইখানে আসিয়া বাস করিল ।

ক্রমশঃ ।

મહયોગી સાહિત્ય ।

রঙ্গভূমি ।

এদেশের বঙ্গভূমি ও বঙ্গভূমিতে অস্তিত্বীত নাটক সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা সমগ্রাচর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মাসিকের সম্পাদক মহাশযেবা ত একবারেই আমাধেব বঙ্গালয।

উক্ত সাহিত্যোচিত পাণ্ডিত্য নষ্ট হইয়া যায়। সাপ্তাহিক মহাশয়-
দিগেব অপবাধ অল্পবিধ। বিনামূল্যে প্রদত্ত প্রবেশাঞ্জা অথবা আলাপ-আলোচনার অনুরোধে
তাঁহাদের মুখ হইতে নিরবচ্ছিন্ন বাহবা-ধ্বনি ভিন্ন অপর কোনও শব্দ সাধারণতঃ শ্রুতিগোচর
হয় না। এদেশীয় রঙ্গালয়গুলির অবস্থা কিরূপ; তাঁহাদের অভাব কি কি, অভিনীত নাটক-
গুলিতে আদৌ কোনও প্রকাব নাটকত্ব আছে কি না; কি করিলে রঙ্গালয়, তথা রঙ্গ সাহি-
ত্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারে,—এ সকল বিষয়ের আলোচন আলোচনা নিতান্ত প্রয়ো-
জনীয়। কারণ, কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতির ন্যায় নাট্যাভিনয় প্রভৃতিও কলা বিদ্যার অন্তর্গত।
মানবেব জীবনসমালোচনা উহাওও উদ্দেশ্য; সুতরাং উহা হইতেও জীবনবাণ সঞ্চকে নানা
অভিজ্ঞতালভেব সম্ভাবনা। আমাদের বর্তমান রঙ্গালয়সমূহে নাটক ও বঙ্গভূমির এই
সমুচ্চ চরম আদর্শ কত দূর অনুসৃত হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করা সমাজহিতৈষী-
মিত্রবর্গই একান্ত কর্তব্য।

বিদেশে, বিলাতে অভিনয় সমালোচনার অবস্থা কত দুঃ উন্নত, আজ আনন্দের ভাষায়ই
একটু পবিচয় দিব। “থিয়েটার” নামক বিলাতী মাসিকপত্র প্রায় ত্রিশ-বৎসর ধরিয়া
বেশ দক্ষতার সহিত পবিচালিত হইতেছে। ইহাতে নাটক, নাট্যা-
লোকা-বিবরণ, অভিনয় সমালোচনা, নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ইত্যাদি

ভিন্নর ও বঙ্গভূমি সম্বন্ধে বাবদীয় কথা বিলক্ষণ নৈপুণ্যেব সহিত আলোচিত হইবা থাকে। বঙ্গাশ্রম যে কেবলমাত্র রঙ্গের আলয় 'নহে, ইহাও যে জগতের উন্নতিব অঙ্গস্বরূপ, "থিয়েটার" প্রাপণে এ কথা প্রমাণিত করিতেছেন। ইহার পরিচালকেরা পত্রিকার ক্রমোন্নতিবিষয়ে সর্বদাই সচেষ্ট। আজ কাল ইহাতে প্রতিমাসেই দুইজন কবিবা প্রতিষ্ঠাবান অভিনেতার কটো-প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইতেছে। এ বিষয়ে প্রকাশ-কেরা অধিকতর উন্নতিব আশাও দিয়াছেন। বর্তমান জুন মাসের সংখ্যায় প্রসিদ্ধ ট্রাজিডি-অভিনেত্রী সাবা বার্গহার্ট ও 'সেন্ট জেমস থিয়েটারের' খ্যাতিমান অভিনেতা হার্বার্ট ওয়ারিং সাহেবের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ছবি দুইখানি আলোকচিত্র শিল্পেব গৌরবস্বরূপ। ট্রাজিডি-অভিনয়কমে সারাব সাধনা অতীব বিশ্বস্তকব। "থিয়েটারের" লেখককে তিনি একদা বলিয়াছিলেন—

“ব্রহ্মার বিভীষিকা মূর্তির সহিত পরিচিত হইবার নিমিত্ত আমি দুই তিন বাব ককিনেব (Coffin) ভিতর নিশিৰাণন করিয়াছিলাম। কিছু দিন হইল, আত্মহত্যাকারী এক জন নিরাশপ্রেমিকের ককাল লইবা আমি নাড়া চাড়া কবিতাম।” এ দেশের স্বয়ংসিদ্ধ ‘ট্রাঞ্জি-ডিবাণ’দিগের জন্য আগরা কথা করটা তুলিয়া দিলাম।

কিছুদিন হইল, প্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখিকা শ্রীমতী উইডা 'নাইটিংস সেকুয়াতে' নাট্যাভিনয়-
সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, 'থিয়েটার' সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উইডা
অভিনয়বিধায়ে কৃষ্ণশিল্পের মধ্য হইতে একবারে বহিষ্কৃত করিতে চান বাটে, কিন্তু, তাহার

সতে ইহা "reflex art not self-originating and self contained." তিনি বলেন,—
 "অভিনেতা যে আশের অভিনয় করিবেন, তাহা তাঁহাকে পূর্বাঙ্কে লিখিয়া না দিলে তাঁহার উপায় নাই। অন্যান্য শিল্প একপ পদার্থাপেক্ষী নহে। উহার স্বাধীন, আপনাই আপনা-
 দের সর্বসম প্রভু। এই হিসাবে অভিনয়বিদ্যা অপরাপর শিল্পের সহিত তুলনার নিকট না
 হউক, কতকটা যে অসহায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

অভিনয়-শিল্পের পরাশ্রিতা সর্বজনসম্মত; "থিয়েটার"-সম্পাদকও তাহা স্বীকার
 করেন। কারণ, যিনি কবি, কেবল কাগজ, কলম, কালী হইলেই তাঁহার কাজ চলে; যিনি
 অভিনয়-শিল্প। চিত্রকর, তাঁহারও কেবল কতকগুলি রং আব একটা। তুলি হইলেই

হইল, পবন অভিনেতার হাতে স্থলিখিত, সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ
 তুলিয়া না দিলে, তাঁহার ব্যবসায় একবারে অচল। এক কথা স্বীকার কবিরূপে "থিয়েটার"
 উইডার ন্যায় অভিনয়-বিদ্যাকে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র বা ভাস্কর্য্য হইতে নিয়তন হান
 দিতে চান না। আমবা সম্পাদকগণের কথাগুলিও ভাবানুবাদ দিতেছি,—

"সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্বেব সৃষ্টি লইয়াই শিল্পের কার্য্য। কোন বিশেষ উপায়ে সেই
 সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইল, সে বিষয়েব পরীক্ষা তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীকে

ভিন্ন ভিন্ন প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। কবিব অবলম্বন, শব্দ ও
 অভিনেতার কথা। স্বাক্ষর; চিত্রকবেব, বর্ণ ও আকৃতি; ভাস্কবেব, উপাদান ও গঠন।

কিন্তু হ্রনিপুণ অভিনেতা উপাদান ও গঠনের ভিত্তি স্বীকারী স্বাক্ষর কবেন,—অভিনেতা
 স্বকীয় দেহরূপ একমাত্র আধারে উপাদান, আকৃতি, বর্ণ, শব্দ ও নমনশীল্যেব বৈচিত্র্য
 দেখাইয়া, উহাদের সকলকেই পবাক্ষিত করেন। তিনি একাধারে চিত্রকর, ভাস্কর ও বক্তা।
 অনেক সময়ে স্তম্ভক অভিনেতা, যার অঙ্গশরীর বাবা কবিব বাক্য অর্থবান ও বিশদ
 করিয়া দিয়া, চিত্রা ও বুদ্ধিশক্তিও পরিচয় দিয়া থাকেন। উইডা স্বয়ং এক কথা স্বীকার
 কবিয়াছেন,—"Many of the modern plays which have been placed on the
 London stage within the last few years, and considered eminently
 successful with and by the London public, are weak in composition, and
 devoid of any value as literature; when read they are seen to possess
 no single literary quality; it is to the art of the actor who has breathed
 life into their dry husks that they owe all their welcome from the public."

"উইডা বলেন, কোনও অভিনেতাকে তাঁহার সহযোগিবর্গের দক্ষতার উপর অনেকাংশে
 নির্ভর করিতে হয়। অন্যান্য অভিনেতা বা অভিনেত্রী হ্রনিপুণ না হইলে তাঁহার সমস্ত
 বিদ্যা ব্যর্থ হইয়া বাব। যিনি রাজ্য লিখরের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা

নর করিতে পারেন, অকর্ষণ্য কডেলিয়ার পামায় পড়িলে তাঁহাকেও
 হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। উইডার এ উক্তি অনেকাংশে সত্য। কিন্তু একপ হইলেও স্তম্ভক
 অভিনেতার নিজেব নৈপুণ্য কোথায় বাইবে? তাঁহার গুণগণা ত সকলকেই স্বীকার কবিতে
 হইবে। অপরন্ত, যেখানে অপরের সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নাই, সেই সকল বগত-
 উজ্জিব স্থলে তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে তাঁহার শিল্পকুশলতার মোহিত করিতে পাবেন।
 আর এক স্থলে বলিয়াছেন যে, অন্যান্য শিল্পিকুল সাধারণের সহানুভূতি ও উৎসাহ না পাইলেও,
 উহাকে উপেক্ষা করিয়া আপনা আপন সহচরিত্ত্যাব আশ্রয়সাধ লাভ কবিতে পারেন। অভিনেতার
 অদৃষ্ট অনাক্রপ। দর্শকবৃন্দের প্রিয় ও অনুব্রাজ্যাজন হইতে না পাবিলে তাঁহার
 সকলই বৃথা। কিন্তু, এ বিষয়ে সকলের অদৃষ্টই সমান। দর্শক নহিলে যেমন অভিনেতার
 চলে না, তেমনই সাধারণের মনোব ভিতর প্রবেশ করিতে না পাবিলে কবিব কাব্যপ্রকাশও

বিফল। সমসাময়িক লোকদিগের প্রজ্ঞালাভে বঞ্চিত হইলে, কবি, উবিদ্যাদংশীরদিগের মুখ চাহিয়া কথঞ্চিৎ আশাষিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা বাও যদি বিকপ হয়, তবে তাহা উপায় নাই। তখন তাহাব সাধের সৌন্দর্যোদ্যানকে মৃত্যুব্রীং এস হইতে কে বন্ধ করিবে? বস্তুতঃ, কেবল আত্মপ্রসাদ শিল্পসৌন্দর্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; লোক-হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিলে, জীবনপথে মানবচরিত্রের নিবাসক হইতে না পারিলে, সর্ববিধ শিল্পেরই সন্ধান দুঃসঙ্গ।”

উপসংহাৰে “থিয়েটার”-সম্পাদক মহাশয় আপন ব্যবসায়ের আয়কৃত গৌরবব্যাখ্যায় উৎকৃষ্ট হইয়া বলিতেছেন,—“অভিনেতা না থাকিলে নাটককাব্যের অস্তিত্ব স্বভাবতঃই লুপ্ত হইয়া যায়। তিনি তাহার রচনা প্রকাশ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাব গ্রন্থ তখন কেবল শুদ্ধ সাহিত্যরূপেই পঠিত ও আলোচিত হইবে, অভিনেত নাটকরূপে অবলোকিত হইবে না। পুস্তকনিবন্ধ নির্জীব অক্ষরভাষা কখনই জীবন্ত ও ফিরাশীল অভিনেতার স্থান পূর্ণ করিতে পারিবে না। সঙ্গীতের সম্পর্ক কেবল প্রবেশদ্বারের সহিত, কিন্তু অভিনেতা মূগপৎ চক্ষু, কর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। অভিনেতা, কবিব স্তম্ভোচ্ছ্বাসিত ভাবে সম্পূর্ণ সজীব, পূর্ণতম প্রতিমূর্তি।” সম্পাদক মহাশয়ের কথা কতকংশে স্বীকার্য। কিন্তু আমবা মুগ্ধিত যে, তাহার সম্প্রদায়ের অন্তর্ধানি গৌরব গাহিতে পারিতেছি না। অভিনেতা বড়ই হৃদয় ও হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন হউন না কেন, তাহাব কীর্তিকোশল তাহাবই সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া যায়। মিসেস্ সিড্‌নস্ সেঙ্গপীয়াবের এক নাটক ও নাট্য।

অন হৃদয় অভিনেত্রী ছিলেন, সেঙ্গপীয়াবের পাঠফালে এখন আমবা কেবল ইহা স্মরণ কবি মাত্র; যে মোহ তিনি তাহার ধোতৃত্বের প্রাণে ঢালিয়া দিতেন, আমবা এখন তাহাব কণামাত্রও অনুভব করিতে পারি না। এখন-কাব কোনও অভিনেতাকে কৃত্ত্ব লাভ করিতে দেখিলে, তাহার ভুলনা মুগ্ধিতে গিয়া নট-প্রবর গ্যারিকের নামট। কখনও কখনও কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, এই মাত্র। কিন্তু তুমি, উইলিয়ম সেঙ্গপীয়াব! পৃথিবীর সমগ্র রঙ্গালয় প্রলয়ের জলে নিমজ্জিত হইক, তুমি আমাদের হৃদয়বাহ্যে যে অগুরু আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছ, স্বয়ং দ্বিবিজয়ী আলেকজান্ডার আসিলেও তাহা হইতে তোমাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী, উজ্জ্বলিনীর রাগচন্দ্রাতপতলে উপবিষ্ট, অসংখ্য সম্ভাসংপরিবেষ্টিত বিক্রমারিত্যের ননোহরণ কবিত, তাহাবা সকলেই কালের শ্বোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে,—কিন্তু তুমি, মহাকবি কালিদাস! তুমি সেই মালিনীভীরশোভী নিম্নত তপোবননিকুলে যে অতুল মহিমাধরী স্ববর্ণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছ, তাহার সৌন্দর্য্যে আজিও এই বহুজগৎ প্রাপ্ত পর্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

সাহিত্য।

জুলস্ ভার্ণে

ভার্ণের মত স্নেহকর ও বহুপুস্তকপ্রাপ্ত সত্য সত্যই বড় অল্প। তাহাব বৈজ্ঞানিক উপপাদ্য পাঠ করিলে লেখকের বর্ণনাকোশল ও রচনামাহুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সম্প্রতি “ইউও ম্যাগাজিন” পক্ষে প্রকাশিত তাহার সঞ্চরীয় প্রবন্ধ ও বৎসব দুই পূর্বে কোনও ইংবাজী পক্ষে প্রকাশিত অল্প এক প্রবন্ধ হইতে, বর্তমান প্রবন্ধ সকলিত হইল।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এই ফেব্রুয়ারি তাবিখে ভার্ণেব জন্ম হয় । তিনি স্থানীয় পরিবারের সন্তান । প্রথমে হগোর প্রভাব তাঁহার উপর অসম্ভব অধিক ছিল । হগোর রচনাবিশ্বকর্মে নবীন লেখক নাটক ও উপন্যাস রচনা করেন । গ্রন্থকারের বড় দুঃখ যে, কবাসী সাহিত্যে তাঁহার স্থান নাই । দেশে তাঁহার প্রতিভা পুরস্কার পায় নাই ।

পর্যটন বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন । তিনি বড় ভূগোলভক্ত ; কাহাবও কাহারও যেমন সাহিত্য বা ইতিহাসের উপর ঝোঁক থাকে, তাঁহার তেমনই ভূগোলের উপর ঝোঁক ছিল । ক্রমাপন্ন মানচিত্র নানাচাঁড়া কবিবাই উপন্যাস আনন্দ হয়—প্রথম পুস্তক “বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ”,—

এম্বে বর্ণিত স্থান আফ্রিকা ; আফ্রিকা সম্বন্ধে আজও আমরা বড় সজ্ঞ—তাই বেলুনে উঠিয়া তদ্রূপদর্শনের কল্পনা লেখকের মাথার উদ্ভিত হইয়াছিল । তিনি জীবনে একবার মাত্র বেলুনে উঠিয়াছেন—তাঁহাও এই পুস্তকবচনার বহুকাল পরে । আব পাঁচ সপ্তাহ ত পর্বের কথা, তিনি পুরা এক ঘণ্টাও বেলুনে ছিলেন না । ভূগোল হইতেই তাঁহার উপন্যাসের উৎপত্তি—বিজ্ঞান হইতে নহে ।

গ্রন্থকারের পত্নী ‘ক্লিও ম্যাগালিনেন’ লেখিকাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামীর উপন্যাসে বর্ণিত অনেক বিষয়কব বৈজ্ঞানিক বার্তা সত্য হইয়াছে । গ্রন্থকার বলিলেন যে, সে সকল হঠাৎ হইয়া গিয়াছে—প্রকৃত কথা এই যে, তিনি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিবাব পূর্বে হইতেই নানা পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে আবশ্যক বিষয়ের সাবসংগ্রহ কবিতে আরম্ভ করেন ।

বিষয় ভাগ করিয়া সে সকল সাজান থাকে । এইরূপ ২০০০ বিষয়ের সংগ্রহ এখন তাঁহার কাছে আছে । এখনও সমস্ত সংগ্রহ ব্যবহৃত হয় নাই । সে সকল অমূল্য । তিনি কুড়িখানা সংবাদপত্রের গ্রাহক—তাঁহা ভিন্ন নবপ্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি আগ্রহের সহিত পাঠ করেন । তিনি পাঠ কবিতে বড় মজবুত এবং পাঠে তাঁহার অসীম আনন্দ ।

ভার্ণে প্রাতে পাঁচটাব সময় শয্যা ত্যাগ করেন, এবং এগারটা পর্যন্ত বচনা, প্রথম প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকেন । কিন্তু সেহটা বড় জটিল ব্যাপার,—বিশ্রাম ত চাই—রাতিতে আটটা সাড়ে আটটাব সময় তিনি নিদ্রিত হন ।

ক্ষুদ্র শরন-কক্ষেই প্রায় গ্রন্থকারের বচনাকার্য সম্পন্ন হয় । প্রথমে গল্পের একটা খসড়া প্রস্তুত করা হয়—তৎপূর্বে গল্পটা আগাগোড়া ভাবিয়া ছিন্ন করা হয় । একখানা পুস্তক বচনার সময় লেখকের সম্বন্ধে আবও খান ছয়ক পুস্তকের ককাল খড় খড় করিতে থাকে । তিনি বলেন যে, যদি কখনও রচনাবিষয়ের

জন্ত তাঁহাকে ভাবিতে হয়, তবে তিনি বুঝিবেন যে, তাঁহাকে লেখকের কার্যে ইচ্ছা দিতে হইবে । বসডাব পর্ব অধ্যায়ের ধারাবাহিক নাম লেখা হয় । তাহার পর অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় পেনসিলে গল্প লেখা হয় । তাহার পর রচনা পাঠ করিয়া ফালিতে লেখা হয় । প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রথম দেখিবাব সময়েই বিষয় বিপদ উপস্থিত হয় । ছত্রে ছত্রে পরিবর্তন ত হয়ই—তাঁহা ভিন্ন সময় সময় এক একটা সমগ্র অধ্যায় পুনর্বার লিখিত হয় । ছাপা না হইলে যেন কাটকুট শেষ হয় না । সময় সময় আট নয় বাব এইরূপ পরিবর্তন করিয়া দিতে হয় । ভার্ণে সাধারণতঃ বৎসরে দুইখানা উপন্যাস রচনা করেন—তবে রচনার তিনি যেতদ্ভিন্ন অগ্রসর—এখন যে পুস্তকবচনার তিনি ব্যাপৃত, সেখানা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইবার কথা । তাঁহার ইচ্ছা, আশিখানা গান্ধাজ পুস্তক বচনা করেন, কিন্তু এখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি বড় ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে ।

প্রকাশকের সহিত বন্দোবস্তে লেখকের বড় লাভ হইত না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সে বন্দোবস্ত বদলান হইয়াছে। কিন্তু তথাপি লাভ প্রকাশকেরই অধিক। লেখক অর্থের জন্য তত হুম্মিত লাভালাভ।

নহেন—তিনি সাহিত্যসেবক ও শিল্পী—তিনি আগ্রহের পশ্চাতে থাকিয়া, একটা মত লইয়া 'বাস্তব', রচনাব পরিপ্রসে আনন্ডিত।
বচনাব পব আর রচিত বিষয় তাঁহাব মনে থাকে না, এবং সময় সময তিনি পুস্তকাগারে যাইয়া আপনাবই রচিত পুস্তকপাঠে প্রচুবপরিমাণে আনন্দলাভ করেন। কেবল তাঁহাব হুম্ম,—স্বদেশে তাঁহাব সম্মানলাভ হইল না।

তাঁহার পুস্তকাগার বৃহৎ—একটা প্রকাণ্ড টেবিলে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের স্তূপ ও একটা ধোপ ধোপ বাজে পূর্বকথিত ২০০০ সারসংগ্রহ। হোমার, ইংরাজী গ্রন্থ। ভার্জিল ও সেকুপীয়বের গ্রন্থ ব্যবহারে মলিন হইয়া আসিয়াছে। কুপার, ডিকেন্স ও স্কটের গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায় যে, সে সকল বিশেষভাবে অধীত।

তিনি বলেন যে, স্কটল্যাণ্ডে ভ্রমণকালে তিনি প্রচুর আনন্দ পাইয়াছিলেন, আব তিনি টেম্‌সের বড় প্রশংসা করেন। স্কটের উপস্থান তাঁহার পরম প্রিয়, ট্রিভেন্সনের Treasure Island তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। ডিকেন্সের উপস্থানে তিনি নারীচরিত্র।

মুগ্ধ। তাঁহাব গ্রন্থে অধিক নারীচরিত্র নাই, এই কথা শুনিয়া তিনি বলেন যে, তাহা প্রকৃত নহে। স্থানে স্থানে নারীচরিত্রের অভাব নাই। তাহার পব তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, প্রেম সর্বদাবী; এবলপ্রেমদ্রাবিত হৃদয়ে অন্ত চিন্তার বড় স্থান থাকে না। গ্রন্থে বর্ণিত মানবগণের বুদ্ধির বড় অবশ্রুত। কোনও মোহিনী হৃদ্যবী কাহে থাকিলে তাহাদের কার্যে ব্যাঘাত ঘটবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাহা ভিন্ন পুস্তকগুলি এমন ভাবে রচিত যে, অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ নিঃসঙ্কোচে সে সকল পাঠ করিতে পারে। নানা নারী-চরিত্র গ্রন্থে থাকিলে তাহা সকল সময় সম্ভবপর হয় না।

থ্যাকারে।

মিষ্টাব লিলি উনবিশ শতাব্দীর পরিহাসবসিকদিগের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন—চার জনের সম্বন্ধে চারিটি বক্তৃতা। তিনি চারি জনের চারিটি নাম দিয়াছেন; ডিকেন্স ডিমক্রাট পরিহাসবসিক; থ্যাকারে দার্শনিক পরিহাসবসিক, জর্জ ইলিয়ট পরিহাসবসিক কবি ও কার্লাইল পরিহাসবসিক ভবিষ্যদ্বক্তা। এতদ্ব্যতী ডিকেন্স ও থ্যাকারে মানবচরিত্রের দুর্বলতা-অন্ধনেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

থ্যাকারে ও ডিকেন্সে একটা বড় প্রভেদ আছে। থ্যাকারে প্রাচীন সাহিত্য-শ্রোতে ভাসমান; ডিকেন্স তাহা নহেন। ডিকেন্স আপনার চারি পাশ হইতে—পুলিসকর্তাদেব কাছ হইতেও মানবের দুর্বলতার ইতিহাস সংগ্রহ করিতেন। উভয়ের রচনায যে পার্থক্য, তাহা একের Vanity Fair, অন্ডের Pickwick

Papers, বা একের The Newcomes ও অন্তের Nicholas Nickleby পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। ডিকেন্সের প্রত্যেক খুঁটিনাটি দর্শনক্ষমতার উল্লেখ করিয়া মিষ্টার লিলি বলিয়াছেন যে, এখন শিক্ষিতসমাজে ডিকেন্সের প্রভাব কমিয়া বাইতেছে। ডিকেন্স মনে করিতেন যে, যে কার্য করিবার উপবৃত্ত, সে কার্য অবশ্রুই ভাল কবিবা করিবারই উপবৃত্ত—তাই তিনি কোথাও কোনও সামান্য বিষয়টিও পরিত্যাগ করেন নাই। ডিকেন্স কেবল মোটামুটি

বিষয়ে ব্যপ্ত নহেন—তিনি তাহাব জাহাজিক সকল বিষয় দর্শন করেন। হুগন্ধম্ব গোলাপ দেখিতে গেলে তাহাব পাঁচটা তাহার চোকে পড়ে—কাঁটাটিও দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না।

থ্যাকাবের অর্থনাশের কথা মিষ্টার লিলি বলিয়াছেন যে, অল্প বয়সে তাহার সমস্ত অর্থ নষ্ট না হইলে তিনি এক ছত্রও লিখিতেন কি না সম্ভব, কারণ তিনি আশ্চর্য্য আলস্তপরবশ ছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন; চার বৎসর নবদম্পতির

থ্যাকাবে।

হৃথের গীমা ছিল না—তাহার পর তাহাব পরীক্ষান হাবাইলেন।

বড় দুঃখে থ্যাকাবে এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, “A dead sorrow is better than a living one.” বাহা হউক, এই দুঃখে তাহার চরিত্র দৃঢ় হইয়াছিল—যথেষ্ট হৃদয় বলিতে হইবে। বিবাহসময়ে থ্যাকাবের মত জামিয়ার জন্ত মিষ্টার লিলি তাহাব এক বন্ধুকে লিখিত একখানা পত্র পাঠ করেন—তাহাতে তিনি ব্যস্ত করিয়াছেন যে, তিনি যখন বিবাহ করেন, তখন তাহার বার্ষিক আয় ৪০০ পাউণ্ড। কিন্তু যে সংবাদপত্র হইতে এই আশ হইত, বিবাহের ছয় মাস পবেই সে সংবাদপত্র উঠিয়া যায়। সুবঙ্গণ অবিচলিত ভাবে দুর্ভাগ্য বহন করে, ইহাই ত দেখিতে আনন্দ হয়। তাহাব বিবাহের পরিণাম এইরূপ শোচনীয় হইলেও তিনি বিবাহ বড় ভাল বলিতেন; কারণ প্রেমই জগতের সকল মঙ্গলের চবস উৎকর্ষ ও মুকুট।

রচনা আবেশের বাব বৎসর পবে তবে লোকে তাহার বচিত বিষয়ের জন্ত তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল। রচনাযত্নের বাব বৎসর পরে Book of Snobs প্রকাশিত হয় ও তাহাতেই থ্যাকাবের ও পাকের ভাণ্ডা কিরিয়া যায়। উক্ত পুস্তক মিষ্টার লিলির স্ত্রে পরিহাসসম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে নিঃসন্দেহ অত্যুৎকৃষ্ট।

অমণবৃত্তান্ত।

শতবর্ষ পূর্বে।

বিগত শতবর্ষে অসংখ্য প্রভূত নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে। শত বৎসর পূর্বে এ দেশে ইংরাজ-সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা “টেম্পলবার” নামে প্রকাশিত “শতবর্ষ পূর্বে ভারতে ইংরাজবালিকা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে কতকটা বুঝা যাইবে। কতকগুলো আত্মজীবনচরিত্রের খসড়া হইতে উক্ত প্রবন্ধ সংগৃহীত।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশবর্ষীয়া কুমারী অলিভিয়া পদ্মাতীরবর্তী সুন্দরে পিতার নিকট আসিতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সিভিলিয়ানপত্নী শ্রীমতী বার্লে। সমস্ত পথ কুমারীকে তাহাব সঙ্গী সুন্দরে নিতুগ্ধের ঐশ্বর্যের কথা বলিতে বলিতে আসিয়াছিলেন। আর ভাবভবাসের কত কথাই যে তিনি কহিতেন।

বেলা তিনটায় সময় জাহাজের আরোহীর আহ্বান করিতেন। কুমারীকে পুঙ্খবদিশের সময়েই মন্যপান করিতে হইত। শ্রীমতী বার্লে তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে,

জাহাজে।

সর্বসমক্ষে মন্যপান না করিলে সকলে দুঃখিত হইবেন। তাই কুমারী

একটু অধিকবাজার মন্যপান কবিতেন,—বাইবার সময় পা টলিলে

লোকে বলিত, জাহাজ টলাতেই এমন হইতেছে। তাহার পয় কামবার গমন করিলে অল্প রমণীগণ সাফা করিতে আসিতেন। চাপানের সময় সকলে ডেকে বাইতেন, এবং আকাশ

পবিত্রাধিকারি এক এক দিন সন্ধ্যাসন্ধ্যায় সন্ধ্যাহীন নৃত্যকলাব চর্চা হইত। ধীরে ধীরে লাহাজ চলিতে লাগিল ও একবার উদ্ভূতমাশা অন্তরীপে ভিড়িল। পথে কুমারীর অবস্থাই, অপবিত্রার পানীর জলই পীড়ার কারণ; তাহার পর পীড়িত অবস্থায় সেই ঈশ্বরক জলপানে কি ভীষণ কষ্ট। ভাষমণ্ডহারবারে আসিয়া তিনি শুনিলেন যে, তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাঁহাকে তাঁহার খুড়ার নিকট ভাগলপুরে স্থাপিত হইবে। পিতৃব্য আসিয়া তাঁহাকে নোকায় করিয়া লইয়া গেলেন।

বাহা হউক—শেষে কুমারী ভাগলপুরে পৌঁছিলেন। গৃহের মধ্যে একটা বড় হল, আর চারি পাশে ছোট ছোট আটটি কামরা, তাহার পরেই বারান্দা। বাড়ীতে পা দিতে না

ভাগলপুর।

দিতেই অনেকগুলি দেশীয় ভৃত্য আসিয়া সেলাম করিয়া গেল—
বেন রাজবাড়ীর চাকরের পণ্টন ॥ তাহার পবেই আহা—রোগ্য-নির্দিষ্ট বাসনের ভাবে ডিনার-টেবিল নতপ্রায়। অলিভিয়ার লম্বা এক জন স্বতন্ত্র দাসী নিযুক্ত হইল। পর দিবস রবিবার, সে দিন দুই চার জন বন্ধুব নিমন্ত্রণ ছিল। সকলে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই অধিক আহাব করেন নাই—কেবল দেখা গেল, পুষ্করণ হ'কাব মোহিনী মাধার মুখ। সে দিন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অভিলিয়ার প্রণয়াকাজী মিষ্টার ফিটজ্জেন্সের এবং স্থানীয় চিকিৎসকগণী শ্রীমতী এলিসন ছিলেন। চিকিৎসকগণী বহুকাল এ দেশে বাসের ফলে ইংল্যান্ডের মত স্বভাবজ কোমলতা প্রায় পরিহারপ্রায়সিনী হইয়াছিলেন, তাহার মেজাজ কড়া, তিনি অসকালো জ্বিনিসের ভক্ত। তিনি ছুলাঙ্গী, বিয়ারমধ্য-পানরতা এবং পুষ্করণের মত হ'কাব তামাকসেবনে মহামজবুত। ইংলণ্ডে তখন কিরূপ বেশ প্রচলিত, তাহা জানিবার জন্য তিনি অলিভিয়ার পোষাক দর্শন করেন,—অলিভিয়ার ভয় হইয়াছিল যে, সব পোষাক তাহার এই বার নষ্ট হইবে—কাব শ্রীমতী এলিসনের "চাঁচর চিকুর চাক" জ্যাব জেবে কবিয়া নারিকেল তৈলে লিপ্ত। তাহার পবে নৃত্যমুঠান হইল। বিপ্রা-মেব পবে নৃত্যমুঠান দেখিয়া ইংলণ্ড হইতে নবাগতা বালিকা বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার পরের রবিবারে কুমারী অলিভিয়া ও তাহার পিতৃব্যকস্তা,—পিতৃব্যের পুষ্করণী কস্তা শ্রীমতী ফেরাবলি গৃহে গিয়াছিলেন। অতি প্রত্যুষে দুই জনকে কবিপৃষ্ঠে ভাগল-পুরের শিশিরসিক্ত ফুলের উপত্যকার মধ্য দিয়া গমন কবিতো হইয়াছিল। তাহারা গিয়া দেখেন, তখন সেখানে প্রভাতী উপাসনা

অতিথি।

হইতেছে। শ্রীমতী ফেরাবলি তাহাদের অভ্যন্ত যত্ন করেন।

কিছু দিন পরে বয়ঃপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিষ্টার মেলবোথ অলিভিয়াকে বিবাহ করেন।

অলিভিয়া ভাগলপুর হইতে অনতিদূরে গতির কর্ণহানে গমন করেন। অলিভিয়ার নিত্য-কর্ম এইরূপ ছিল—সকালে শয্যাভ্যাগ, হাতীর হাওদার হাওয়া

বিবাহ।

খাওয়া, শয্যার শয়ন, দশটার সময় আহা, তাহার পর উপস্তাসাদি পাঠ ও গৃহকর্মের তত্ত্বাবধান। বৈকালে আহারের পর একটু নিজা—বৈকালে অব, শকট, হস্তী প্রভৃতি বিদায় করিয়া তিনি মাঝে মাঝে পদব্রজে লম্বে বাহির হইতেন। ফ্রিয়্যা আসিয়া ডিনাব ভোজন—তাহার পরে বানিকটা তাসখেলা।

বিবাহের এক বৎসর পরে অলিভিয়ার একটা কস্তা হয়—নাম বাধা হইল, মেবিথ্যান। ও নামটা তখন বড় প্রচলিত ছিল। ইহার পর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু তিনটিই সরিয়া যায়, কাজেই যখন এক বন্ধুব সহিত মেবি দেশে গেল, তখন গৃহে বিবাদের অন্ধকার বান্ধ করিতে লাগিল।

এইবার অলিভিয়া বলিতেছেন যে, যুবোপবাসীরা বৃদ্ধিবেন, না, এখানে যুবোপীরেরা কিরূপ বিজ্ঞতা বোধ করে। এখানে সময় যেন কাটে না—আব সেই অকৃতিকর অসীম

অতিরিক্ত এক্ষেপের। এখানে মাস কিংবা অন্তর পরিবর্তন প্রকৃতিতে পবিত্রীকৃত হয় না।
 বুঝে যেমন এক সময় বুদ্ধলতা পত্রহীন হয়, দিবস ছোট হয়,
 অক্লি আক্ষেপ। গৃহের জানালা রুদ্ধ থাকে, কেবল অগ্নিকুণ্ডে পাত্র পরিবারের এীতি
 প্রবাহিত হয়, এখানে তেমন হয় না। আবার সেখানে যেমন এক সময় প্রান্তরে উদ্যানে
 নবমাদ্রীসমাগমে হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হয়, এখানে তেমন হয় না। এখানে—এই উষ্ণ-
 প্রাণে দেশে তেমন পরিবর্তন নাই।

বিবিধ।

সম্পর্কে বিবাহ।

সাধারণতঃ একটা বিবাস প্রচলিত আছে যে, আত্মীয়দিগের মধ্যে বিবাহে বিকৃত বংশবর্ধনের
 সম্ভাবনা। নিকট সম্পর্কে বিবাহে সম্বন্ধিগণ আরই বিকৃতদেহ বা বিকৃতবুদ্ধি হইয়া থাকে।
 যুরোপে আত্মকাল First Cousin দিগের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত। থাকা উচিত কি না, এই
 প্রশ্ন উঠিয়াছে। “হম্পিটাল” পাত্র প্রকাশিত প্রবন্ধের সাব এখানে সম্মিষ্ট হইল।

এক বংশের পুরুষ ও রমণীদিগের মধ্যে কর্তৃকৃতলা বিবাহে বিশেষ সাবিত্ত সর্বত্র দৃষ্ট হয়।
 কোনও বংশে দৃষ্টিগোচ্যতা, কোনও বংশে ফুসফুসের দুর্বলতা, কোনও বংশে হৃদয়ের দুর্বলতা,
 বংশের বিশেষত্ব। কোনও বংশে শিষ্ঠারের পীড়া, কোনও বংশে বা বৃদ্ধির ক্ষীণতা, দৃষ্ট হইয়া
 থাকে। এ জন্য “বংশের বিশেষত্ব।” যদি কোনরূপে এই সকল রোগের

হাত এড়ান যায়, তবে দৈহিক ও মানসিক সম্পূর্ণতার দিকে আগ্রহ হইবার আশা করা যায়।
 এইরূপ কোন পীড়াগ্রস্ত বংশের একজন যদি ঐ রূপ পীড়াহীন কোনও বংশে বিবাহ করে,
 তবে সম্ভানে সে পীড়ার প্রকোপ প্রভূতপরিমাণে কমিয়া যায় এবং ঐরূপ বংশের বাহিরে
 বিবাহে ক্রমে ঐ পীড়া একেবারেই নাশিয়া বাইতে পারে। বংশের
 বংশের বাহিরে। বিবাহ হইলে, তাহা হয় না। বংশের বাহিরে বিবাহে অনেক সময়
 সম্ভানে পীড়ার প্রকোপ অর্ধেক কমিয়া যায়।

নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে বংশের বিশেষত্ব সর্বদাই দেখা যায়। কাজেই তাহাদিগের
 মধ্যে বিবাহ হইলে সম্ভানে বংশের পীড়া না কমিয়া বরং বাড়িয়াই যাবে। অবশ্যশক্তির কথাই যথা
 বংশে বিবাহ। ষাটক, যে বংশে অবশ্যশক্তির প্রার্থনা নাই, সেই বংশের দুই জন নিকট
 আত্মীয় বিবাহ হইলে, সেই বিবাহের সম্ভান শৈশব হইতেই বধির
 হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। অবশ্যশক্তির বিষয় লইয়া যাহা বুঝান গেল, সকল প্রকার শারী-
 রিক ও মানসিক শক্তি সম্বন্ধেই সেই কথা। ভাবিয়া দেখিলে আত্মীয়বিবাহে সম্ভানেব
 বিকৃতির কারণ প্রাপ্ত হওয়া দুর্বল নহে। কারণ একই-শক্তি-হীন পুরুষ ও রমণীর বিবাহে
 যে সম্ভান উৎপন্ন হইবে, তাহাও পিতা মাতা উভয়ের একই শক্তির অভাব থাকায়, তাহাও
 ঐ শক্তির অভাব হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং হইয়াও থাকে তাহাই।

ইহাই বিবেচনা করিয়া নিতান্ত নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ, First Cousin দিগের
 মধ্যে বিবাহ বন্ধ করিলে, যথেষ্ট উপকাৰেব সম্ভাবনা। তাহা ভিন্ন বংশের পীড়া বুঝিয়া যে
 বংশে সে পীড়া নাই, সে বংশে বিবাহ করিতে পারিলে ক্রমে সম্ভান শারীরিক ও মানসিক
 সম্পূর্ণতার দিকে আগ্রহ হইবে, সন্দেহ নাই।

খিয়সকি।

শ্রীমতী বেসাণ্টের প্রবল প্রতিভা ও আলাদার রাজতান্ত্রিক মহাস্বাভাবের প্রচারে ব্যাপৃত। খিয়সকিষ্ট দলকে গুপ্তসম্ভার বলা যায় না। অনেক গণ্য রাষ্ট্র ব্যক্তি এই সম্ভারভুক্ত। এখন কেহ বলেন, খিয়সকি নতুন মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, কেহ বলেন, কতকগুলি লোকের কুসংস্কার ও সবল বিশ্বাসবৃত্তি নইয়া এই বৃহৎ জনবিশ্ব ভাবিয়া উঠিয়াছে। তাঁহা। এখন কথা, বিশ্ব বিনীত হইতেছে কি? সম্ভারের মধ্যে দলাদলি ও উচ্চস্বর ক্ষীণ হইয়া বাহিবে আসিতে পারিত করিয়াছে, আর চারিদিক হইতে সমালোচনার তীব্র আঘাত চলিয়াছে। “ওয়েষ্টমিনিস্টার গেজেট” পত্র মিস্টার গ্যারেট তাঁর বাগবৈদ্যমায় প্রবন্ধে এই সম্ভারকে সম্বাদে কবিরাজেন।

যতদিন বিভাবিকারী ম্যাডাম স্যাক্সেসকি, খিয়সকি দলের নেতা ছিলেন, ততদিন খিয়সকির বড় সম্মান ছিল না। তিনি ঘন-উল্লসিত চুরুটের ধূমে ও আপনার অভ্যাসের কুখ্যতিকার সমাচ্ছন্ন থাকিতেন। কিন্তু শ্রীমতী বেসাণ্ট যখন বক্তৃতা-মঞ্চে গিয়া দাঁড়াইয়া সেই তীব্র প্রতিভাবালক দুটি শ্রোতাদের উপর স্থাপিত করিয়া কঠোর স্ববে বলিলেন যে, তিনি মহাস্বাদেব, ধবরাধবব পাইয়াছেন,—তিনি কি কখন মিথ্যা বলিয়াছেন?—তখন লোকে মহাস্বা ব্রতীয়ার বাস্ববীকে বিশ্বাস করিল। কিন্তু লেখক বলেন যে, তিনিই প্রতারণিত হইয়াছেন। মিস্টার স্যাক্সেসকি কথায় তিনি কুক্ষণে বিশ্বাস কবিরাজিলেন—কুক্ষণে তিনি খিয়সকিষ্টদলের উন্নতিকল্পে জীবন অর্পণ কবিরাজিলেন। বহিলে খিয়সকি নইয়া এ রাষ্ট্রাব্যর্থ্য করিতে হইত না।

“মুসিকার” বলেন যে, মিস্টার ওল্ড লেখককে প্রমাণাদির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে—তাঁহার কথার বোধ হয় যে, তিনি কর্ণেল অলকট ও শ্রীমতী বেসাণ্টের কথাতেই বিশ্বাস কবিরাজিলেন। মহাস্বাদিগের পত্রাদি সত্য সত্যই বাতাসে উৎপন্ন হইত না, সে সকল ম্যাডাম স্যাক্সেসকির বুদ্ধবুদ্ধি,—এ সব তাঁহারই কীর্তি। যে দিন অন্তর্দেশীয় কোন ইংরাজীপত্র দেখিতেছিলাম, একজন যুরোপীয় একথানা পত্র লিখিয়াছেন যে, ম্যাডাম একবার তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথি ছিলেন, তখন তিনি বালক; তিনি দেখিয়াছেন, ম্যাডামের ভৃত্য পার্শ্বের কক্ষ হইতে চলে গিয়া রাখিয়া কুঁড়িয়া উড়াইয়া দিত। কখনও মহাস্বাদিগের সম্বন্ধে কোনও স্থিতিবিশিষ্ট হইবে কি না, সন্দেহ। মুসিকার পত্র কোনও তিস্ত্রমণকারী বলেন যে, মহাস্বা দেখিবে কেমন কবিরাজি? লামারাও তাহাই বলে—যদি তাঁহারের পার্শ্বও বসিয়া থাক, তথাপিও কি তাঁহাদেব দেখিতে পাইবে? তাঁহার জগৎ এক ব্যক্তিব-সাহায্যে সর কার্য কবেন।

“এরিনা” পত্র এই সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক সব জানেন, এমন কি, বোধ হয় “মহাস্বাদিগকে” গণনাও কবিরাজিলেন। এই এরিনা। ব্যাপার বিন্দুস্বকব, বিচিত্র। তিনি যেন সে সম্বন্ধে সর্বস্বজ্ঞ। লেখার ধূরণে সন্দেহ হয় যে, লেখক নাম প্রকাশ না বুঝিলেও তাঁহাকে ধরা যায়—তিনি খুব সম্ভবতঃ মিস্টার ব্রজ স্বয়ং। শ্রীমতী বেসাণ্ট “বিভিউ অফ রিভিউস” পত্রের সম্পাদক মিস্টার ব্রজকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, তিনি এখন তাঁর সমালোচকদিগের নিকটে নাই—এখন তিনি স্বল্প ভরতল্যে; কাজেকাজেই এখন তাঁহাদিগের কথার প্রতিবাদ করিতে ও তাঁহাদিগের জ্ঞান দেখাইতে তাঁহাব ইচ্ছাও নাই, অবসরও নাই। কিন্তু নম্র পত্রখানিতে আপনার সমর্থন বা সমালোচকদিগের প্রতিবাদ উভয়ের নামপঙ্কও নাই।

সাদপ্রতিবাদ ।

উত্তর ।

‘বাল্মীকি ভাষা ও জাতীয় জীবন’ নামক প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া “সাধনা”-সম্পাদক মহাশয় বর্তমান লেখককে বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এমনকি সাদপ্রতিবাদ সম্পাদক মহাশয়ও একটি ক্ষুদ্র নোট করিয়াছেন। নোট মধ্যস্থ লেখকের বস্তুত্ব এইমাত্র—সত্যবিশেষের সত্যমত সত্য উপবে আদোষ করা সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও স্থলবিশেষে নহে। সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে অবস্থাবৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্যক লক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। লেখকের ধারণা এই—যখন কোন বিষয়ের বিশিষ্ট আলোচনার জন্য কোনও সভা হইতে সব কমিটি নিষেধাজ্ঞিত হয়, তখন যাবৎ সেই সব কমিটির দ্বিগুণ পাইয়া সভা কোন বিশেষ পক্ষ অবলম্বন না করেন, তত দিন পর্যন্ত সভার ক্ষেত্র দ্বিগুণ কোনরূপে পক্ষবিশেষের মতপ্রচাৰের সুখপাশ্রবরূপে হওয়া অবৈধ; কারণ, তাহাতে স্বাধীন-কৃত অঙ্গক্ষপাতিতা বিনষ্ট হয়, এবং আপন ও সব কমিটি উভয়ের প্রতিই সভার অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। এইরূপ কার্য পবিত্রতাব পক্ষে অসম্ভব কল্পনায় সত্য উদ্ভাস সত্যের আরোপে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এটি সভার এক বিশেষ অধিবেশন, ইহাতে সভা ব্যতিরেকে সাধারণের মধ্যে কেহ কেহও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন, এবং সংসদেও প্রবন্ধপাঠনব্যাপ্তির পক্ষে যখন সভার অঙ্গক্ষপাতিতা বন্ধার জন্য এ অবৈধ কার্য কিম্বা প্রস্তাবিত বিষয় দুইটির একটি সম্বন্ধেও উপস্থিত সভাপূর্ণবে মধ্যে কেহ দ্বিগুণ কবিলেন না, উপরন্তু সভাপতি মহাশয় প্রত্যাবের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন, তখন নূর্য যে প্রতীক্ষিত সব কমিটির একজন সভ্য এবং সভার সহকারী সভাপতি মহাশয়ের দ্বারা নিজ মত প্রচাৰের জন্য সাধারণকে আহ্বান করিয়াছিলেন—সাধারণের মধ্যে এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া কি নিতান্তই অস্বাভাবিক? (১)

সাধনা-সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচনায় বর্তমান লেখক “কোথাও” তাহাব “কিছুমান প্রতিবাদ করেন নাই”। ইহা প্রকৃত হইলে বর্তমান লেখকের পক্ষে নিতান্ত সামান্য স্থান ও স্থানাব বিষয় হইত না। তবে দুঃখের বিষয় এইটুকু বলা যে অনেক বিষয়েই মতভেদ বিলক্ষণ সম্প্রদ। তিনি বাল্মীকিকে ‘জাতি’ হিসাবে দেখেন, অর্গবে ব্রিটিশশাসিত সমগ্র ভূভাগের অধিবাসিবর্গকে ‘জাতি’ভাবে দেখেন, তাহাব মতে অস্বতঃ এটি স ক্লাস পর্বতি ইংবাজীর পবিত্রতা বাল্মীকির বিষয়শিক্ষা হওয়া কর্তব্য, এবং বর্তমান লেখকের মত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দিকে “মতের আক্ষর্য্য একা” দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় বিশ্রয় প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উপমাচ্ছে পুনরাবৃত্তি দ্বারা স্বয়ংক্রিয় সত্যতা প্রমাণ বিষয়েও পূর্ণাঙ্গদ হন নাই।

কাহার ঘোরা কাহার খাড়ে পড়িয়াছে। সাধনা-সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি প্রবন্ধের নামকরণে ‘জাতীয় সাহিত্য’ পদের সার্থকতা সম্বন্ধীয় সংশ্লিষ্ট নোটটি কি কাৰণে সাদপ্রতিবাদ সম্পাদক মহাশয়ের ক্ষেত্রে চাপিয়া পড়িল, তাহা বলা লেখকের সাধ্যাতীত। নোট দুটি ছিল,—একটি সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের, অপরটি বর্তমান লেখকের; এবং দুইটিরই স্বতন্ত্র স্বাধীনার্থ প্রথমটির শেষে ‘লেখক’ এবং দ্বিতীয়টির শেষে ‘সাহিত্য-সম্পাদক’ লেখা

(১) সমিতির কার্যকার্য সমিতি বুঝবেন, আমার সে তর্কে যোগ দিবার প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি নাই।—সাহিত্য-সম্পাদক।

ছিল। আশ্চর্যের নিম্ন তথাপি তাহা বা সাধনা-সম্পাদক মহাশয়কে বিতর্ক হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি বলিতেছেন, “আমরা ‘বঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য’ প্রবন্ধের নামকরণে ইংবাঙ্গি, জাণ্ডাল শব্দের স্থলে ‘জাতীয়’ শব্দ ব্যবহার করিবাছি বলিয়া ‘সাহিত্য’-সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ স্নেহকটাক্ষপাত করিয়াছেন।” বাক্যটি আশ্চর্যরূপ যথার্থ। এমন কথা সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় কেন, কেহই কোথাও বলেন নাই। এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে একমাত্র বর্তমান লেখক দাবী, এবং তাহা এই :—“এ স্থলে (অর্থাৎ ‘বঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য’ নামকরণে) ‘জাতীয়’ শব্দের সার্থকতা বোঝা গেল না। ‘জাতীয় সঙ্গীত’ ইত্যাদি পদে ইংরাজী National শব্দের ভাব প্রকাশ হবে, এবং এ স্থলে ঐ ভাবই স্বভাবতঃ আকাজিক হব, কিন্তু প্রবন্ধের মধ্যে এ জাতীয়তা কুত্রাপি লক্ষিত হব না।” লেখকের আপত্তি যে কিসে—national শব্দের অর্থে ‘জাতীয়’ শব্দের ব্যবহারে কিবা তাহা বহুপ্রযুক্ততা সম্বন্ধে—তাহা স্পষ্ট, অতএব এ সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় নিম্নবোজন। সাধনা-সম্পাদক মহাশয় আবও বলিতেছেন, “সম্পাদক (অর্থাৎ সাহিত্য-সম্পাদক) মহাশয় অকস্মাৎ অকাবণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে আমরা ‘জাতীয় সাহিত্য’ শব্দে ‘ভগ্না-স্থলব লিটবেচর’ শব্দের অপূর্ণ তর্জমা করিয়াছি।” এ কথা কত দূর প্রকৃত, তাহা নিম্নোক্ত অংশ হইতেই সপ্রমাণ হইবে, অল্প টীপনী অনাবশ্যক :—“তবে এই নাম (‘বঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য’) যদি ইংবাঙ্গী Vernacular Literature পদের অনুবাদ হয়, তবে বলিতে পারি না।” (২)

সাধনা-সম্পাদক মহাশয় নিম্নোক্ত অংশে আপন প্রবন্ধের নামকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন :—“সাহিত্য যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আশ্রয় বা শিক্ষাসাধক নহে, তাহা যে সমস্ত জাতির ‘জাতীয়’ বন্ধন দৃঢ়তর করে, বঙ্গলা সাহিত্য, যে, বঙ্গালী জাতির ভূত ভবিষ্যৎকে এক সঙ্গীত সচেতন নাড়ি-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বৃহত্তর এবং বনিষ্টতর করিয়া তুলিবে—আমাদের প্রবন্ধে এই এসঙ্গের বিশেষরূপ অবতারণা ছিল বলিয়া, বঙ্গলা সাহিত্যকে ব্যক্তিগত বসনস্তোত্রের হিসাবে নহে, জাতীয় উপবোধিতার হিসাবে আলোচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দিয়াছিলাম।” বর্তমান লেখক স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই সুদীর্ঘ টীকা পাঠান্তেও উক্ত প্রবন্ধের নামকরণে ‘জাতীয়’ শব্দের সার্থকতা অথবা সুপ্রযুক্ততা উপলব্ধ হইল না। তবে Bengalee National Literature পদ যদি বঙ্গবাসীসাধাণে এই অর্থে বোঝেন অথবা তাহা সুপ্রয়োগ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সম্পাদকমহাশয়ের ব্যাখ্যা সার্থক হইবাছে সন্দেহ নাই।

“সাধনা” সম্পাদক মহাশয়ের আলোচনার একটী কথা স্বাক্ষর, লেখকের ত্যাগ করিয়া প্রবন্ধের আলোচনা তিনি সমস্ত জ্ঞান করেন না। তাহাতে বর্তমান লেখকের অবস্থা কিছুমাত্র আপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ সাধনা-সম্পাদক মহাশয় যেকোন স্ববচিত উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইবা শিষ্ট ভাষা প্রয়োগ দ্বারা স্ববচিত শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের ভাব নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা-নগণ্য সাধারণের কর্তব্যানীয়ার মধ্যে স্থান পায় না। তবে সাধাণের নিকট বর্তমান লেখকের নামে ত্রিটি যে প্রকাশ অভিযোগ করিয়াছেন, তৎ

(২) মাননীয় সাধনা-সম্পাদক মহাশয় প্রথমক্রমে “বঙ্গলা ভাষা ও জাতীয় জীবন” প্রবন্ধের লেখক শ্রীমুখ্য বোম্বিনামোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত একটি ফুটনোট আমায় মনে করিয়া, আবাহের সাধনাভাষ্য তাহা প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি যখন উক্ত নোটের লেখক নহি, তখন তাহার সমাজত, রবীন্দ্র বাবু কৃত প্রতিবাদ বা বোম্বিনামোহন বাবু কৃত সমর্থনের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ দেখিতেছি না।—সাহিত্য-সম্পাদক।

সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে। অভিযোজ্য ধরং বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি কবিয়। আমানীর প্রতি দৃষ্টিধান কবিত্তে কুঠিত হন নাই। এরূপ না করিয়া সাধারণের উপর বিচারভার প্রদান করিলে হয় ত বা সমালোচক মহাপ্রাণের সাক্ষিত কঠি ও সম্পাদকীয় মর্যাদা সম্যক রক্ষা পাইত না—নচেৎ ইহাও অপর কোন কারণে দেখা যায় না।

অভিযোগের প্রমাণ দুইটি। প্রথমতঃ,—“তিনি (অর্থ্যৎ বর্তমান লেখক) অভ্যস্ত সবল ভাবে অমুমান কবিত্তা লইয়াছেন, বে, ‘বাহাতে প্রহুকাবদেব শিক্কা’র ধমিতে কিকিৎ অর্ধসমাগমেরও সম্ভাবনা হয়’ আমাদেব পঠিত প্রবন্ধের এমন গোপন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে।” দ্বিতীয়তঃ,—“আমাদের ‘সাক্ষ্যাব্যবসনভাব ঠাট্টা’ যে ‘অন্যক’ তাহাও তাহাব স্তূতিক এবং উদার অনুমান-ভিত্তির নিকট থবা পড়িয়াছে।” সম্পাদক মহাপ্রাণের প্রমাণদ্বয় প্রকৃত হইলেও বা একটা কথা ছিল। কিন্তু কোন বাক্যেব মাঝধান হইতে দুই একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত সুরচিত শব্দ যোজনা করিয়া সমস্তটাকে বন্ধ ও বিকৃতভাবে সাধাবণের সন্মুখে দাঁড়ি কবাইয়া দেওয়াও তিনি অসম্মত বিবেচনা করেন না।

সম্পাদকমহাশয়ের ছেঁড়া দড়িতে সর্পভ্রম ঘটিয়াছে। অমুমানবস্ত্রে সান্নাৎ রহস্তের ভাব ব্যতীত তিনি কেবল তীব্র মেঘ ও বিজ্ঞপের আব দেখিয়াছেন, তাহা লেখকের উদ্দেশ্যও ছিল না এবং ভাষাতে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও তাহার বিশ্বাস নহে। পাঠকের পক্ষে অনাবহিত-কতা এবং “সাহিত্য” পত্রের অতিমাত্রা স্থান-অধিকারের আশঙ্কা বশতঃই সমস্ত খুল সম্পূর্ণ-রূপে উদ্ধার করা গেল না। পাঠক অল্প প্রশ্ন স্বীকার করিয়া পত্র ৫ংখ্যা “সাহিত্যে” ১২৪—৫ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত সাধনা-সম্পাদক মহাশয়ের যুক্ততার সারমর্ম পাঠ করিতেই দেখিতে পাইবেন। প্রথম ‘অমুমান’ সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত এইটুকু বলিলেই হয়ত-বশেষে হইতে পারে—সম্পাদক মহাশয়ের পঠিত প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট বাঙ্গালায় বিশ্বশিক্ষা দেওয়া কর্তব্য বিষয়ক প্রস্তাবে বে প্রহুকাবগণেব অর্ধসমাগমরূপ গৌণ উদ্দেশ্যও মাখিত হইতে, পার্শ্বে, একটা অমুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা যে কেমন করিয়া সম্পাদকীয় লেখনীমুখে তাহার “পঠিত প্রবন্ধের গোপন উদ্দেশ্য”রূপে বিকৃত হইবা দাঁড়াইল, কে তাহার রহস্তোন্মেষ করিতে পারেন? এহ-রচনা দ্বারা অর্থোপার্জন ধনী, নির্ধন, কাহারও পক্ষেই আত্মগন্যনিব্রোধী নহে, বরং তাহা যে দেশ এবং সাহিত্য উভয়ের পক্ষেই বিশিষ্টভাবে হিতকর, সে বিষয়ে লেখকের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব প্রহুকাবগণের অর্ধসমাগমেব উল্লেখ অবমাননামূলক কি আছে উপলব্ধি করা লেখকের পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। পরন্তু উহাভেঁ তীব্র মেঘ অথবা বিজ্ঞপের ভাবের সংযোজনা কবিলে উহাব অনাবহিত পত্রের অংশেও সন্নিবিষ্ট সন্নিবিষ্ট হই বা হয় কিক্রমে, বোঝা দুঃসাধ্য। আব একটি কথা, প্রহুকারগণের অর্ধসমাগম সম্পাদক মহাশয়েব পঠিত প্রবন্ধের নহে—প্রস্তাবের গৌণ উদ্দেশ্য পে অমুমান কবা কি এতই অসম্মত হইয়াছিল? সম্পাদকমহাশয়ের কি স্মরণ নাই যে তাহাব বক্তৃতায় নিম্নোক্ত বেদনা হয় ব্যক্ত হইয়াছিল :—“বাহাব বাঙ্গলভায় বসিতেছেন তাহার। ধন্য গাঁহার। প্রজাসমুদায় বসিতেছেন তাহাদের স্বপক্ষকার,—আমাব এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষাব স্তম্ভেরেব স্বপ্ন দুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরের-কড়ি খরচ করিবা তাহা ছাপাই এবং ঘরের-কড়ি খরচ করিবা কেহ তাহা কিনিতে চাহে না—আমাদেব অনুগ্রহ করিবা কেবল একটি অহঙ্কার করিতে দিবেন।” ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে কি অমুমানটি নিতান্তই লেখকের কল্পনাপ্রসূত অথবা সান্নাৎ রহস্তের অবতারণাও সম্পাদকীয় মর্যাদার পক্ষে অসহনীয়,—কোটি ?

সম্পাদক মহাশয়েব দ্বিতীয় প্রমাণেব বল নির্দ্ধাবার্থ তাহার রাবট উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তিনি এই মর্মে রায় দিতেছেন,—“নানা বাস্তবিক কারণে সাক্ষ্যাব্যবসন প্রতি আমাদের

অনুভবগ অন্ধ এবং পক্ষপাতাধীনে হইতে পারে কিন্তু তাহা 'অলীক' এ কথা প্রকাশ করিয়া তিনি (বর্তমান লেখক) যে কেবল আমাদের প্রতি অথবা অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে; সত্যের প্রতি যে সকল উজ্জ্বলনের স্বাভাবিক ভক্তি আছে তাহার অন্ধকে অকারণে এরূপ অপবাদ দিতে কুণ্ঠিত-বোধ করেন।" বাক্যটির সার্বভৌমতা অথবা ব্যাকরণগুণিত কোনটি যে অধিক প্রশংসারোগ্য স্থির করা দুঃকর। সাধারণ ভাবে বলা কথা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা কতদূর সঙ্গত, সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া লেখকের পক্ষে অনাবশ্যক। গত সংখ্যা "সাহিত্যে"র ১৩২ পৃষ্ঠা পাঠেই পাঠক বুঝিবেন পূর্বেদিত দ্বিতীয় প্রমাণ-সম্বন্ধ "আমাদের" শব্দটি কতদূর সঙ্গত হইয়াছে। লেখক এইমাত্র বলিয়াছিলেন:— "বাক্যের ভাবের বিষয়শিক্ষা কর্তব্য, এই প্রস্তাবের পক্ষপাতীগণের মধ্যে কেহ কেহ যখন আপন সম্মাননের শিশুকাল হইতে ইংরাজী শুলে দেন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাদের আপন কার্য হইতেই প্রকাশ পাইতেছে যে উহা মাতৃভাবাবৎসলতার প্রকৃত নিদর্শন নহে, তখন কেন তাহারা বুঝা এই প্রস্তাবরূপ ঠাট মাতৃভাবাবৎসলতার নিদর্শনরূপে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। অর্থাৎ যদি সম্পাদকমহাশয়ের পরন্তু সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও কি ঐ সকল ব্যক্তির মাতৃভাবাবৎসলতা 'অলীক' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা এতদূর অসঙ্গত হাঁড়ায়?—লেখকের বক্তব্য বাহা ছিল একরূপ সমাপ্ত হইল, এখন দেখা যাউক সত্যের প্রতিবে সম্পাদকমহাশয় তাহার এতগুলি প্রমাণ ও অকারণ অপবাদের প্রতিকার করিতে অগ্রসর হন কি না।

উপসংহাৰে এইমাত্র বক্তব্য—সম্পাদকমহাশয়ের হোট-বড় এতগুলি প্রমাণ বটিয়াছে, কেহ তাহা খেঁজাপূর্বক বটিয়াছে বলিয়া শব্দবিশেষের দ্বারা অভিহিত কবিতা যদি তাহাকে তাহাতে অভিযেক করিতেন, তাহা হইলে সাধাবণ্য অথবা "সাধনা"-সম্পাদকমহাশয় কি তাহাতে উজ্জ্বলনাচিত সত্যপ্রিয়তা ও শিষ্টাচারের নিদর্শন পাইতেন?

শ্রীযোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

দুইটি কবিতা।

পরিচয়ন।

নহি আমি অনিরাজ প্রেমকলি পাণে;
কল্পনাব-কুহুমিত কোনল শবনে
নহি কবি কমলবিলাসী; কাব্যবনে
নহি মুগ্ধ সমীৰণ লুপ্ত মধু-প্রাণে।
আমি সর্জক-মধু, স্থপতি-বাসে
পূর্ণ কবি চারি ধার আশ্র-নিগাড়নে;
আমি সে চন্দন-বস, আশ্র-বিলেপনে
জুড়াই সংসার-মালা সাংগ-প্রকাশে।
উচ্চাশয় রথী আমি জীবনের রণে
জিতির উপাসক; বিষয়-রূপতে
আমি বিবাদেব কবি; অনন্তের গণ্ডে
আমি বহুধার সাধী তীর্থ-দৰ্শনে;—
স্বপ্নাব উৎস যিনি, অসীম হৃদয়ে,
চরণ-সরোজে তাঁর আমি মধুকর।

বাসনার বহু।

চমক তড়িৎ ও/কি?
বাসনার বহু ভাতে?
আর্জ এ পীতল বাহ,
কেবা জাগে, কে ঘুমায়,
মধুব স্বপন কারো
নিবীলিত আঁখি পাতে;
কি লেখা লিখেছে সে গো
সজল জলদ পাতে?
কি লেখা লিখেছে সে গো
ফুটে না উঠিছে ফুটি,
উদাসে হৃদয় শুধু,
নীবে ভবে আঁখি ছুটি।

গামিক সাহিত্য সমালোচনা ।

সাধনা । জ্যৈষ্ঠ । এবানকাব প্রথম প্রবন্ধ,—“কালিক মহারাণী প্র মতী দেবী বাই ।” মহা বাই ভাষায় লিখিত লক্ষ্মীবাইর চবিত্র হইতে বঙ্গ-ভাষায় সংগৃহীত । আমবা প্রবন্ধটি পড়িয়া আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি । ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে আমবা প্রদান না হইলে ভাষানুপাতের আশা করা যায় না । ভাষান্তের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা । একপ্রদেশবাসীরা স্ত্রী ও ভাব বোঝেন সেই প্রদেশের মধ্যেই লিখিত ; পাঠকের প্রতিবেশী প্রদেশেও তাহার প্রমাণ নাই । কিন্তু ভাব ও চিন্তার বিশেষ ব্যতীত একদেশবাসীদের মধ্যে সাহিত্যনান্দনুভূতির ও উদার বিপুল প্রাচীণ সমবেদনার সূত্রপাত হয় না । এ দেশে তাহা সেই ভাবমণ্ডলের অন্তর্গত প্রবল অন্তরাব । বাহ্যিক সেই অন্তরার দূর করিয়া বস্তুর পরিচয় ও বস্তু করিতেছেন, তাহারা আমাদের খসড়াভাষ্যন ;—বস্তুমান লেখক সেই চেষ্টা বর্ণনা করেন,—এবং তাহার দক্ষতাবশে এ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে,—এতৎ আমবা তাঁহান্নিকট কৃতজ্ঞ । “নামকোত্তর” প্রবন্ধে লেখক কতকগুলি নামের অন্তর্ভুক্ত বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন । “জন্মগোচর গববা” একটি অভিমতের, সরস বচন । “গরবা” উক্তব্য একটি প্রাচীন উৎসব, লেখক কবিত্বপূর্ণ নিষ্ঠা ভাষায় সেই উৎসবের কাহিনী বিবরণ করিয়াছেন,—বিবরণের সম্প্রদেয়, “গরবা” উৎসবের চিত্রখানি উজ্জলভাবে সমুদ্ভাসিত কবিয়াছেন । ভাষা একটু সংকটবহন,—এতৎ একটি কঠিন হইয়াছে,—কিন্তু এই ভাষায় প্রাণ ও দারুণ আবেগ, এবং তাহা অনুভব কবিয়া হৃৎ পাওয়া যায় । “মেঘলি ওত” এমনও চলিতেছে । “চাকুরী” একটি সুন্দর গল্প । গল্পটির আব কোনও আকর্ষণ নাই থাকে, এই গল্পের কৈলাস চৌধুরী নামক “নরসিংগোড়ের অসিদ্ধ বংশের নির্দোষিত বাবুটি” বর্ণন প্রস্তুত হইয়াছে । “উপাধি” প্রবন্ধে ভাবতবানীর বর্তমান অবনত অবস্থা ও ‘ভাবত-উদ্ধারের উপায়’ আশোচিত হইয়াছে । লেখক শেষে বলিতেছেন,—“সে শুভদিন কি আসিবে যখন বঙ্গদেশের এই বলিয়া গুরু কবিত্তে পারিবেন যে আমায়ই গুরুপুরুষের ভারতমাতাকে কল্যাণ ও হীনতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ।” ইহা হইতেই পাঠক প্রবন্ধলেখকের আশা ভাসাই পড়িয়া পাইবেন । “ছবি” চারটি ছোট ছোট কবিতার একটি গুচ্ছ । আমবা ইহার প্রথম কবিত্তে অশ্রু “চুপ-চুপে” উক্তনামের একখানি কবিগণ্যাদের রচিত গানের সংগ্রহপুস্তকের সমালোচনা । “মামারামের” একটি উৎকৃষ্ট কবিতা ।

ভারতী । জ্যৈষ্ঠ । “বন্ধুবিদ্যোৎসব” স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা । শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এই কবিত্তান প্রণেতা । সম্প্রতি সাধনা-সম্পাদক মহাশয় একখানি গীতিকাব্যের সমালোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন,—“ব্যক্তিগত হৃদয়বোধের প্রকাশ যতক্ষণ না সার্বজনীন ও সার্বকালীন সৌন্দর্য লাভ করে ততক্ষণ সাহিত্যে তাহা কাহাও নিকট সমবেদনা প্রাপ্ত হয় না । এই গুণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিমধ্যেই সাহিত্য প্রণয়নতঃ আবিস্কৃত হইতে পারে ।” টেনিসনের ইন্ মেমোরিয়াম নামক কাব্য কেন্দ্র সর্বসাধারণের নিকট এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ? তাহা টেনিসনের ব্যক্তিগত আশোকেই প্রকাশ বলিয়া নহে, তাহাতে মানবজাতির বিচ্ছেদশোকমাত্রই বিচিত্র রূপিলিত আশোকে ব্যক্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশযোগ্য হইয়াছে । নচেৎ ব্যক্তিগত শোকের প্রকাশ বিলাপ টেনিসনের পক্ষে সম্ভার কারণ হইত । এ ক্ষেত্রেও ইহাই বস্তুবা । “সংস্রাবপ্রবণ” শ্রীযুক্ত অপরূপচন্দ্র সেনের লিখিত একটি উৎকৃষ্ট জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধ ।

হরিশাশন মুখোপাধ্যায় "আকসব ও ইসলাম" প্রবন্ধে বঙ্গদেশকে আকসব সাহের উদ্ভারতা প্রতিপন্ন করিতেছেন। প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। "ফলাহাব" শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায়ের একটি চলনসই গল্প। উক্ত লেখকের "শিখ-ধর্ম-উন্নয়ন ও বিস্তৃতি" এখনও চলিতেছে। এবাব, জঙ্গল, অমরদাস, রামদাস, অর্জুন, হরগোবিন্দ, এই কয় জন শিখ-ধর্ম-উন্নয়ন সংকল্পিত বিষয়বস্তু আছে। "আর্য্যাপাখ্য" গুটিকত গান" একটি সমালোচনা। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরলাল রায় প্রণীত "আর্য্যাপাখ্য" কতিপয় ইংরাজী গান বঙ্গলায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক, সেই অনুবাদের সমর্থন ও সুখ্যাতি করিয়াছেন। "বঙ্গলা বঙ্গভূমি" আর একটি সমালোচনা। আমবা পুনর্বার ভারতীতে বঙ্গভূমির সমালোচনা প্রকাশিত হইতে দেখিবার সুখী হইবাছি। লেখক দক্ষতাসহকারে আশ্রয় নির্ভীকমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এবাবে "ষ্টাব থিয়েটারে" অভিনীত "বাবু" সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। "ভাবতীর" সমালোচক, "বাবু" প্রণেতা ও ষ্টাব থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় সবক্ষে বলিতেছেন,—"বর্তমান বঙ্গালী সমাজের অংশবিশেষেব ব্যবহারে যে আতিশয্যের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল তাহাই খবরা বাবু অমৃতলাল বহু তাঁহার প্রথম প্রহসন "বিবাহবিজাট" বচনা করেন। "বাবুতে" তাঁহার প্রকৃত পবিধি দার্শনিক বঙ্গীর সমাজের আশ্রয় ও বিস্তৃতিতে প্রবিখ্যাপ্ত। এই নাটকখানি পড়িলে অনুভব হয় ব্যক্তিগত বিজ্ঞপে অমৃত বাবুর হস্তবুদ্ধিকতার ভিত্তি হইলেও এক জন বাদ্যলার হৃদয়ে অনেকগুলি বঙ্গালীর জ্ঞানকাণ্ডশূল ব্যবহার দেখিলে যে পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে, সে পীড়া তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান। কখনই বিশ্বাস করা যায় না, কেবলমাত্র অর্থ-লোভে তাঁহার স্বদেশীয় স্বজাতীয় গুটিকত সমদুর্ভাগ্য ভাতাদের কোন কোন বিষয়ে আচরণের ভুলত্রাস্তিকে তিনি পশ্চাদ্ভাব্য হিসাবে দেখিতেছেন, তাহাদের সঙ্গ সাঙ্গাইয়া রঙ্গভূমিতে নাচাইয়া, কাঁদাইয়া কেবল "মুদ্রাদাতা" দর্শকের পরম প্রীতি উৎপাদন করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্বের দুর্ভাগ্যতা, আত্মীয় অনুভব করিবার একটি দীন প্রবৃত্তি যে সমুদায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান তাহাই উল্লেখিত করিয়া তোলা তাঁহার চরম উদ্দেশ্য বোধ হয় না। তিনি যে প্রশংসন্য ব্রাহ্মণের এবং গৌড়ত: অর সমুদায়ের বিরুদ্ধে বিজ্ঞপায় ধারণ করিতেছেন তাহা নিবর্ধক নহে। সহস্র উপদেশে বাহা না হয়, একটি বিজ্ঞপাশে তাহা সম্পন্ন হব। তিনি সংস্কারকের সংস্কারক। কিন্তু সে জন্ত তাঁহার বক্তব্যকে দুঃশ্রাব্য ভাষায় পরিহিত করা কি অনিবাধ্য? বঙ্গালী ভজ্ঞ সমাজের একমুখে ইতর ভাষাই প্রচার এবং আরব আছে (সত্য) কিন্তু তিনি তাহাদের দাসত্ব কেন কবেন? যে প্রভু হইতে পারে, সে কেন দিবকাল দাস থাকে? রঙ্গালয়ে বিনিদ্র বিবয়ের অবতারণা কবিয়া দেশেব লোকের মভাসত পরিচালনা করা একটা মন্ত ক্ষমতা, সে ক্ষমতা তাঁহার হাতে, তিনি ইচ্ছা করিলে দেশে সুরচিবিস্তারের অনেক সহায়তা কবিতে পারেন। আর জিনিষটি কত সহজ শুধু একমুখে একটি ইতর শব্দের পরিবর্তে তৎসমার্থজ্ঞাপক ভজ্ঞ শব্দ ব্যবহার করা মাত্র—সে ইতর শব্দটি ব্যবহারেব প্রবৃত্তি নিরোধে কতটুকু সংবোধের কার্যকর—অথচ তার কল কত হৃদ্যে! অমৃতলাল বাবু যেন রাখেন যেন বঙ্গালার শিক্ষিত সমুদায়ের ভাষাগত সুরচি দিন দিন অধিকতর প্রতিষ্ঠা পাইতেছে, এমন দিন আসিবে যে দিন অতি মহৎ ভাবও কুৎসিত ভাষায় পরিহিত হইবা আসিলে বঙ্গালার উপবিতন সমাজে বুদ্ধি-সম্ভাব্য পাইবে না। তিনি যদি শুধু "Pat" এর অর্থায় মুদি মধ্যব রঁধুনী বাসন ও চাকরের দলেব অবিবিশ্র প্রজ্ঞাজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতে না চান তবে এ কথাটা বিচার করিবার দৈবিনেব। আব বিশেষত: ভাষার অসীলতাতেই তাঁহার বসিকতার বল নহে, স্তবরাং তিনি অল্পে তাহাব সোচা প্রতিষ্ঠাকে এই মর্শন ধায়েব হাত হইতে উদ্ধাব কবিত্তে পারেন, তাহাতে তাহাব জ্যোতি আশ্রয় ও ফুটিয়া উঠিবে। "প্রেম" একটি ক্ষুদ্র কবিতা, কবি বলিতে

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদির একমাত্র মহৌষধ।

লক্ষ লক্ষ লোক সেবন করিয়া আবোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রতি-
পন্ন হইয়াছে, জ্বর-বীহাদি রোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ ভারতে এ
পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ রাজ্যেশ্বর রাজ্যের অট্টালিকায় এবং নরিন্দ্রের
কুটারে, বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্তমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু-
স্তানবাসী, কি পঞ্জাববাসী,—সকলেই বিজয়া বটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজ-
রাজ্যের বিজয়া বটিকা পরম প্রিয় বস্তু। বহু ইংরেজ-পুরুষ এবং ইংরেজ-সম্পদ
বিজয়া বটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসারে
আব নাই বলিলে অত্যাক্তি হয় না।

বিজয়া বটিকার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।
সুতরাং, বাহার জরভাবের উপক্রম হইয়াছে, বাহার চক্ষু জালা, হাত-পা ঝালা
করিতেছে, বাহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, বা কোমর কামড়াইতেছে; বাহার
ক্ষুধা হয় না, বাহার কোষ্ঠ খোলসা হয় না, বাহার কসিন-সর্দি হইয়াছে,—এই-
বেলা বিজয়া বটিকা সেবন আরম্ভ করুন, গ্যালেরিয়া জরে আর ভুগিতে হইবে
না। বিজয়া বটিকার শক্তি প্রকৃতই মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্বুত।

অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যিনি জ্বর-বীহা-যক্ত্যাদি রোগ
ভুগিতেছেন, হাত-পা পর্যন্ত কুলিরাছে, ২৪ ঘণ্টাই বাহার নাকীতে জর আছে,—
বিজয়া বটিকার কবিরাজ বাহাকে প্রবৃত্তি দিয়াছেন,—এমন রোগীও বিজয়া বটিকা
দ্বারা সহজে আশাম হইতেছেন,—ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া, যে-
প্রতিবেদী বৃন্দ মুগ্ধ হইতেছেন। কংজর, পালাজর, আসামের কালাজর,
অমাবস্যা-পূর্ণিমার জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, মজ্জাগত জ্বর,—সর্বত্রই
জ্বরোগই ইহা দ্বারা আশাম হইয়া থাকে।

বিজয়া বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাকমাণ্ডল	প্যাকিং
১মং কোটা	১৮	১৮/০	১০	১০
২মং কোটা	৩০	১৮/০	১০	১০
৩মং কোটা	৫৪	১৮/০	১০	১০

বিশেষ বৃহৎ—গার্লিন্ড কোটা অর্থাৎ

৪মং কোটা	১৪৬	৪১/০	১০	১০
----------	-----	------	----	----

বিজয়া বটিকা প্রাপ্তি-স্থান।

মাদিহান—অর্থঃ ঔষধের উৎপত্তি-স্থান বেড়ুগ্রাম, পোষ্ট মাদিপুর,
জেলা বর্ধমান—স্বত্বাধিকারী শ্রীমুক্ত দে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য; অথবা—
৭৯নং হারিশন রোড, পটলডাঙ্গা কলিকাতা—ভারতে একমাত্র এজেন্ট—
বি, বসু এন্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

কবিরাজ শ্রীমুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত কবিত্বমণ্ডের

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়।

৫০ নং হেরিসন রোড, কলিকাতা। আমহার্ট স্ট্রীট পোস্ট অফিস।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রপারদর্শী শ্রীকোক্তনামা স্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও চিকিৎসক বিগত সাত বৎসর বাবৎ প্রতিষ্ঠার সহিত কলিকাতা ঝামাপুকুর নিবাসী স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই মহোদয়ের আলয়স্থিত ভৎপুত্র গিরিশ চন্দ্র নিতের নানীয় দাতব্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ের প্রধান-চিকিৎসকের কার্য করিয়া আসিতেছেন। বৎসর বৎসর ভিন্ন ভিন্ন গীড়াক্রান্ত সহস্র সহস্র রোগী তাঁহার চিকিৎসায় বোগমুক্ত হইয়াছে।

ইংরাজী ১৮৯২ সালের ২৮ জুলাই তারিখেই ইণ্ডিয়ান মিরর ও অমৃত-বাক্সার পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে যে, ঝামাপুকুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইহার চিকিৎসাদীনে থাকিয়া ২০৭৬৪ জন রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

এই ঔষধালয়ে সর্বপ্রকার অকুত্রিম আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। মফঃস্বলের রোগিগণ রোগের বিবরণ আমুপুর্ষিক লিখিয়া পাঠাইলে কবিরাজ মহাশয় ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এস্, লাহিড়ী কোম্পানী



আমাদের নিকট সর্বপ্রকার পেবল ক্রীফ্যাল উৎকৃষ্ট চশমা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আমরা সর্ববিধ সোণা, রূপা ও ষ্টীলের ফ্রেমও প্রস্তুত করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১৪ নং বৃন্দাবন বস্তুর লেন, কলিকাতা।

গোবিন্দ দাসের কড়চা।

বৈষ্ণব জগতের এক অপূর্ব রত্ন এবং বৈষ্ণবদিগের জীবনসর্বস্ব শ্রীশ্রীগোবিন্দ দাসের কড়চা বাহির হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা।

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে সংস্কৃত বস্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

বোস এণ্ড কোং।

১৪৪ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফেশনার্স্, কমিশন-এজেন্টস্ ও জেনারাল্

অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

আপাততঃ কলিকাতায় বিখ্যাত অর্ডার সাপ্লাই এজেন্সি অতি দিগল। বিদেশীয় ধনী মহাজন, জমিদার, দোকানদার, প্রভৃতি সর্ব সাধারণের সুবিধার্থে উপরোক্ত এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের প্রকৃত ও বিক্রয়ে সকলেই সম্মত হইবেন। আমরা আমাদের বহুকাল পরিচিত নানাবিধ দ্রব্যের কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাঁহারাও বাবতীর দ্রব্যাদি আমাদের নিকট পাইকারী দরে বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। দূরদেশবাসী দোকানদার মহাজন অথবা ভ্রমলোকদিগকে অনেক সময় বিস্তর ব্যয় স্বীকার করিয়া ক্রয় করিতে আসিতে হয় ও তাঁহারা নূতন ক্রেতা বলিয়া অনেক সময় বিলক্ষণ প্রভাবিত হইয়া থাকেন। কলিকাতায় যে জিনিষ যে স্থানে অল্প মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের অবিদিত নাই, এজন্য আমরা আশা করিতেছি যে, অত্রস্থ অত্রস্থ এজেন্সি সমূহ অপেক্ষা আমাদের প্রেরিত দ্রব্যাদির মূল্য স্বল্পই হইবে এবং কলিকাতায় আসিয়া বাহারা দ্রব্য খরিদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার আমাদের প্রবীক্ষা করুন, এই প্রার্থনা। আমরা সকল প্রকার দেশী ও বিলাতি শাল, আলোয়ান, বেনারসী, বোম্বাই, ঢাকাই, শান্তিপুর, ফরাসডালা, এবং অত্রস্থ নানাপ্রকার বস্ত্রাদি, পুস্ক ও জীলোকদিগের বড়ি, সার্ট, কামিজ, কোট ইত্যাদি সর্ব প্রকার পোশাক, জুতা, মোজা, ক্রমাল, গারটার, তোয়ালে, বোতাম, সৌগন্ধ দ্রব্য (Essence), সাবান, ছাতি, ছড়ি, পুস্তক কাগজ, কলম, লিখিবার ও রবার-স্ট্যাম্পের কালি, জাপান ও চীন দেশীয় খেলনা ইত্যাদি। কবিরাজি ইংবাজি, হোমিওপ্যাথিক, সুপ্রাপ্যাথিক, ইলেকট্রোপ্যাথিক, হাকিমি ঔষধ ও সর্বপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ, টেবিল, চেয়ার (Furniture), কলকজা লৌহ-দ্রব্যাদি (Hardware), রং, বিলাতি মাটি (Cement), দুই চাকার গাড়ী (Bicycle), তিন চাকার গাড়ী (Tricycle) ইত্যাদি, সর্বপ্রকার কাচের দ্রব্য (Glassware), এবং এনামেল দ্রব্যাদি, ঘড়ি, ঘাংটী, হারমোনিয়া, ফ্লুট বাশী, দেশী ও বিলাতি বাস্তবস্ত্র এবং সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও গ্রীয়োপযোগী (Ice and Aerated water) সরবরাহ করিয়া থাকি।

মানোজাব

শ্রীসনৎকুমার বসু।

N.B.—নাম ও ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিলে বাঞ্ছিত হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি ।

মৃষ্ট বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল । গ্রাহকগণ
আবলম্বে মৃষ্ট বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৭ ছুই টাকা পাঠাই-
য়া বার্ষিক করিবেন ।

যে সকল গ্রাহক এখনও পঞ্চম বর্ষের মূল্য পাঠান নাই,
ভাহারা শীঘ্র পঞ্চম বর্ষের বাকী ৩ বর্ষ অগ্রিম মূল্য
পাঠাইয়া আমাদের উপকৃত করিবেন ।

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বঙ্গব লেন,
দিল্লী পোঃ অফিস, কলিকাতা ।

} ত্রিযতীশ চন্দ্র সমাজপতি
কার্যাব্যাহক ।

জ্বরারি।

সকল প্রকার জ্বরের অব্যর্থ পবীকৃত ঔষধ।

শায়েলিনি। জ্বর, মীলি বহুৎযুক্ত জ্বরের ও পুরাতন স্বদৃশ্যে জ্বরের এ পণ্য

একটিও রোগনির্মূলক ঔষধ প্রচার হয় নাই, যে একমাত্র ঔষধদ্বয় বিদেশ

কুইনাইন বা ক্রোম্যাট মিশ্র বা বাটিকা, তাহাতে কোনও কোনও স্থলে

দিনে জ্বর গ্রন্থ হয় বটে, কিন্তু অবশেষে এক বিবেক স্থানে ছুই মিশ্র

মিশ্র হইয়া প্রায়শঃ পরম্পরিক যন্ত্রণা দেয়। আমি ও আমার বন্ধগণ বহুসং

কাল জ্বরারি ব্যবহার করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, পুরাতন ও ম্যালেরিয়া

জ্বরে, মীলি বহুৎযুক্ত জ্বরে ইহা পরোৎকৃষ্ট—এমনকি ডাক্তার কবিরাও

কখনও রোগ আশ্রয় করিত না, এখন নাই, বহু বারের সাক্ষীয় স্বজন বাহ্য

জ্বরের আশ্রয় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকার উৎকৃষ্ট

ঔষধের জ্বরারি সেবনে এতদ্বারা অযোগ্য লাভ কবিয়া পুনরায় সহজ শরীরে

কাজ করিতেছেন। কুইনাইনে যে স্বরূপ হয় না, জ্বরারি সেবনে সেই

কর দিনেই বন্ধ হয়। জ্বরারির আর একটি বিশেষ গুণ যে, ইহা জ্বর

প্রকৃতির আরোগ্য হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ইহা জ্বর, অগ্নি, পিত্ত

কোষ্ঠ, পবিকারক, মীলানাশক, বহুদোষ নিবারক এবং শিশু রক্ত জন্ম

আজেরই প্রতিষেধক।

১নং কোটা ১৫ রটকা ১০ প্যাকিং ১০ আমা

২নং ২৮ ১০ ১০ ১০

৩নং ৪২ ১০ ১০ ১০

ডাক্তার ডলচাচারি আম স্বতন্ত্র লাগে।

যদি বগে বগদ কিনিলে প্রতি কোটার ১০ অধিক মূল্য লাগে।

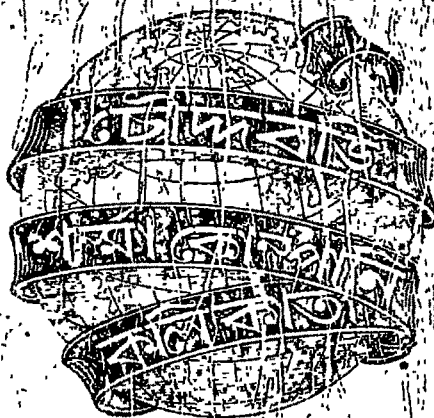
এক সাদা এক ডজন লাইনে মূল্য ১না ৫ টাকা প্যাকিং ১০ ১০ ১০

টাকা প্যাকিং ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

মণি বর্তমানকালীন মূল্য

স্বরূপ পাইয়া দিচ্ছি।—এস, সি, সোম, জ্বরারি

১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০



নূল্য প্রতিকৃতি ॥ আনা, ডাকমাণ্ডল ॥ আনা
(একত্রে ১০ কোটি পর্য্যন্ত ১০ মাসেলে বার)

১০০০০ এক বঙ্গ বড়ি বিনামূল্যে বিতরণিত হইয়াছে। বঙ্গী নিদন
ফলা, মূর্ণ, সকলেই আজ "চৌদ্দবড়ি" মতামূল্যে শুধে চাংকিত—আজ
দেখায় "চৌদ্দবড়ি" সুবর্ণ। পুণ্যচন জন্মের যে মন অমোঘ প্রিয়
নাই, তাই সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের কলকাতার
বঙ্গবঙ্গ ও পবিত্রম সার্থক হইয়াছে।

ম্যাগেরিয়া জরো বোগ বতরিনের পুণ্যচন হতক না—ইহার
কৃত ২৪ দিনেই প্রকাশ পায়। গীহ, কৃত জহতির গীহের যেকোন
ন উপধে সফল দেখ নাই, সেখানেও ইহার ব্রহ্মনাশক ক্ষমতা খুব দৃঢ়
মেনের প্রকাশ পাইবে। বহিরা ম্যাগেরিয়া ও প্রাণজর কষ্ট পাইয়াছেন
মনাক্ষ চিকিৎসার বাহবা হকল পান নাই, তাহারা এই ঔষধের আশ্রয়
প্রাপ্ত পরীক্ষা করুন,—কল দেয়িয়া তত্ত্বিত হইয়া বাইবেন।

প্রশংসাপত্র।—প্রতিশ্রুতগী ৬ দৈনিক ৬০০ বিদ্যামাগর মহাশয়ের
কৃত নীরায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন ইহার লিখিত হেন:—

"আমি আপনাব আশ্রিত চৌদ্দবড়ি গীহা আমার এক প্রতিবেশীকে
বিমোহনাম তিনি বাসস্থান করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন। তাহার প্রায় পানি
দান জর হইত; এই বড়ি ব্যবহার করিবার পর হইতে তিনি আজ প্রায়
৫ মাস ভাল আছেন।"

বিনামূল্যে প্রতিকৃতি ৬ ইরিচন্দ্র শর্মা প্রণীত "জীবন-রক্ষক" পুস্তক
প্রতিবর্তিত হইবে। ১০ নূল্য প্রতিকৃতি পাঠাইলে পাঠাইয়া থাকিবে।

শ্রীমদ্রামানন্দ

১০ মাসেলে বার ১০ কোটি পর্য্যন্ত

জ্বরারি।

সকল প্রকার জ্বরের অব্যর্থ পরীক্ষিত ঔষধ।

ম্যালেরিয়া জ্বরের, মীহা যক্ষ্মণুক্ত জ্বরের ও পুরাতন ঘূর্ণঘূর্ণ জ্বরের এ পর্যন্ত একটিও রোগনিগ্রহ লব্ধ ঔষধ প্রচার হয় নাই, যে এত মাত্র অবলম্বন বিদেশীয় কুইনাইন বা তজ্জাত মিশ্র বা বাটিকা, তাহাতে কেমনও কোনও স্থলে কিছু দিনের জ্বর জ্বর বন্ধ হয় বটে, কিন্তু অবশেষে এক যিবের স্থানে দুই দিব একত্রিত হইয়া আমরণ মরণাধিক বজ্রপা দেয়। আমি ও আমার বন্ধুগণ বৎসর কাল জ্বরারি ব্যবহার করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, পুরাতন ও ম্যালেরিয়া জ্বরে, মীহা-যক্ষ্মণুক্ত জ্বরে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট—অনেক ডাক্তার কবিরাজ যে সকল বোগ আরাম করিতে পারেন, নাই; বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজন বাহার জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকার উৎকট বোগীও আগাদের জ্বরারি সেবনে একেবারে আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় সহজ শরীরে কাজ করিতেছে। কুইনাইনে যে জ্বর বন্ধ হয় না, জ্বরারি সেবনে সেই জ্বর অল্প দিনেই বন্ধ হয়। জ্বরারির আর একটি বিশেষ গুণ যে, ইহা দ্বারা রোগ-একবার আরোগ্য হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ইহা জ্বরঘ্ন, অগ্নিউদ্দীপক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, প্লীহানাশক, যক্ষ্মণৌষ নিবারক, এবং দূষিত রক্ত জন্ত বোগ মাজেরই প্রতিষেধক।

১নং ১০ কোটা ১৪ বাটিকা ১০ প্যাকিং ১০ আনা

২নং ১০ ২৮ ১০ ১০

৩নং ১০ ৪২ ১০ ১০

ডাক্তারগণ চারি আনা স্বতন্ত্র লাগে।

মফঃস্বলে নগদ কিনিলে প্রতি কোটার ১০ অধিক মূল্য লাগে।

এক সঙ্গে এক ডজন লইলে মূল্য ১নং ৫ টাকা প্যাকিং ১০০; ২নং ১০ টাকা প্যাকিং ১০০; ৩নং ১৪ টাকা প্যাকিং ১০ টাকা। ড্যানুপেবলে লইলে মণি-অর্ডার কমিশন অধিক লাগে।

জ্বরারি গাইবার ঠিকানা;—এস, সি, স্যাম, জ্বরারি আগিস;

১নং চীনা বাজার লেন কলিকাতা।

বোস এণ্ড কোং।

১৪৪ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্টেশনার্স, কমিশন-এজেন্টস্ ও জেনারাল
অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

আপাততঃ কলিকাতায় বিকল্প অরডার সাপ্লাই এজেন্সি অতি বিরল। বিদেশীয় ধনী মহাজন, জমিদার, দোকানদার, প্রভৃতি সর্ব সাধারণের সুবিধার্থে উপরোক্ত এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদেরই ক্রয় ও বিক্রয়ে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা আমাদের বৎসরকাল বিচিত্র নানাবিধ জব্যের কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের সহিত সতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাঁহারাও যাবতীয় জব্যাদি আমাদের নিকট পাইকারী দরে বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। দূরদেশবাসী দোকানদার প্রভৃতি অথবা ভুল্লোবদিগকে অনেক সময় বিস্তর ব্যয় খরচাব করিয়া ক্রয় করিতে আসিতে হয় ও তাঁহারা নূতন ক্রেতা বলিয়া অনেক সময় বিলক্ষণ প্রভাবিত হইয়া থাকেন। কলিকাতায় যে ভিনিয় যে স্থানে অল্প মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের অবিদিত নাই, এজন্য আমরা আশা করিতেছি যে, অত্র অত্র এজেন্সি সমূহ অপেক্ষা আমাদেরই প্রেরিত জব্যাদির মূল্য শ্রবণ হইবে এবং কলিকাতায় আসিয়া বাহ্যিক জব্য খরিদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার আমাদেরই প্ররীক্ষা করুন, এই প্রার্থনা। আমরা সকল প্রকার দেশী ও বিলাতি শাল, আলোয়ান, বেনারসী, বোম্বাই, ঢাকাই, শান্তিপুর, কলকাতা, এবং অত্র নানা প্রকার বস্তাদি; পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের বড়ি, শার্ট, কাপড়, কোট ইত্যাদি সর্ব প্রকার পোষাক, ছুতা, মোজা, রুমাল, গায়টার, তোয়ালে, বোতাম, সৌগন্ধ জব্য (Essence), সাবান, ছাতি, ছড়ি, পুস্তক কাগজ কলম, লিপিঘর ও রবার-ষ্ট্যাম্পের কালি, জাপান ও চীন দেশীয় খেলনা ইত্যাদি। কবিরাজি ইংরাজি, হোমিওপ্যাথিক, সূত্রপ্যাথিক, হৈলেকট্রপ্যাথিক, হাকিসি ঔষধ ও সর্ব প্রকার গেটেস্ট ঔষধ, টেবিল, চেয়ার (Furniture), কলকজা লোহ-দ্রব্যাদি (Hardware), রং, বিলাতি-মাটি (Cement), দুই চাকার গাড়ী (Bicycle), তিন চাকার গাড়ী (Tricycle) ইত্যাদি, সর্ব প্রকার কাচের জব্য (Glassware), এবং এনামেল জব্যাদি, বড়ি, আংটি, হারমোনিয়া, ফ্লুট, বাদী, দেশী ও বিলাতি বাতখত এবং সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় জব্য ও ট্রীমোপ বোতল (Ice and Aerated water) সরবরাহ করিয়া থাকি।

ম্যানেজার

শ্রীমদেবকুমার বসু।

N.B.—সাম ও খাব স্পষ্টাকরে লিখিলে বাবিত হইবে।

কবিরাজ অভয়চরণ গুপ্ত কবিরত্নের

মুখাবলী ।

১২০ বটাকার এক কোটা—১ এক টাকা।

প্রতি ১২ কোটা—১০ দশ টাকা।

ইহা পাচক, বিরেচক, রক্তপরিষ্কারক এবং বলকারক; স্তত্রায় শরীরের ব্যায়াম সমস্ত দূরীকৃত করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং লাবণ্য ও পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। ইহা কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং অতিশয় কুখাবর্জক। ইহা আহার পরিপাক করিয়া মল নির্গত কবে, অথচ জলবৎ ভেদ হয় না। এবং শরীর বিকৃত করে না। আকস্মিক ব্যবহারিদিগেরও বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কোন পীড়ার উপক্রমে ২/১ দিন সেবন করিলে আর পীড়া হয় না। যে প্রকার জ্বরই হউক না কেন, ইহা অল্পদিন সেবনেই সম্পূর্ণ স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয়। ইহাতে কুইনাইন কিম্বা ত কোন দূষিত দ্রব্য নাই। অস্ত্রাঙ্ক ঔষধের স্তায় অল্প দিন পরেই পুনরায় জ্বর হয় না। অল্পপিত্তজনিত সর্সপ্ৰকাদ পাত্তব একেবারেই দূষ হইয়া যায় ও অধিবৃদ্ধি হয়। ডাক্তার, কবিরাজ ও বহুতর রোগীর প্রশংসাপত্র ঔষধালয়ে আসিলে দেখিতে পাইবেন।

অনেক সময় লেখার দোষে ঔষধ প্রেরণ করা হয় না। অতএব লেখা যেন ছড়ান না হইয়া স্পষ্ট হয়। বিদেশস্থ মহোদয়গণ ব্যবহার ও ঔষধের জ্ঞান পত্র ও মনি অর্ডার আমার নামে পাঠাইবেন।

ত্রিবিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত—কবিরাজ

আর্য্য আয়ুর্কৌমারী ঔষধালয়,

১৯ং নীলমাধব সেনের গলি, সান্‌কীভাঙ্গা,

কলিকাতা।

গ্রাহকগণের প্রতি ।

ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইল । সম্মুখে পূজা,—
গ্রাহকগণ অবিলম্বে ষষ্ঠ বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৭ দুই
টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন ॥

যে সকল গ্রাহক এখনও পঞ্চম বর্ষের মূল্য পাঠান নাই,
তাহারা শীঘ্র পঞ্চম বর্ষের বাকী ও ষষ্ঠ বর্ষের অগ্রিম মূল্য
পাঠাইয়া আমাদের উপকৃত করিবেন ।

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বস্তুর লেন,

সিমলা-পোঃ আফ্রিস, কলিকাতা ।

} ত্রীযতীশ চন্দ্র সমাজপতি
কার্যাব্যক্ষ ।

প্রেম ।

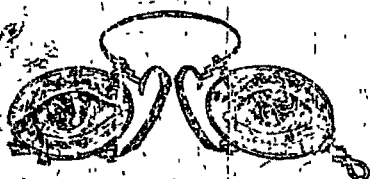
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি. এ. প্রণীত ।

মূল্য ১৭ এক টাকা । ডাঃ মাস্তুল ১০ এক আনা ।

“উহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে । উহাতে উভয় পাণ্ডিত্য ও হৃদয় সঞ্চিত
আছে । উহাতে অনেক স্থলে হৃদয়োন্মাদক কথা আছে ।” শ্রীরাজনারায়ণ বসু

প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের নিকট ২, নং পারীমোহন-সুরের লেন,
পাড়াবাগান, সিমলা পোঃ, কলিকাতা ;—এই ঠিকানায় প্রার্থনা ।

এস, লাহিড়ী কোম্পানী



আমাদের নিকট সর্বপ্রকার পেন্স
ক্রীষ্টাল উৎকৃষ্ট চসমা স্থলভ মূল্যে
পাওয়া যায় । আমরা সর্ববিধ-সোণ,
রূপা ও ধাতোর ফ্রেমও প্রস্তুত করিয়া
থাকি । পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।

১৪ নং বৃন্দাবন বস্তুর লেন ; কলিকাতা ।

ইংরাজি-শিক্ষার পরিণাম ।

পূর্বাধ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, সে কালের ভেজীয়ান্ মুনিঋষিগণের সন্তান সন্ততি সকল সময়ে অন্নগ্রহণের অল্প প্রচলিত নিয়মানুসারে দণ্ড মাস কাল গর্ত্তীয়স্থানরূপ বাতনাতোঁগের অপেক্ষা রাখিতেন না। দেশ কাল পাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়াই যত্র তত্র অকস্মাৎ এক এক ঋষিবংশধরের আবির্ভাব হইত, এবং তিনিও প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যাদ্রোপাদ্য বেদশাস্ত্রের উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া একটা ডাবী বিপ্লবের সূচনা করিয়া ফেলিতেন।

সৃষ্টি বৎসর পূর্বে এ দেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংবাজী বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্য জন্মিবে না। সাব্যস্ত হইবামাত্র বিদ্যাতী সন্ন্যস্তী দণ্ড মাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি ঋকগুচ্ছবাহী সুপক সন্তান এসব করিলেন; এবং অকস্মাৎ দেশমধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ আশা করিলেন, ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলেব উচ্চতম শিখরে উন্নীতা হইবেন; কেহ আশঙ্কা করিলেন, এইবাব ইহার বড়ীকে ভারতনাগরে ডুবাইয়া নাবিলা।

তাব পর ষাট বৎসর অতীত হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে ভারতের বিশেষ উন্নতিব বা অধোগতিব লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে আর এক তান উঠিয়াছে, ইংরাজি বিদ্যা এ দেশের ক্ষেদ্রে ফলিল না; নাহালার মাটিতে কি বিলাতি দরক পাছের বৃদ্ধি হয়? এ দেশের মাটিতে বরং দেশী প্রাচীন নৃসন্ততিব চাখ আবাদ ফলিলে কিছু ফল পাওয়া বাইতে পারে চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।

বিজ্ঞের দল স্মৃতমুখে বলিতেছেন, আমরা পূর্বে জানিতাম, বিলাতি মালমাত্রই ভূয়া; কেবল বাহিরের চাকচিক্য দেখি। হোয়ায়া আলানার আটখানা হইয়া একটা প্রকাণ্ড গুণ্ডগোষ্ঠ আরম্ভ করিয়াছিল; এখন তৈকিয়া দেশ ও পথে এসে।

সুতরাং নৃসন্ততি প্রাচীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্বদেশী বিদেশী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা অভৃষ্টি ও আকাজক্ষার চিহ্ন দেখা যাইতেছে; একটা নৃগণ পন্থার আয়িকার ও অনুসরণ না করিলে ভারতবর্ষীয় মানসিক উন্নতিব আশা উপায় নাই; নরাজ এইরূপ একটা ভাব অন্তরে অন্তরে খেঁচিয়া পোড়াইতেছে।

নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। ত্রিশ বৎসরের বেশী হইল, ইংরাজি বিজ্ঞান বহুল প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বড় বড় অধ্যাপক বড় বড় জটিল শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া দিতেছেন; তথাপি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একটা নিউটন জন্মিল না, একটা ফ্যারাডে জন্মিল না। কি পরিতাপ! ভারতবাসীর মস্তিষ্কটারই বোধ হয় দোষ আছে। ভারতবাসীর মস্তিষ্কসারে বানব ও অল্পবোধের মধ্যবর্তী পর্য্যায়ভুক্ত জীবের কিছু দিন হইতে অনুসন্ধান হইতেছে। বোধ হয়, ভারতবর্ষের লোক সেই জীব।

যাহাই হউক, সরস্বতী এ দেশে পদার্পণ করিয়া বক্সা হইলেন, অথবা কেবল অকালপ্রসূত দুর্বল জীবের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন, এ দেশের পক্ষে এ বড় দুর্নাম ও কলঙ্কের বিষয়। সুতরাং, এই কলঙ্কটনার ভিত্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

কলে কথাটা কত দূর সত্য, দেখা যাউক। বিলাতের মাটিতে নিউটন ফ্যারাডের মত লোক দুই দশটা করিয়া প্রতি বৎসর জন্মান, এমন নহে; সুতরাং সে কথা বলিয়া হা-হতাশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। জাতীয় জীবনের পক্ষে ত্রিশ বৎসর কি বাচি বৎসর এত অধিক সময় নহে যে, তাহার মধ্যে একটা প্রচণ্ড উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিতে হইবে।

যাহারা এরূপ আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্ত নানা সদগুণে বিভূষিত হইতে পারেন; কিন্তু বুদ্ধি নামক গুণের জন্য তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে পারি না। যাহারা পঞ্চাশ বাচি বৎসর পূর্বে ইংরাজি-শিক্ষার প্রথম আমদানির সময়ে একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার ঘটাইয়া আঠার দিনের মধ্যে ধর্ম্মের রাজ্য সংস্থাপন করিয়া দিব স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আশ্চর্য্যকর কোনও রূপ অধীব বা বিচলিত হইবার কারণ ছিল না। কলে, ইংরাজি-শিক্ষার প্রচারে আমাদের প্রভূত উন্নতি হয় নাই বলিয়া শোক তাপের কোনও কারণ নাই।

কেহ কেহ হয় ত এই সময়ে চোক মাঙাইয়া বলিবেন, বাতুলের মত এ কি কথা বলিতেছ, ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের কোন বিষয়ে প্রচণ্ড উন্নতি হয় নাই? যখন আমরা ইংরাজি বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হইয়াছি, তখন এখনও আঁধার গেল না বলিয়া চীৎকার করা, এবং কেন আঁধার গেল না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বসি, কেবল অন্ধস্বেরই লক্ষণ। দেখ না, আমরা রেলগারে থলিতেছি, সাহেবে কাণ মলিয়া দিবা মাত্র

বিলাতে টেলিগ্রাফ পাঠাইতেছি, এমন কি, মস্তপানের বিষয়ে ইংরাজের অনু-
করণ অন্তর্য, ইহাও বলিতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতেছি।

পুনশ্চ, দেশ, সেকালের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বলিয়াছে; আমরা এখন
পৃথিবীর গোলব্ধের প্রতিপাদনার্থ জাহাজের মাস্তুলঘটিত প্রমাণ এক নিখাসে
আওড়াইতে পারি; দধি, ক্ষীর অথবা এলকোহলের সমুদ্রের কথা মানি না;
কুশ, শাক, পল্লব, কুম্ভাণ্ড প্রভৃতি উদ্ভিদনামীর দ্বীপের অস্তিত্ব শুনিতে হস্ত
করি; বিকটাকার তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থলে এক ঈশ্বরের অমুভব কবি;
এবং ইংরাজি শিক্ষা সহকারে ইংরাজের রাজনৈতিক ধাত লাভ করিয়া বড়
চাকরির সহিত নির্বাচন প্রথাাদিও চাহিয়া থাকি।

আমরাও বলি, ঠিক কথা। ইংরাজের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে আমরা যে
কিছুই লাভ করি নাই, এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা। যে ব্যক্তি ইংরাজি
শিক্ষা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে চাহেন, আমরা তাঁহার সহিত
বাহ্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত নহি। এবং আশা করি, ভার ও সত্যের অমু-
রোধে এইরূপ দৃষ্টে প্রবৃত্ত হইতে কখনও পরাধীন হইব না। কিন্তু তথাপি

অর্থাৎ কি না; আমরা শিখিয়াছি অনেক ও পাইয়াছি অনেক; কিন্তু
তাহাতে আমাদের বাহ্য ব্যতীত আভ্যন্তরিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই।

আমাদের মজ্জা বা শোণিত শোষিত হয় নাই; আমাদের শরীরে বল জন্মায়
নাই; আমাদের আত্মার পুষ্টি হয় নাই। এ যেন অস্থিচর্মসার চিররোগীকে
বজ্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অথবা গলিতনখদন্ত বৃদ্ধকে পরচুল
রঙ ও কৃত্রিম দস্তুর সাহায্যে যুবা সাজাইয়া রথমঞ্চে নামান হইয়াছে। জীব
কণ্ঠাগতপ্রাণ রোগীকে কোঁটা কতক ত্রাণ্ডি খাওয়াইয়া কয়েককাল তাহার
শরীরে অস্বাভাবিক বল সঞ্চয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, বা তাহার স্ব-
স্পন্দন পুনরানয়ন করিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য হিম অঙ্গে উষ্ণতার সঞ্চয়
করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী লাভ কিছুই হয় না। আমাদের পক্ষে
এ কতকটা সেইরূপ। আজ যদি ইংরাজেরা চলিয়া যায়, আমরা বজ্রাতাবে
উলঙ্গ হইয়া বেড়াইব, ছুঁচের অভাবে নরুণ বা কাঁটা ব্যবহার করিব, এবং
পুনরায় শাকদ্বীপ, পল্লবদ্বীপ আওড়াইতে থাকিব। এ সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য কথা;
সত্য কথা ও পুরাণ কথা; সবিস্তার উল্লেখের প্রয়োজনাতাব।

আমরা জানিয়াছি অনেক ও শিখিয়াছি অনেক; কিন্তু কিরূপে জানিতে
হয় ও কিরূপে শিখিতে হয়, তাহা শেখা আবশ্যক বোধ করি নাই। মনুষ্য-

জাতির জ্ঞানব রাত্র্য আমাদের কর্তৃক এক কাঠা কি এক ছটাক পরিমাণেও বিস্তার লাভ করে নাই । রাজ্যবিস্তার দূরের কথা ; কিন্তু নিজে পরিচিত সীমানা পার হইয়া পা ফেলিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, আমাদের সাহসেও কুলায় না । রাজ্য-অধিকাংশ কি কি অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, তাহার কতক গুলা নাম কণ্ঠস্থ করিয়াছি বটে ; কিন্তু কখন তাহা চক্ষে দেখি নাই । আমাদিগকে না চালাইলে আমরা চলিতে পারি না, আমাদিগকে পথ না দেখাইয়া দিলে আমরা পথ চিনিয়া লইতে পারি না ; আমাদের নিজের হাত পার উপর নিজের কর্তৃত্ব নাই ; আমাদের জীবনীশক্তির মাত্রা শূন্য । আমরা সোনার সিপাই ; তার টানিলে আমাদের হাতের চাল তলোয়ার নড়িতে থাকে ; আমরা ছেলেদের খেলানার ব্যাঙ ; পেট টিপিলে আমরা কক্ কক্ কবি ।

অবশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা এক হিসাবে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি ; কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলে সেই বা কতটুকু ? কর্তৃকটা আমরা এক লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই ; কিন্তু দিন পূর্বে বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী, মার্বাটী ও শিখ, এক কার্যের জন্য একাসনে বসিবে, ইহা অসম্ভব ব্যাপার ছিল । এখন সম্ভব হইবাছে, ইহা কতকটা ইংরাজি শিক্ষার গুণে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু অনেকটা আবার ইংবাজী শাসনের গুণে ও অল্প পাঁচটা কারণে । এবং এই একদু-সাতনেও আমাদের চরিত্রের দুর্বলতা, লঘুতা ও তস্থহীনতা অনেকটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । ইংরাজি শিক্ষার গুণে আমরা জাতীয় চরিত্রের এই হীনতাটা দেখিতে শিখিয়াছি, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি ; কিন্তু হীনতার শোধন করিতে হইবে, তাহা শিখি নাই । তবে ভবিষ্যৎ ইংরাজি শিক্ষা, ইংরাজের পায়ের বুট ও আমাদের রুম্ম পীঠা, এতদ্ব্যতীত অন্য লাভ করিয়া কতকটা চরিত্রশোধনের পথ দেখাইয়া দিতেও পারেন ।

আর জ্ঞানার্জন্যের কথা । আমরা শিখিয়াছি অনেক । টিট-কাকা টিটকটুর ভৌগোলিক বুৎপত্তি, অক্সিজেন, ক্লোরীন, আর ইলেকট্র-সিটি ও ঈশ্বর, অনেক কথা শিখিয়াছি, বাহা পূর্বে জানিতাম না । আমরা বড় বড় আঁক করিতে পারি, বাহা ভাস্করচার্যের মাথায় কখনও আসে নাই ; বায়ুমধ্যে পদের বেগ নির্ধারণ করিতে গিয়া নিউটন কিন্তু ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন, অক্লেশে বলিয়া দিতে পারি । এমন কি, বোতলের ভিতর হাইড্রোজেন পুরিয়া নির্ভয়ে আগুয়াজ করিতেও সক্ষম হইয়াছি ।

সুতরাং আমরা ইংরাজের প্রসাদে শিখিয়াছি রপেট ; এমন কি, আমাদের

শিখিবার শক্তি কত গভীর, এ পর্যন্ত তাহা কেহ মানরজ্জু ফেলিয়া নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু হায়! আমাদের গড়িবার শক্তি কই, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় কোথায়! আমরা শোনা কথা ও শেখা কথা ভিন্ন জগতে নূতন কথা কি বলিলাম। উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় ত কিছুই দেখি না, এবং আরও কিছু দিনের মধ্যে যে পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহারও কোন শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। ইংরাজি-শিক্ষার কি এই পরিণাম?

আমরা গুরু উপদেশ গ্রহণে অতিশয় মজবুত; সে বিষয়ে আমাদের তুলনীয় কে আছে, জানি না। আমরা বালকেব হাতে কর্দম; কাঠিন্দ্রমাত্রবজ্জিত। আমাদের কাছে হইয়া যাহা গড়িবে, আমরা তাহাতেই পরিণত হই। আমরা এক দিনের মধ্যে তেজিষ কোটি দেবতা ভাঙিয়া একেশ্বরবাদী বা নাস্তি-বাদী হইয়া দাঁড়াই, আবার এক বজ্রতায় আমাদের ধ্বংসকষ্টি করিয়া তুলে। আমরা হাতচালা ও ভূত-নামানো গল্প শুনিয়া উৎকট হাস্তে গৃহপ্রাকার ধ্বনিত করি, আবার পর মুহূর্ত্তে টেলিগাথি বা সাইকিক ফোর্স শুনিগেই ডগাঅ্‌হার হইয়া গলিয়া যাই।

আমরা বিজ্ঞান শিখিতেছি সত্য; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ধাতু আমাদের শোণিতে এখনও আসে নাই। বিজ্ঞানের নামে আমরা আটখানা হই; কিন্তু আমরা যাহা শিখি, তাহা মোটের উপর উপবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান। মাছুবের চুল তাড়িতের পরিচালক নহে শুনিবা মাত্র আমরা লম্বা লম্বাটকি রাখিতে আরম্ভ করি; এবং চক্রে অবস্থানভেদে জোয়ার ভাটা হয়, পাঠ করিবা মাত্র কোষ্ঠি গণাইতে বসি। এমন শোচনীয় অবস্থা কি হয়!

বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না। মস্তিষ্কে কতকগুলো মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গোছাইয়া রখাবিস্তৃত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশই দেখিতে থাকি, ও তাহা হইতে লম্বা চোড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। থাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয়, ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া লাগাইয়া, ভাঙিয়া গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এক লক্ষ

মাগর পার হইতে চাই, সেভবন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহিরিবাঁমাঝ উড়িতে চাই, পক্ষাঙ্কবের দেয়ী সহে না। উত্তমও নাই, অধাবসারও নাই; ইন্দিয়গুলিকে সংযত করিয়া বহির্জগতে প্রেরণ করিবার দরকাব বোধ করি না; কেবল একবার চকিতের মত দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে ধ্যানযোগে বিশাল বিশ্বের কার্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করি। পাদরি সাহেব জাতিভেদের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া বেলি, আবার রিসলি সাহেব নাক মাপিয়া জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন দ্বায়হীন, পেশীহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজি-শিক্ষা আমাদের শতধা উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে, স্বীকার করিতে পারি না। দেশী হউক, আর বিলাতী হউক, গুরুবাক্য যতদিন আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিব, তত দিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞান ছাড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অস্ত্রব্রহ্মই বা আমরা কি করিয়াছি? কিছু দিন ইংরাজি ভাষায় চটকদায় গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা আমাদের শিক্ষিতদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। সম্প্রতি সে ভ্রান্তি কতকটা গিয়াছে বলিতে হইবে। তবে আজও অকারণে ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি জাহির করিতে গেলে হাত্পান ও অবজ্ঞাপদ হইতে হয় না। বাঙ্গালা সাহিত্য কতকটা আমাদের সমাজ সরগরম করিয়া রাখিতেছে সত্য। সুখের বিষয় ও আশার বিষয়। কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যে আছে কি? উপভাস ও কাব্য? তাই বা কর খানা? কাব্যরস-আত্মানের শক্তি আমাদের কতকটা আছে, স্বীকার করি। সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের পুরাতন জাতীয় সম্পত্তি। প্রকৃতিতে ও মানবচরিত্রে সৌন্দর্য্য অমূল্যব কম্বার ক্ষমতার আমরা কোনও কালে বঞ্চিত নহি। পূর্বেও ছিলাম না, এখনও নহি। ইংরাজি-শিক্ষা যে এই অমূল্যবতার মাত্রা বা সূক্ষ্মতা বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ; তবে ইংরাজি সাহিত্য ও ইংরাজের চরিত্র এবং পাশ্চাত্যগণের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলি বিচিত্র অদ্ভুত ইতিহাস অনেক অপরিচিতপূর্ব্ব হৃদয়ের প্রদেশ আমাদের সম্মুখে আনিয়া দিয়াছে; আমরা এখন সেই নূতন ফুলের মধু আহরণে অধিকারী হইয়া কতকটা সৌভাগ্যবান হইয়াছি, এই পর্য্যন্ত।

ফলে ষাট বৎসরের ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই; আমাদের আহ্বানের জবাব বাড়িয়াছে; কিন্তু পরিপাকের

শক্তি বাড়ে নাই; আমরা পুত্রের কথাই আবৃত্তি করিতে পারি; কিন্তু স্বয়ং
বাক্যরচনা করিতে জাতি না। আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা হীন;
আমাদের জ্ঞানজীবনে পরাধীনতা শোকাবহ। জ্ঞানালোচনার আমাদের
স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নাই; আমরা আত্মনির্ভর ও জ্ঞানমর্যাদা জানি না।
চির দিনই কি এমন ছিল! প্রকৃতই কি আমরা পিতৃপরম্পরাক্রমে পিতৃ-
পিতামহ হইতে এই অস্থিহীন মাংসপিণ্ডবৎ কলুষের প্রাপ্ত হইরাছি? বস্তুতই
কি আমাদের হীনতা ধাতুগত ও মস্তিষ্কগত? বস্তুতই কি আমরা মানুষ ও
বানরের মধ্যগত পর্যায়ভুক্ত জীব?

অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া আমরা একমোচন দ্বিহার অভ্যাস আছে,
তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—না। চিরদিন ত এমন ছিল না। শুরুবাক্যে
ভারতবাসীর ধর্মের শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে সত্য; এবং সেই আত্মাত্মিকী শ্রদ্ধা
কখন কখন জ্ঞানবুদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু তাই
বলিয়া প্রাচীন ভারতে জ্ঞানাবেষণ ছিল না, এমন কথা বলিও না; তাহার
জ্ঞানের রাজ্য প্রচারিত করিতে জানিত না, অথবা পুরাতন পবিত্রিত পরিধির
বাহিরে পদক্ষেপ করিতে সে কালের ভারতবাসী সাহস করিত না, এ কথা
বলিও না। কিরূপে প্রাচীনকে ধ্বংস করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়,
কিরূপে জীর্ণ কুটীর ভূমিগাং করিয়া অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, কিরূপে সাহ-
সের সহিত বিজয়ভূমি নিরাদিত করিয়া জ্ঞানবর্জিত হস্তে করিয়া অজ্ঞানের
তিমিররাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, সে কালের লোকে জানিত।—সাক্ষী, উপ-
নিষদ, সাংখ্য, বেদান্ত, দশমিক লিপি, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ; লীলাবতী,
বীজগণিত ও গোলাধার; সাক্ষী, বুদ্ধ ও শঙ্কর, ব্রহ্মসুত্র ও ভাস্কর, গদাধর
ও রঘুনাথ। কত নাম করিব? চক্ষে কি জল আইসে না? লেখনী কি সরে?
দধি সমুদ্র ও ইক্ষু সমুদ্রের কথা ভুলিয়া হাসিও না; 'তৈলে পাত্র কি
পাত্রে তৈল' বিতর্কের কথা ভুলিয়া বিক্রপ করিও না; ঊনবিংশ শতাব্দীর
উপার্জিত জ্ঞানের সহিত সে কালের জ্ঞানের তুলনা করিয়া ভাচ্ছীল্য দেখাইও
না। মনে রাখিও, সে কোন কালের কথা; মনে রাখিও, তখন পৃথিবীর অবস্থা
কি ছিল, তখন এ দেশেরই অবস্থা কিরূপ ছিল। নিউটন বাহা জানিতেন না,
জ্ঞান ভূমি জান; তথাপি ভূমি নিউটনের চরণরেণুর যোগ্য নহ, এ কথাও
রাখিও। তবে সে কালের মাহাত্ম্য বুঝিবে। অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ
কথা নহে; জ্ঞানার্জনস্পৃহা ও জ্ঞানার্জনক্ষমতা লইয়া কথা। আমরা

ইংরাজেব নিকট শিখিতেছি; সে কালেও তাহারা পরের কাছে না শিখিত, এমন নহে। গ্রীকের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা প্রদান। তবে বিদেশ হইতে বীজ আমদানি করিয়া তাহার চাব কবিতে জানিত, তাহা ফলাইতে পারিত; আমরা তাহা পারি না।

আর যে জ্ঞান স্বাবলম্বনে নিজের চেষ্টায় উপার্জিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ও মাত্রাই কি সামান্য? সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। সে কালের সহিত এ কালের তুলনা করিয়াও

পূর্বকালের কাহিনী দূরেন। মুসলমানী আমলে আমাদের যা ছিল, এখনও তাই। মুসলমান রাজার সময়ে আমাদের অবস্থা অতি-দুঃখের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, এইকপ একটা কথা গম্ভীর ভাবে ভাবিয়া তখন বলিয়া থাকেন। ছি ছি! লোকে যখন কুনিশ করিয়া সাপা পিছাইয়া কাজি সাহেবের সম্মুখে বাইত, যখন ভট্টাচার্য লিখিত শিক্ষা সহ টোলে বসিয়া ছায় শব্দের কচকচি লইয়া কাল কাটাইতেন, ও গৃহস্থ ভদ্র পার্শ্বীর বয়েদ আনুতি করিয়া মুসলমানী জানাইত, এবং পাঠ-শালার শুকমহাশয় পোড়োদের দ্বারা তামাক সাজাইয়া লইতেন ও উকুন তোলাইতেন, সে কালে আমাদের অবস্থা মনে বসিতেও যুগা আইসে। ছি, ছি, সে কালের প্রসঙ্গ মুখে আনিও না।

আমরা লজ্জার মাথা ধাইয়া তখনকার প্রসঙ্গও উত্থাপিত করিতে চাই, এবং তখনকার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে চোখে হাত দিয়া থাকি। ভট্টাচার্যের টোলঘরের পার্শ্বস্থ গোশালা ও ইজার-পরিহিত কাজি সাহেবের মুখে পলাতুর গন্ধ ভুলিয়া যাই। প্রতাপ ও শিবজী, নানক ও কবির, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। চতুর্পাঠ-মধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ, বেদান্ত ও জ্ঞান, কাব্য ও অলঙ্কারের স্বাধীন আলোচনা মনে পড়ে। এ সকল সত্য কথা; ইতিহাসের অপলাপ করিও না। সে কালে যত দুর্দশাই থাক, সজীবতার লক্ষণ ছিল; শত্রুতেও আমাদের সঁধ্যাদা করিত, ভয় করিত। এখন

সুতরাং জ্ঞানার্জনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কোনও কালে ছিল না, এ কথা বলা সাজিবে না। যতদূর দোষ দিবে না; সে কথা যে বলিবে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেল। তবে সন্দেহ এ হ্রস্বতার কারণ কি? কারণ অল্পসংখ্যক।

অদৃষ্টদোষেই হউক, আব শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই হউক, ইংরাজি-শিক্ষা ষাটি বৎসরে আমাদের দেশে ফলে নাই। বৎসর বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানকালে প্রতিনিধি চ্যান্সেলারের মুখে এই আক্ষেপই শুনা যায়। আমাদের জ্ঞানার্জনে মতিরতি হইল না, জ্ঞানরসের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা জন্মিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বৎসর বৎসর হাজার দক্কে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু একজনও একখান লাদল আনিয়া জ্ঞান-রাশ্বেয় এক ছটাক জমিতে চাব দিল না।

দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ততোধিক দুঃখের বিষয় আব একটা আছে। সরস্বতী যন্ত্রের সহিত কোলে লইয়া তাঁহার বীণা পুস্তক তাঁহার সম্মানগণের হাতে দেন; কিন্তু কৃতী সম্মানেরা যাবের কোল হইতে নামিবামাত্র বীণাটি ভাঙ্গিয়া ও পুস্তকখানি বেচিয়া মারের সগদ্বী লক্ষ্মীদেবীর দাসত্বে নিযুক্ত হইলেন। জ্ঞানার্জনে শক্তি নাই, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু অর্থোপার্জন জ্ঞানচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য, এ বড় ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ বাক্য। এবং সত্য বল দেখি, ইংরাজি-শিক্ষা কি আমাদের সমাজে অর্থোপার্জনের ও জীবিকার্জনের সুগম উপায়মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে?

ইংরাজি-শিক্ষার প্রথম আবির্ভাবকালে যে সকল মহারত্ব সহসা আবির্ভূত হইয়া সমাজকে উন্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের উৎসাহ-বহি শেষ পর্য্যন্ত হাকিমী উকীলী কেরানীগিরি প্রভৃতিতে কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষার বলে হাকিম ও উকীল ও কেরানীতে দেশটা প্লাবিত হইয়া গেল। ফলতঃ সুখিক অভিবৃষ্টি প্রভৃতির ভ্রায় গ্রাজুয়েটের অভিসৃষ্টি রাষ্ট্রের পক্ষে একটা জৈতিস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতেছে। রাজা ব্যস্ত; ইহাদিগকে লইয়া কি করিবেন? সমাজ ব্যস্ত, কিরূপে ইহাদের খোরাক যোগাইবে; বিশ্ববিদ্যালয়জননীও প্রহৃত অপোগণ্ড গুলির সংখ্যাধিক্যে লজ্জিতা ও কাতরা। আমাদের মত বাহাবা বিশ্ববিদ্যালয় মাতার অকৃতী সম্মান, তাহারও লাভসংখ্যাধিক্যে ভীত হইয়া সন্নিবেশন করিয়া ডাকিতেছে, 'সম্বর! সুভগে, দিন কতক ক্ষান্তি দাও; এ যত্নকুল আর বাড়াইবা ফল কি! আমাদের খোরাকের কিছু আধার হউন! শেষে ভূভারহরণের জন্ত অবতাবেব প্রয়োজন যেন না হয়! জননী, উকীল-প্রসবিনী, উকীলের আর স্থান নাই মা!'

অন্ত দেশে কি অবস্থা, জানি না; কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষে লোকে

জীবিকার্জনের পন্থা শিখিবার জন্য বিজ্ঞাননিদ্রের প্রবেশ লাভ করে। এবং ইহাও একটা লোনহর্ষ সত্য কথা, যে ব্যক্তি বিজ্ঞাননিদ্র হইতে বাহির হইয়া অর্থে-পার্জনে সমর্থ না হইল, তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হব। সমাজ তাহাকে অবজ্ঞা করে, তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে টিটকারী দেব, সে-দুঃস্থতারীর মত মুখ ঢাকিয়া লোকসমাজে বেড়ায়; তাহার জীবনে ভার বোধ হয়। সে অক্ষম ও ভাগ্যহীন, সংসারমধ্যে সে দরিদ্র পাঁজ।

বিজ্ঞান এইরূপ লালনা দেখিয়া গায়ে লোমাক্ষ জন্মে; ভবিষ্যতের জন্য কোন আশা থাকে না; সমাজের অধঃপতন দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজ অনেক আশার ভারতবাসীর মুখের অপনোদনের জন্য বিজ্ঞা বিতরণ করিতেছেন; কিন্তু তাহাদের প্রদত্ত অমূল্য রত্নের বি এই মূল্য? বানরের গলায় মুক্তাব হার শোভা পায় না; ভারতবর্ষের দিগ্ভাসনিরগুলি ভাঙিয়া ফেল।

ভারতবর্ষের, অর্থাৎ যে দেশের মধ্যে এক সুবৃহৎ মানবসম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল হইতে কেবল জ্ঞানার্জনের জন্য ধনলালসা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবন পর্তুকুটীর ও শাকান্ন ভাইয়া তৃপ্ত থাকিত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ভারতের ব্রাহ্মণের জীবনের ব্রত ছিল। তাহার কোষে অর্থ ছিল না, তাহার হস্তে তরবারি ছিল না; অধ্যয়ন ও অধ্যাপনমাত্র ব্রত করিয়া সে জীবনের সমুদয় ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়াছিল; এবং এই গরীয়ান স্বার্থ-সংহারের জন্য, এই মহীয়ান ব্রতাবলম্বনের জন্য সমাজ তাহাকে শীর্ষস্থানে বসাইয়া পূজা করিত। অতাপি চতুর্পাশীর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানে দণ্ডারমান আছেন; কোটিপতির মুকুটমণ্ডিত মন্তক তাহার চরণের স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়।

এখনও সেই প্রাচীন কালের গদ্ধতির শিশু দ্বারা ক্ষীণস্রোতে এ দেশে বহিয়া আসিতেছে। এখনও নাকি সিদ্ধুতীর ও কুকাভীর হইতে শিক্ষার্থী নবদ্বীপের চতুর্পাশীতে ভক্তিমাঞ্জ দক্ষিণা ও উপহার লইয়া শিক্ষকসরীপে উপস্থিত হয়। তাহারা কি শেখে, কি না শেখে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কি তাহাদের উদ্দেশ্য, কি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, কিসে তাহাদের তৃপ্তি, কেবল তাহাই দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

ভারতবর্ষের অন্য জাতির কথা জানি না; কিন্তু হিন্দুজাতি জ্ঞানের মর্যাদা বুঝে না, ইহা তাহাদের জাতীয় অপকর্ষের পরিচয়, এ কথা বলিতে পারি না। তবে কেন এমন হয়?

কুক্ষণে ইংরাজি গবর্নমেন্ট শিক্ষিতগণকে বড় চাকরিতে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; এবং কুক্ষণে অর্থাগমের জন্য ইংরাজি জ্ঞানের দরকার হইয়াছিল। দরিদ্র অনার্থী ভারতবাসী অন্নাহরণের এমন হুগম পথ পাইয়া স্বাঁকে স্বাঁকে সেই পথে ছুটিবে, বিচিৎ কি? তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

অন্নচিন্তা মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ; সে জন্য বে দোষ, তাহা দরিদ্র হিন্দুযুবকের নহে; বিশেষতঃ, মাসী, পিসী ও পিসীত ভগিনীব বিধবা গুরুবধুর অপোগণ্ড সন্তানগুলির সমবায়ভূত স্রবৃহৎ ক্ষুধার্ত হিন্দু পরিবার বখন সত্য ও সৌকর্য্যভাবে কলেজ-ভাতায়াতনীল যুবকের আগামী পরীক্ষায় পাশের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে থাকে। দেশভুক্ত সমুদয় লোককে যে অন্নচিন্তা ও বস্ত্রচিন্তা ত্যাগ করিয়া বাগ্‌দেবীর আরাধনায় নিরত হইতে হইবে, এমন অসম্ভব প্রার্থনা করিতে পার না ; এবং কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হিন্দুযুবকের চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার শুদ্ধ অক্ষম কঙ্কালবশেষ শরীর স্মরণার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, ও বাল্যে বিবাহিতা পত্নী তিন চারিটি শিশুসন্তান সহ অনাধিনী হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিতে থাকে, এই ব্যাপারের জন্য মনুষ্যচরিত্র ও সমাজচরিত্রকে দারী করিতে পার ; হিন্দু যুবককে দারী করিতে গেলে বড় নিষ্ঠুরতা হইবে।

বিলাতী শিক্ষার সহকারে বিলাতী সভ্যতার নিয়ম এ দেশে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সংসার খরচের মাত্রাটা অযথাপরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে, নেটো বিবেচনা করা উচিত। চটিকুতা ও তালপাতের ছাতা মাত্র সঞ্চল করিয়া এমন কি, দেনেটহাউসে পদার্পণ করাও বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে ; এবং উত্তরীষমাত্র স্কন্ধে কবিতা সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে বেজাঘাতের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। জলের গেলাস মুখে তুলিবার সময় ফিলটার করা না থাকিলে ব্যাসিলাসের অবস্থিতির শঙ্কা জন্মে, এবং দেহে ব্যাধি ঘটিলে কবিরাজ মহাশয়ের প্রাচীন কফপিত্তঘটিত প্যাথলজির আশ্রয় লইতে সাহস হয় না। স্ততঃ জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী থাকিলেও কিঞ্চিৎ অর্থাগমের উপায় না দেখিলে চলে না ; এবং ভিক্ষা ও চাকরি ভিন্ন অর্থাগমের তৃতীয় পন্থা এ দেশে বর্তমান নাই।

একটা কথা উঠিয়াছে, ভাল ছেলেদের জন্য বড়লোকে যদি বৃত্তিসংস্থাপন করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল ভাল মাথা হাইকোর্টের গ্রানিট দেওয়ালের আশ্রয় লইতে না বাইতে পারে। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত

লাটবাহাদুরগণের শুভবিদায়-উপলক্ষে প্রস্তরমূর্ত্তিস্থাপন দ্বারা পুণ্যসংকল্পেব সম্ভাবনা থাকিবে, তত দিন এ প্রস্তাব অরণ্যে রোদনমাত্র ।

গবর্মেণ্ট শিক্ষাবিভাগে দেশীয়দিগকে মোটা বেতনের চাকরি দেন না, এই একটা আক্ষেপ আছে । কথাটা ঠিক আগাদের মত ভিক্ষাপঞ্জীবীর উপস্থিত, স্মরণ প্রথমে উপস্থিত করিতে লজ্জা হয় । কিন্তু অদৃষ্টবশে যখন ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের উপজীব্য, এবং ইংরাজি বিদ্যাটাই আমরা পয়ের কাছে ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিতেছি, তখন আর লজ্জা করিয়া কোন লাভ নাই । গবর্মেণ্টের উপর কতকটা দাবীও আছে । গবর্মেণ্ট শিক্ষাবিভাগে নিয়োগার্থ বিলাত হইতে যে সকল মূর্ত্তি আমদানি করেন, অনেক স্থলে তাঁহাদের দ্বিপদে সন্দেহ জন্মে । কৃষিকার্যের জন্য এ দেশে গরু ও বিলাতে বোড়া ব্যবহৃত হয় । বিলাত হইতে বোড়া আমদানি করিয়া চাষে লাগাইলে হয় ত এখানে লাভ ঘটতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া বিলাতী গাধা কি হিসাবে দেশী গরুকে পদচ্যুত করিবে, বুঝিতে পারি না ।

‘আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষা প্রণালীর মূলে দোষ বর্তমান আছে । এই মূলস্থ দোষের সংস্কারসাধন না হইলে, কোনরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই । বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষার আশাহ্রুপ ফললাভ না দেখিয়া প্রাচীনের দল পুনরায় টোলে প্রবেশ করিয়া আমরা কোষ মুখস্থ করিতে উপদেশ দিতে ছেন ; এবং আমাদের ইংরাজ মনিবেবা আমাদের জাতিগত হীনতাকেই কারণ স্থির করিয়া আমাদের মনুষ্যজাতীরে কিছু সাহায্য নাই হইয়াছেন । আমাদের বিবেচনায়, আমাদের জাতির মনুষ্যধর্ম্মে সংশয়স্থাপনের সম্যক কারণ এখনও উপস্থিত হয় নাই ; এবং দেশী পুঁথিগুলির বহুল প্রচারের জন্য ইংরাজি গ্রন্থগুলি উপর আমদানি মাণ্ডল বসাইবার প্রস্তাব না করিলেও শুভবিদ্যভের আশা আছে । দোষ ইংরাজি বিদ্যার ত কখনই নহে ; এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রেরও সম্পূর্ণ পরিমাণে নহে । বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহাতে বিদ্যার প্রতি বিশেষ অল্পরূপ ঘটবার সম্ভাবনা নাই, স্মরণ সেই প্রণালীর সংস্কারেব একবার চেষ্টা করা উচিত । কোন্ দিকে সংস্কার চলিতে পারে, এ প্রবন্ধে উত্থাপন করিতে সাহসী হইলাম না । বলাই কোন পাঠক নিতান্ত করুণাপরবশ হইয়া বর্তমান প্রবন্ধের এত দূর পর্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত্বতাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের এই স্থলে উপসংহার করিলাম ।

— স্বাক্ষরিত্বনন্দিত্রি

অভিভাবক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আমার পৈতৃক ভ্রাসন কোথায় ছিল, অথবা আদৌ ছিল কি না, সে বিষয়ে সঠিক কোনও সংবাদ দিতে পাবিলাম না। স্মৃতিস্মন্দরীকে কতবার সাধিয়াছি। তিনি শৈশবের অতি সুদূর প্রদেশ হইতেও বিক্ষুব্ধভাবাবু রান্না-ঘরের রোয়াক ছাড়া আর কোনও স্থানের খবর এ পর্য্যন্ত আনিয়া দিতে পারেন নাই। সেই রোয়াকের একাংশে আমার সহায়হীন জননী, আপনার মহাযহীন শিশুটি লইয়া, দিবসের কঠোর কর্ম্মবিসানেন পর, রাত্রি একটার সময় আসিয়া শয়ন করিতেন।

বাৎসরিক ঋতুভেদে বোয়াকটির মূর্ত্তিভেদ ঘটত। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে শীতের শেষ পর্য্যন্ত উহার কিয়দংশ দরমার বেড়ায় বেষ্টিত থাকিত। আবার নবীনবসন্তসুমাগমের পূর্বেই বৃক্ষ সকলের শীর্ণ পত্ররাশির জ্বার কোথায় অদৃশ হইয়া যাইত। গরবিনী-নান্নী গৃহকর্ত্তীর বিশেষ প্রিয়তমা একজন পরিচারিকা ছিল। স্ববর্ণ হু, উহার সহিত, সেই আববণ-বেড়ার সত্বর অন্তর্ধানের বিষয় লইয়া, মাঝে মাঝে স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর কলহ বাধিত। গৃহিণীর নবপ্রসূতা কুমারীর হৃৎ গরম করিবার নিমিত্ত গরবিনী নিশীথে উহা ভাস্কিয়া লইয়া যাইত। প্রাণাধিক সন্তানের গায় শীত লাগিবে, অথবা হিমে তাহার সর্দি হইবে, স্নেহময়ী জননীর তাহা সহ্য হইত না। কিন্তু গরবিনীর সহিত ঝগড়ায় আঁটরা উঠাও সহজ নহে। অবশেষে নিরস্ত হইয়া অভাগিনী, এই বিশাল সংসার-প্রান্তরে মাথা গুজিবার যে একটু স্থান পাইয়াছেন, তাহাকেই পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন।

আমার বয়স তখন দশ বৎসরের বেশী হইবে না। বিক্ষুব্ধ বাবু অমুগ্রহ করিয়া আমাকে একটা ইংরাজী স্কুলে পড়িতে দিয়াছিলেন। ধরচপত্র সমুদয় তিনিই যোগাইতেন। স্বর্গীয়া মাতৃদেবী বারোমাস রন্ধনশালায় মহাযজ্ঞটি চালাইয়া এই উপকাবের কথঞ্চিৎ পরিশোধ, করিবার চেষ্টা করিতেন। উপকার-কারীর নিন্দা করিতে নাই। আর বিক্ষুব্ধ বাবুর নিন্দা অতি বড় শত্রুতেও করিতে পারে না। কিন্তু কর্ত্তাঠাকুরাণীর ছই একটা উদার আচরণের কথা তোমাদিগকে না শুনাইলে, আমার প্রাণের ভৃষ্টি হইবে না। গরবিনীর গিন্নী-

মা শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী আপনাকে প্রকৃতই রাজরাজেশ্বরী ভাবিতেন। তাঁহার শ্রাব বুদ্ধিমতী, ধর্মপরায়ণা, সুশীলা, সুগৃহিণী ইতিপূর্বে ভূতাবতে আর কোথাও অবতীর্ণ হন নাই, তিনি চব্বিশ ঘণ্টা কেবল ইহাই মনে করিতেন। শুধু মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেও প্রতিবেশিগণ, বিশেষতঃ দাসদাসীগণের বাচিষা বাইত। ঠাকুরাণী পদে পদে দৃষ্টান্তসহকারে বিষয়টি লইয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের বিষম কর্ণজ্বর উৎপাদন করিয়া দিতেন।

ঝোঁকটা সেই নিরাশ্রয়া অনাথিনী ও তাহার নিরাশ্রব পিতৃটির উপবেই সর্বদা আসিয়া পড়িত। শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী,—তোনবা! কেহ কেবল রাজেশ্বরী বা রাজরাজেশ্বরী বলিয়া তাঁহার অসম্মান করিও না,—শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী আমাব স্বর্গীয়া জননীকে বুঝাইতে চাহিতেন যে, তিনি তাহাকে ও তাহার কুপোষ্য সন্তানটিকে প্রতিপালন করিয়া যে অপূর্ণ বদান্ততার পরিচয় দিতেছেন, তাহা অন্তের পক্ষে একবাবেই অসম্ভব। দাতাকর্ণের মহিষী পদ্মাবতী ইতিহাসে তাদৃশ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। নহিলে ঠাকুরাণীব একটা ব্যাকরণমত উপমা মিলিতে পারিত। কিন্তু পোড়া লোকের কেমন স্বভাব, যাব বত উপকার কর, তার গুণের ততই বাড়ি। কলিতে কাঁহাবও ভাল করিতে নাই। ঠাকুরাণীর মন বুকে না, প্রাণ কাঁদে, তাই তিনি সেই সকল লোককে বাটীতে আশ্রয় দেন। বিধাতার কাছে প্রার্থনা এই, গুরু তাঁহার আপনার না হউক, তিনি যেন চিরকাল পবের উপকার কবিয়া মবিতে পান।

শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী কুসুমশয্যাব উপর কুসুমকোমল দেহখানি ঢালিয়া সুসুপ্তিসমাহিত না হইলে, বিষ্ণুবল্লভ বাবুর বাটীতে ঐ সকল বক্তৃতা অবিশ্রাম চলিতে থাকিত। প্রভাতে সাড়ে সাতটার সময় গাত্রোথান করিয়া যখন দেখিতেন, প্রায় সাতটা চল্লিশ মিনিট পার হইয়া গেল, অথচ তাঁহার আলস্তবিজড়িত বাহুখানির সম্মুখে সেই দিব্যবাসসুন্দরভিত, প্রধুমিত-দ্রবময় প্রোতবাস উপস্থিত হইল না ;—বক্তৃতা তখনই চলিত। যখন দেখিতেন, তিনি শয্যাভ্যাগ, হস্তমুখপ্রক্ষালন, স্নান, গাত্রমার্জন, শুষ্ক শুভ্র বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি কত কাজ সারিয়া ফেলিলেন, তথাপি রাধুনি ঠাকুরণ তাঁহার জন্ত একমুটি অন্ন এখনও প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলেন না ;—বক্তৃতা তখনই চলিত। যখন দেখিতেন, প্রস্তুতমল্লিকারানিশিতুল্য অন্নরাশির চারি পার্শ্বে ব্যঞ্জন পাত্রগুলি গুণাগুণ বখাক্রমে সজ্জিত হয় নাই, কোথাও একটু গোল-

মাল-হইয়া পড়িয়াছে ; অথবা তাঁহার নবনির্মিত রজতপাত্রে জল না রাখিয়া সেই পুৰাতন কাঁসাৰ গ্লাসটাই ধরিয়া দিয়াছে ;—বক্তৃতার শ্রোত তখন আর কিছুতেই বাধা মানিত না । হায় ! এ সংসারে দাসদাসীগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইবার জন্তই কি শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী জন্ম হইয়াছিল !

বিকুবল্লভ বাবুর আশ্রিতা আর এক সুন্দরী ছিলেন । নীতিবিদেব শাসন-ভয়ে তাঁহাকে গৃহিণী বলিতে আমার সাহস হয় না । তবে এ বিষয়ের যত দায়িত্ব স্বয়ং কর্ত্তমহাশয়ের ষাড়ে চাপাইয়া আমি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি । কারণ, বাবু নিজের তাঁহাকে গৃহিণীৰ অপেক্ষাও অধিকতর সমাদর করিতেন । আকিসের কাজ সারিবা বতরুক সময় পাইতেন, তাহার প্রায় পনের আনা তিন পাই গোলাপসুন্দরীর শ্রীমন্দিবে অতিবাহিত হইত । আর গৃহিণী যদি বলিলাম, তবে পুরা-গৃহিণী আখ্যাটাও প্রদান করিতে হইতেছে । বাক্সালার অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র রামসদয়ের আধখানা গৃহিণী “রামমণির” যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া, সেই পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া, চিরসমৃদ্ধ মোবনা পূর্ণ সুন্দরীকে পূর্ণগৃহিণী হইতে বঞ্চিত করিতে আমার আদর্শে প্রবৃত্তি হইতেছে না । পুরা-গৃহিণী গোলাপসুন্দরীর গৃহে উৎসবের নিত্য-শ্রোত প্রবাহিত হইত । বিকুবল্লভ বাবু এখনকার ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য যুবক ছিলেন না । দেব বিদ্যে তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল । নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড, দোল-হুগোৎসব প্রভৃতি বারো মাসের তেরটা পার্বণের একটাও ফাঁক পড়িত না । বাস্তভিটার উৎসবগুলা তুলিয়া লইয়া তিনি তাঁহার সাধের প্রমোদকাননে তাহাদের নূতনতর প্রতিষ্ঠা করিতেছেন দেখিয়া, দৃষ্ট লোকে তাঁহার নিন্দা করিত । পুরোহিত প্রেমচাঁদ পাঠক মহাশয় জনান্তিকে কখনও কখনও বলিতেন, “বাবু যদি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি পবিত্র কৰ্ম্মগুলাও ঐ পবিত্র ভবনে সমাহিত করেন, তাহা হইলে আমারও পাওনাটা কিঞ্চিৎ অধিক হয়, আব বাবুও পুণ্যেব মাজাটা বাড়িয়া যায়,—অধিকন্তু দুই বাড়ীতে বৃথা আর হাঁটা-হাঁট করিতে হয় না ।”

এ কয়টা কথা আমি তোমাদের নিকট নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বলিলাম । বিকুবল্লভ বাবু অপরের চক্ষে বাহাই হউন, আমার কাছে তিনি দেবতা ; তাঁহার আশ্রয় না পাইলে, তোমাদের গল্পপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে এই অধম প্রস্তুতচরী বাচিয়া থাকিত কি না, সন্দেহ ।

শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী স্বয়ং এ সব বিষয়ে বড় একটা লক্ষ্য করি-

শক্তিশূন্য, সেই অপূর্ণ পদার্থে তাহারই অধিকার। বেহ, প্রেম, ভক্তি—সংসারের এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্য পৃথকভাবে একরূপ রূপিতে পারি। কিন্তু মেহের পরিণাম বে প্রেম, প্রেমের পরিণাম বে ভক্তি, তাহা ত বুঝিলাম না। তিনের সৌরভ সম্মিলিত হইয়া মানুষের দ্বারা যে বিচিত্র নন্দনকানন বসাইতে পারে, তাহা ত জানিতাম না। আজ আমি সেই হ্রস্ব ভ জানে জানী হইয়াছি। তাই আমার এই গল্প শুনাইবার এত আগ্রহ। নহিলে এই আমার জীবনের অসার কাহিনী লইয়া বুঝা তোমাদের কান্ধাতিপাত করিতাম না।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার শৈশব কাটিয়া গেল। কৈশোর আসিয়া সমুপস্থিত হইল। কৈশোরেরও কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে অতিবাহিত হইল। সেই দশ দিবসের ক্ষুদ্রমারী এখন ত্রয়োদশবর্ষীয়া দিব্যাদনা; বিকাশোন্মুখ রক্তোৎপলের স্তায় বালারূপশ্মির অপেক্ষা করিতেছে। আমার কাছে সে কখনও সরম বা সঙ্কোচের অভিনয় করে নাই; সেই ক্ষুদ্র ছদ্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল কথাই খুলিয়া বলিত। কিন্তু আজ কাল তাহার সে ভাবের কতকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই ত্রয়োদশ বৎসরের আত্মীয়-স্বজনকে পরিভাগ করিয়া, তাহাকে যে নীত্বই পরগৃহে ফাইয়া আপনার হইতে হইবে, সেই চিন্তা যেন ইতিমধ্যেই তাহার সকল কার্য্যে কতকটা ছায়া বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। পুস্তকপাঠে তাহার আর তেমন মন নাই। আগে কলেজ হইতে আমি কতক্ষেণে প্রত্যাগমন করি, তাহারই আশায় উদ্গীব হইয়া বসিয়া থাকিত; এমন অনেক সন্ধানের পর ধরিয়া আনিয়া বসাইতে হত। মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহে না। কান দিয়া আমার সকল কথা বুঝি শুনেও না। ধমক দিলে বিশাল চক্ষু দুইটি মুখের পানে একবার ফিরাইয়া, দ্বিধা হাসিয়া, বই ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলায়। পলাইয়া কোথায় লুকায়, আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে আমি গুল্পোস্তানের ভিতর বেড়াইতেছিলাম; উদ্ভান-পথের উত্তর পার্শ্বে নানাবিধ কুসুমরাশি সন্ধ্যাসমীরদর্শণে ধীরে ধীরে ছুটিয়া উঠিতেছিল। তাহারই মধ্য দিয়া সেই বিবিধ সৌরভের সম্মিলন উপভোগ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। দেখিলাম, অদূরে এক নববিকশিত মাধবীর মূলে, লোহময় আসনের উপর সন্ধ্যা অন্তমনে বসিয়া রহিয়াছে। গোধূলির শান্ত স্ববর্ণালোক তাহার বেশে, চক্ষে, কপোলে; বাহতে, সর্বজ্ঞে নাচিতেছে। বাগিকা শূন্যনিবদ্ধদৃষ্টি আপন মনে কি ভাবিতেছে, তাই সেই জানে। অল্প দিন হইলে আমি তাহার নিকটে গিয়া বসিতাম। বসিয়া স্তম্ভ

ভবে তাহার সহস্র সরল প্রশ্নের উত্তর দিতাম । কিন্তু, আজ তাহাকে সেই-
থানে; সেই ভাবে, সেই শত শত প্রশ্নুটিত পুষ্পগন্ধসমাকুল লতামণ্ডপে, মাধবী-
শাখাসংলগ্নিত আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, আমার চরণ আর চলিল না । আমি
দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম । কি দেখিলাম ? আমার জন্মজন্মান্তরের অক্ষুট
স্মৃতির-ছায়, আমার ভবিষ্যতের চিরোদ্ভল আশার ছায় ঘাঘা দেখিলাম, তাহা
ত বর্ণনা করিতে পারিতেছি না । সেই অতীতের স্মৃতিরূপিনী, সেই ভবিষ্যতের
আশারূপিনীকে আজিও যদি একবার সেই ভাবে, সেই লতামণ্ডপে, দেখিতে
পাইবার আশা থাকিত, তোমরা এই রূপট ব্রহ্মচারী করুণানন্দ স্বামীকে এত-
ক্ষণ আর খুঁজিয়া পাইতে না । হায় ! জ্যোতিষ বংশরের তপস্বী-সঙ্কিত সেই
অপরিস্রব স্নেহরশ্মি, গৌলিরাগরঞ্জিত আকাশের ছায় মুহূর্তমধ্যে সেই কিসের
রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, তাহা কে বুঝিবে ? অথবা,—

“লমতি তুবনে কন্দর্পাজ্ঞা বিকারি চ যৌবনম্ ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর একান্ত বাসনা, খুব বড় ঘরে তাঁহার এক
মাত্র কস্তার বিবাহ দেন । এ বিষয়ে তিনিই সর্বসর্ব্বা । বিফুবল্লভ বাবুর
সহিত কেবল টাকার সম্পর্ক । চারি দিকে ঘটক ঘুরিতেছিল ; সুস্বল্পও অনেক
আসিয়াছিল । এ পর্য্যন্ত একটাও কিন্তু ঠাকুরাণীর পছন্দমত জুটিয়া উঠে
নাই । দেখিতে দেখিতে কস্তার বয়সও কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়া উঠিল ।

আমার সহপাঠী সুরেন্দ্রকুমার মিত্র এবার আমারই সহিত বি. এল.
পরীক্ষার পাশ হইয়াছেন । তাঁহার কলিকাতার আদি বড়লোক না হউন,
অবস্থাটা নিতান্ত আমার মত নহে । সুরেন্দ্রকুমার সম্প্রতি তাহার জ্যেষ্ঠের
সহিত বড়দাদার একটা জাঁকাল রকম বাটা ভাড়া করিয়া বাস করিতে
ছেন । বড়দাদার বরাবর আকাজ্ঞা ছিল, সুরেনের বিবাহে একটা বড় গোছের
দাঁও মারিবেন । সে জন্ত চাল চলনটাও একটু বড় গোছের করিয়া লইয়াছেন ।
শুনিলাম, আজ প্রভাতে বড় দাদাকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ং বজ্রবর সুরেন্দ্রকুমার
মন্ড্যাকে দেখিতে আসিতেছেন ।

বাটাতে অল্প অভিভাবক কেহ ছিল না । বিফুবল্লভ বাবুর ডবল আফিস,
অবকাশ অতি কম । সুররাং আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকেই সেই কস্তা-
পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত থাকিতে হইল । বজ্রবর আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ
বিস্মিত হইলেন,—“করুণা ! তুমি—তুমি এখানে ?”

আমি বলিলাম, “আমি এই বাড়ীতেই থাকি।”

সুরেন্দ্রকুমারের সহিত আমার বিশেষ বনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহাদের বাসায় আমি সর্বদাই বাইতাম। তাঁহাদের বরকনার ধবরও সব জানিতাম। আমি কি ভাবে কলিকাতায় রহিয়াছি, সুরেন্দ্রকুমারও তাহা জানিতেন। জানিয়াও যে আমার প্রতি তাঁহার প্রণয় ও যত্নের কোনও ক্রটি করেন নাই, এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তবে, তিনি যে আমার সামান্য আবাসে আসিয়া আমার দর্শন দিবে, ইহা আশার অজীত। আমার ছাত্র পরামিত্তোজ্জীর বাটাতে আসিয়া বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে হইলে, তাঁহাকে যে একটু হীনতা স্বীকার করিতে হয়, এ কথা স্বীকার না করিলে চলিবে কেন? স্মরণ্য বর্তমান বিষয়ে আমার কোনও প্রকার আরদার বা অভিমান আদৌ ছিল না। আমি নিজের টানেই তাঁহার নিকট বাইতাম; তাঁহার অভ্যর্থনার বড় অপেক্ষা করিতাম না।

বন্ধুবর ও তাঁহার সহকারীদিগকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলাম। কিন্তু কল্লার আসিতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল,—বর্তমান বিষয়ে সচরাচর বতটা বিলম্ব হয়, তাহারও অতিরিক্ত বিলম্ব হইতে লাগিল। বরপক্ষীর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন আমি স্বয়ং তাগাদা করিবার নিমিত্ত অন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বিচিত্র-উজ্জল-বস্ত্রপরিহিতা অশেষরত্নালঙ্কার-বিভূষিতা আমার ত্রয়োদশ বর্ষের সদিনী সেই অপূর্ব বালিকা, চারি দিকের পরিজনপরিবেষ্টিতা হইয়া আনন্তবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হুই এক জন তাহাকে ধরিয়া সাধিতেছে। “লক্ষ্মী, মা আমার! কেমন বড়মাহুষ, রাজা বর এসেছে; একবার দেখা দিবে চল।” বালিকা সে সব কিছুই অনিল না। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি ইতিপূর্বে আরও ছুই একটা এইরূপ অভিনয় দেখিয়াছিলাম। স্মরণ্য তাদৃশ বিস্মিত হইলাম না।

তোমরা কেহ কি বলিতে পার, এই হতভাগিনী কামিনী কুলের গতি কি হইবে? বিবাতা ইহাদের রোদন ভিন্ন আর কি কোনও উপায় করিয়া দেন নাই? ইহারা স্মরণ্য কাদে, হৃৎখেণ্ড কাদে;—মানেও কাদে, অভিমানও কাদে! আজ বাহাকে দেখা দিতে হইবে বলিয়া কাঁদিতেছে, কালই আবার তাহাকে দেখিবার জন্য কাঁদিবে! এমন অদ্ভুত পদার্থ লইয়াও মানুষে সংসার করে!

আমি অগ্রসর হইয়া ডাকিলাম—“সন্ধ্যা!” সন্ধ্যার মুখে কথা নাই,—

কেবল কাঁদে। তখন কি করি, পূর্বপরিচিতা পরিচায়িকা গরবিনীৰ সাহায্যে নিজেই তাহার হাত ধরিয়া বহির্বাটীতে বন্ধুবর সুরেন্দ্রকুমারের সম্মুখে আনিয়া বসাইলাম। দেখিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে বালিকার মুক্তি পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহার নয়নে অশ্রুর চিহ্নমাত্র নাই। মুখমণ্ডল স্থির, গম্ভীর; অধরযুগলে যেন অপূর্ণ সহিষ্ণুতা পরিব্যক্ত হইতেছে। সেইরূপ স্থির-গম্ভীর ভাবে সে নিজের নামটি হইতে আরম্ভ করিয়া পরীক্ষকদিগের সকল প্রশ্নেবই চমৎকার উত্তর প্রদান করিল। আমার বন্ধুবরের প্রতি দুই একটা বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ কবিতোও ভুলিল না। অবশেষে 'অনুমতি পাইয়া' ধীরে ধীরে, শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুবানীর উপযুক্ত কণ্ঠ্যর মত, ধীরে অথচ অচলমহিমান্বরে, নিজেই উঠিয়া চলিয়া গেল। কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করিল না।

বন্ধুবর সদলে বিদায় লইলেন। সকলেই ভাবিলেন, এতদিনে তবে সন্ধ্যার যোগ্য বর মিলিল। কিন্তু আমি ভাবিলাম, একটা শেষ উপায় না দেখিয়া ছাড়িয়া দিলে, আত্মবিজয়টা নিতান্ত মূল্যহীন সহজ হইয়া পড়িবে। যদি মরি-তেই হয়, একটা ছোট রকমের কীর্তি না রাখিয়া মরিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বড় ঘটনা করিয়া বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কর্ত্তীঠাকুরাণীর জীবনের বত সাধ, তাহার সকলগুলি এই একমাত্র সন্তান সন্ধ্যার বিবাহোৎসবে মিটাইয়া লইবেন। স্তত্রাং আড়ম্বরের আর সীমা রহিল না। বরকন্যা উভয়ের ঠিকুজী মিলাইয়া কানুন মাসের পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা দিন স্থির হইল। সে দিনেরও বেশী বিলম্ব নাই। সংসারে প্রবেশ কবিতো না করিতেই মাথাব উপর মৃত্যুরূপী একখানা মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মেঘের ভিতর যে বিষম বজ্র নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে কি এই জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা অক্ষুরেই দগ্ধ হইয়া যাইবে? চিরদারিদ্র্যপীড়িত হতভাগ্যের অভিনব এই দুঃখেব কথা কে বুঝিবে? শুনিবেই বা কে? দুঃখ যে বলিবার নহে। পরান্নভোজীর প্রাণেব চিহ্ন এই দুর্ব্বার প্রেম-পিপাসা যে বলিবার নহে।

একটা আশা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সন্ধ্যার হৃদয়ভাব জানিতে পারিলে ইহার কি কোনও প্রতিকার হইবে না? কিন্তু সে বালিকা, তাহার আবার মতামত কি? সে চিরাত্মজ্ঞানবিহারী স্নেহমল্য মালতী-লতা; যে গাছ ধরাইয়া দিবে, তাহাবই সোহাগে শাখা প্রশাখা গেলিয়া দিয়া সুজরিত হইয়া উঠিবে;

সৌরভে তাহারই গৃহভাঙাব আমোদিত কবিবে । ছুঃখের কাহিনী বলিয়া কেবল বালিকা-ছন্দরের বেদনা বাড়াইয়া কি ফল ? ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী মেহের যে মধুব স্মৃতি তাহার জীবন হয় ত চিরদিন আলোকিত কবিত্তে থাকিবে, তাহার সহিত এই বিকাবজনিত ঘোর তৃষ্ণারূপকার কোন্ প্রাণে গিশাইয়া যিবে ? আমার ছুঃখ আমারই থাক । কোন্ অধিকাবে পরকে তাহার অংশভাগী করিতে চাই ?

মন কিছুতেই বৃথিল না । বালিকার নিকট না হউক, স্বয়ং কর্ত্তীঠাকুরাণীব নিকট প্রস্তাবটা একবার করিলে হয় না ? ছুঃখা অতি পারুণ, তা জানি ; তবু একবার চেষ্টা করিতে আপত্তি কি ? কিন্তু বলিবে কে ? কে সাহস করিয়া শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর মাথার মণিময়া মুকুট স্পর্শ করিবে ?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কথাটা মায়ের কাছে প্রকাশ করিয়া কেলিলাম ! মা প্রথমতঃ বেন আকাশ হইতে পড়িলেন । কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহাকে বিলক্ষণ আশাবিত্ত হইতে দেখিলাম । তিনি বলিতে লাগিলেন,—“তা কেবল ধনই কি বড় ? আমার ছেলের মত ছেলে ত পেলে হয় । রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এমন আর কোথায় মিলিবে ? কেবল ধনই কি বড় ? আমারও এক সময়ে সব ছিল । হার ! কত যুগান্তর হইয়া গেল, জীবনের বাধনগুলি পর্য্যন্ত ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল, এখনও সেই পোড়া স্বতি ঘুচে না কেন ?”—মা কাঁদিতে লাগিলেন । আমি বড়ই ন্যাযিত হইলাম । আমার কাছে মাকে এই প্রথম কাঁদিতে দেখিলাম । সেখানে আর মাড়াইতে পারিলাম না ।

তোমাদের যদি দয়া হয়, তবে সেই পূর্বস্মৃতিসমুদ্রা জননীর ছুঃখের সহিত একটু সহানুভূতি দেখাইতে পার ; কিন্তু তিনি পুত্রমেহের আধিক্য-বশতঃ যে কয়টা কথা বলিয়াছিলেন, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ করিও না ।

কি কারণে কি হইল, ঠিক বলা যায় না । ইহার দুই এক দিন পরেই বাড়ীতে একটা বড় গোলযোগ বাধিয়া গেল । সম্ভ্রা স্বয়ং বর্ত্তমান বিবাহে তাহার একান্ত অসম্মতি জানাইয়াছেন । গরবিনী সেই কথা লইয়া পাড়া তুলে তোলপাড় করিতেছে । বালিকা কারণ কিছুই বলে না ; কেবল বলে, বড় মামুষের ঘরে সে বিবাহ কবিবে না । গরবিনী অমূল্য অলঙ্কারবাণির উল্লেখ করিতে সে না কি অলঙ্কারে, আঙুন ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছে । বাঙ্গালীর ঘরের অশিক্ষিতা বালিকার একরূপ স্বাভাব্য দেখিয়া আমিও বিমিত্ত হইলাম ।

পালন করিয়া, নববধূরূপিনী সজীব দেবীপ্রতিমা আনিয়া তাঁহার শ্রীচরণে সম-
র্পণ করিতে পারি নাই। বিবাহবিষয়ে আমার ওদাসীজ্ঞ দেখিয়া মা.সরুদাই বিষম
খািকিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার আহার-নিদ্রা একরূপ বদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি
পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শয্যা গ্রহণ করিলেন। আমি আর সহ
করিতে পারিলাম না। তোমরা আমাকে কপট প্রেমিক, ইন্দ্রিয়স্থখাভিলাষী,
ভণ্ড প্রভৃতি আর যাহা যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বলিও, কিন্তু মাতৃভক্তিহীন
বলিও না। আমি বুক বাধিয়া বিবাহের উত্তোগ করিতে লাগিলাম। মায়ের
মুখ আবার প্রফুল্ল দেখিলাম। তিনি পাকী করিয়া নিজে গিয়া কচা দেখিয়া
আসিলেন। সব স্থির হইয়া গেল। কিন্তু অভাগিনীর কপালে বিধাতা সুখ
লিখেন নাই। তাঁহার কত সাধের “দাসী” ঘরে আসিতে না আসিতেই তিনি
চলিয়া গেলেন। স্মরণঃ “দাসী” আর আনা হইল না। আমি একাই রহিলাম।

একা রহিলাম বটে, কিন্তু একা থাকার সেই হুঃখটা আজিও ভুলিতে
পারিলাম না। প্রত্যহ প্রত্যাতে উঠিয়া দেখিতাম, আমার সাধের শোভনো-
দ্যানে দলে দলে তরুণাজি, মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, দলে দলে কুসুমরাশি
ফুটিয়া তাহাদের রূকে সৌন্দর্যের বাজার বদাইয়া দিতেছে;—কিন্তু আমি
একা! সন্ধ্যাবেলা লতামণ্ডপতলে বসিয়া, আকাশের পানে চাহিয়া দেখিতাম,
দলে দলে, সহস্রে সহস্রে অসংখ্য তারকারাশি মাথার উপর জাগিয়া উঠিতেছে,
—দলে-দলে সারি-সারি অসংখ্য শুভ্র মেঘখণ্ড তাহাদের গারে গারে খেলা
করিয়া বেড়াইতেছে;—কিন্তু আমি একা! ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, নংসারে
কত লোক দলে দলে প্রমোদের তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতেছে,—আমি
তাহাদের কেহ নহি—আমার কেহ নাই—আমি একা! সকালে বিকালে কত
অর্থী প্রত্যার্থী আসিয়া, কত কাজ হাতে করিয়া আমাব চারি ধারে ঘেরিয়া
বসিত;—কিন্তু আমার কোন কাজ নাই,—আমি নিত্যন্ত একা!—যাক!
আজ ত আমার আর সে হুঃখ নাই। আজ আমি যে সঙ্গ লাভ করিয়াছি, এই
অসংখ্যজীবরাশিগরিমণ্ডিত জগতের অনন্ত ঐশ্বর্যও তাহার সহিত তুলনীয় নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তিন বৎসর বিফুবল্লভ বাবুর বড় কোনও খবর রাখি নাই। দৈবাৎ পথে
কোথাও দেখা হইলে একবার হাত তুলিয়া, মাথা হুঁইয়া প্রশ্ন করিতাম,
কিন্তু এই সময়ে একদিন হঠাৎ খবরের কাগজে একটা বড় মন্দ

পাঠ কবিলাম। বিক্ষুব্ধ বাবু বিষয় বিপদগ্রস্ত। তাঁহার বিপদের কথা
আমার মাতৃশোক পর্যন্ত চাপা পড়িয়া গেল।

বিক্ষুব্ধ বাবু একটা বড় গোছেয় আকিসে কেশিয়ার ছিলেন। তিনি
একবারে পঞ্চাশ হাজার টাকা তহবিল ভান্ডার অপরাধে অভিযুক্ত হইরাছেন।
সংবাদটা পাঠ করিয়া প্রথমতঃ আমার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু বিন্দুবল্লভ
বাবু নামের সহিত আকিসের নামটাও ঠিক মিলিতেছে দেখিয়া সেই মুহূর্ত্তেই
এ বিষয়ের সন্ধান লইতে বাহিব হইলাম। জানিলাম, সংবাদ প্রকৃত। আমার
ভূতপূর্ব্ব প্রতিপালক ও আশ্রয়দাতা বাস্তবিকই কৌজদারীতে অভিযুক্ত। সম্প্রতি
জানিনে খালাস আছেন।

ভাবিলাম, ধর্ম-পরিশোধের এই সময়। কর্ত্তামহাশয়ের উদ্ধারের জন্য প্রাণ-
পণ বন্ধ করিতে হইবে। বৃত্তান্তটা কি, ঠিক অবগত হইবার নিমিত্ত, তাঁহার
সহিত একবার সাক্ষাতের প্রয়োজন। প্রতিজ্ঞাতঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলেও
আমার শৈশবের সেই লীলা-নিকেতনে আর-কিবার মুখ দেখাইতে প্রস্তুত
হইলাম। কিন্তু ভোগাদের কাছে বলিতে লজ্জা হইতেছে, এ বিপদের সময়েও
আমি শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরানীকে বড়দায়ী দেখাইবার একটু প্রলো-
ভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। সাক্ষসাক্ষার দিকে কিঞ্চিৎ নজর রাখিয়া,
নূতন যে ফিটন খান। প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, তাহাই হাঁকাইয়া বিক্ষুব্ধ
বাবু দ্বাবদেশে উপনীত হইলাম।

ঘরে প্রবেশ করিতে পা যেন চলে না। প্রাণের ভিতর কি-যেন-কি ছপ্
ছপ্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। আমি যে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল মিষ্টার
করুণাপ্রসাদ বোষ, তাহা ভুলিয়া গিয়া, আবার যেন সেই শ্রীমতী রাজরাজে-
শ্বরী ঠাকুরানীর অন্নদাস, কালোজের নিতান্ত গোবেচারী নিরীহ ছাত্রের পরিণত
হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে গরবিনী আমার অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছিল।

সে আমাকে দেখিয়াই একটা হাসির বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। গর-
বিনী কি আমার পোষাকে ও চেহারায় কোনও অসামঞ্জস্য দেখিল? অথবা,
আমার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া, আমি যে সেখানে মাটি ছাড়াইয়া এক-
কিছু কাঁদা হইয়া গিয়াছি, অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই একটা বিষম গোলমাল
পড়িয়া গিয়াছে,—আপনাকে কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না,—তাহাই

হইয়াছিল? তখনকার সেই ঘটনাগুলি আমি আদৌ স্মরণ করিতে
পারি না। কখন কি হইল, তাহাও বলিতে পারি না।

লাম; আমি শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর শয়ন-গৃহে উপনীত হইয়াছি। আমার সন্মুখে শয্যার উপর কর্তা ও গৃহিণী দুইজন বিবস্ত্রমণে বসিয়া রহিয়াছেন।

আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিবারি বিম্ববল্লভ বাবু যথোচিত সম্ভাষণ কবিয়া শয্যাপার্শ্বস্থিত একখানা চেয়ারে বসাইলেন। নিজেও আর এক খানায় বসিলেন। শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী শয্যাস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলেন। তোমরা শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, তিনি আমাকে দেখিবার একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিলেন।

বিম্ববল্লভ বাবুর সহিত যে সব কথাবার্তা হইল, তাহাতে বুঝিলাম, অভিযোগটা বড় অমূলক নহে। কতক টাকার জন্ত তিনি নিজেই দায়ী। বাকী-টা বোধ হয় তাঁহার সহকারী হরসুন্দর সমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছেন। হরসুন্দর এক্ষণে ফেরাব। প্রায় দুই মাস তাহার কোনও খবর নাই। গোলাপসুন্দরী তাঁহাকে আপনার কোনও দ্ব্যসম্পর্কীয় ভাই বলিয়া পরিচিত করিতেন। পুরা গৃহিণীটির প্রেমানুরোধে বিম্ববল্লভ বাবু তাঁহাকে নিজেরই অধীনে একটা কর্ম দিয়াছিলেন। তাঁহার স্থায়ী আড্ডাটা গোলাপসুন্দরীর বাড়ীতে ছিল বটে; কিন্তু, সকাল বেলা কেবল আহ্বারের সময় ভিন্ন আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া বাইত না। রাত্রিকালে ত কখনই না। হরসুন্দর সব দিন আফিসেও যাইতেন না। ইচ্ছা হইলে কোনও দিন ১টাব সময়, কোনও দিন বা অপরাহ্ন চাষিটাব সময়, টলিতে টলিতে একবার গিয়া হাজিরা দিতেন। ক্যাশিয়ার বাবুর নিজের চাকর বলিয়া সাহেবরা তাঁহাকে কিছু বলিতেন না।

বিম্ববল্লভ বাবু তিন শত টাকা মাত্র বেতনের উপর নির্ভর করিয়া, গোলাপসুন্দরীর মন্দিরের সেই নিত্য-বসন্তোৎসব কিরূপে চালাইতেন, এরূপ একটা সন্দেহ মাঝে মাঝে আমারও মনে উপস্থিত হইত। আমি তখন কথাটার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করিতাম না। এখন কথাটার গোড়া পাইয়া, মানুষের দুর্বলতা ভাবিয়া, অন্তরে বিলক্ষণ ক্লেশানুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু, যেরূপেই হউক, উপকারীতে বাঁচাইতে হইবে, এই মনে করিয়া আমি আর সেখানে বেবী ক্ষণ অপেক্ষা করিলাম না। কর্তা মহাশয়কে দুই চাষিটা আশ্বাসের কথা বলিয়া মকদ্দমার তদ্বির কবিবার জন্ত বিদায় লইলাম।

সে ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে গরবিনী পার্শ্বে একটা কুঠাবী দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"এইখানে একবার পায়ের ধুলা দিবেনা দিদিমনি কিছু জলখাবারের যোগাড় করিয়াছেন।"

আমার প্রাণের ভিতর যেন বিছাৎ চমকিয়া উঠিল । কি উত্তর করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। সেই সন্ধ্যা ! ত্রয়োদশ বৎসরের উদ্বোধনের পর আজ তিন বৎসর ধরিয়া বাহার স্বতির পূজা করিয়াছি, অবশেষে যে প্রতিমা বিসর্জনের উপক্রম হইয়া আসিতেছিল, আমার জন্মান্তরের বাসনারূপিনী সেই সন্ধ্যা ! আমি আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অসম্বন্ধ কি একটা উত্তর দিতে বাইতেছিলাম, এমন সময়ে স্বয়ং শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী আমার সহায় হইলেন । তিনি বলিলেন,—

“পূর্ব্ব অপরাধ কি এখনও ক্ষমা করিবে না ? কিছু থাকে । ছোট বোন্টির মনে অকারণ কষ্ট দিবে কেন ?”

তখন আর বাক্যব্যয় না করিয়া যন্ত্রচালিতবৎ সেই গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলাম । প্রবেশ করিবামাত্র লজ্জাতরপরিশৃঙ্খা, হাঁশুময়ী, বোড়শবর্ষীয়া এক অপূর্ব্ব স্নানরী, আমার সম্মুখে পতিত হইয়া, চাবীর গোছা বাঁধা অঞ্চলখানি গলায় বেড়িয়া দিয়া, চিপ কবিতা এক প্রণাম করিয়া । আমি কথা কহিব কি ছাই !—কি বলিয়া সন্মোদন করিব, তাহাই খুঁজিয়া পাইলাম না । সেই সন্ধ্যা ! তিন বৎসরের কি বিচিত্র পরিবর্তন ! তিন বৎসর পূর্ব্ব যাহাকে নাম ধরিয়া, নামের কতরূপ বিকৃতি করিয়া ডাকিয়াছি, আজ তাহার সন্মোদনের উপযোগী একটা কথাও খুঁজিয়া পাইলাম না । আমার অবস্থা দেখিয়া, বোধ হয়, সন্ধ্যাব একটু দয়া হইল । সে বলিল,—

“দাদা ! দাঁড়াইয়া কেন রহিলেন ? বসুন না ।” এই বলিয়া বিবিধ ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি-পরিপূরিত একখানা বৃহৎ রেকাবের পশ্চাতে একখান দ্রুতহং আসন দেখাইয়া দিল । আমি জুতা খুঁজিয়া বসিলাম । যোগ্যতঃ তখনও নীরব দেখিয়া বালিকা বলিতে লাগিল,—

“আমি আজ তিন মাস এখানে আসিয়াছি । আপনাকে একবার খবর দিবার জন্য কতলোককে যে সাধিয়াছি । কেউ আমার কথা শুনে নাই । আজ বাবার এ বিপদ না হইলে আপনি বোধ হয়, আর এই সন্ধ্যা পোড়ারমুখীর মুখ দেখিতেন না ।”

আর চুপ করিয়া থাক! অসম্ভব হইয়া পড়িল । আমি বলিলাম,—“কীটা মারিয়া বাহাদিগকে বিদায় করিয়াছ, তাহাদের প্রতি যে আবার অকস্মাৎ দয়া হইবে, ইহা আমি জানিতাম না ।” কথাটা বলিয়াই আমায় বড় লজ্জা করিতে লাগিল । বালিকা বড়ই ব্যথিত হইল । তাহার চোখের কোণে ছ ফোঁটা জল

গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে বাষ্পরুদ্ধ, ভাঙা ভাঙা কথার বলিল,—

“আমরা তোমার কাছে নিতান্ত অপরাধী। সে জন্ত আমার মায়ের হইয়া তোমার চরণে সহস্র মার্জনা তিফা করিতেছি।”—তার পর ঈষৎ রুদ্ধ-
 ছিলে, সেই স্ত্রীতিপরিপূর্ণ অধরে ঈষৎ মধুব হাসি হাসিয়া,—“আর স্ত্রীজাতির
 অপরাধ পুরুষে যে এত দিন মনে করিয়া রাখে, আমিও তাহা জানিতাম না।”

আমি ভাবিলাম, হায়! এই সেই নিতান্ত সঙ্কচিতস্বভাবা, আমার আজ্ঞা-
 পালনমাত্র-পরায়ণা, একান্ত পরাবলম্বিনী বালিকা সন্ধ্যা। তাহার ব্যঙ্গের
 কোনও উত্তর না দিয়া বলিলাম,—“এ বাড়ীর সহিত আর আমার সম্পর্ক
 কি? তোমার ছেলে মেয়ে হউক, তখন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া তাহাদের
 লইয়া আমোদ করিয়া আসিব।”

বালিকা লজ্জাটা চাপা দিয়া বলিল,—“হাতের কাছে ওই জিনিষ গুলি
 কি তোমাকে দেখিতে দিয়াছি?” আমিও তখন আর দ্বিধা নী করিয়া
 তাহাদের কিছু কিছু গদ্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সে কাণ্ডটা শেষ করিয়া, জলের গ্লাসটি রাখিয়া, পকেটের রুমাল খানি
 লইয়া হাত মুখ মুছিতেছি, এমন সময়ে বালিকা পানের ডিবাটি একটু সর-
 ইয়া দিয়া, মাথাটি একটু নামাইয়া, কতকটা জড়সড় হইয়া বলিতে লাগিল,—

“তা আপনি এখনও বিবাহ করেন নাই কেন? মা ত বৌ বৌ করিয়া
 চলিয়া গেলেন। আমরাও কি দেখিতে পাইব না? আমি আপনার এক
 সখ্য করিয়াছি। আমার এক ঠাকুরবী এখনও অবিবাহিতা রহিয়াছেন।
 যদি অনুমতি করেন, আপনার নিতান্ত অল্পপয়োগী হইবে না। এই কথা
 বলিবার জন্তই আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিলাম।” কথা করটা বালিকা, বোধ
 হয়, মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। বলিয়া, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পাঁচ হাত
 পিছাইয়া দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম,—

“আমার ষটকের অভাব নাই। বিবাহের দিনে তোমাদিগকে, বিশেষতঃ
 সন্ধ্যা ও তাহার স্বামীকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুলিব না। ভরসা করি, তুমিও
 আমাকে, সুখের সময় না হউক, অন্ততঃ দুঃখের সময়েও এক এক বার স্মরণ
 করিবে।” এই বলিয়া আমি আর বিদায়ের অপেক্ষা করিলাম না। আশ্চ-
 গোপন একবারে সাধ্যাতীত হইয়া পড়িতেছিল। ব্যস্ততার ভাণে উর্দ্ধ্বাসে ছুটিয়া
 গাড়ীর উপর আসিয়া বসিলাম। গাড়ীখানাও যেন আমার বিপদ বুঝিয়া
 গবনবেগে ছুটিল।

আমি একটা কাঁচনীর পালায় আশঙ্কা করিয়াছিলাম। দেখিলাম, আশঙ্কা-টা আমার পক্ষে নিভাস্ত অমূল্যক নহে। কিন্তু সেই বালিকার সৈধ্য, সেই মুখরার গাভীরা, সেই রক্তপ্রিয়ার পরত্যাগসন্ধান দেখিয়া মনে করিলাম,— “সংসারের ইহারাই রক্ত। পুঙ্খ ইহাদিগকে স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সাহেবদের সহিত বর্তমান মকদ্দমার একটা নীমাংসা করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম,— “আপনাদের পুরাতন চাকর, আমার এই মক্কেলগণ প্রতি এক টুকু অল্পগ্রহ করিতে পাবেন না কি? আমি এই মকদ্দমার কোনওরূপ Settlement করিতে চাই।”

সাহেব। Settlement,—বাবু? নেটিবের সহিত কোনও Settlement করা আমার অভ্যাস নহে।

আমি। আপনাদের টাকাটার কিনারা হয়, আর আমার মক্কেলগণ জেল হইতে নিষ্কৃতি পান।

সাহেব। বলিয়া যাও।

আমি। আমার মক্কেল সমগ্র টাকাটার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতে ছেন।

সাহেব। তা'র পর?

আমি। সম্ভ্রতি ১৫ হাজার টাকা আপনারা পাইবেন। বাকী টাকার লেখা পড়া করিয়া লউন। মাসে মাসে In part আদায় করিয়া উদ্ধৃত দিবেন। এজন্য আমি জামিন হইতে প্রস্তুত আছি।

সাহেব। সেটা আমার প্রশ্ন নহে।

আমি। তবে কি?

সাহেব। তোমার মক্কেলকে জেলে দিব না। তাহার নিমিত্ত কি দিবে?

আমি। উহা ত আপনাদের অল্পগ্রহ! তার জন্য আবার দিব কি?

সাহেব। বাবু। তোমরা আমাদিগকে ব্যবসাদারের জাতি বল। আমরা ব্যবসা করিতেই আসিয়াছি। দান করিবার নিমিত্ত তোমাদের যত্নে আসি নাই।

আমি। ভাল, আপনার অতিপ্রার্থটা কি শুনি।

সাহেব। তোমার মক্কেল আমাদের কোম্পানীর অনেক টাকা চুরি
করিয়াছে। আমরা এখন টেব গাইতেছি। তাহা হইতে আর পঞ্চাশ হাজার
দিতে হইবে। ইহাতে মেথাপড়ার কথা নাই। একবারে সব টাকা দিতে
হইবে।

রাগে সর্কাজ জলিয়া উঠিল। আমি দেখিয়াছিলাম, আবার নিজের
হাবর অস্থাবর সব জড় করিয়া তার উপর বিক্ষুব্ধতা বাবুর বাড়ীখানি বন্ধক
দিয়াও আরও অতিরিক্ত পনের হাজার টাকার বেশী কিছুতেই সংগৃহীত হইতে
পারে না। তাই সাহেবের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এখন
দেখিলাম, তাহার কোনও আশা নাই। সুতরাং আর দ্বিধা নাই করিয়া,
সাহেবকে একটা লম্বা সেলাম দিয়া বিদায় লইলাম। ভাবিলাম, এত দিন
আইন পড়িলাম কি যুব দিবাব জন্ত ? এই সামান্য মকদ্দমাটা ফাঁশ কবিয়া বড়
সাহেবেব মুণ্ডপাত করিতে পারিব না ?

বড় বড় উকীল, ব্যাণ্ডিটার, এটর্নী নিযুক্ত করিলাম। বাছা বাছা চৌকশ
সুফীর বোগাড় করিলাম। আর আর কত কাণ্ড করিলাম, তাহা তোমাদের
শুনিয়া কাজ নাই। নিজ মুখে স্বীকার করিয়া অবশেষে নিজেই জেলে
যাইব কি ? জেলখানাটা আর যাহাই হউক, ব্রহ্মচর্যের স্থান নহে। এক
কথা, আত্মবক্ষার্থ আইনের যে ব্যুহটি রচনা করিলাম, তাহা স্বয়ং অভি-
মন্ত্যরও অনধিগম্য।

ব্যুহরচনা করিলাম বটে, কিন্তু বিক্ষুব্ধতা বাবুকে বাঁচাইতে পারিলাম
না। আমার আশ্রয়দাতা সেই পরমোপকারীকে, জেলের ওয়ার্ডারগণ গোলাপ-
সুন্দরীর বক্ষ হইতে দুই বৎসরের জন্ত কাড়িয়া লইয়া গেল। তার পর
সাহেবেরা তাঁহার বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া লইল। শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী
ঠাকুরাণী কাদিতে কাদিতে বন্ধুবর অরেন্দ্রকুমারের আশ্রয় লইলেন। গোলাপ-
সুন্দরীর আর কোনও খবর রাধি নাই। তবে শুনিয়াছি, মকদ্দমা মামলা
সব মিটিরা যাইবার পর, হরসুন্দর কোথা হইতে অকস্মাৎ দেখা দিয়া তাহার
দুহে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। লোকে বলে, তাহার চরিত্র এখন শুধরাইয়াছে।
কারণ, সে গোলাপের গৃহ ছাড়িয়া আর লোথাও যায় না। সেই প্রৌঢ়া
সুন্দরীর অদৃষ্টের মত চরিত্র দৃষ্ট। তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে।

ইহার পর আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। আইনের কোণে বিক্ষু-
ব্ধতা বাবুর মকদ্দমার সময় যে বড় ব্যুহটি রচনা করিয়াছিলাম, তাহা বিক্ষল

হইলেও, প্রতিদিবসের ছোট ছোট কাজে ছোট ছোট যে গুলান সৃষ্টি করিতাম, তাহাদেব কি আগম কি নির্গমেব পথ এ পর্য্যন্ত কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। অর্থের ভাণ্ডার দিন দিন পূর্ণ হইতে লাগিল। কত বড়গাহুণী করিতাম, বন্ধুবন্ধবদের লইয়া কত নূতন নূতন উৎসবে উদ্ভাবন, আয়োজন, সম্পাদন পর্য্যন্ত উপভোগ করিতাম। সে ভাণ্ডার আর কমে না। অবশেষে ধনাগারটা টাকার কাঁপে ফাটিয়া গিয়া পাছে আমার শুদ্ধ সম্ভ্রম উড়াইয়া, শুঁড়াইয়া দেয়, একরূপ আশঙ্কাও হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, অর্থই কি অর্থের উদ্দেশ্য? ইহার দ্বারা ভগতের কি কোনও কাজ করা যায় না? ভাবনাটা মনের ভিতর দিন দিন পাকিয়া উঠিতে লাগিল। জীবনটা নিতান্ত অলস, কুশলীন, শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল।

হে কর্ণ! হে কর্ণব্য! হে বাহিত! আমি কোথার তোমার সন্ধান করিব? শৈশবে তোমার চিনিতাম না, সে সময়টা বুঝার গিরাছে, তোমার অন্বেষণ করিতে পারি নাই। তার পর যখন স্কুললালসাপরিপূর্ণ বোবনে আসিয়া উপনীত হইলাম, তখন, তুমি যে আছ, একরূপ দুই একটা চিন্তা কোথা হইতে, আসিয়া প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিল, কিন্তু আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিয়াছি। দুই চারি বার লাক্ষিত হইয়া তাহার আর বড় কাছে বেসিল না। আর আজ এই বোবনের সীমান্তে, প্রৌঢ়তার প্রাকালে, আমি তোমার জন্ত আকাশ পাতাল, অন্তর বাহির তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইতেছি। এখন কি আর তোমার দর্শন পাওয়া যায় না? যে মন্দির নির্মাণকালে তোমার নামে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এখন কি তুমি স্বয়ং আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিতে পার না? মন্দির যে জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। হায়! আমার কপালে মুক্তি-প্রতিষ্ঠা কি ঘটয়া উঠিবে না?

শুনিলাম, বন্ধুবর সুরেন্দ্রকুমার বায়ুপরিবর্তনার্থ সপরিবারে পশ্চিম বাইতেছেন। তাঁহার সহিত একবার দেখা করিবার জন্ত মনটা বড় উৎসুক হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার বিবাহের পর আমার প্রতি তাঁহার পূর্বের প্রেমটা কথঞ্চিৎ নন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। সে জন্ত আমিও তাঁহার সহিত সর্বদা আর সাক্ষাৎ করিতাম না। আমি ছুড়ী হাঁকাইয়া, নব নব বন্ধুবর্গের সহিত নব নব রসের হাসি হাসিয়া চলিয়া যাইতাম। হয় ত দেখিতে পাইতাম, তিনি ছাড়াটি মাথায় দিয়া, সামলাটি হাতে করিয়া, ধীরে ধীরে ফুটপাথের উপর দিয়া গৃহে কিরিতেছেন। চোখোচোখী হইলে আমি নমস্কার করিতাম। তিনি

করিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া হৃদয়ের ভিতর ক্ষুদ্র বৃহৎ ফুলটির মত কোথাও কি একটা কিছু ফুটিয়া উঠিল, কি এমনতর আর কোনও কিছু হইল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। সেই উৎফুল্লোচন, স্নিগ্ধকাস্তদৃষ্টি, সৌম্যদর্শন শিশুর মনের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? সে বলিয়া উঠিল,—“একবার নিয়ে এস না, আমি কোলে করি!”—একটা বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। নায়করাজ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন কি না, তিনিই বলিতে পারেন। হায়েব আতিশয্যে নায়িকা কিন্তু কাঁদিয়া উঠিলেন। এইরূপে আকর্ষণে, অল্পরাগে, হান্তে ও রোদনে, আশা ও নিরাশার আমাদের শুভদৃষ্টি হইয়া গেল।

তার পব শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর সেই সুকুমারী কন্যা সন্ধ্যাকে আসি একপ্রকার কোলে-পিঠে করিয়া বসে করিয়াছি, বলিলে ও হয়। আমাব কোলে না আসিলে তাহার কান্না থািত না। প্রতাহ প্রভাতে ও অপরাহ্নে আসি তাহাব ক্ষুদ্র গাড়ী বানি স্বহস্তে না টানিলে তাহার বেড়ান হইত না। বিষ্ণুবল্লভ বাবুর প্রাঙ্গণস্থিত পুষ্পোচ্ছান হইতে সত্ত্বঃপ্রক্ষুটিত গোলাপ গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলগুলি আসি তুলিয়া না দিলে তাহার মাথায় পরা হইত না। বকুল-ফুলগুলি কুড়াইবার সময় আমি সাহায্য না করিলে, মালা গাঁথিয়া সুখ হইত না। “বর্ণপরিচয়ের” প্রত্যেক কথাটি আমি বানান করিয়া না দিলে পড়িতে তাহার মন উঠিত না। তাহার খেলাঘরে আসি গিয়া আতিথ্যাগ্রহণ না কবিলে, স্বহস্তে প্রস্তুতকরা অপূর্ণ অন্নব্যঞ্জনরাশির দুর্দশার সীমা থাকিত না। হায়! সেই বিচিত্র স্নেহলীলা জগতে আর কেহ কখনও দেখিয়াছে কি? কিন্তু, কে জানিত যে, একমাত্র হৃদয়বৃক্ষে বিবিধ ফুলই ফুটিয়া থাকে। যে ফুল হৃদয়তরুর সর্বোচ্চ শাখায় প্রক্ষুটিত হইয়া পবিত্র পরিমলে সমগ্র বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তাহা দেবতা বা দেবসদৃশ মহাজনের প্রাপ্য;—তাহা ভক্তি। প্রেম নামে আব এক পবিত্র পুষ্প বৃক্ষের মধ্যভাগে, হৃদয়ের অতি সন্নিকটে, বিবিধ পত্রপুষ্পরাশির অভ্যন্তরে, সন্ধ্যাপনে, কোন শুভ মুহূর্ত্তে বিকশিত হইয়া উঠে, মানুষ এ কাল পর্যন্ত তাহার সন্ধান করিতে পারিল না;—সে বিচিত্র পুষ্পের পূজা পাইবার যোগ্য কে, কেই বা অযোগ্য, তাহাও বুঝিল না। আর যে স্বর্গীয় স্নেহকোমল বৈহকলিকা শিশিরসিক্ত জলরাশি বিস্তারিত করিয়া, শঙ্কতিনত্র প্রসন্নমনে এই নিবাস্রয় পৃথিবীর পানে চিরদিন চাহিয়া রহিয়াছে, তাহাই বিশ্বের প্রাণস্বরূপ। তন্নিঃসৃত শিশিরকণিকা পান করিয়াই চরাচর পুষ্ট হইতেছে। আমার অপেক্ষাও যে অসহায়, দুর্বল, বাঙ্-

শক্তিশূন্য, সেই অপূর্ণ পদার্থে তাহারই অধিকার । মেহ, প্রেম, ভক্তি—
সংসারের এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য পৃথকভাবে এককপ রূপিতে পারি । কিন্তু, মেহের
পরিণাম যে প্রেম, প্রেমের পরিণাম যে ভক্তি, তাহা ত বুঝিলাম না । ভিনের
সৌভদ সম্মিলিত হইয়া মানুষের হৃদয়ে যে বিচিত্র নন্দনকানন বসাইতে পারে,
তাহা ত জানিতাম না । আজ আমি সেই দুর্লভ জানে জানী হইয়াছি । তাই
আমার এই গল্প শুনাইবাব এত আগ্রহ । নহিলে এই আমার জীবনের অসাম
কাহিনী লইয়া বুঝি তোমাদের কালাতিপাত করিতাম না ।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার শৈশব কাটিয়া গেল । কৈশোর আসিয়া সমুপস্থিত
হইল । কৈশোরেরও কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে অতিবাহিত হইল । সেই দশ
দিবসের স্মৃতিমারী এখন ত্রয়োদশবর্ষীয়া দিব্যাকনা ; বিকাশোন্মুখ রক্তোৎপ
পলের স্তন্য বালারূপগন্ধির অপেক্ষা করিতেছে । আমাব বাছে সে কখনও
সরম বা সঙ্কোচের অভিনয় করে নাই ; সেই ক্ষুদ্র জন্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল
কথাই খুলিয়া বলিত । কিন্তু আজ কাল তাহার সে ভাবের কতকটা পরিবর্তন
ঘটিয়াছে । এই ত্রয়োদশ বৎসরের আত্মীয়-স্বজনকে পরিভ্যাগ করিয়া, তাহাকে
যে শীঘ্রই পরগৃহে রাইয়া আপনার হইতে হইবে, সেই চিন্তা যেন ইতিমধ্যেই
তাহার সকল কার্যে কতকটা ছায়া কিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে । পুস্তকপাঠে
তাহার আর তেমন মন নাই । আপে কলেজ হইতে আমি কতকগণে প্রত্যাগমন
করি, তাহারই আশায় উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিত ; এখন অনেক সন্ধানের
পর ধরিয়া আনিয়া বসাইতে হয় । মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহে না । কান
দিয়া আমার সকল কথা বুঝি শুনেও না । ধমক দিলে বিমোহিত হইয়া দুইটি মুখের
পানে একবার ফিরাইয়া, ঈষৎ হাসিয়া, বই ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলায় । পলা-
ইয়া কোথায় লুকায়, আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না ।

একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে আমি পুষ্পোদ্ভানের ভিতর বেড়াইতেছিলাম ;
উদ্ভান-পথের উত্তর পার্শ্বে নানাবিধ বৃক্ষমরাশি সন্ধ্যাসমীরণস্পর্শে ধীরে ধীরে
ছুটিয়া উঠিতেছিল । তাহারই মধ্য দিয়া সেই বিবিধ সৌরভের সম্মিলন উপভোগ
করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম । দেখিলাম, অদূরে এক নববিকশিত
মাধবীর মূলে, লৌহময় আসনের উপর সন্ধ্যা অশ্রমনে বসিয়া রহিয়াছে ।
গোধূলির শান্ত স্ববর্ণালোক তাহার কেশে, চক্ষে, কপোলে, বাহুতে, সর্বত্র
নাচিতেছে । বালিকা শূন্যনিবদ্ধৃষ্টি ; আপন মনে কি ভাবিতেছে, তা সেই
জানে । অশ্রু দিন হইলে আমি তাহার নিকটে গিয়া বসিতাম । বসিয়া সরল

বেন তাহাও নিতান্ত অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত হইতেন। ক্রমশঃ দেখিতে পাই-
তাম, দূর হইতে আমার গাড়ীর শব্দ শুনিয়া হাতাটি বা সামলাটি আড়াল
দিয়া, অথবা অস্ত্র কোনও উপায়ে, বাহাতে আগার চক্ষে না পড়িতে হয়,
সেইরূপ করিয়া পলাইতেছেন। কিছু দিন পরে সে রাস্তা দিয়া পথ চলা
পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন।

তাঁহার বাড়ীতে সর্বদা যাইতাম না, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার পূর্ব-
ভাব বেন অধিকতর গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার সহিত তাঁহার বিবাহ
ইহার কারণ কি না, ঠিক বুঝিতে পারিতাম না। বাহা হউক, তিনি আমার
বড়মানুষীতে আপনাকে লজ্জিত মনে করিতেন, দেখিয়া আমি এবার সামান্য
বেশে, গাড়ী ছাড়িয়া, পদব্রজে তাঁহার বাটীর দরজায় গিয়া ঘা দিলাম। তিনি
নিজেই আসিয়া দরজা খুলিলেন। কতকটা অপ্রসন্ন ভাবে, একটু শুষ্ক হাস্যের
সহিত, আমাকে সদরে লইয়া বসাইলেন। সম্ভাষণসূচক দুই একটা কথা
পরই আমি বলিলাম,—

“আপনার সকলে কিছু দিনের জন্ত এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন,
তিনিলাম। তাই একবার দেখা করিতে আসিয়াছি। অনেক দিন সাক্ষাৎ
হব নাহি।”

সুরেন্দ্রকুমার। শরীরটা কিছু খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারেরা যন্ত্রাব
আশঙ্কা করিতেছেন। কিছু দিন ঘুরিয়া দেখি, কি হয়।

আমি। আপনার দাদাকে দেখিতেছি না? তিনি কোথায়?

সুরেন্দ্রকুমার। তিনি এ বাড়ীতে থাকেন না। পটলডাঙ্গার আলাদা বাটা ভাড়া
করিয়াছেন। ক্ষমা করিবেন, বেশী কথা কহিতে আমার কষ্ট হয়।

আমি শুনিয়াছিলাম, ইহারা দুই ভাইয়ে পৃথক হইয়াছেন। সে কথাটা মনে
পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্রকুমার পাছে বিরক্ত হন, এই ভয়ে সে বিষয়ে আর কোনও
প্রশ্ন করিলাম না। যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, তাহা কোনও মতে ব্যক্ত করিবার
অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। বলিলাম,—“এরূপ লোভজন লইয়া, সপরিবারে
পশ্চিমে গিয়া থাকিতে হইলে বিধক্ষণ অর্থব্যয় আবশ্যক। তাহার বন্দোবস্ত
এখান হইতে করিয়া যাওয়াই ভাল। আপনি ওকালতীতে তেমন কিছু বোধ
হয় করিতে পারেন নাহি। এ পর্যন্ত আপনার তাদৃশ পসার ত দেখি নাহি।”

আর বেশী কথা বলিতে হইল না। তাঁহার মুখমণ্ডল ইহাতেই নিতান্ত
অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি খুব উগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন,—

“আপনি কি আমার কাছে বদান্ততার পরিচয় দিতে আসিয়াছেন ? জরো”
দশ বৎসর বাঁহার অয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাহার বাড়ীখানা বিক্রয়ের
সময় ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন,—আর কেন ? পূর্বাবস্থা স্বরণ করিয়া
আইনবাজীর পরগাশুলা যদি একা হুজুম করিতে না পারেন, রাস্তার দুই পাশে
তাহার যোগ্যপাত্র দেয় দেখিতে পাইবেন। সে ভ্রাতা উপযাচক হইয়া ভ্রজ-
লোকেব বাড়ীতে আসিতে হইবে না। বড়মামুদী ফলাইবাব এ স্থান নহে।
এখন অনুগ্রহ করিয়া ঘরে যান। ভরসা করি, আপনার হাত এড়াইবার ভয়
বাড়ীর চাকরের সাহায্য লইতে হইবে না।”—

নবম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টে আরও কি হইত, বলিতে পারি না। তাহার পরীক্ষা করিবার
সাহস হইল না। একবারে বাস্তার আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম,
উর্দ্ধস্থিত বাস্তারন-পথে শৈশবের পরিচিত দুইটি প্রশান্ত চক্ষু, অশ্রুভারাক্রান্ত
হইয়া, অতি সকাতির আমাব পানে চাহিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ
মনে ঘবে কিরিলাম। কিরিয়া আসিয়াই একটা স্মৃহৎ ভোজের আয়োজনে
প্রবৃত্ত হইলাম।

শৈশবের বন্ধনগুলি একে একে সব ছিন্ন হইয়া গেল। সেই সব পরিচিত মুখ
এখন আর একটিও দেখিতে পাই না। দিনের পর দিন আসে, কিন্তু সেই
পুরাতনের আর কিছুই আসে না। একটু যে স্মৃতির সম্পর্ক, কেবল তাহা
লইয়া এই সুদীর্ঘ জীবন কি কাটান যায় ? পুরাতন আমাকে চাহে না। তবে
আমিই কেন আর তাহার মুখ চাহিয়া থাকি ? তাই নূতনের সহিত সম্পর্ক
পাতিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

প্রথমতঃ একটা বিবাহ ত করিতেই হইবে। সংসারের সহিত আমার যে
সম্পর্ক, তাহা আমার সঙ্গেই বিলুপ্ত হইতে দিব কেন ? আমার এই বিপুল
অর্থরাশি দুই হাতে ছড়াইয়া গেলেও, মৃত্যুর পর দিন কতক লোকে বড় জোর
বলিবে, “হাঁ লোকটা উদার, হাতদরাজ ছিল বটে।” যাহাবা উপরুত, তাহাবা
হয় ত তাহাও বলিবে না ; অপরে বলিলে বরং চাপা দিবার চেষ্টা করিবে।
কিন্তু দুই-চারিটা সন্তান-সন্ততি রাখিয়া যাইতে পারিলে, নামটা এত শীঘ্র লুপ্ত
হইবার সম্ভাবনা নাই। নাতীরা ঠাকুরদাদার নাম না করুক, অন্ততঃ ছেল-
গুলি যতদিন বাঁচিবে, বাপের নামটা করিয়া পরিচয় অবশ্যই দিবে ; উদ্ভিদেব

মত গজাইয়া উঠিয়াছে, এ কথা ত আর সম্ভানে বলিতে পারিবে না। তার পর সমাজেরও একটা উপকারের আশা আছে। ছুই এক জনকে যদি তেমন মায়ুব করিয়া বাইতে পারি, তাহারা যে পবিত্র নামে দ্বিতীয় রামমোহন, মাইকেল বা বঙ্কিম হইয়া উঠিবে না, ইহাবই বা নিশ্চয়তা কি? আর একটা কথা, এই দুর্ভাগ্য মানবজন্মের যে সুখ, তাহারও কিছুই উপভোগ করা হইল না। প্রাণের ভিতর যে শ্রুতি, তাহা ত কেবল অশ্রময়, হুঃখময়। আমি কেন সাধ করিয়া সে হুঃখ পোষণ করিব? যদি জানিতাম যে, আমার হুঃখে অপবের সুখ;—মনে কর, আমাব হুঃখে আমার শৈশবসঙ্গিনী সেই সন্ধ্যার সুখ,— তাহা হইলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু আমি সেকপ আত্মত্যাগের দ্রষ্টাও প্রস্তুত নহি। ও সব সৌখীন সেণ্টিমেন্ট কেবল নভেলেই শোভা পায়। আমাব যৌবনের পিপাসা এখনও অপরিভূষ্ট রহিয়াছে। ফুল শুকাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু ছুই চারিটা ডাঙা পাণ্ডী এখনও ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাই। আমি তাহাদিকেই এককপ জোড়াতাড়ি লাগাইবা একগাছি শালা গাঁথিয়া গলায় পরিব। সে সৌরভ নাই থাকুক, আকাজ্জার অশ্রুজলে ডুবাইয়া লইলেও কি উহার ভিতর একটু রসের সঞ্চার হইবে না?

অতএব আমি বিবাহ করিব। নূতন সংসার পাতিব। স্থির হইল, বিবাহ করিব; কিন্তু বিবাহ করি কাহাকে? একটা পাণ্ডী ত চাই। ধনৈশ্বর্যের অভাব নাই, অথচ বড়ো বর দেখিয়া গেয়েওয়ালারা সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না,—নানারূপ সন্দেহ করে। জীর্ণ তকর শীর্ণ শাখায় নবলতিকা বেড়িবে না, জোব করিয়া বেড়িয়া দিলেও তাহাতে ফুল ফুটিবে না, ফুটিলেও সৌরভ ছুটিবে না, এ কথাও কেহ কেহ বলিতে লাগিল। তবে উপায় কি? আমার হৃদয় দেখিয়া বজ্রাণ্ড বড় উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ভাবিতে ভাবিতে একটা সুদীর্ঘ বৎসরই কাটিয়া গেল।

তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে, এক বৎসরের পর, কতটা জুটিল। তবে আর দেৱী নয়। বন্ধুগণ আনন্দে একবারে উন্নত হইয়া উঠিলেন। কেহ সাজিলেন হইবকর্তা, কেহ হইলেন নিব্বর। বরষাজীর তালিকা করিতে ছুই দিবা কাগজ ফুরাইয়া গেল। দ্বাদশ জন জ্যোতিষী ডাকিয়া ওত অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি লগ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হইল। এত দিনের পর বিয়েমাগলা করুণাশঙ্করের অদ্ভুত নিতান্তই ফিরিল।

আমার বন্ধুবর্গের কোনও জুটা ছিল না। জীলোক নহিলে এ সব শুভ

কার্য সম্পন্ন হইবার নহে। আমার গৃহে উক্ত পদার্থটির অভাব। তাই তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব পরিবার হইতে দুই এক জনকে পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন। সুন্দরীরা অদীনের কুটারে পায়ের ধুলা দিয়া আমার নূতন সংসার পাতিবার সকল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বন্ধুরা নিজে নিজেও সর্বদা আসিয়া তত্ত্বাবধান কবিত্তে আবস্ত করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিবাহের সেই চিরবাহিত শুভদিন আসিয়া পড়িল।

বুড়োবর বলিয়া তাঁহার সখের অভাব ছিল না। কস্তার বাড়ী কিঞ্চিৎ দূরে। একটু বেলা থাকিতে থাকিতে বাহির হইতে হইবে। তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। চারি-ষোড়ার একখানা গাড়ী দিয়া সাজে সজ্জিত হইয়া গেষ্টের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে ঘেবিষা বাস্তবকরণ আপনাদের বিবিধ গুণপণ্য পবিচর দিতেছে। পশ্চাতে আবার গাড়ীর অনন্ত শ্রেণী। রাশি রাশি লোক, কেহ মশাল, কেহ খামসাস, কেহ আতসবাজী হাতে লইয়া, সাগ্রহে অপেক্ষা কবিত্তেছে। এবার বর বাহির হইলেই হয়। অবশেষে বরও বাহির হইলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠিলেন না। বলিলেন,—“এখনও একটু বিলম্ব আছে। একজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিতে বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। আমি স্বয়ং গিয়া এখন তাঁহাকে না ডাকিলে তিনি হয় ত আসিবেন না; মনে কষ্ট করিবেন। আমি এখনই আসিতেছি। তোমরা প্রস্তুত হইয়া থাক।” এই বলিয়া বর মহাশয় পদব্রজে ছুটিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে মুন্দের হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছিলাম। চিঠিখানার কোনওরূপ সন্ধান বা স্বাক্ষর নাই। কেবল হাতের লেখা দেখিয়া সব বুঝিলাম। চিঠিখানা এই,—“এখন বোধ হয় তুমি আর আমার সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তে সাহস করিবে না। সে বিষয়ে আমিও প্রস্তুত নহি। নারীজন্ম যে জন্মের অধম, তাহা তোমাকে না বলিলেও চলে। কিন্তু এই নিরাশ্রয় শিশু,—পাচটি মাসও আজ পূর্ণ হয় নাই,—ইহারই মধ্যে পিতৃহীন। এখন তুমিই ইহাব অভিভাবক। নহিলে আর উপায় নাই।” আনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলাম না। উদ্বেলিত অশ্রুরাশি বুকের ভিতর চাপিয়া, এটর্গী-বন্ধু মিষ্টার পি. সি. করের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

মিষ্টার কর ও আর কবেক জন বন্ধু বিবাহ-উৎসবে যোগ দিবার জন্য আসিবাব উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—“দ্বাবে এমন সনম এখানে যে!” আমি বলিলাম,—“ভাই, বরার সঙ্কল্প ছিল, বিবা-

হেব পূর্বে ভাবী সহধর্মিণীর নামে আমার সমগ্র বিষয় সম্পত্তির একটা বিনিয়োগ করিব। আজ সে সময় আসিয়াছে। এখন একখানা কাগজ দাও দেখি।”

কাগজ লইয়া একখানা দানপত্র প্রস্তুত করিলাম। তাহাতে উপস্থিত কয়েকজন বন্ধুর সহি করাইলাম। মিটার করের উপর ভাঁহাও ভাঁহাও করিয়া তাঁহারই নিকট রাখিয়া দিলাম। কি লিখিলাম, কাহাকেও দেখাইলাম না। কিন্তু তোমাদিগকে শুনাইতে রাখি নাই। লিখিলাম,—

“যিনি শ্রেয়, প্রেম ও ভক্তি, এই ত্রিবিধ রূপে আমার উদ্ধার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারই প্রীতিকামনায়, আমার এ জন্মের বধাসর্বস্ব, শ্রীমতী সন্ধ্যা ও তাঁহার শিশুটিকে অর্পণ করিলাম।”

গুরুদেবের কৃপায় আজ আমার বিবাহের সাধ মিটিয়াছে। আর আমি মানবী-প্রেমের কাঙাল নহি। সকলে আশীর্বাদ কর, যে বিধেয় রকে বরণ করিয়া এই হৃদয়-গন্ধিরে একমাত্র অধীশ্বর করিয়াছি, অন্তিমের বেন তাঁহাকেই প্রাপ্ত হই।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র।

মাণিকতলা

২৪ ডিসেম্বর। ১৮৭৯

মদারীবেশু—

মদারীবেশু—

গতকালের পত্রে আমি একটি কথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন যে আপনাব উদ্ধৃত বাক্যগুলি বড় কিম্বা ছোট মাদলা পাঞ্জী হইতে প্রাপ্ত। পরন্তু তৎসকলের সূত্রিতে বোধ হয় যে তাহা কোন বংশাবলী বা পাঞ্জীর পাঞ্জী হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। বড় মাদলা পাঞ্জী দিন দিন লেখাইয়া তাহাতে একেবারে সমস্ত কথা প্রাপ্ত। অসম্ভব, এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করা হইয়া, কারণ পাঞ্জীর কথা প্রামাণ্য নহে। সমকালের কথাই প্রামাণ্য। “মড কুলি” শব্দের অর্থ “নৈসর্গ্য” লিখিয়াছেন আমার বোধ হয় এটি পানবী “মজুলি” শব্দের অপভ্রংশ। ঐ শব্দে ডংসব, মজলিস, মজলীতাদি বোঝা। নব্য কোন গ্রন্থকাব উদ্ধৃতি তাহা এচলিত করিয়াছেন। রঙ্গলাল বাবুর এই মত।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রের

অম্বাকাব ডাকগোলে বীজকেব শোধানীৰ পত্র পাঠাইলাম। আপনি অম্বগ্রহ পূর্বক শ্রীমন্দিরে গিয়া জনসংহনের দ্বারপার্শ্বে যে আদর্শ আছে তাহাব সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ করিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। যদিপি আমি কোন বীজক বাদ দিয়া থাকি তাহার অবিকল প্রতিলিপি ও আবাস পাইতে ইচ্ছা করি। উৎকল ভাষায় আমাব বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই; অতএব সংস্কৃত অনুবাদ বিদ্যাসংযোগ হইতে পারে না বা করিয়াছি তাহা অন্তর্জ্ঞ। আপনি তাহার সংশোধন করিবেন। পূর্বে পত্রে অপব সকল কথা লিখিয়াছি। অনন্তজীমের বড় বেউল বরণ ও নবসিংহের অর্কমন্দিব করণ বিষয়ে বড় মাদলা পাঞ্জীতে যাহা আছে তাহাব প্রতিলিপি বিশেষ প্রয়োজনীয় কিমধিকমিতি।

মাণিকতলা

২২ ডিসেম্বর।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রের

সদ্যাক্ষীরেবু—

জামুখারীর ৪ঠা দিনদীর, ভবনীর অমুগ্রহ-
পত্র বৎসর সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। মাদলা
পাঁচীর সমস্ত দেখিয়া আমার পুস্তক ছাপাই-
বার অবকাশ নাই। পরন্তু উপস্থিত বিষয়ে
যতদূর অনুসন্ধান করা যাইতে পারে তত দূর
কর্তব্য। পরন্তু বীজকণ্ডলির সংশোধন অবশ্য
সমাধা করিতে হইবে। এবং তাহা আপনাব
সাহায্য ছিন্ন নিম্পন্ন হইবে না। বীজকণ্ডলি
ছারপার্শ্বে আছে, কিন্তু তাহা পড়িতে দ্বার
বন্ধ করিতে হয় না। দ্বার ভিতরে খোলে
এবং বীজক বাহিবেব অর্থাৎ নাট-মন্দিবেব
দিকে আছে। দ্বাবে দাঁড়াইলেই নাম ও
দক্ষিণ পার্শ্বে দেখা যায়। পরন্তু রত্নলাল বাবু
আপনার আদেশ মত বাবু রামপ্রদাস সিংহের
নামে পত্র পাঠাইয়াছেন। প্রয়োজন হয়
বিদিত করিবেন। ফলে যাহাতে বীজকণ্ডলি
শীঘ্র শুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হই তাহাব বিহিত
চেষ্টা করিবেন পুস্তকের মুদ্রাস্থন প্রায় শেষ
হইয়াছে। মধ্যে কেবল ৪ পৃষ্ঠা বীজকণ্ড
নিমিত্ত বাকী আছে।

কোণাবকের মন্দিবেব পতন বিষয়ে আমি
অনেক খান করিয়াছি, কিন্তু মাটি বসিয়া
যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন কাবণ সন্দেহ বলিয়া
বোধ হয় না। সাহস্য দ্বারা ভগ্ন হইলে তাহার
অবশ্য চিহ্ন থাকিত। কিন্তু আমি কোন চিহ্ন
দেখিতে পাই নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্ত ।

১৬

সদ্যাক্ষীরেবু—

আমার পত্র লিখিবার দুই দিবস পরে
স্বর্গাভিমুখ্যাদয় হস্তগত হয়, এবং অর্য আপ-
নাব ২১ তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

শুক্রবাস আমি দুই গ্রহব একটা হইতে
তিনটা পর্যন্ত পুলসে কর্তৃক কবির। তৎপূর্ব
ও পর সকল সময় বাটীতে থাকিব এবং আপ-
নাব সহিত সাক্ষাতে পবন প্রীতি লাভ
করিব।

২০ আগষ্ট ।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্ত ।

সদ্যাক্ষীরেবু—

১৩ই নিবসেন আপনাব পত্র বৎসরকালে
প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি যে কল্পনা করিয়া-
ছেন তাহা সর্বতোভাবে আদরণীয়। আর
বিহিত চেষ্টা করিলে যে আপনি কৃতকার্য
হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। পবন
কার্যটি অতি দুর্লব, অনেক পবিগ্রম করিতে
হইবে। যে পুস্তকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন
তাহার মধ্যে আবিয়ানা আস্তাইকা বিশেষ
উপকারী হইবে না। যেহেতু তাহাতে ভাবত-
নর্ঘের ভুলগোলের প্রায় কিছুই নাই। তাহাব
নমস্ত আকর্ণানিস্তান সম্বন্ধে নিয়োজিত।
অপরগুলি উত্তম বটে কিন্তু লাসেনব পুস্তক
গম্পান ভাষাব, তাহার ইংরাজী অনুবাদ নাই।
উইলসনের বিকুপুনাণে অনেক বিষয় আছে
তাহাতে আপনাব বিশেষ উপকার হইবে।
দেশাবলী গ্রন্থ ৯ প্রস্তে বিভক্ত তাহাব এক এক
৪০০ পৃষ্ঠা পবিমিত। সংস্কৃত কলেজে তাহা
প্রাচ্য—ভিত্তির আব নাই। তাহা ৩০০ বৎসর
সবের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না
কিন্তু তাহাতে অনেক বিষয় আছে, তাহাব
চূর্ণক করিতে পাবিলে উপকারী হইতে পারে।
আমাদ্বারা এ বিষয়ে যে পর্যন্ত সাহায্য হইতে
পারে তাহার কোন মতে ত্রুটি হইবে না।
আমার প্রবন্ধগুলি খতজ মুদ্রিত করিবার
প্রস্তাব আছে। কিন্তু কিছুই লিখিত হই
নাই। লোকের উদ্যমও সকল বিষয়ে উগ্র
নহে। আমাব উদ্ভিয়ার বিবরণ বাঙ্গালীয়াবা
৯ খানি মাত্র গৃহীত হইয়াছিল।

সাপিকতলা

মার্চ ২২—৮০

সদ্যাক্ষীরেবু—

আপনাব পূর্ব পূর্ব পত্রের অঙ্গীকার
পূর্বেই করিয়াছি। বীজকণ্ডলি প্রাপ্ত হইয়া
মুদ্রিত কবিয়াছি। মুদ্রাকার্য শেষ হইয়াছে।
কেবল কয়েক পৃষ্ঠা হুতী অবশিষ্ট আছে, দুই
এক দিনে শেষ হইবে। এতৎকার্যে আপনাব
সাহায্য আমার বিশেষ উপকারজনক হই-
য়াছে।

কীকট শব্দই প্রাপ্ত, কীকট মৃত্যুর নাম, এবং আমাব সংশোধনের কটির ফল। কীকটের মীমাংসার বিষয়ে আমার কিছুমাত্র মনে হয় না। চরণাঙ্গি যদ্যপি চরণভূমি শব্দের পর্যায হয় তাহা হইলে অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু হিমা-এরকে কেহ কখনও অ্যাচলের স্থানীভূত বলেন নাই। এবং তাহা তাইতেও পাবে না। কারণ অ্যাচল পশ্চিমে হইবে। ফলে বিভা-পর্বত নতশিখর হইয়া চরণাঙ্গি হইয়াছে এবং বিভা হইতে গুরুত্ব মগধের দক্ষিণাংশ এবং তাহাই আমি নিশ্চিত। কীকটের প্রধান স্থানের একটা নির্দেশ আছে; তাহাতে লেখে কীকটে গয়া পুণ্য, নবী পুণ্য পুনঃপুনঃ।

চ্যবনক্যগ্রন্থঃ পুণ্যঃ পুণ্যঃ রাজগৃহং * ? ?
এই শ্লোক অগ্নিপুণ্যে আছে; ইহার শেষ শব্দ আমার স্মরণ হইতেছে না; ইহার উদ্ভিষ্ট স্থান সকলই দক্ষিণে পাওয়া যায়; গঙ্গার উত্তর পারে ইহার কোন স্থান নাই। ভাগবতের প্রকৃত অভিপ্রায় † বৌদ্ধ ধর্ম বা শাক্য বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা; তাহা বঙ্গ-এর উদ্দেশ্য নহে। অপর যে সময়ে কীকট নামক ছিল সে সময়ে নিখিলা প্রভৃতি স্বতন্ত্র দেশ প্রসিদ্ধ ছিল তৎসমুদায় কীকটের অন্তর্গত নহে। শব্দকল্পদ্রুমে কীকটের পর্যায়ে মগধ আছে কিন্তু সে মগধ ত গঙ্গার পূর্বপারে বিস্তৃত ছিল না। দেশাবলীতে যে বিবরণ আছে তাহাতে মগধ গঙ্গার দক্ষিণপারে স্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আমার ক্ষুদ্র প্রস্তাবগুলি সমস্ত ছাপাইলে ২০০০ পৃষ্ঠা হইবে। তাহার মূল্য দিতে কেহই স্বীকৃত হইবে না। দুই খণ্ডে ১০০০ পৃষ্ঠার ১৬০ টাকার কম নহে; তাহা কি কেহ দিবেন ? দিলে ছাপাইবার বাধা নাই ইতি।

মাণিকতলা

৮ মার্চ ১৮৮০

শ্রী রাজেন্দ্রলাল মিত্র

কীকট—

বিগত প্রাতে আপনাকে একখানি পত্র লিখিবার পূর্বে অপরূপে ডাকযোগে আপনার প্রেরিত নীলাক্ষিমহোদয় পুস্তক প্রাপ্ত হই-

যাছি। পুস্তক খানি সম্পূর্ণ নহে। পবন যে পর্যন্ত আছে তাহা এত শুদ্ধ। ইহাতে আমার বিশেষ উপকার হইবে; এবং ইহার নিমিত্ত আমি মহাশয়ের নিকট বিশেষ উপ-কৃত হইলাম।

মাণিকতলা

২০ জানু, ১৮৮০

শ্রী রাজেন্দ্রলাল মিত্র

২০

মদামসীবে—

২২শে দিবসীষ আপনার পত্র গতকলা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বীজকণ্ডলি পাঠে বিশেষ আশ্চর্য হইলাম। আমি উত্তম পার্শ্ব-বই বীজকের প্রতিবিম্ব লইয়াছিলাম। কিন্তু দেশীয় কাগজে যতদূর তাহা অনেকাংশে বীজকণ্ড হইয়াছে; এবং এক্ষণে তাহা পাঠের যোগ্য নাই। যাহা পাঠ করিয়াছি তাহা বিবাসযোগ্য নহে। এবং তদ্বিনিস্তে এ বিষয়ে আপনাকে ক্লেশ দিতেছি।

আমি উড়িয়া ভাষায় কোন মতে পট্ট নহি। অতএব আপনি যে অনুবাদ দিবেন তাহাই আপনার নান দিরা ছাপাইব এই মনস্থ করিয়াছি। প্রথম বীজকণ্ডলি আমি ভাব কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় উহাতে তেলগু শব্দ অনেক আছে। অনেক বিজ্ঞ তেলগুকে জিজ্ঞাসা করিলে আপনি উহা উদ্ধার করিতে পারিব।

মহারাষ্ট্র ভাষায় "চা" শব্দটি সমস্ত প্রত্যয় বটে; পরন্তু "অভিচা" শব্দ প্রাচীন; উহা, বোধ হয়, মহারাষ্ট্র ভাষা হইবার পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে।

অগস্ত্য দেবের অন্তর্বে যে একখানি অস্থি স্থাপিত বলা হয়, তাহাতে আনাব বিন্যাস বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহা না দেখিলে কিছুই হিন হইবে না। অনুভবে কাহাব্য অস্থি হই-বার নহে। বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ আমি করি-য়াছি। কনিংহাম সাহেবের Geography of Ancient India গ্রন্থে উড়িয়ায় বৌদ্ধ-

* শুভ্র—খ্রীষ্টীয়োৎসব বার। † "বুদ্ধনামা গ্রন্থে কীকটে বর্ণিত।"

‡ আমি "Indo-Aryans" ছাপাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম।—খ্রীষ্টীয়োৎসব বার।

দিয়েব উল্লেখ আছে, কিন্তু কি তাহাতে কি অস্ত্র ধারাবাহিক কিছুই লেখা নাই। যে যে স্থানে উল্লেখ আছে, তাহার সারাংশ আমি আমার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছি। আপনাব বীজক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন শেষ হইলেই আমার পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতে সমস্ত ভণ্ড পাইবেন।

হট্টারের তালিকা প্রস্তুত তাহা আমি জ্ঞাত আছি। পরন্তু ভণ্ডগণের বিশ্বাসযোগ্য কিছুই আমার নিকট নাই। আপনাব তালিকাটি দেখিতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য হইয়াছে। অন্তর্গত করিয়া তাহা প্রেরণ করিলে উপকৃত হইব।

“কেবর” ও “কেবর” * শব্দের বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। আমার বর্তমান বোধে “কেবর” শব্দটিকে “কেবর” ও লাতিন Caesar শব্দটিকে অপভ্রংশ অনুভব হইতেছে।

বামদেবসংহিতা হইতে যে শ্লোকগুলি গাঠাইয়াছেন, তাহা অবিকল কপিলসংহিতার আছে। তদ্ব্যতীত জিজ্ঞাস্য এই, ঐ উভয় পুস্তক কি একই, কেবল দুই নামে প্রচলিত? এই তর্কটি অসম্ভব। আমি কপিলসংহিতাব শ্লোকগুলি মুদ্রিত করিয়াছি।

শ্রীরাঙ্গেন্দ্রলাল মিত্র।

পুঃ নিঃ—

পূর্বপক্ষে নীলাক্ষিমহোদয়ের প্রাচীনসংবাদ লিখিয়াছি; বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন।

২১

মহাশ্বীরে—

বীজকগুলির মূল আপনাব দুই গজে ছিল তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গজে যে তিনটি বীজক ওলির অনুবাদ ছিল, তাহাও হস্তগত

হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত বীজকের অনুবাদ পাই নাই। পবক তাহাতে কোম ব্যাঘাত হয় নাই। আপনাব উদ্যমের সাহায্যে কষ্ট সমাধা হইয়াছে। উক্তব্যের সূচী মুদ্রিত হইতেছে। তাহার প্রকাশের আর নিলম্ব নাই। আপনাব শিবসংবাদ সর্বদা প্রার্থনীয়।

মাণিকতলা

২৮—২—৮

শ্রীরাঙ্গেন্দ্রলাল মিত্র।

২২

মহাশ্বীরে—

কয়েকদিবস গীড়িত থাকি প্রযুক্ত আপনাব এই এথেলের পক্ষে উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। “ইণ্ডো-আরিয়ন” পুস্তকের উপাধিটা আপনি। অতএব ইহা অবজ্ঞাই সম্ভব বে, আপনি তাহার প্রাপ্তিতে পরিতুষ্ট হইবেন। আমার যে সঞ্চয় আছে তাহাতে আর ৪ খণ্ড হইতে পারে। কিন্তু এখন দুই খণ্ডের ব্যয় অদ্ব্যপিত আদায় হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বলিলেন যে ঐ হরষাণ প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন শিবনিবাসে নহে।

শ্রীযুক্ত বাবু উপর্যুপ দত্ত তিন বৎসর হইল নিদানের বন্ধানুযায় মুদ্রাস্থিত করান ও তাহার পুস্তক উত্তম হইয়াছে; পুনঃ তাহার মুদ্রাস্থনের প্রয়োজন নাই। পরন্তু ইংরাজি দিগের নিমিত্ত একখানি ইংরাজি অনুবাদ করিতে তিনি আনিয়াটিক সোসাইটির আদেশে নিযুক্ত আছেন। মূল অনেকবার ঘাণা হইয়াছে আর প্রয়োজনীয় নহে ইতি

মাণিকতলা

৮ এপ্রেল। ১৭৮২ } শ্রীরাঙ্গেন্দ্রলাল মিত্র।

নারায়ণ রাওএর বখর।

অবতরণিকা।

ককণ প্রদেশের উত্তরাংশে, সমুদ্রতীরে, সাবিত্রী নদীর নোহানার নিকট, "শ্রীবর্ধন" নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রাম বহুদিবসাবধি আবিসিনীয়গণের অধিকারভুক্ত ছিল। আবিসিনীয়গণ মহারাষ্ট্র দেশে "সিদ্ধি" নামে পরিচিত।

বর্তমান সময়ের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে (খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে) "বালাজী পন্ত" নামক এক জন সৎশক্ত মহাবাহির ব্রাহ্মণ শ্রীবর্ধনগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতার নাম বিঘনাথ ভট্ট। মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্ব স্ব নামের সহিত পিতার নাম সংযোজিত করিবার প্রথা আছে। তদনুসারে বালাজী পন্ত সাধারণতঃ "বালাজী বিঘনাথ" নামে অভিহিত হইতেন। বালাজী পন্ত বা বালাজী বিঘনাথ শ্রীবর্ধনের দেশমুখ অর্থাৎ গ্রামাধিকারী (মোস্তাজির) ছিলেন। তদানীন্তন কালের সকল দেশমুখের স্থায় তিনিও প্রায়ের ২৫ ভাগের এক ভাগ ভূমি নিজের ভোগ করিতে গাইতেন। ইতরাং তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

বালাজী বিঘনাথ যখন এইরূপে শ্রীবর্ধনগ্রামে হুখে স্বচ্ছন্দে কালতিপাত করিতেছেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনার অধ্যক্ষ কাহোজী আঙ্গের সহিত সিদ্ধিগণের যুদ্ধ প্রচেষ্টার উপক্রম হয়। স্বাভাবিকতানিবন্ধন আঙ্গের সহিত বালাজী পন্তের নোহাদ্য ছিল। এই নিমিত্ত আঙ্গের সহিত যুদ্ধ ঘটবার উপক্রম হইলে, বালাজী পন্তকে আঙ্গের স্বপক্ষীয় জানে, সিদ্ধিপতি তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। বালাজী পন্ত এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ভীতচিটে সপরিবারে শ্রীবর্ধন পবিত্র্যাগ পূর্বক মহারাষ্ট্র দেশেব তদানীন্তন রাজধানী সাতারা (সেতারা) অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১৭০৭ অব্দে বালাজী বিঘনাথ সাতারায় পদার্পণ করেন। এই সময়ে হজপতি মহারাজ শিবাজীর পৌত্র মহারাজ শাহ, মহারাষ্ট্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, রাজ্যের জামাবন্দী ও রাজস্ব আদায়ের ভার প্রধান সেনাপতি/খনাজী রাও বাদবের প্রতি সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি এই নূতন কার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া, তৎসম্পাদনার্থ যে সকল কায়কুন (কেরানী) নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বালাজী বিঘনাথ তাঁহাদের অন্ততম। অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যে, বালাজী পন্ত স্বীয় কার্যে এত দূর দক্ষতা প্রদর্শন করিলেন যে, সেনাপতি বাদব রাও ও মহারাজ শাহ তাঁহার একান্ত গচ্ছপাতী হইয়া পড়িলেন। অবঃ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে খনাজী বাদবের মৃত্যু হইলে, মহারাজ শাহ রাজস্বসংক্রান্ত সমস্ত কার্যের ভার বালাজী বিঘনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সময় হইতে কার্যতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তাশ্রমে বালাজী বিঘনাথ রাজসভায় ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থানে স্থানে যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা নিবারণের ভার বালাজী বিঘনাথের প্রতি অর্পিত হয়। বালাজী স্বীয় অল্পত বৈজ্ঞানিকতা, অদ্বাদ্য বিজ্ঞান ও অনাম্যাত্ত বুদ্ধিকৌশলে অল্প কালের মধ্যেই সমস্ত বিদ্রোহেব দমন করিয়া, রাজ্যসমুদ্রে সর্বত্র শান্তি স্থাপন করিলেন। মহারাজ শাহ তাঁহার এই কার্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে

তাহাকে “পেশওদের” অর্থাৎ এখান মস্তীর পদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত ও পূজিত করিলেন। (১)

বালাজী বিখনাথের মৃত্যুর সাত মাস পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজীরাও পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বাজীরাও অতিশয় পরাক্রমশালী ও কর্তৃত্বময় ছিলেন। তিনি মুসলমানগণের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, নাল, ওজরাথ (ওজরাট) ও সুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি মোগলাধিকৃত প্রদেশসমূহে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। দিগ্বীচর তাঁহার বিক্রম সম্বন্ধে অসমর্থ হইয়া, চাষেল ও নর্দনা নদীর সন্ধ্যাবর্তী ভূভাগ মহারাষ্ট্রীয়গণকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। বাজীরাওএর প্রবল পবাক্রমে নিজের উপযুক্ত পুনঃপুনঃ পরাজিত, এবং পোহু শীতগণ হস্তদর্প হইয়া, ভারতে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অজ্ঞান হইয়া উঠে।

বাজীরাও যেমন যুদ্ধনিপুণ, তেমনি রাজকাব্য-শ্রবণজ্ঞও ছিলেন। তিনি যে কার্যের ভাব গ্রহণ করিতেন, শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইলেও, তাহা হ্রস্বগ্ন না কবিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। বাজীরাওর ক্ষমতা তাঁহার বিশেষ স্বাধীনতা ছিল। এই সবস্ত তৎসম্পন্নতা হেতু, মহাবাঘা শাহ, রাজ্যের সমস্ত ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত করিয়া, স্বয়ং ভোগবিলাসে কালান্তিপাত করিতেন। বাজীরাওএর ভ্রাতা চিনাজী আশ্রাও নীচ ও দুষ্কৃশল ছিলেন। পোহু শীতগণের সহিত যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাওএর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বাজীরাও তিনটি পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম, বালাজী বাজীরাও (সচবাচন নানাসাহেব নামে অভিহিত) ; মধ্যমের নাম বহুনাথরাও (সাধারণতঃ দাদাসাহেব নামে পরিচিত) এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম জনার্দন পণ্ড। জনার্দন পণ্ড অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। চিনাজী আশ্রাও এক পুত্র, —সরাশিব বাও ভাউ, সংক্ষেপে ভাউ সাহেব।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বাজীরাও (বা নানাসাহেব) পেশওদের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনার নয় বৎসর পূর্বে, মহারাষ্ট্র শাহ অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক হইতে আকস্মিক হইয়া মৃত্যুকালে তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যান যে, তাঁহার পিতৃপৈতৃক রাজবাল্যকে তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড়ে দত্তকবৎ প্রদান ও শিবাজীর বংশধরজ্ঞানে সেই দত্তক পুত্রের প্রতি রাজসম্মানমাত্র প্রদর্শন করিয়া, পেশওদের সমস্ত রাজকাৰ্য্যের নির্বাহ ও মধ্যস্থত্রে রাজ্য ভোগ করিবেন। শাহের দত্তকপুত্র বাসরাও অতিশয় অকর্মণ্য ছিলেন বলিয়া, তিনি সাহি-গোপালের আশ্রয় নানারাম সিংহনামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পেশওদের (১৭৫০ খ্রীঃ) পুত্র বাজধানী স্থাপন করিয়া মহাবাঈ রাজ্য শাসন ও ভোগ করিতে লাগিলেন।

পেশওদের বালাজী বাজীরাও (বা নানাসাহেব পেশওদের) মহাবাঈ রাজ্যের শাসনভাগ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বহুনাথ রাওকে যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান ও পিতৃব্যপুত্র সর্বাধিকার বাও বা ভাউসাহেবের উপর রাজকীয় সমস্ত কার্যের ভার অর্পিত করিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পূর্বে হইতে সে সমস্ত পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে যে সকল বিশুদ্ধতা বটাইছিল, ভাউসাহেবের চেষ্টা ও তদাধিকারণে তৎসমস্ত বিলুপ্ত হইয়া রাজ্যনাথো সর্বত্র শান্তি বিবাক্রিত ও প্রজাগণ অশেষ প্রকারে দুঃখী হইল।

চয় বৎসর কাল মহাবাঈ রাজ্যের “পেশওয়াই” বা মন্ত্রিব, দিলী-নিয়ম ও নিয়াম উল্লেখ্য মুনকের দর্প চূর্ণ কবিয়া, ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে “পেশওদের বালাজী বিখনাথ” ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বালাজী বিখনাথের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম বাজীরাও, কনিষ্ঠের নাম “চিনাজী আশ্রা”।

বালাজী বাজীবাওএর রাজত্বকালে, এক দিনে রঘুনাথ রাও ওদরাথ (ওদরাঠি) সন্তোষী ও পঞ্জাব ভ্রম এবং অপর দিকে সদাশিববাও হারদরাবাদের নবাবকে পরাজিত করিয়া ভাংতে মহারাষ্ট্রগৌরব স্থগতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতেছিলেন। কিন্তু এমন সগম সহসা অপর দিক হইতে এক বিপদ আসিয়া কিছু দিনেব ক্ষুদ্র তাঁহাদিগের উন্নতিব পতি রুদ্ধ করিয়া দিল।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ আব্দালী ভারত আক্রমণ পূর্বক গঞ্জাব হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণকে বিভাদ্রিত করিয়া দেন। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ চেষ্টা, পূর্ণা হইতে সদাশিব বাও ভাউ (বালাজী বাজীরাওএর জ্যেষ্ঠ পুত্র) ও বিশ্বাস রাও বহু মৈত্র্য সহ পাণিপতের সন্ধি যুখে প্রেরিত করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী দিবসে, মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত আব্দালীর যে যুদ্ধ হয়, তাহা ইতিহাসে “পাণিপতের তৃতীয় যুদ্ধ” নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধেব পবিত্রাম ইতিহাসপাঠকের অবদিত নাই। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্য্যদন্ত ও প্রায় দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য সদরক্ষেত্রে পতিত হয়। বালাজী বাজীরাও এই সংবাদশ্রবণে একেবারে ভগ্নচিত্ত হইলেন। জাভা ও পুন্ড্রের শোকে ও পরাজয়জনিত দারুণ মানসিক ব্যর্থগার, অন্ধকারের মধ্যেই তিনি পরলোকে গমন করেন। (২)

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে, নানাসাহেব (বালাজী বাজীরাও) পেশওয়ারে ইহলোক হইতে অবস্থত হইলে, তাঁহার প্রথম পুত্র মাধবরাও (সপ্তদশবর্ষ বয়স্ককালে) তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় গৌরব যে বীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, মাধবরাওএর চেষ্টায় তাহা পুনরুদ্বীপিত হইল। তিনি বহু যুদ্ধে মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া ভারতে মহারাষ্ট্র-ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মাধবরাও অতিশয় দয়ালু, সত্যপ্রিয়, ধার্মিক ও সৌধাশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার দ্বায় প্রসাররুদ্ধ নবগতি পৃথিবীতে অতি অল্পই জনপ্রিয় করিয়াছেন। তিনি প্রজাগণকে সুখী করিবার চেষ্টা দিগনিমি প্রাণপণ যত্ন করিয়া, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে অকালে বস্মাকাল রোগে প্রাণভাগ করেন।

মাধবরাওএর সন্তানাদি না থাকায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশওয়ারে গদ প্রাপ্ত হইলেন। অদ্য আমরা যে মহারাষ্ট্রীয় প্রবন্ধে অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে নারায়ণরাওএর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম “ঐমন্ত নারায়ণরাও পেশওয়ারের বধর—রাজকর্তৃচাৰিগণের বিবরণ সহ।” ইহা কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহা জানিবার কোনও উপায়ই নাই। এই বধরের প্রারম্ভ ও শেষভাগ অতি সংক্ষিপ্ত। রচনাপ্রণালী নানা ফড়নবীসের আঙ্গুরিতের রচনা অপেক্ষা কিম্বৎপরিমাণে প্রাঞ্জল। অনুবাদে মূল্যের ভাব যথাসাধ্য অবিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মূল গ্রন্থের রচনাপ্রণালীর দোষে অনুবাদের ভাষার সমতা সর্বত্র সম্পূর্ণ রূপে করা ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। বধর-বর্ণিত ঘটনাগুলি যথাসাধ্য বিশদ ও সাধাৰণ পাঠকের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত, বহুল পাদটীকা সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে।

এই বধনের অনুবাদ প্রদানের পূর্বে, বধর-বর্ণিত ঘটনাবলীর সহিত বাহাদের জীবনের অতি বনিষ্ট সম্পর্ক, এ স্থলে সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

১ম, রঘুনাথরাও বা দাদাসাহেব।

রঘুনাথরাও বা দাদাসাহেব, পেশওয়ারে বালাজী বাজীরাওএর কনিষ্ঠ ভ্রাতা—মাধবরাও ও নারায়ণরাওএর পিতৃব্য। বালাজী বাজীরাওএর প্রথম স্ত্রী হয়, মাধবরাও তখন সপ্তদশবর্ষ বয়স্ককাল। এই নিমিত্ত মাধবরাওএর ব্যাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত দাদাসাহেব দাস্ত্র্য

সাতারা হইতে "পেশওয়ারি পরিচ্ছদ" (অভিবেকবসন) আসিল (১)। তাহা পাইয়া/ঈগন্ত নাবার্যাণ রাও সাহেবের মনে "আমিই সকলের প্রভু" এইরূপ স্বেচ্ছার জন্মিল। গহে সমস্ত সচিবগণ সহ পুণায় আসিলেন, এবং রাজকাৰ্য্য নিৰ্বাহ করিতে লাগিলেন।

"বাবাজী বরগুদে" নামক তাহার একজন বালাসহচর ছিল, তাহাকে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সে বাহা করিত, তাহাই গ্রাহ্য করিতেন। সচিবগণের কথার বড় কর্ণপাত করিতেন না। রাজাজিও অতি শ্রমস্তের পূর্ণ অনুগ্রহ ছিল। বাহা হউক, এইরূপে ভালয় মন্দয় এক রকমে চারি-বাস রাজত্ব করিলেন।

তৎপরে, সৌভাগ্যবতী (২) আমলী বাইর মনে বিবশ্য জন্মিল। নারায়ণাও সাহেব রাজ্য কবিত্তেছেন, ইহা তাহার সম্ব হইল না। তিনি নারায়ণ রাও সাহেবকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়া, খরগসিং, হুমেরসিং ও তুলাজী গওয়ার (প্রমার) এই তিন জনকে ডাকাইয়া আনিলেন। রাজপ্রসাদরক্ষার জন্ত ৫ পাঁচ সহস্র বৈদেশিক গারবী, সৈন্ত (Regular infantry) ঈশমন্তের নিকট থাকিত। খরগসিং ও হুমেরসিং তাহারিগের অগাধার ছিল। দুই শত রাজসুচর-বর্ণের মধ্যে তুলাজী গওয়ার ও চাপালী টিলেকর এই দুই জনই প্রধান ছিল। তন্মধ্যে তুলাজী গওয়ার, হুমেরসিং ও খরগ সিংহকে নিকটে রাখান করিয়া আমলী বাই বলিলেন—

"তোমাদিগকে আমার সংকল্প জাহিতোছি। কিন্তু ইহা যেন কাহারও নিকট প্রকাশিত না হয়। তোমরা যে গুরুত্ব্য চাহিবে, তাহাই দিব। অগ্রে তোমাদের প্রতিশ্রুতি চাই, পরে মর কথা বলিব।" ইহা শুনিয়া তাহার নিবেদন করিল— "আমরা কিছু না জানি। শুনিয়া অগ্রে কিরূপে প্রতিশ্রুত হইব, আপনায় মনোগত অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে পারিলে, আমরা তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব মতামত নিবেদন করিতে পারি।" পবে আমলী বাই তাহারিগেরে শপথ করাইয়া ও তাহাদিগের নিকট হইতে "বেলজাভার" (৩) গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, নারায়ণ রাও সাহেবকে হত্যা করাইতে ইচ্ছা করি। এই বলিয়া খরগসিং, হুমেরসিং ও তুলাজী গওয়ার, এই তিন জনের নামে নারায়ণ রাওকে সারিয়াব খাজাপত্র জিখিয়া দিলেন। তখন তাহার বলিল যে, যদি দাদা সাহেবের সহস্তুলিখিত "নারায়ণ রাওকে সারিবে," এইরূপ আদেশপত্র আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা এ নিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারি।

আমলী বাই দুই জন জরীয়ার ও তুলাজী গওয়ার, এই তিন জনের নামে একটি আদেশপত্র জিখিলেন, এবং একদিন টহা এইরা দাদা সাহেবকে নিকট গমন করিলেন। সে নম্র দাদা সাহেব দেখা করিয়াই খানসহ হইয়, বসিয়াছিলেন। তাহার মনে সন্ধ্যা ও তপস্কাৰ্য্য।

(১) ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শাহর বংশধরগণ অভিশয় অকৰ্ম্মণ্য হিচকো বলিয়া পেশওয়ারেগ সমস্ত রাজকাৰ্য্য নিৰ্বাহ ও রাজত্ব ভোগ করিতেন। পেশওয়ারেগ অধীনতার চিত্র-বস্ত্র তাহাদের নিকট হইতে "অভিবেকবসন" গ্রহণ করিতেন। সাধবরাওএর, যুতুর পর, শাহর মন্তকপুত্র রামরাজা অগ্রহাব নামে (১১৭৩ খ্র. শঃ) নারায়ণ রাওকে পেশওয়ারে-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তৎপরিচ্ছদ "পেশওয়ারি পরিচ্ছদ" প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) বহুদ্রষ্টা দেশে সধবা, হোলোকরণের নামের পূর্বে "সৌভাগ্যবতী" এই বিশেষণটি সর্কদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(৩) বেলজাভার অর্থে বিধগত ও (প্রবীর প্রসাদচিহ্নরূপ) হরিজাচরণ। মহারাজি-গণের মধ্যে ইহা অভিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। কঠিন শপথ করিতে হইলে বেলজাভার হস্তে গ্রহণ করিয়া শপথ করা হইয়া থাকে।

সমাপ্ত হইবামাত্র—(১) আনন্দী বাঈ সেই আদেশপত্র তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন । তিনি তাহা পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন,—ভূমি কি বলিতেছ? নাবাষণ রাও আমাদের পর নহে—প্রত্যক্ষ প্রাতুষ্পুত্র । হুতরাং তাহাকে পুত্রস্বৎজ্ঞান করা উচিত । যদি সে কোনও অজ্ঞায় মাত্রণ কবিতা থাকে, অথবা তাহা দ্বারা যদি রাজ্যেব অনিষ্ট ঘটিতে থাকে, তবে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পার । কিন্তু “তাহাকে মারিবে” এই কয়টি অক্ষর আমি কদাচ লিখিব না । ইহা ছাড়া যদি তোমার অন্য কোনও কথা বা প্রার্থনা থাকে, বল । তোমার যদি স্বয়ং রাজ্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাকে ধৃত কবিবাব আদেশ দিতে পারি ।” ইহা শ্রবণে আনন্দী বাঈ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, “এসবকালে ছেলে কাং হইয়া পড়িলে, তাহাকে কাটিয়া বাহির করিতে হয় ।” পরে আনন্দী বাইর আগ্রহাতিশয্যে দাদাসাহেব “নারায়ণরাওকে ধরিবে” এই কয়টি কথা লিখিয়া দিলেন (২) ।

আনন্দী বাই সেই আদেশপত্র লইয়া দেবগৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িয়া দেখিলেন । কলম-দান (লেখনপাত্র) সঙ্গেই ছিল । একটি অক্ষর বদলাইবাব ইচ্ছা ছিল বলিবা “ধ” কে “মা” কবিয়া দিলেন ; তাহাতে “ধরিবে” স্থলে “মারিবে” এই অক্ষরগুলি স্থাপ্ত হইল । পরে সেই আদেশপত্র জমাদারদ্বয় ও পণ্ডারের হস্তে সমর্পণ কবিতা বলিলেন,—“অক্ষরগুলি খোদ সরকারেব (দাদাসাহেবের) স্বহস্তলিখিত ।” তাহার এই আদেশপত্র পাইয়া কার্যসিদ্ধির উপায়-উদ্ভাবন নিবৃত্ত হইল ।

ক্রমশঃ ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্বর ।

(১) নারায়ণরাওএব অভিষেকবসনপ্রাপ্তির পর কিছু দিন দাদাসাহেব কারামুক্ত ছিলেন । কিন্তু পরে নারায়ণ রাওএর মাতার সহিত আনন্দী বাইর প্রত্যহ অতিশয় কলহ হইতে আরম্ভ হইলে, নারায়ণ রাও জননীর উপদেশক্রমে দাদা সাহেবকে বন্দী করিয়া রাখিলেন । পেশওয়ারগণের বখরে লিখিত আছে যে,—নারায়ণ রাওএর এইরূপ ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তপশ্চর্যা করিতে লাগিলেন । তদর্শনে নারায়ণ রাওএর স্বপ্ন বিগলিত হইল । তিনি ২৪ বার দাদা সাহেবের নিকটে গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া মিনতিপূর্বক বলিলেন যে, “আগনি ক্রোধ ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ কবন ।” দাদা সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন না । “সমস্ত রাজ্য আমি গ্রহণ করিব”, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা । এই উদ্দেশ্যে তিনি একবার রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা সফল হয় নাই ! তিনি পুনরায় বন্দী হইলেন । এ সময় তিনি দিবসেব অধিকাংশ মানাসিক, দেবাবাদনা, তপশ্চর্যা প্রভৃতিতে অতিবাহিত কবিতেন ; এবং কখনও কখনও উপবাসও করিতেন ।

(২) “পেশওয়ারগণের বখরে” কথিত হইয়াছে যে, নারায়ণ রাওকে ধৃত করিবার জন্য দাদাসাহেব প্রাসাদরক্ষক গারদী সৈন্যগণকে নর লক্ষ টাকা দিতে প্রতিক্ষিত হইয়াছিলেন । সখারাম বাপুও গোপনে এই বড়বস্ত্রের মধ্যে ছিলেন । কিন্তু আনন্দী বাই দাদাসাহেবের লিখিত “ধরিবে” স্থলে যে “মারিবে” করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সখারাম বাপু অবগত ছিলেন না ।

কুরুক্ষেত্র ।

২। কাব্যংশ ।

অতঃপর কুরুক্ষেত্রের চরিত্রসৃষ্টির কিছু আলোচনা করিব। কাব্য যদি রসের উৎস হয়, তবে কবিসৃষ্ট চরিত্রই সেই রসের আধার। চরিত্রের চিত্রনেই রসের উৎকর্ষ, ভাবের ক্ষুধা।

কুরুক্ষেত্রের চরিত্রসম্পত্তি অতি মনোহারিণী। কি বৈচিত্র্য, কি বিশেষত্ব, কি সৌন্দর্য্য, কি সঙ্গতি, কি স্বাভাবিকতা, সকল গুণেই সেই সকল চরিত্র উৎকৃষ্ট। নাট্যকারের সৃজনীয় চরিত্রচিত্রনের ক্ষমতা কবিতে বিশেষ লক্ষ্য হয়।

কুরুক্ষেত্রের শীর্ষ অভিনেতা শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই কেন্দ্রস্থলে। আর তাঁহার জীবনব্রতের স্বপক্ষ বিপক্ষরূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত সমগ্র চরিত্র। দ্রুপদাশা, বাসুকি, জয়ৎকার এক দিকে, অশ্রু দিকে ব্যাস, অর্জুন, শূভদ্রা, অভিমুখ্য। মরুভূমে ত্রিধারার স্থার কবি কুরুক্ষেত্রের শোণিতকর্দমে আর তিনটি স্ত্রীচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—তাহারা স্নানোচনা, শৈলধা ও উত্তর। তাহারা কুরুক্ষেত্র জীবনব্রতের সাগাংসম্বন্ধে সহায়িনী নহে, কিন্তু তাহাদের কাব্যের পাতপাতী-গণের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এই সকল চরিত্র কুরুক্ষেত্র-চিত্রপটে সন্নিবিষ্ট হইয়া সে পটের বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছে। কবি আদর্শপুরুষ নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে উৎকৃষ্ট কবিত্ব ও সূক্ষ্মতম ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনব্রত—

সাধুদের পরিজ্ঞান, বিনাশ দুহস্তদের করিব সাধন,
স্থাপন করিব ধর্ম্ম, এক মহা ধর্ম্মরাজ্য করিয়া স্থাপন।

তাঁহার ধর্ম্মব্রত—

নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম্ম, বস্ত্র নহে পূর্ণ ধর্ম্ম
ধর্ম্ম কৃষ্ণ! সর্ব্বভূতহিত;
তাঁহার সাধন কর্ম্ম নারায়ণে কর্ম্মফল
ভক্তিতরে ধর্ম্ম সমর্পিত।

তাঁহার প্রীতি সর্ব্বভূতময়—

দেখিলে কষ্টক এক চরণে কাহাব
কি বিষম ব্যথা পাই মরমে মরমে

তাঁহার চক্ষু—

শত্রু যুদ্ধকালে।

কৌরবেরা; যুদ্ধ-অন্তে ভাই পাণ্ডবের।

কিন্তু অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী অনন্ত কোটি মানবের মঙ্গলের পথে অন্তরায়

হইয়াছে, সেই জন্ত

নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জুনের রথে
নাথিছেন স্থিরচিস্তে কলিরবিনাশ।

কিন্তু

সর্বত্র নির্গিষ্ট কৃষ্ণ সর্বত্র নিকাম
সর্বত্রই দয়া ধর্ম আদর্শ মহান।

সেই জন্ত—

স্বত্র কাঁট ছার

বশোলোভে মস্ত বধা বীর অধিতীর
ভারতের সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র আপনি
সারথীর ব্রতে ব্রতী।

তিনি যেমন পোজাপতিরূপে আত্মবলিদান দিয়া এই জগৎস্থিতি সম্ভাবিত

করিয়াছিলেন, জগৎরক্ষার জন্ত আবার সেইরূপ আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত।

একই নিখাতে হার একই নিমেষে-হার
যুদ্ধের শোণিতে কেন ভালোলে না এ ধরায়
এই প্রশ্ন মাত্র করি যেন প্রকলিত
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত।

ধর্মবীর ভীষ্মের কথা বড় বধ্য—

ধাঁব আবির্ভাবে এই জগতের হার
তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হইল পুর্ণিত
ধাঁব পদতরী তল করি যুগে যুগে
সংসার-অর্ণব বাতী বাবে মোক্ষধাম।

এই আদর্শচরিত্র এত দিন কথায় পর্যাবসিত ছিল, * কবি অপূর্ণ প্রতিভা-

বলে ভাষার জীবন্ত চিত্র চিত্রিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত
করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্রের জড় কঙ্কালে এত দিনে রক্ত মাংস,

* মুকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণচরিত্র-সমালোচনায় ইংরাজ ঐতিহাসিক হুডের
এই কবিতা সাবগর্ভ কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। বধ্যার্থ মহৎ ব্যক্তির অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক
মহৎ গদ্যের আবর্তন বহিবে; তাহা কেবলমাত্র কবির লেখনী দ্বাৰাই বর্ণনাশাধ্য। কবি-
ভাব এই সম্ভাবনীয় আছে এবং গদ্যের তাহা নাই। বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র ও রৈখিক,
কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র আশোচনা করিলে হুডের কথার সত্যতা স্বদৃশ হয়।

অধিকন্তু জীবনীশক্তির সঞ্চাব হইয়াছে। এখন আমরা বুঝিলাম, কেন ভারত
এক দিন কৃষ্ণরসে মাতিয়াছিল, কেন গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্তি, কেন মুখে মুখে
কৃষ্ণনাম, কেন আসিদ্ধহিমাচল কৃষ্ণপূজা। কেন ভীষ্মের মত রাজর্ষি, ব্যাসের
মত ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে আদর্শ করিয়াছিলেন। কেন শুকসুখগণিত তাঁহার কথামূল্য
আস্বাদন করিবার জন্য হিন্দু জনসাধারণ লালসিত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রে দুর্কীস্যাচিহ্ন বেশী কুটিয়াছে। সেই রৈবতকের দুর্কীসা—

ঋষিকুলধূমকেতু, জীবন্ত নরক

মহাপাপ-মূর্তিমস্ত কোথ অবতাব।

কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ—কৃষ্ণ বেদদেবী, কাপুরুষ, চক্রী,
গোপ, পামব। এই বিদ্বেষের কারণ রৈবতকে বিবৃত আছে। দুর্কীসার দৃঢ়
বিশ্বাস, কৃষ্ণপ্রবর্তিত বৈষম্য ধর্ম অঙ্কুরে উদ্ভূত না হইলে,—

ভগ্নিবা ব্রাহ্মণ ধর্ম বেই পাণানল

প্রাণিবে ভাবতরাজ্য দানিল মত

কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্মরাজ্যসংস্থাপন বিফল করিবার জন্য তিনি অনার্যের
নেতা বাহুকির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

আইস ব্রাহ্মণ আব অনার্য শিলার

মধ্যস্থ দস্তির জাতি পিবিয়া তেমন

নুতন ভারত রাণ্য ববিব স্জনন।

সেই সন্ধিবন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্য দুর্কীসা বাহুকির যুবতী রূপবতী
ভগিনী জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিবাহের সময় হইতে
ষোল বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু সাধ্বী রমণীর মত দুর্কীসার প্রকৃতি
তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এখনও কথায় কথায়

ক্রোধেতে ধবির অন্ন কাঁপে থর থর

তাঁহার মতে

তরুর আবার কেবা পিতা মাতা ভ্রাতা ?

হলে বৃক্ষান্তর

ভাঙ্গিয়া পড়ুক বড়ে পড়ুক কুঠারে

পূর্ব ভক, আছে তাহে কি হুংস লতার ?

জরৎকার তাঁহার ধর্মপত্নী, কিন্তু সে অনার্যা।

অন্ধ-বাতাসেও তাব

হয় বৈ কলুষিত আমি দুর্কীসার,

যুগায় শিহরে অঙ্গ। কিন্তু কি করিব

কিন্তু যাবৎ না ব্রত উদ্ধাপন হয়, তাবৎ

হইবে সহিতে

অনার্যসংসর্গ পাপ এই বিড়ম্বনা ।

আর সেই ব্রত-উদ্ধাপনের পথে কোন ধর্মবাধা স্থান পাইতে পারে না । শিশু অভিমত যদি সে পথের কণ্টক হয়, তাহাকে অনায়াস-যুদ্ধে উন্মূলিত করিতে হইবে ।

নাহি পারে এক রথী, সপ্তরথী মিলি

বধিবে তাহারে বশে ।

কবি দশম সর্গে কর্ণ-দুর্কীসা-সংবাদে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক অভিনব ইতিহাস দিয়াছেন । তাঁহার মতে, কর্ণ দুর্কীসার করচালিত যন্ত্র ; তাহারই উপদেশে কর্ণ কৃষ্ণের পঞ্চগ্রামভিক্ষা নিষ্ফল করিয়া কুরুক্ষেত্র-মহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে । দুর্কীসার উদ্দেশ্য, কোরব পাণ্ডব ধ্বংস করিয়া কর্ণকে ভারত সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে । আর বাহুকির সহিত বে ধর্মসাক্ষাৎ প্রতিক্ষা, তাহার ফলে অনার্য জাতি অতল জলে ডুবাইয়া দেয় । এ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের আমরা যথাস্থানে বিচার করিব । এখানে এই টুকু লক্ষ্য করা উচিত যে, কবি দুর্কীসায় যে সকল ছল কৌশল আরোপিত করিয়াছেন, তাহা দুর্কীসা-চরিত্রের সম্পূর্ণ অমুরূপ । কুরুক্ষেত্রের দশম সর্গ অপূর্ণ কৌশলে লিখিত—ইহাতে অতি-সংক্ষেপে অভিনব ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ভাবন এবং ক্রুর কুটিল কৌশলী দুর্কীসা-চরিত্রের বিকাশ ও সঙ্গতিরক্ষা দৃষ্ট হয় ।

কুরুক্ষেত্রে বাহুকিচরিত্র বড় ফুটে নাই—বোধ হয় কবি ফুটাইবার অবকাশ পান নাই । দীর্ঘকাল কোথা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অসংখ্য অনার্য জাতিকে একতাস্থ্রে গ্রথিত করিবার প্রয়াসে ভগ্নমনোরথ হইয়া বাহুকি ভগিনীর কাছে কিরিয়া আসে । সেই একবারমাত্র তাহার সাক্ষাৎ পাই । তাহার মুখে শুনি,

হিলাম ব্যাপ্ত

নানা কার্যে, অসম্পূর্ণ এসেছি রাখিয়া ।

কি এই নানাকার্য, কবি তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই । করিলে ভাল হইত । কবি এই সুযোগে তদানীন্তন অনার্যসমাজের অনার্য-সম্মিলনের, অনার্য অনৈক্যের একটা সজীব চিত্র আঁকিতে পারিতেন । এ চিত্রের আভাস তিনি রৈবতকে দিয়াছেন ; সেই চিত্র উদ্ভাসিত করিতে পারিতেন । তাহা করেন নাই । তাহার ফলে রৈবতকের সেই অনার্য-ঈশ্বর, অনার্য

নাহি দি পাইলাম কেন নাহি বলিলাম

হায় নাথ চরণে ভোঁয়ার ?

জলিয়া জলিয়া অভাগিনীর হৃদয় মরুভূমি হইয়াছে ।

হায় মাতঃ বহুকরে দখায়ই তুমি !

বহিতেছ বক্ষে তব কত মরুভূমি ।

এ হৃদয় মরুভূমি কর মা গ্রহণ

‘কারুর’ হৃদয়ের নিকুঞ্জ বনে

আজি জলিতেছে কিবা দাবায়ি ভীষণ !

উন্মাদিনী প্রতীহিংসারত আজিও ভুলে নাই—প্রভাসে উদ্ভাপিত করিবে ।

আর বাগবালা আমি দংশিয়া তাহার বুক

মাঝে, মরিখ তাকে এ বুকে নইয়া ।

শ্রোমনিরাশী, প্রতীহিংসা, রাজ্যলিপ্সা, স্নেহ, কোমলতা, অভিমান, সহিষ্ণুতা,

এই সকল বিচিত্র বৃত্তির সামঞ্জস্যে ও সংঘর্ষে কারুচরিত্র । জগতের কাব্যে
একুপ চরিত্রের সংখ্যা অধিক নহে ।

ধর্মরাজ্যস্থাপনে কৃষ্ণের প্রধান সহায় ব্যাস অর্জুন, সুভদ্রা অভিমত্যা ।
ব্যাস ও অর্জুন চরিত্রের বিস্তৃত সমালোচনা নিম্নয়োজন । কবি রৈবতক ও
কুরুক্ষেত্রে তাঁহাদের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে ধারণা হয়
যে, কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত

নব ধর্মমন্দিরে

ধনস্তর বাহবলে

করিতোছে কুরুক্ষেত্রে পরিণা খনন ;

নিয়কর্ষী ছৈপায়ন

কবিবেন জ্ঞানবলে

এই পবিণায় নব মন্দির স্থজন

‘তাহার গাভীর জ্ঞান অস্ত্র তত্ত্বরাশি’

‘তাহার ব্রহ্মাস্ত্র গীতা নিত্য অবিনাশী ।’

সুভদ্রা আদর্শ রমণী—‘রমণীর পূর্ণ সৃষ্টি’, রৈবতকের সেই বালিকা এখন
স্ববতী হইয়াছে । অর্জুনের প্রণয়িনী আজ অভিমত্যুর মাতা । তরল জন ও
ঘন ভূবারে যে প্রভেদ, রৈবতকের সুভদ্রা ও কুরুক্ষেত্রের সুভদ্রায় সেই প্রভেদ ;
যেমন অষ্টমীর চন্দ্র পরিণত হইয়া পূর্ণিমায়া, ষোলকলায় পূর্ণিত হয়, যেমন
সুভদ্রা গিরি-নিবাসিনী শ্রামল ক্ষেত্রে পূর্ণতোয়া হইয়া জীবনরূপিনী হয়, বালিকা
সুভদ্রা যুগতীবে বিকশিত হইয়া সেইরূপ হইয়াছে ।

সুভদ্রা 'ভূতলে রূপের স্বপ্ন', গুণেব সমষ্টি। গীতাব অপার্থিব ধর্ম তাহাতে
পূর্তিমান। বৈবতকে আমবা উনিয়াছি

যেইখানে বোগী শোকী ভদ্রা সেইখানে

সুষ্ঠিমতী শাস্তিকপে। অশ্রু সেইখানে

সেখানে ভদ্রাব কব।

কুরুক্ষেত্রে দেখি—সুভদ্রার

নাহি বাজি নাহি দিন থাক এলেনেব মত

লাগি অদে আহিত সবাব।

শিবিরে শিবিরে সুবি আহিতের শুষ্কযাব

হইয়াছে কি দশা তোমার।

রণান্তে প্রতি সন্ধ্যায় সেবক সেবিকা সৈন্ত চিকিৎসক সহ রণস্থল বুলিয়া
বেড়ায়। তাহাব জীবনের ব্রত পরহিত।

তোমাব অশ্রুতে অশ্রু কবির বর্ষণ

হৃদয়ের রক্ত দিয়া পারি যদি মুছাইতে

এক বিন্দু হবে মম সার্বক জীবন

তাহার রমণীজীবন আদর্শ অতি মহান।

জগতের পত্নী জগতের মাতা

জগতের দাসী রমণীচর। (বৈবতক)

বোগে শাস্তি দুঃখে দয়া ণেকেতে সাধনা ছায়া

দিদি এই ধবাতলে বসন্তের বুক। (কুরুক্ষেত্রে)

তাহাব কাছে শত্রু মিত্র আর্থ্য অনার্থ্যে ভেদ নাই।

তোমাব আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ

এক জল ভিন্ন জলাধার।

শত্রু এক ভগবান সর্বদেহে অধিষ্ঠান

সর্বময় এক অধিষ্ঠান।

না লোন, অনার্থ্য আর্থ্য কহিতে লাগিলা ভদ্রা

একই পিতাব পুত্র কন্যা সমুদয়

এক বস্তু এক মাংস এক প্রাণ সকলের

এক আত্মা এক জল ভিন্ন জলাধার।

তাহাব ব্যাপক হৃদয়ে পাণীব জন্তু স্থানের অসন্ধ্যাব নাই।

যেই জন পুণ্যবান কে না তাবে বাসে ভাল

তাহাতে সহ্য কি বা দার

পাশেরে যে ভাল বাসে

আমি ভাল গাসি তাহে

সেই জন প্রেম-অবতার ।

আর জগতের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা, জাগতিক প্রীতির পরিমাণই বা কত !

হুজুর পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ

কবি এই হতাননে পৃথিবী পাবক

মানবেব হৃৎপথ করে উন্মোচন

তবে শৈল ভাণ্ড্যবতী পুণ্ড্রবতী আর

কে আছে এ ধরাতলে মত হুজুর ?

এই জগতের হিতে আত্মবিসর্জনে আমবা হুজুর কঠোর কর্তব্যজ্ঞানের
পরিচয় পাই। সেই জন্ত স্বধর্মপালনে তাঁহাব এত অহুয়াগ। তিনি পুত্রকে
আশীর্বাদ করেন

লও আশীর্বাদ করি স্বধর্মপালন

স্বীতার ন্যায়াজ্য কর জগতে স্থাপন।

কৌরবেরা অস্ত্রায়ুদ্ধে পুত্রের ঘোর অমঙ্গল ঘটাইবে জানিয়াও, হুজুর
সেই জন্ত পুত্রকে যুদ্ধে যাইতে মানা করিলেন না।

ধর্ম যুদ্ধে করিয়া বারণ

কুমারে, কেমনে ধর্ম হইব গতিভা।

সেই জন্ত পুত্রের বিদায়ের কালে হৃদয়ে অমঙ্গল বিবাদ ছাড়া জাগিলেও

তথাপি একটি রেবা মুখে রূপান্তর

হইল না হুজুর।

ভ্রাতার ধর্মরাজ্যস্থাপনপ্রভেদে উদ্বোধন জন্ত ভগিনীর কতই প্রয়াস, কতই
একগ্রতা।

পিতা পুত্র মথ করে করিতেছে রণ

কুক হুজুর বহু বাইছে ডাসিয়া।

* * *

দয়ায়। নাহি শোক সাধিল তোমার কর্ণ

পুত্র যার তার শোক নাহি ধরাতলে।

তথ পলায়িতা, পুণ্ড্রবতী জ্ঞা তথা

এসবির অভিমুখ্য এই মহাক্ষয়

সাধিয়াছে যদি দেব মানবমঙ্গল।

* * *

এইরূপে দুইজনে প্রেম আলিঙ্গনে

বাধিব অনাথ্য আর্থ। গাইবে জগৎ

কুকনাম ; কুক-প্রেমে ডাসিবে ধরপী।

কবি সুভদ্রাকে পুত্রশোকে পোড়াইয়া তাহার অগ্নিপরীক্ষা দেখাইয়াছেন। সে অগ্নিও সুভদ্রার স্পর্শে চন্দনশীতল হইয়াছে। শোকের সাগর কুরুক্ষেত্রে শবচক্রমহাবেলায় মধ্যে, স্তম্ভিত প্রাঙ্গণে যথায় বিরাটপতি মুচ্ছিত, 'পাণ্ডব সকল বাচবিদ্ধ নীন-মত'।

কেল্লহলে অভিমমু শরের শয্যায়
নিজা যাইতেছে হৃৎ ; বক্ষে হলোচনা
মুচ্ছিত, মুচ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা

সেই মহা শোকক্ষেত্রে

কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক বিকারিত,
কেবল অচল সেধা একটি স্তম্বর
সেই নেত্র সেই বুক মাতা সুভদ্রার।

জননী যোগস্থা হইয়া পৃথিবী ভুলিয়া অচেতনা আকাশের পানে চাহিয়া
আছেন।

অচেতনা দেবী মাতা বসিয়া শিয়রে

দুঃখময় ধরা হইতে চিত্ত অবসৃত করিয়া নারায়ণে সমাধিস্থা আছেন।
এ ভাব কাহারও কাহারও চক্ষে আনুভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে।
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথমতঃ সুভদ্রা সমাধিস্থা ছিলেন, অর্থাৎ শোকের
বস্ত্র হইতে চিত্ত প্রত্যাহার করিয়া ভগবানে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই
সমাধির ফলে প্রহ্লাদ আত্মের ছেদ ও অগ্নির দাহনজ্বালার ক্রেশও অনুভব
করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহার ক্রব বিখ্যাত হইয়াছিল যে, অভিমমুর মরণে
মানবমঙ্গল সাধিত হইবে।

আমরা সকলে মেলি সাধিতেছি যেই ব্রত
একা অভিমমু আশ্রি করিল সাধন।
সফল জীবন ব্রত অধর্ম হয়েছে হত
হলোচনা মাতৃশ্রেয় অভিমমু আশ্রয়ান
নব ধর্ম রাজ্য তিজি চূড়া তার কৃকনাম।
এই নব ধর্মাসূত্রে দুঃখ রহিবে না আর
অপতের হবে ধনা হৃৎ শান্তি পাণ্ডাবার।

তৃতীয়তঃ পুত্রের বীরত্বগৌরবে বীরমাতার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

সন্মিলিত সপ্তবধী, বিমুখি ভীষণাহবে।
এই শরশয্যা শেষে হইল সাহার
তার জননীর শোক সত্তবে কি আর?

শেষ কথা, স্তম্ভদ্রার মেহ এক পুত্রে সীমাবদ্ধ না করিয়া সমগ্র মানব জাতিতে সংক্রামিত হইয়াছিল ।

সমগ্র মানব জাতি আদি অভিমুখ্য মম
আজি অভিমুখ্য মম বির চবাচর
এক মম পুত্র মম হাবাহিষা লভিবাছি
আমি কি মহান পুত্র জনন্ত অমব ।

এরূপ অবস্থায় শোকের উচ্ছ্বাস বা উন্মাদতা সম্ভবে না । যতটুকু শোক স্বাভাবিক, ততটুকুই হইয়াছিল ।

একটি লহরী মাত্র তুলিল এক উচ্ছ্বাস
পুত্রের অশ্রু-ছায়া বহিল একটি বোনে ।

এই স্তম্ভদ্রাচরিত্র । এরূপ শোভাময় শাস্তিময় পবিত্রতাময় মহিমাময় চরিত্র জগতের সাহিত্যে বিরল ।

কৃষ্ণ, অর্জুন, স্তম্ভদ্রা ও অভিমুখ্য সম্বন্ধে কবির এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

জ্ঞান দেব নারায়ণ, বল দেব ধনঞ্জয়,
মধ্যে ভক্তি দেবী ভদ্রা, সম্মুখে মহিমাময়
চিতা আশ্ববিনস্কন, জ্ঞান বল আশ্রয়
ভক্তিব নিফামহুদ্রে সন্মিলিত সম প্রাণ ।

ধর্মরাজ্যব্রতে এই আশ্ববিনস্কন বালক অভিমুখ্যর । কবির চিরবিশ্বাস

নিষ্পাপ মানব পুত্র নাহি দিলে বলিদান
আত্মপ্রাণ হবে না কি মানবের পবিত্রাণ ।

মানবউদ্ধারে এই আশ্ববিনস্কন বালক অভিমুখ্যর ।

পাবিল না পিতা পুত্র করিল স্থপিত
আজি ধর্মরাজ্য দিয়া আশ্ববিনস্কন ।
আমরা সকলে মেলি নাথিতেছি সেই ব্রত
একা অভিমুখ্য আজি কবির সাধন ।

কি মহান উদ্দেশ্য, কি বিশাল উদ্ভম, কি যুগসংস্কারী ব্রত ! এই উদ্দেশ্য উদ্ভম ব্রত যে পরিমাণে মহান বিশাল যুগসংস্কারী, তাহার সাধনের জন্য বলিদানের বস্তুব-তেনি গোবব মহিমা মহত্ব হওয়া উচিত । এইরূপে স্থপতির সামঞ্জস্য-বিধি বক্ষিত হয় । কবি অভিমুখ্যচরিত্র যে তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ধারণা হয়, যে ধর্মরাজ্যসাধন, এবং মানব-উদ্ধার সাধন-ার্থে আশ্ববিনস্কন বলিদান ।

অভিমহু্য 'কৌরবধনির শিশুমণি সর্বোত্তম' । ত্রিদিবপ্রসূত বারিবিন্দু
পৃথিবীর শুভিতে মুক্তার ঘনীভূত হইয়াছে ।

দেব প্রতিভায়

বিক্রমে বাহাস্ত্র্যে জ্ঞানে অভিমহু্য মম

আমার (অর্জুন) অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ অর্ধ শুণে ।

অভিমহু্যর কবিতার জ্যোৎস্না সঙ্গীতের বীণা নিকপমা ।

কেন নিজে বাবাধণ

প্রশংসা ত সর্বকণ

করেন চিত্তের তব, তব কবিতাব ।

তাহার প্রীতি সীমাহীন ;

শত্রু মিত্র তাব কাছে উভয় সমান,

উভয়ে সমান প্রীতি ভক্তি সমতুল ;

শিশুরা সকলে ভাই, পিতৃব্য আমবা

সকলেই ; পত্নীগণ সকলি জননী,—

সমস্ত জগৎ তার প্রেমের নির্যব ।

তাহার সকল শৈশবশিক্ষা এইরূপ—

সকল পুরুষ পিতা ; বমণী জননী—

সকলের পুত্র কন্যা ভাতা ও ভগিনী,

দেখিব সকল জীব আপনাব মত

পবহিত প্রাণপণে সাধিব সমত ।

ইহার ফল আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই,—

যথাব ক্ষত্রিয়গণ হইয়াছে সঙ্গবেত

সেই যুদ্ধে কেন হই আমি বা কাতর এত ।

কেন সিংহেশিত্ত আমি শুনি বীর সিংহবাদ

না নাচে হৃদয় মম ।

আর এই প্রীতিব কবি একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন । একদিন অভি-
মহু্য তৃষ্ণায় কাতর হইলে

সাবধি আনিল বাবি, আজহে মা পানপাত্র

লইয়াছি করিবারে পান,

দেখিলু অদূরে মাগো,

পুড়িয়া সৈনিক এক

অজ্ঞাহত কণ্ঠাগত প্রাণ ।

স্বত্বানুগে পিপাসাব

রখেছে চাহিয়া হাব

মম পানপাত্রে নেত্র স্থির—

ছুটে গিরি কাছে তার কহিলাম পান কর
আনিয়াছি হৃদয়ল নীর ।

মাতা পিতা মাতুলের প্রতি তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা অগাধ অপরিমিত ;
মাতা দেবী পিতা দেব মাঝা নারায়ণ,
আমি তোমাদের মাগো পুত্র নরাধম ।

তাহার পত্নী-প্রেম অন্তলম্পর্শ—

ইচ্ছা থাকি প্রেম অনন্ত বপনে
ওই বুকে মরি জাগি না আর ।

কুরুক্ষেত্রের মৃত্যুশব্দায়—

কহিল কুমার, 'সুত । ললাটে আমার
লেখ হৃদয়েব বসে শরের জিহবার,
কৃষ্ণার্জুন নাম, মধ্যে মাতা হস্তদ্বার—
লেখ বুকে অনাথিনী নাম উত্তরার ।'

* * * গাহিতে গাহিতে
পুণ্য নাগ চতুর্ভুজ হুদিন নয়ন ।

অভিমতের কর্তব্যনিষ্ঠা ও স্বধর্মপালন হস্তদ্রাব্যতের অহরূপ ।

স্বধর্মপালনে মাগো করি প্রাণদান
জন্মে জন্মে তোমাদের পদে পাই স্থান ।

* * *
ধর্মহীন প্রিয়তমে স্বধর্ম আমার
এই কুরুক্ষেত্র মম জীবনের ঘার ।

* * *
নাথদের পরিজ্ঞাপ হৃতত মনন
নাথিব করিব ধর্মসাম্রাজ্য স্থাপন ।

তাহার বীৰ্য্য তরুণ ভাস্করের স্তায় স্নিগ্ধ প্রেধর—

হাসিমুখে নিত্য বায় নিত্য করে রণ
রণক্ষেত্র যেন তার খেলার প্রাঙ্গণ,

* * *
বাদ্য পাণ্ডব শক্তি যমুনা জাহ্নবী—
বহিতেছে এই তুমি ধাবা সন্মিলিত
* * * এই ভুলে মম
হৃদয় পার্শ্বের বল, শিক্ষা গোবিন্দের ।

সেই বল সেই শিক্ষার পরিচা পলায়মান সপ্ত রথীর পৃষ্ঠদেশে শোণিত অঙ্করে

লিখিত হইয়াছিল, কামের প্রস্তরবক্ষে খোদিত হইয়াছিল। আর অভিমুখ্যর মরণও আদর্শ-জীবনের উপযোগী—

* * * কহিতে কহিলে

‘নারায়ণ ধর্মরাজ্য পতিত-উদ্ধার
শুনিতে শুনিতে অয় অভিমুখ্য ময়
অনন্ত কোঁরব কঠে মুদিল নয়ন।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন, সেই মহাদিবার, ভারতের জগতের সেই শোকের সেই স্মৃতির দিনের—

অবসান ? না না, নাহি এই দিবসের—

অবসান। ব্যাপি চারি যুগ মহাকাল
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন এই দিবালোক
ছলিতেছে, ছলিবেক।

আর উত্তরা—

কুত্র একখণ্ড কুল নিবাস
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরা

বাহার

আনন্দনির্ব্বর উথলে-হৃদয়ে
আনন্দনির্ব্বর নয়ন-তাঁবা,
আনন্দনির্ব্বর কুত্র রক্তাধর
চালে অবিরল আনন্দধারা।
সারাদিন তার পুতুলের বিয়া *
হলুধনি উচহাসি,

সেই ‘পুতুল বিরাটবালা’টির অভিমুখ্যর পাশে কেমন শোভা হইয়াছে। যেন মেঘের সঙ্গে তড়িৎ, কবিত্বের সঙ্গে প্রতিভা। পিতার স্নেহে মায়ের আদরে পতির সোহাগে উচ্ছ্বসিতা হইয়া উত্তরা যবে ভাবে ‘কে সুখী আমার মত,’ তাহার পরদিবস স্বর্ধ্যাক্ষের পূর্বে অভাগিনী জিজ্ঞাসা করে,—‘ভাদ্রিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?’ ইহাই বিড়ম্বনার নামান্তর জগৎ !

উত্তরার প্রেমের গভীরতার, শোকের পবাক্ষাটার ইতিপূর্বেই আলোচনা

* উত্তরার এই বালিকাহলুদ পুতুলখেলায় কাহারও কাহারও আগন্তি শুনিবাছি।

এ পুতুলখেলা ঐতিহাসিক, মরণ বাস মহাজীবতে উত্তরগোপ্ত্রে অর্জুনকে উত্তরার পুতুলের রক্ত বিচিত্র বসন সংগ্রহ করাইয়াছেন।

কবিরাজি । সে শোকের পরাকাষ্ঠা বুঝিলে, সে প্রেমের গভীরতা বুঝা যায় ।

সে শোক কি দারুণ, যাহাতে ছয় দিনে বালিকার কেশভার শুভ্র হইয়া যায় ।

করিতে সে শোকচিহ্নে বেখাট গভীরতর
না পারিল পিতৃশোক জাতৃশোক চিত্রকর ।

উত্তরা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ণ সৃষ্টি; এত হাসি ও অশ্রুর সম্মিলন, এত প্রমোদ ও বিবাদের সমাবেশ, এত মেঘ ও বোজের মিশামিশি, আর কোথায় আছে, মনে পড়ে না ।

উত্তরা যে বীরপত্নী, বীরোত্তম অভিমত্যুর অর্দ্ধাঙ্গী, তাহা একটা ঘটনার বেশ বুঝা যায় ।

পতিশোকে রিবারিনী
উঠি ধীবে ধীবেশেবে কহিল 'মা চল বাই'
কোণাষ ? মা উত্তরার একস্তির গতি নাই
পতিব অলস চিতা ।

কিন্তু যখন অনাধিনী উত্তরা শুনিল যে,

তুমি কোরবের লক্ষ্মী আছে-মা গর্ভে তোমাব
একই অঙ্কুরমাত্র কোববেব ভবনার,

তখন মৃত্যুর অধিক জীবনব্রত পালন করিতে স্বীকৃত হয় ।

ছয় মাস পরে যেন ছব বৃণ উত্তরাব-

উত্তরা আসিবে অন্তে স্বর্গে তাব প্রস্ফুট ।

পতিব চিতার এই মৃত প্রাণ সমপূর্ণ

নহে মৃত্যু অনাধার দীর্ঘরত্ন এ জীবন ।

আর, হুলোচনা—তাহার হৃদয় গোলক অবিরত অভিমত্যা-সমীরণে প্রপু-

রিত ছিল ।

হুলোচনা দুঃখিনীর কে আছে কি আছে তার

একা তুই সর্ব্বব তাহার

তুই ধর্ম্ম তুই কর্ম্ম

তুই মায় তুই মর্ম্ম

তুই অবলম্বন আমাব ।

তোর মুখচন্দ্র স্বর্গ

তোর গুহ কমলক্ষেত্র

তুই মম সকল সংসার ।

উত্তরা ও অভিমত্যা

তুই পুত্র কন্তা মম

ধাকিব লইয়া আনি বুকে

এই মম নারীধর্ম্ম

ধাকে যদি ধর্ম্ম আর

মাঝি শত ঝাঁটা * তাব মুখে

* হুলোচনার সে কলহপ্রিযতা, তাঁর স্নিহাভাৱ সে অল্প গালিবর্ষণ (যাহাব সহিত বৈবর্তকের পাঠক অপরিচিত নহেন) তাহা কল্পক্ষেত্রেও পূর্ণ মাত্রায় আছে । সে ভগ্ন কলহেব মল্লী সত্যভামাষ দেখে । শাবক ছাড়াইবা স্বগড়া অন্তর্নে স্নিহা কণ্ঠস্বনে অধির হয় । আর,—

উত্তরার মুখেও শুনি।

না নিলেও অভাগী যে বাইবে মবিয়া
না পাবে থাকিতে এক তিল না দেখিয়া
মুহুর্তেক যদি আমি থাকি লুকাইয়া
বৎস-হারা গাভী মত মরে গবজিয়া।

নিদারুণ কাল সে সর্বস্ব কাড়িয়া লইলে সে অভিমম্বাকে হৃদয়ে লইয়া অনন্ত
নিদ্রায় নিদ্রিত হয়।

প্রিয় পুত্রে লয়ে বক্ষে হুলোচনা পুণ্যবতী
লম্বিবাছে নিরবাণ একই চিতাব সতী।

তাহার নিয়তি অভিমম্বার সহিতই পূর্ণ হইয়াছে। হইবারই কথা;

হাসে নাই নিজ হৃদে কাঁদে নাই নিজ দুখে

চিরদিন প্রেমময়ী সলিলেব মত

আপন তবল প্রাণ পরে কবিয়াছে দান

হুলোচনা চিরদিন পর-প্রাণ-পত।

তাহার নিয়তি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু কি নিষ্কাম, কি গভীর, কি নিশ্চল, কি
পুণ্যধার!

কুরুক্ষেত্রের আলোচ্য চরিত্রসৃষ্টির শেষ দৃষ্টান্ত শৈলজা। রৈবতকের পাঠ-
কের কাছে, শৈলজা অপরিচিতা নহে। রৈবতকের সমালোচনায় দেখিয়া-
ছিলাম যে, ‘অতুল রূপ, অমৃতভরা হৃদয়, অদ্বিত সাহস, অকৃত্রিম প্রেম, অবা-
চিত আত্মত্যাগ, নিরাশার অতুল শান্তি, সফল মিলিয়া শৈলজা এক অপূর্ণ
সৃষ্টি হইয়াছে।’ দেখিয়াছিলাম, নাগবালা শৈলজা পিতৃহস্তা অর্জুনের কাল-
ভুজঙ্গিনী মত দংশন করিবার জন্য ছদ্মনামে ছদ্মবেশে অর্জুনের দাসত্ব গ্রহণ
কবে। কিন্তু অর্জুনের প্রীতিপূর্ণ মুখ, শোকপূর্ণ অমৃততাপ দেখিয়া শুনিয়া
তাহার হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটে। শেষ অভাগিনী প্রতিহিংসা ভুলিয়া অর্জুনের

তাই লো বিরলে বসি

সত্যভামা উদ্দেশ্যে

ছাড়ি শব্দভেদী শর দল।

কবি একটি ছোট ঘটনায় হুলোচনা চরিত্র বেশ প্রস্তুত করিয়াছেন। হস্তপ্রাণ অভি-
মম্বা মহাপ্রহর গীতা পড়িতেছে।

হুলোচনা কাছে বসি হাই তুলি কিছুকণ

চলি গেয়া ব্যাস দেবে কবি মিষ্ট সম্ভাষণ,

এই মিষ্ট সম্ভাষণ অনেক সময়েই বেশ লাগে। কিন্তু কিছু অতিরিক্ত হইয়া বঠ মর্মে।
বসন্ত কবে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

পরে অনাথ জীবন সমর্পণ করে। অবশেষে অজ্ঞানকে সুভদ্রার প্রেমাকাজক্ষী দেশিয়া নিরাশহৃদয়ে তাঁহার সুখাকাজক্ষার আশ্রয়স্থল বলিদান দিয়া অজ্ঞানের সুভদ্রালাভের পথ নিশ্চল করিয়া দেয়। তাহার পর আরক্তবসনধারিণী যোগিনী সাজিয়া ঝাঁপোচ্চাস-অবরুদ্ধ কণ্ঠে অজ্ঞানের নিকট আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়া শৈলজা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়। তাহার বিদায়ের কালের কথাগুলি এই,—

বিদ-চরাচর

হবে সব পার্শ্ববর; আমাব' হৃদয়
রহিবে অতিশয় নিত্য অজ্ঞানেতে লয়
ভূমি পিতা ভূমি মাতা ভূমি প্রাণেশ্বর
ভূমি শৈলজার এক প্রমত্ত বিশ্বর।

সুহৃৎক্ষেত্রে যখন তাহার সাক্ষাৎ পাই, তখন শৈলজা নব-জীবন লাভ করিয়াছে। এই নতুন জীবনলাভের কাহিনী কবি অপূর্ণ কোশলে বিবৃত করিয়াছেন। অজ্ঞানের কাছে বিদায় হইয়া একাকিনী অনাধিনী শৈলজা নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। পৃথিবীর শত সৌন্দর্য্য তাহার নিরাশ চক্ষে মরুময় বোধ হইতে লাগিল।

আগে মরু পিছে মরু মরু চারি দিকে
হ হ করিতেছে মরু প্রাণের ভিতরে।

ক্রমে অজ্ঞানের প্রতি পতিভাব ঘুচিয়া পিতৃভাব হুটিতে লাগিল। করাল কামনা সুখময়ী করনায় পরিণত হইল। শৈলজা হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিল।

ঈর্ষ্যার নয়ন নিভিল হৃদয়ে
ভাসিল শান্তি দীপ্তল
মেলিল নয়ন বেলা অবসান
শান্তি পূর্ণ ধরাভল।

সেই অবধি শৈলজার নব-জীবন আরম্ভ হইল। শৈল বিদ্যাচলে পার্শ্বের মুখমূর্ত্তি গড়িয়া ভক্তিভরে তাহার পূজা করিতে লাগিল। চৌদ/বৎসর ধরিয়া পূজিতে পূজিতে

* অভিমত এ পার্শ্বপূজা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ,—

পথে পুষ্পে হৃদয়ভিত, বেষ্টী-বক্ষে হৃদয়পিত
পিতার মুখমূর্ত্তি হৃদয় নিখিল
মনোহর মুগ্ধার বেশে শোভমান।

সেই গতিভাব ঘেবি হইল বিলীন

সিকুম্বী গঙ্গা মত। এই চরাচর

হইল অর্জুনময়, হইল তমর।

একদিন ব্যাসদেব শৈলজার কুটারে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিলেন,

সিদ্ধ তব পার্শ্বপূজা, পুত্র তুমি এবে

পার্ষ্বরূপে ভগবান্ অনন্ত হনয়।

* * পুত্র ভক্তিভরে তবে

বাদ্য মানব কৃষ্ণ যুগ-অবতার

পার্ষ্ব কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর নারায়ণে নয়।

{ শৈলজা পিতার মুখে শুনিরাছিল, ধর্ম্মেই সূত্র, 'ধর্ম্ম বিনা আর, হইবে না কোন মতে অনার্য্য-উদ্ধার'। ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য্য করিল। }

গাও তবে কৃষ্ণনাম, গাও বনে বনে

গতিতপাবন নাম, অনার্য্য-উদ্ধার

হবে এই নামে; মন্ত্র নাহি জানি আর।

তদবধি শৈলজা পরহিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। কন বনে কৃষ্ণনাম গাহিয়া অনার্য্য * উদ্ধারের, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের সহায়তা করিতে লাগিল।

পুলকে ভরিয়া বুক

গাহিতেছে শারিত্তক

জনকের দশ নাম বিহঙ্গ-নিচর,

হানে হানে শিল্পায়

বনবিহঙ্গেরা গায়

বুকে বুকে শুনি সেই নাম পুণ্যায়

নামের সঙ্গীতে বন অতিক্রমিয়।

* শৈলজার স্বজাতিবাৎসল্য বড় মর্ম্মস্পর্শী,—

(স্বজ্ঞার প্রতি)—এ ভারতভূমি,

বাহাদুর পিতৃভূমি সে অনার্য্য জাতি

আজি কোথা? যেখ আছা কি দশা তাদের

রাজ্যহীন গৃহহীন আহাববিহীন।

* * * * অমাবস্তা ঘোর

অনার্য্যের হাং দিদি রবে কি এমন,

গতিতপাবন হবি, এ গতিত জাতি

পাবে না তাহার দয়া?

(অর্জুনের প্রতি)

বমপুত্রগণে তব দেহ অধিকার

শ্রেমসর পুত্রশোক রবে না তোনাব।

পারিব যে দিন মিলি ভগিনী দুজনে

আর্য্য অনাধ্যের শক্তি করিয়া সিলিত

সেই মহা ধর্মরাজ্য করিতে স্থাপিত

সেই মহা প্রয়াগতীর্থ দেখিব যে দিন

আর্য্য অনাধ্যের শক্তি হস্তজা শৈলজা

বহিতেছে এক স্রোতে জাহ্নবী যমুনা ।

বিক্র্যাচলে শৈলজার পুণ্ড্রাশ্রমে একদিন অভিমত্যা যুগয়ায় পথ হারাইয়া

উপনীত হন । তাঁহাকে দেখিয়া শৈলজার—

কি মধুর মেহ-হাসি-কুটিল সে মুখে

কি মধুর মেহ-স্রোত উথলিল বুকে ।

সেই অবধি একটি নতুন মেহনিব্বর শৈলজার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে

থাকে । তাহার হিলোলে আঁকুল হইয়া শৈলজা—(অধাস্থিক সপ্তরথীর পাণ-

ময়না-নিষ্ফল করিবার আশার)—গভীর নিশাকালে অজ্ঞানের শিরিরে

সুভজার সহিত সাক্ষাৎ করে । এই সুভজা-শৈলজা-মিলনে কবি উভয় চরিত্রের

বৈচিত্র্য বড় সুন্দর ভাবে প্রকট করিয়াছেন । উভয়ই পার্শ্বানুরাগিণী, উভয়ই

অভিমত্যা প্রতি মেহবতী, কিন্তু উভয়ের মেহ ও প্রেম রূত ভিন্ন প্রকৃতির ।

যোগের একটি অবস্থা আছে, তাহাকে কষায় বলে; সে অবস্থায় বস্তু

থাকে না, কিন্তু বস্তুর বীজ অতি নিস্তেজভাবে চিত্তের অভ্যন্তরে লুকায়িত

থাকে । বিচ্ছেদের প্রবল হেতু উপস্থিত হইলে, সেই বীজ বাস্তু হইয়া চিত্ত

বৃত্তিরূপে প্রকটিত হয় । কষায় অবস্থায় এই বীজ দৃঢ় করিতে পারিলেই

যোগীর সাধনা সম্পূর্ণ হয়, যোগী সমাধি লাভ করেন ।

শৈলজার পার্থপ্রেম অনেক সাধনার এই কষায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

প্রেমের উচ্চাস ছিল না, কিন্তু নিস্তেজ বীজ মর্শের অন্তস্তলে নিহিত ছিল ।

সেই জন্ত অজ্ঞানের বক্ষে সুভজার সুপ্ত মুখ দেখিয়া (মানস সরসে যেন

একটি কমল)

ইবং কাপিল চন্দ্র সংযত হৃদয়

যোগিনীর অলঙ্কিত, কাপিল ভূতল

অনন্ত ভূখর ভাবে হির অবচল ।

সেই বীজ দৃঢ় করিল অভিমত্যা শোক । যোগিনীর যোগসাধনা সম্পূর্ণ

হইল । হৃদয়-নিবৃত্তিনিষ্কম্প সাগরের ত্রায় গভীর শান্তিতে ভরিয়া উঠিল ।

চতুর্দশ বৎসরের তপস্যার পরে

ছিল যেই শুভ্র ছায়া প্রাণে কামনার
পুত্র আছি-প্রাণ দিয়া মুছাইল সেই ছায়া
পতি পিতা পুত্র তুমি আছি শৈলজাব
পুণ্যবতী—আছি পূর্ণ তপস্তা আনাব।

অতএব

শাস্তির ত্রিদিব বুকে পুত্র সমর্পিয়া হুখে
করি আনাদেব শোক চরণে অর্পণ
গাই কৃষ্ণ নাম মাগো জুড়াই জীবন।
বনবিহঙ্গিনী মত উধাও উড়িয়া
গাব কৃষ্ণনার মাগো বিষ জুড়াইরা।

শোকে এই অপরূপ শাস্তি বিধান করিয়া পিতৃস্নেহে শৈল-অবকদ্ধ গৃহমুখী
পতিপ্রেমমন্ডাকিনীধারা-পতিত অনার্য জাতি উদ্ধার জন্ত বনভূমে বহাইরা;
কবি শৈলজা-চরিত্র সাক্ষ করিয়াছেন।

স্বল্প দৃষ্টিতে দেখিলে স্ত্রীজা ও শৈলজা কেবল আর্য ও অনার্য রমণীনাট্য
নহে, কিন্তু আর্য ও অনার্য শক্তির প্রতিকূপ। যমুনা ও জাহ্নবী যেমন
প্রমাণে মিলিত হইয়া পুণ্যতম-তীরের সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ আর্য ও অনার্য
শক্তি কৃষ্ণের পদতলে সম্মিলিত হইয়া পতিত উদ্ধার করিয়া প্রবাহিত
হইয়াছে।

দাঁড়িয়া থাক নাথ নিবন্ধি নরন ভবি
আর্য অনার্যেব লক্ষী থাক মা চরণে পড়ি,

এত দূরে কুরুক্ষেত্রের কাব্যাংশের সমালোচনা শেষ হইল। বারাস্তরে দর্শ-
নাংশ আলোচিত হইবে।

শ্রীহীনেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রতিশোধ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কিছু দিনের অনিষ্ঠতা-কৃষ্ণ-সর্দার বুদ্ধিতে প্রারিল; বৈজ্ঞান্যথের বল শক্তি যত,
সাহস এবং বুদ্ধি সেই অল্পপাতে কম। বুদ্ধি, এত দিন বে তাহাব চলিয়াছিল,
সে কেবল বিশ্বনাথ তাহাকে চালাইত বলিয়া। কৃষ্ণ সর্দার নিজের বাড়ীর
কাছে তাহার ঘর ছবার তৈয়ার করিয়া দিল, এবং যথাসম্ভব সর্বদা তাহাকে

কাছে কাছে রাখিত । ইহাতেও কিন্তু গোপসন্তান নিঃশঙ্কিত হইতে পারিত না । বিশ্বনাথের ভয়ে রাত্রে প্রায় তাহার নিদ্রা হইত না ।

অতএব বৈষ্ণনাথ-দত্ত আশ্রমের ভরসায় একান্ত নির্ভর না করিয়া কৃষ্ণ সর্দার নিজের চরদের দ্বারাও খবরাখবর লইতে লাগিল । বিশ্বনাথ বা তাহার দলে

কাহারও ঝোঁকখরপ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু অজ্ঞাত-বৎসরের চেয়ে এবার স্বরূপগঞ্জের আশ্রমের পূজার ধুম বরঞ্চ বেশী । কোশলী কৃষ্ণ সর্দার বিশ্বনাথের

চতুরতা-কতক না বুঝিল, এমন নহে । বৈষ্ণনাথ অভয় দিয়াছিল, নবগ্রীপূজার বলির সময়-দলপত্নী অবশ্য ধরা পড়িবে । কৃষ্ণ সর্দার বুঝিখরচ করিয়া স্থির

করিল, বায় যদিই কাঁদে পড়ে, মহাষ্ট্রীর সন্ধিপূজাঞ্চল তাহার উপযুক্ত অবসর । বগ্নী সপ্তমী একরূপ নির্ঝিল্লি কাটিয়া গেল । কৃষ্ণ সর্দার সদলে ককনগরের

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের-হুক্মে হাজিরী দিতে-গিবাছে, এবং পূজার ছুটিতে তাঁর শীকারখেলার সহায়তা করিতে যাইবে, ইহাই রাষ্ট্র । বাস্তবিক অষ্টমীর

মধ্যাহ্নে প্রায় পঞ্চাশ-জন লপঙ্গ অশ্বারোহী সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট-ইলিয়ট শীকারে বাহির হইয়া-গেলেন ।

বেলা তৃতীর প্রহরে-সন্ধিপূজা । যথাসময়ে ভাগীরথীর অগর-তীরে নদীয়ার, বোম এবং বন্দুকের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হইল । তখন স্বরূপগঞ্জ হইতে

বোমের উপর বোম ফুটিয়া উঠিয়া জালুবা-খড়িয়ার সঙ্গমস্থল কম্পিত করিয়া তুলিল । বাস্তভাণ্ডকোলাহলে ভাগীরথীর উত্তর কূল স্পন্দিত হইতে লাগিল ।

এমন-সময়ে নদীতীরের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথে সহস্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোদ্ধ বেশী অশ্বারোহী সিপাহী দল সঙ্গে দেখা দিলেন । দেখিতে-দেখিতে সেই

হুত্র সেনা বিশ্বনাথের আশ্রম চতুঃসীমা অররোধ করিয়া দাঁড়াইল । কৃষ্ণ সর্দার একটু পশ্চাতে ছিল, তখনও আসিয়া-পৌছে নাই ।

স্বারে-দীর্ঘমুষ্টি বলিষ্ঠদেহ বৈষ্ণব এক জন অনারত প্রশস্ত বন্ধে চন্দনের অঙ্করে হরিনামেব ছাপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল । ইলিয়ট সাহেব তাহাকে

দেখিয়া-অশ্ববেগ সংযত করিলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন—“কোন ছায় তুমি ?—বিশ্বনাথ বাবু ?”

বাবাজীটি আর-কেহ নহেন,—ভগবান মদক স্বয়ং । সে সাহেবকে সেলাম করিয়া আশ্বপরিচর দিবে, ঠিক এমন সময়ে কৃষ্ণ সর্দার সদলে বিস্তর লাঠি

সড়কী লইয়া পৌছিল । সাহেব ভগবানের দিকে বেজ নির্দেশ করিয়া তাহাকে স্খাইলেন—“কেমন, এই বিশ্বনাথ বাবু ?”

কৃষ্ণ সর্দার অনেক দিন বিশ্বনাথকে দেখে নাই, ভগবানকেও চিনিত না, সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। বৈষ্ণনাথ চাল তলওয়ার ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, ইঙ্গিতে সর্দার ভগবানের পরিচয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। ইলিয়ট সাহেব বক্রদৃষ্টিতে ইহা লক্ষ্য করিলেন। বৈষ্ণনাথ করষোড়ে বলিল, “ধোদাবন্দ, এ ব্যক্তি বিশেষ ডাকাত নয়, তবে তা’র দলের লোক বটে।”

“কি! আমাকে বলিস্ ডাকাত, বাটা ভেমো গোরালা? এক চড়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব জানিস? মাজিষ্টার সাহেবের সামনে বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না।” ভগবান সদর্পে গর্জন করিয়া উঠিল। বৈষ্ণনাথ জানিত, ভগবানের পক্ষে ইহা সম্ভব। অতএব সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। খতমত খাইয়া বলিল, “না মোশাই তোমাকে কি আমি ডাকাত বলতে পারি। হজুর ভগবান ওনার নাম। অনেক কাল ডাকাতের দল ছেড়েছেন, বড় ভাল লোকটি।”

ভগবান হাসিল। “ধর্মাবতার! আপনি হলেন ইনিয়ার মালিক। একমুখে ছ কথ্য শুনলেন! এদের কথায় বিশ্বাস হতে পারে কি না, বিচার করুন।”

সাহেব একটু করিয়া কৃষ্ণ সর্দারকে শাসাইয়া উঠিলেন, “দেখাও আভি কাহা হায় বিশ্বনাথ ডাকাত। নেহি ত আচ্ছা নেহী হোগা।”

কৃষ্ণ সর্দার বৈষ্ণনাথকে দেখাইয়া দিল। “জানাব আলী, এই গোয়েন্দীর কথায় পিত্তর করে আমি মারা বেতে বসেছি।”

বৈষ্ণনাথ রোদনোন্মুখ হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ইচ্ছা—বলে যে, নবমীর দিন আসিতে বলিয়াছিল, আজ নহে; কিন্তু কথা ফুটিল না। ইলিয়ট সাহেব তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুই বেত কবাইয়া দিলেন। তারপর পূজা বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

পূজাদর্শকের অধিকাংশ জীলোক সেই অবসরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সীপাহিরা কাহাকেও বাইতে দিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূজারাত্রে সাহেব যখন প্রবেশ করিলেন, তখন আরতি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাহিরের গোল ভিতরেও প্রবেশ করিতেছিল—পুরোহিত নূতন লোক, পূজাটা শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলে বাচেন, সকলেই চঞ্চল এবং উৎকণ্ঠিত। কেবল বাটার পরিচারিণী জীলোক দুটি স্থিরভাবে প্রতিমার উত্তর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর বীজন করিতেছিলেন।

সাহেবকে দেখিয়া সরলা চামর ফেলিয়া ঘোমটা টানিয়া নৈবেদ্যের ধরে

পলাইল। অপরা—মীরা—কিন্তু কোনও চাকল্য প্রকাশ করিল না, পূর্ববৎ
বীজ্ঞন করিতে লাগিল। একবার মাত্র ধূনাচূর্ণ লইয়া ধূপদানিতে দিল। পট্টবন্ধ-
মণ্ডিত সে গোবীমূর্তি, মহিমাময়ী অথচ লজ্জাবিনতা—ইলিয়ট সাহেব প্রশংস-
মান চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ইনি?”
স্থির বিদ্যুতের নত-কশাক্ষী সরলা বে চকিতে পলাইয়া গেল, তাহাও ইলিয়ট
লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুধাইলেন—অন্ত জীলোকটিই বা কে?”

ভগবান বলিল, “ইনি বিক্রমসিংহের কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর গঙ্গাতীরে
বাস করতেন। অন্তটি এঁরই বহিন; এঁরই এ বাটীর মালিক।”

সাহেব চগমার ভিতর হইতে স্থির দৃষ্টির কটাক্ষ-বর্ষণ কবিয়া ভগবানকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি তবে কে?”

হাসিয়া ভগবান উত্তর করিল, “ধর্ম্মাবতার! আমি তাঁদেরই ছেলো, নিজের
হরিনাম নিয়ে থাকি।”

ইলিয়ট সাহেবের সন্দেহ হইল। এই বুড়াটা বলে কি না, সে এই মুরতীদের
হেলে; অবশ্য এর ভিতর রহস্য আছে। সাহেবের দোষ—ছিল না। তখন
ইংরেজ এ দেশে সবে নুতন, এদেশী রীতি নীতি জ্ঞানের বড় ধার ধারেন না।
মাতৃবৎ পরদারেষু—বে-হিন্দু সভ্যতার অস্থি-রজ্জা, তখনকার কথা দূরে থাক,
এখনও সাহেব-মহলে সে তত্ত্ব পরিস্কট হয় নাই। তখনকার ইংরেজের চক্ষে
নেতীভের কননীষষ্ঠগম্যাবজ্ঞিত। প্রমাণ, মেকলের কটুক্তি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব তীক্ষ্ণ স্বরে ক্রয় সর্দারকে ডাকিয়া বলিলেন, “বোলাও
তোমার গোঙ্গল্লাকো!” বৈষ্ণনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল, সাহেব মীরান-
দিকে বেজ-নির্দেশ করিয়া তাহাকে জুধাইলেন যে, সে তাঁকে চেনে কি না?

ডাকাতের-রাতের সে দেবীমূর্তি বৈষ্ণনাথ ভুলিতে পারে নাই। সরলাক্রেড়
তার বেশ মনে ছিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “চিনি, বিক্রমসিংহের রোটা।”

ইলিয়ট ভগবানকে বলিলেন, “দোসরা জেনানাকোভি সনাক্ত করনে
হোগা!” ভগবান করযোড়ে প্রার্থনা করিল, পূজা শেষ হইতে দেওয়া-হোক।

আরতিটা দেখিতে সাহেবের মন লাগিতেছিল না। কিন্তু চাক-চৌলের
বাছ তাঁর কানে বড় বাজিতেছিল। তিনি বাজনদারদের দিকে বেত উঁচাইয়া
হাকিলেন, “বস, চুপ রও!” তার পর বিনা বাস্তে কেবলমাত্র বণ্টা বাজাইয়া
কম্পিতদেহ পুরোহিত ঠাকুর রথাসম্ভব সত্ত্বর সন্ধিপূজা শেষ করিলেন।

ভগবান সাহেবকে বলিল, “হুজুর! যিনি আড়ালে আছেন, তিনি

আপনার সামনে বাহির হবেন না। মজি হয় ত আপনার অসাক্ষাতে বনে
তাকে সনাক্ত করুক। তা হলে হজুরকে একটু বাহিরে যেতে হয়। সাহেব
চট্টয়া জ্বাঙন হইলেন। তাঁর মতে, এ প্রতি হাঙ্গর প্রস্তাব, প্রার্থনা হজুর
হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভগবান তবু ছাড়েন না। সে বাহিরের সকল লোককে বাহির করিয়া দিল।
সাহেবের সঙ্গে রহিল কেবল কক সর্দার ও বৈদ্যনাথ। সরলা এর আগে আর
কখন সাহেব দেখে নাই, সামনে আসিতে বড় সঙ্কচিতা হইল। ইচ্ছা, ঘোমটা
বজায় রাখিয়া কোনও মতে এ বিপদ কাটাইয়া তোলে; কিন্তু ধীরে বুঝাইয়া
দিল যে, তাহা অসম্ভব। সেই মুখ খুলিয়া কথা কহিতেই হইবে, কত কথা
জিজ্ঞাসা করে, তার টিকানা কি? মাঝে হইতে অনর্থক কেবল লাঞ্ছনা।
কাজেই সরলা ধীরে সন্ধে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ বলিল, “এ-মা ঠাকুরাণীকেও চিনি হজুর, বনি হলেন দেবীপুরের
জয়দুর্গা ঠাকুরের কাছে।”

সুযোগ দেখিয়া ভগবান কহিল, “ধর্মাবতার, এ লোকটা কি করে মা-

ঠাকুরাণীর পরিচর জানলে, সেটা গুকে জিজ্ঞাসা করা হোক।”

ইলিয়ট সাহেব ক ক্লান্ত করিলেন। সন্দেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, “এ
লোকটা তবে কি মিছা বলচে?”

ভগবান বলিল, “তা-বলচি নে হজুর! কিন্তু সে কথাটা সাক্ষ হলে ও
লোকটার হাট হৃদ্য সকলই হজুরের মালুম হবে।”

তখন ভগবান বৈদ্যনাথকে সন্ধান করিয়া বলিল যে, “নেমকহারামির ধা-
কল, তা সে হাতে হাতে পাইয়াছে। এখন মিছা কহিয়া আর বেন পাপের
স্বর বৃদ্ধি না করে। সম্মুখে ঐ গঙ্গা, মাথার উপরে ঐ মা দুর্গা, কোন কথা
নুকাইলে তার ইহকালও নাই, পবকালও নাই।

বৈদ্যনাথ বধাসম্ভব সংক্ষেপে সে গল্প করিল। ইলিয়ট সাহেব তাহার কলে
সরলার প্রতি কিছু দরজি হইলেন। শুধাইলেন, বিশ্বনাথ বাবু তাঁর কে হন?

সরলা এ পর্যন্ত কোনও কথা কহে নাই, কহিবার প্রয়োজনও হয় নাই।
মুখ নত করিয়া গাটস্বরে বলিল, “তিনি আমার মা বলেন! আমার ধর্মছেলে।”

সাহেব হাসিয়া উঠিলেন, কি আপদ! তোমার মত বালিকা কি করে
কাবুও মা হতে পারে?

সরলা উত্তর দিতে পারিল না। মীরা কহিল, “সাহেব!-সোয়ামি ছাড়া সবাইকে আমরা সন্তান মনে করি। তাঁর ছেলে বুড়ো নেই।”

কৃষ্ণ সর্দার করঘোড়ে প্রার্থনা করিল, ধর্মাবতারের যদি অনুমতি হয়, বিশ্বের সবকে সোটাৎতক-কথা সে মা ঠাকুরাণীদের শুধাইবে। তার বিশ্বাস, সব কথা তাঁরা জানেন।

ভগবান কৃষ্ণ সর্দারের প্রতি রোষকবায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কহিল যে, বৈষ্ণবনাথের নিজের কথাতেই প্রমাণ যে, সে-ভাকাত। কৃষ্ণ সর্দারকে মাঠাকুরাণীরা কখন চেনেন না; সে কেমন লোক, বলা যায় না। মা ঠাকুরাণীরা কাছে লোকের সঙ্গে কথা কন না, দিভাসা যত যা করিতে হয়, হুজুব নিজেই কন।

ইলিয়ট আর কখন এদেশীয় কুলমহিলাদের সন্মুখীন হন নাই, ভগবানের আপত্তি সঙ্গত মনে করিলেন, এবং একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কতক হিন্দী কতক বাকালি উভয়কে প্রশ্ন করিলেন, “আপনারা বিশ্বনাথ বাবুর কোনও খবর বলিতে পারেন?”

মীরা বলিল, “সাহেব, যিনি কখন উপকাব করেন, প্রাণ দিবে তার প্রত্যাশা করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে জান্লেও আমরা এমন কোন কথা বলতে পারতাম না, যাতে বিশ্বনাথের অনিষ্ট হতে পারে, কিন্তু বাতাবিকই আমরা এখন তাঁর কোন খবর জানিনে।”

সরলার আয়ত-চক্ষু-এই উত্তরে হাস্তপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার অর্থ, এ কথাটা অমন শুধাইয়া সে সাহেবকে কখনই বলিতে পারিত না। ইলিয়ট সাহেব সে উল্লাসের অর্থ বুঝিলেন। মহিলাদ্বয় যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত, তাহাতে তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না। তাঁহাদের কোনও কথায় অবিশ্বাসের স্থল ছিল না। সাহেব সমস্তম্বে বিদায় লইলেন। উভয়কে সন্মোদন করিয়া বলিয়া গেলেন, “যদি কখন বিপদে পড়েন, আমার স্মরণ করিবেন।”

বাহিরে আসিয়া ভগবান জানাইল যে, মা ঠাকুরাণীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতে চাহেন না। সাহেব আপ্যায়িত হইয়া ধন্তবাদ দিলেন, এবং আফ্লাদসহকাবে কদলী ও বাতাবি লেবুর উপহার গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার আদেশে বৈদ্যান্যাপের হাতে তখনই হাতকড়ি পড়িল। কৃষ্ণ সর্দার মর্মে মরিয়া গেল। তাহারও অপমানের কিছু বাকি ছিল না। ক্রমশঃ।

সহযোগী সাহিত্য ।

জীবনচরিত ।

অধ্যাপক হকুমসি ।

অধ্যাপক হকুমসির মৃত্যুতে বৈজ্ঞানিক-জগতে একটা ইলেকপাত হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপকের বয়স নিতান্ত অল্প হয় নাই—বরং অল্পবয়সে যে বয়সে লোকে মৃত্যুতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হয় না, অধ্যাপক সে বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। তবে বহুবিক্রিয় সহিত তাঁহার কর্মক্ষমতা নির্দোষিত হইয়া যায় নাই—তাই বৈজ্ঞানিক জগৎ সেই মনীষী মহাপুরুষের মরণে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে অধ্যাপকের জন্ম হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, জননীর সহিত তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য সসামান্য অধিক। এমন কি, হস্তমঞ্চালশেষে জননীর প্রভাব। সে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইত। পিতার নিকট হইতে তিনি তিনটি বিশেষত্ব

পাইয়াছিলেন—অক্ষয়বিদ্যার প্রতি কোঁক, গবয় মেলায় এবং অন্যান্য লবিত কার্যে “নাছোড়বালা” ভাব, কেহ কেহ সেটাকে একগুঁয়েমি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার পিতা ইনিং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন—সেখানেই তাঁহার শিক্ষা আৰম্ভ হয়। তিনি বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা অল্প দিনই পাইয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, সেটা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ বিদ্যালয়ে তাঁহার ভাগ্যে সংসংসর্গ লাভ ঘটে নাই।

বিদ্যালয়ে পাঠকালে একবার একজন সহপাঠীর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল। সে তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; শেষে আর সহ হইল না। তিনি দুর্বল হইলেও তাঁহার অন্তর্নিহিত উগ্রভাব তাঁহার সহায় ছিল, এবং সহ-যুদ্ধ যুদ্ধ।

পাঠি প্রচুর প্রহার পাইয়াছিল। কিন্তু তিনি জয়ী হইলেও চক্রে আঘাত পাইয়াছিলেন। ইহার ষাটশ বৎসর পরে একদা সিডনি নগরে আত্মবল হইতে শ্রী-তাঁহার অঙ্গ লইয়া আসিয়াছিল, সেই তাঁহার জুতপূর্ব্ব প্রতিমণ্ডী, এই পরিচয়ে তিনি বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কল কারখানায় এন্জিনিয়ার হইবার জন্য প্রবল বাসনা সঙ্গেও, মটরচাক্রে-পড়িয়া তাঁহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মাঝে এন্জিনিয়ার না হইলেও শিক্ষা।

কালে শরীর-ভঙ্গ বা-সজীর-কুলেব-ব্যাপার অধ্যয়নেই তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ দৃষ্ট হইত।—কিন্তু শরীর-তত্ত্ববিদ্যার জটিল বিষয়ের মোহিনী—নস্তি, এই উৎসাহী যুবকের কর্মক্ষেত্রভাষেই সাংঘাতিক কল প্রসব করিয়াছিল।

তের বৎসর বয়সের সময় কতকগুলি ছাত্রবন্ধু তাঁহাকে দেহচ্ছেদ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে ববাবর বিষয় বিতৃষ্ণা সঙ্গেও এবার তিনি দেহচ্ছেদ দেখিতে গেলেন; কিন্তু দর্শন করিয়া চেতন্যাহীনের মত হইয়া পড়িলেন। শেষ স্বাধ্যক্ষাভাষণে তাঁহাকে ওয়ারউইকশায়ারে পিতার বন্ধুর নিকট পাঠান হয়। সেখানে বাইয়া গর দিবস প্রভাতে যখন বিছানা হইতে কোনরূপে উঠিয়া তিনি জানালা খুলিয়া দিলেন, তখন বাহিরে প্রকৃতি সৌন্দর্য্যমণী, বসন্তের মেঘযুক্ত আকাশ রবিকরে হাত্তোদ্ভল। সেই মধুর বসন্তগবন যেন তাঁহার বলহীন অবসন্ন দেহে জীবন পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। ক্রমে তিনি শ্রু হই-

দেন- তবে মধ্যে মধ্যে পাকবস্ত্রে-নেদনাবোধ হইত, আর সেই হইতে অবসাদময় অজীর্ণ রোগ তাঁহাকে তাগ করিত নাই ।

সিডেনহাম কলেজ-এ চেম্বিংফ্রগ মেডিকেল স্কুলে পাঠ, তাহান-জীবনের দুইটি প্রধান ঘটনা । চিকিৎসাবিদ্যানয়ে পাঠকালে তিনি মিষ্টার ওয়াবটন স্কোলসের ছাত্র ছিলেন ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Rattlesnake জাহাজে কর্ম প্রাপ্ত হইলেন । চার বৎসর এই জাহাজে অবস্থানকালে তিনি-সামুদ্রিক-প্রাপিতক শিক্ষা করেন, এবং বাস্তবিক প্রাপ্তিতত্ত্ববিৎগণের কলসাস ।

মধ্যে তাহাব স্থান অতি উচ্চ । এই সময় তিনি Lienean Society-তে অনেক বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু কিছুই-হইল না দেখিয়া, শেষে বিশদভাবে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া Royal Societyতে প্রেরণ করেন । এইবার সফল-কলিল ; কিন্তু জাহাজে অবস্থান-হেতু লেখক তখন কিছু জানিতে পারেন নাই । ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে-প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি-দেখিলেন যে, সে প্রবন্ধ ছাপান হইয়া গিয়াছে । Royal Society তাঁহাকে একান্ত সন্মেলন প্রদান করেন ।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক দিভাগের সহিত হমলিব পরিচয় হয় । টণ্ডলের-শোচনীয় দুর্য্য পর্ধ্যন্ত উভয়েব মধ্যে বন্ধুত্ব সঞ্চার হিল । উভয়ের প্রথম পরিচয়সম্মে-দিভাগ-বলিয়া-ছেন যে, তখন তাহারা উভয়েই উপযুক্ত কর্মের অভাব অনুভব করিতে ছিলেন, কারণ উপযুক্ত কর্মসম্পাদনের ইচ্ছা উভয়েরই তখন বলবতী ।

চৌরোটে বিদ্যবিদ্যালয়ে প্রাকৃত-ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপেব পদ-ধালি হওবার তাহারা দুই জন, এই দুই পদেব ব্রত অব্যবন করেন ; কিন্তু কেহই কর্ম পান নাই । আব এক স্থানেও নাকি এইরূপ ঘটনাছিল ।

ছাঙ্গিণ বৎসর বয়সে হমলিব ম্যাল সোসাইটীর সভ্য হইয়াছিলেন-এবং ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল ইনষ্টিটিউশনে তাহাব প্রথম বক্তৃতা পাঠ করেন । ডারউইনের Origin of Species পুস্তক প্রকাশিত হইলে ভাষণ তর্কের বড় উত্তিষ্ঠাছিল, সেই সময় কর্মক্ষেত্রে- অধ্যাপক ডারউইনের মতের পোষণ করিয়া তাহাটাই মত আদ্রয়ণ-মত করিয়াছিলেন । ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকে তিনি মানব ও মাকুলহীন বানবের মধ্যে

সাদৃশ্যের বিচার করিয়াছিলেন । ডারউইনের পুস্তকের মত এই পুস্তকও তাঁর সমালোচনামহি প্রজালিত করিয়াছিল । তাহাব পর তাহার-অসিদ্ধ-প্রহ 'Lay Sermons, Addresses, and Reviews' প্রকাশিত হইলেও বড় গুণগোল গড়িয়া গিয়াছিল ।

লিভারপুল বৃষ্টিণ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিরূপে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'স্বতঃস্ফূর্ত' (Spontaneous generation) প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কার্লাইল লর্ড বেক্টর হইলে তিনি এডিনবরা বিদ্যবিদ্যালয়ের-এল্-এল্-ডি-উপাধি প্রাপ্ত হইলেন । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এডিনবরা বিদ্যবিদ্যালয়েব লর্ডবেক্টর পদে মনোনীত হইলেন । এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটীর সম্পাদক নিরূচিত হইলেন । তিনি স্বদেশস্থ এবং বিদেশস্থ নানা বৈজ্ঞানিক সভা কর্তৃক নানা প্রকারে সম্মানিত হইলেন-এবং তাহারিগকে সম্মানিত করেন ।

সমাজ-নীতি ।

ব্রহ্মে রমণী ।

এখন ব্রহ্মে বৃষ্টিণ-পাঙ্গপুরুষগণের উচ্ছৃঙ্খল নীতিহীনতার বিষয়ে যে আলোচন উত্তিষ্ঠাছে, তাহা অনেকেরই অবগত-আছেন । যে সংখ্যা ব্রাকউড পত্র মিষ্টার ফিল্ডিংএর লিখিত প্রবন্ধ হইতে আমরা বার্গিন্স রমণীদিগের সম্বন্ধীয় ণ্টিকতক কথার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম ।

ব্রহ্মে রমণীগণের স্বাধীনতা বৈকল্প সম্পূর্ণ, জীবন ও সম্পত্তিতে অধিকার বৈকল্প অসাধারণ, জগতে বোধ হয় আর কুত্রাপি তেমন দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মের বমণী সর্ববিষয়ে পুরুষের সমান।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। আইনে জীপুয়্যেব সনান অধিকার হইরা থাকে। বালিকা বালকের সম্বন্ধে সমানভাবে উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবাহে সম্বন্ধে কোন

ব্যতিক্রম ঘটে না। এই সম্পত্তিতে তাহার স্বাধীন কোন অধিকার নাই, পত্নীর উপরও তাহার আইনতঃ কোন অধিকার নাই। শৈশব হইতেই রমণীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। যে নারীপুত্র বমণীকে সাধুব মত পূজা ও ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার করে, তাহা ব্রহ্মে নাই। তাহাদিগের দেশের ধর্ম-কথন তাহাদিগকে সকল পাপেব-মুস-বিলিয়া গণ্য কবে নাই, এবং তাহাদিগকে নরকগমনের কাঁদ-বলিষ্টা সমুদ্রপথে পবিহাব কবিতেও বলে নাই। তাহারা প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহাই বলিয়া গণ্য হয়, এবং জগতে স্বীয় স্থান বাহিন্যা লইবার জন্য তাহারা স্বাধীনতাও পাইয়াছে।

ব্রহ্মে যেমন-জগতে আর কোথাও বমণী ভৈরব যোল আনা রমণীয়ে পূর্ণ নহে। রমণীর সকল নামহীন সৌন্দর্য্যই তাহার আছেন বর্ম্মাধীনব আগন্তুক আকর্ষণ হইতে পারেন; কারণ সেখানে রমণীর কটদেশে নিভান্ত কীর্ণ নহে, বমণীর দেহেব মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং সৌন্দর্য্যই তাহাদের পরিবেশ। তাহাদিগকে ভাল করিয়া জানিলেই তাহা বুঝা যায়, কিন্তু তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তাহাদের প্রত্যেক-দৃষ্টিতে এবং দেহকম্পনে সে মাধুরী রমণীর বমণীত্ব। প্রকাশিত হয়। পুরুষ অপেক্ষা রমণীর বর্ণ অধিক শুভ্র, তাহাদের

নয়ন বিশাল-ও মেটে রঙ্গের। তাহাদিগের ব্যবহারি স্থিতি ও সংযত, কঠোর যুদ্ধ-ও-সমুদ্র। তাহাবা-পুরুষদিগের মত লেখা পড়া শিখে না, বাধ্যবস্ত্রাবধানে গাবগ নহে, গান গাহিতে শিখে না, ভবে কেহ কেহ হস্তের গাহিতে-পাবে। নৃত্য বা অঙ্গনবিদ্যায় তাহারা কিছুই জানে না; কিন্তু তাহারা পৃথকপথে পারদর্শিনী। ব্রহ্মে বালিকাদিগের সকল-বিষয়ে মতামত তাহাদিগের দৃষ্ট ঘটনা হইতে উদ্ভূত; সে সকল অজ্ঞতা বাক্যতমস্যাচ্ছন্ন বজ্র-নীর স্বপ্নমাত্র নহে, সত্যজ্ঞান হইতে উৎপন্ন।

ব্রহ্মে বালিকার আশ্রয়-আশ্রয়দেব স্থিতি। প্রত্যেক গৃহে বালিকাকে নিবাসিত কার্য্য করিতে হয়। ধর্ম্মের গৃহে দাস দাসী থাকিলেও বালিকার বস্ত্র-বয়ন-কবে। ব্রহ্মে অল্প বয়সে বালিকাদিগের বিবাহ হয় না—স্বাধারণতঃ বিবাহের বয়স যোল হইতে কুড়ি। বিবাহ বালিকার উপরেই নির্ভর করে। ব্রহ্মে একটা নৃত্য-ব্যাপার আছে, সেটাকে "কোটিং" কাল নামে অভিহিত করা যায়। জ্যোৎস্নাসমুজ্জল শুক রজনীতে নয়টা হইতে দশটা পর্যন্ত প্রায় ইহার স্থিতি। গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে জ্যোৎস্নালোকপ্রান্বিত-রজনী-বিবাহ।

নীতে সমস্ত প্রকৃতি যেন মাধুরী-বস্ত্রে অঞ্জিত থাকে; সুখম্পর্শ সমীকৃত সুমধুরভিন্ন থাকে, আর সেই সৌন্দর্য্যে শান্ত শিথল ছাতির মধ্যে রূপের সভ্যসভায় আনন্দে কম্পিত হইতে থাকে। গৃহের সমুখে বারান্দায় সেই স্বচ্ছাঙ্ককারময় সন্ধ্যাসময়ে বালিকা উপবিষ্টা; কখন কখন নিকটে একজন বাহিনী থাকেন, কিন্তু প্রায়ই বালিকা একাকিনী। তাহার স্তন্যপ্রাণিগণ আসিয়া প্রৈনিকদিগের চিবপ্রচলিত প্রাণায় সজ্জা ভাস্কর্য্যে লবনের কথা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পায়। কখন কখন তাহারা অনেকেই আইসে,—যে কালের কথা জানাইতে আসে, সে প্রায়ই একাকী আসে, আব-যে শুধু শুধু আসে, তাহাব সঙ্গে একজন বন্ধু থাকেও অসম্ভব নহে। কাহারও উপব বিশেষ অনুগ্রহ হইলে বালিকা তাহার চুটকি ধবাইখা দেয়—সেই চুটকিই তাহার অধর চুষন করে। প্রায়ই কাছাকাছি কোন বাটীর লোক থাকেন; কারণ, কে কখন আসিবে, তাহা তাহির নাই, আর মেঘচর্চ্ছািত শাদ্মূলের আগমনও অস-

স্বপ্ন-নহে । কিন্তু প্রেমব্যাপারে কার্যবিভাগ নাই, বালিকা একাই তাহা সম্পন্ন কবে । সে বাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, কেবল স্বামীর অনুমতি চাই । আর পরীর সাহায্য পাইলে সংসার চালাইতে পারে, তাহাব এমন সুকৃতি চাই ।

প্রথমই প্রেমাত্মিনের প্রধান অঙ্গ পলায়ন ও তাহাব পরেই দিন-দশ ক্রমাগত কুৎসা রটনা । সময় সময় বিনা কারণে এই পলায়ন হয়, কেবল উদ্ধত যুবকের প্রবৃত্তির বিলম্বে বিরক্তই হইবার কারণ ; ক্রোধ, জীবন-কণহারী, এবং আজ আসবাব-বাঁচিয়া আছি, কিন্তু কাজ যে থাকিব, তাহার নিশ্চয়তা কি ? পূর্ণিমা রজনীকে বজ্রনদী-বুজা যায় না—কেবল তপনের তীব্রতাপময় স্বর্গলোক নিবিষা গেলেই চন্দ্রের রক্তত ধরল রক্ত আলোক প্রকৃতিকে হান্ধনবী করিয়া তুলে । বনসমূহে নিব রক্তলানাদম্বুরিত গর্ভতপণে, তাড়ুরিবারে কটীত আছে—

প্রেমাত্মিনঃ— কার্ণ ও যুগকম্ব তপেব শ্রম্যা-আত্ম, আব বৃক্ষজীবীর সূর্য্যকর পেহকে অবসর কবে না । বন আনন্দময় । আহীরেব সন্ত তেমন চিন্তা-নাই,

একরাড়ি চাউল, একটু লবণ, আব মৎস্ত বা মশলা, পূর্বে লুকাইয়া রাখা হয়,—তাহাব পব একটা হাঁড়ি ঘোগাড় করিলেই দুই জনের কিছুদিনের সাহাবের আঁধ তাদনা থাকে না । অথবা কোনও গিধাসী-বজু প্রতিদিন আহার যোগাইয়া যান । বৃক্ষী-ব্রিহি কুন্তলজালেব রক্ত কাননকুমারের অভাব নাই । আব সেই রহস্যময় অজ্ঞেব হানে মুক্ত স্বাধীনতার মধ্যে সর্বদা-একত্র অবস্থান করিয়া দুই জনে বে আনন্দ উপভোগ করে, তাহা কি ভাবাব ব্যক্ত করা যায় । তাই বধন কোন আত্মীয় আসিয়া পবিত্র বৃক্ষতলে প্রেমিকদ্বয়কে বলেন—যে, বিবাহেব সকল আবেজিন-স্থির হইয়াছে, এবং সক্ষম-বাধা বিহীন অপসারিত হইয়াছে, তখন তাহারা সেই সুখস্বপ্নিতরাগুল কাননভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিতে যে দুঃখিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

সর্বত্রই বে পুঙ্ক প্রেম-পলায়নের প্রস্তাবক, তাহা নহে । নিম্নলিখিত ব্যাপার হইতেই তাল প্রভিগ্ন হইবে ; লেখকের একটি ব্রহ্মদেশীয় চাকর ছিল, তাহাব বয়স বিশিষ্ট বৎসর হইবে ; আব সে বড় কাজেব লোক ছিল । সে-জন্মে-জন্মে-সকল কাজ চাকরেব ব্যবহার ।

শিখিয়া লইয়াছিল । যে গ্রামে তাহু-সংস্থাপন করিয়া লেখক আড্ডা লইয়াছিলেন, সে সেই গ্রামেব প্রধান ব্যক্তির (সদ্বাব) কন্তাব প্রেমে পড়িল । তাহাব কারণও ছিল ; বালিকার কুন্তলজাল দীর্ঘ—তাহার কণ্ঠস্বব মধুর এবং সেও যুবককে ভাববাসিত । একদিন সন্ধ্যাকালে ভূত আসিয়া প্রভুকে জানাইল যে, সে বিবাহ করিবে, কাজেই তাহাব কর্মত্যাগ অনিবার্য, পবকে উপদেশ দিবার সময় আমরা যেকণ জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতে পারি,—সেইরূপ বলিয়া লেখক তাহাকে বুঝাইলেন যে, সে এখনও অপ্ৰাপ্তবয়স্ক, তাহার প্রথমণীর বয়সও ব্রহ্মদশের কম—তাহা ভিন্ন তাহাদেব কিছুই সম্ভব নাই । আব এক-বৎসব নিয়ম মত বেতনপ্রাপ্তির পর একটু কাজের হইয়াই চাকরি-ত্যাগ বড় অকৃতজ্ঞ-ভাব পবিচায়ক হইবে । ভৃত্য-সংস্থাপণ দিয়া সকল অনিল ও-রাত্রিকালে আহাবের পর প্রথমণীকে সমস্ত কথা জানাইতে গেল । প্রভাতে অস্ত-চাকরেবা সংবাদ দিল যে, সে আর ফিরে নাই । অল্পকণ পরেই গ্রামের সদ্বাব আসিয়া জানাইল যে, তাহাব কন্তাও পলাইয়াছে, তাহাবা বনসমূহে গিয়াছে । এক সপ্তাহ তাহাদের কোন সংবাদই পাওনা গেল না । একদিন সন্ধ্যাকালে লেখক তাহাব সমুখে তুষারবৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বালিকাব জননী আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহাব নিকট লেখক শুনিলেন যে, উভয় পবিবাবের মধ্যে সকল বন্দোবস্ত-স্থির হইয়া গিয়াছে, বালকের বিবাহ স্থির হইয়াছে, আব তাহাতে বালক পবিবাব-প্রতিপালনে সক্ষম হইতে পারে, তাহাব অস্ত কার্য স্থির হইয়াছে । কিন্তু তিনি

গ্রামে থাকিতে বালক কিবিবে না, কাবণ সে বড়ই লজ্জিত ও ভীত হইয়াছে,—কাজেই তিনি যত সত্বর-সম্ভব-সে স্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন।—লেখক বলিলেন যে, তিনি আদৌ ক্রুদ্ধ নহেন, বরং তিনি নবদম্পতিকে দেখিলে আনন্দিত হইবেন।—বৃদ্ধার অনুমোদে তিনি সেই মর্মে বার্ষিক ভাণ্ডার একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন। বোধ হয়, এণ্ড্রিয়ুগল অভি-
নিকটেই লুকাইয়াছিল; কারণ প্রথমদিবস প্রভাতেই বালক একাকী ভাণ্ডারে উপস্থিত হইল।
সে নিতান্ত লজ্জিত এবং প্রথমেই সে পূর্বের মত সহজভাবে কথা কহিতে পবিত্র না।
—ব্রহ্মপুত্রী অনুবর্ত্তা, ও তাহাদেব বধেই নাইন-আছে। দেশের খুচরা বিক্রয় প্রায়ই ব্রহ্মপুত্রী
চালায়। তাহার অর্পণের দোকানে সাহিওয়ান-লইরা বিক্রয়কার্য চালায় না—আপনা-
পত্নী।
বাই গ্যুবা চালায়। রেশম ও কাপড় বিক্রয় ভিন্ন অন্য ব্যবসায় গৃহ-
কার্যের কোনও ক্ষতি হয় না। তিন ঘণ্টা নাজ বাজাব থাকে, তাহার
পরে রমণী গৃহকার্যের জন্য বধেই অবসর অবশ্যই পাইবা থাকে।—সারাদিন রমণীগণ
বাজারে বা কাঁচখানার থাকে না। পার্হিয়া-জীবনই—ব্রহ্মপুত্রীর জীবনের কেবল, তাহাব প্রতি-
উপেক্ষা প্রদর্শন করা অসম্ভব। এইরূপে প্রত্যেকের ব্যবসা-পাকার, জারনের উপর আশ্রিত
অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে রমণীর মতে উদ্বাবতা-জন্মে, এবং গৃহকার্যের সঙ্গী গভীর মধ্যে
যে সকল শিক্ষা অসম্ভব সে সকল শিক্ষাও হয়। ইহা হইতেই ব্রহ্মপুত্রীর বিশেষত্ব, সহিষ্ণুতা
এবং বোধশক্তি উৎপত্তি। ইহাতে আপনার বল এবং দুর্বলতা, উভয়ই জানিতে পাওয়া যায়।
বিবাহভঙ্গের সম্পূর্ণ সুবিধা সম্বন্ধে—সে ব্যাপারটা বড়ই শুল্ক দৃষ্টি থাকে। বিবাহিত-
দিগের মধ্যে বোধ হয় শতকরা একটি বিবাহভ্রষ্ট হইয়াছে, আবার বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলে
বিবাহভঙ্গ।
পুনরায় বিবাহিত হইলে:—জারণ, মিলনে যে প্রেমের সাধু কনিষ্ঠ,
যায়, বিচ্ছেদে তাহার আকর্ষণী শক্তি আবার বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে বোধ হয়, সেখানে বিবাহিত
জীবন হইবে। বিবাহভ্রষ্টের সব-পুত্রগণ গিতাব-ভাগে ও কস্তাগণ সাতার ভাগে
পড়ে, তবে লেখক বলেন, সম্ভান হইবাব পবেও যে বিবাহভ্রষ্ট হয়, তাহা তিনি ভ দেখেন
নাই। ব্রহ্মপুত্রী-যে কেবল স্বদেশীর পতিকেরই স্বামী কবে, তাহা নহে; ইংরাজ, চীনাওয়ান,
মুসলমান, হিন্দু, সকলেই তাহাদিগের সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া স্বামী হইয়াছে। ভারত-
বাসীর মত স্বস্থানপ্রিয় আর বোধ হয় কেহই নাই; ফরাসীদেব নিকট প্রায় যেমন প্রিয়,
হিন্দুস্থানীর নিকট হিন্দুস্থান তাহা অগোচ্য প্রিয়। তবুও লেখকের একজন সহিস—একজন
শিখ ব্রহ্মে বিবাহ করিয়া সেখানে-স্থান হইতে দূরে, বাস করিতেছে—সে একজন
সমিক ছিল। একপ্রদৃষ্টান্ত নিতান্ত বিবল নহে।
রমণীর আনুভূতি, সহিস ও দৃঢ়তার বেশ পরিপূর্ণ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—আবাচ।—বৈরাগ্য।—একটি স্থিতিশীল দার্শনিক প্রবন্ধ। “ভাবাত্তর” প্রবন্ধে
লেখক বাস্তব-ও মহারাষ্ট্রীয় ভাবার গঠন ও ভাব প্রকৃতি সম্বন্ধে তুলনার আলোচনা করিয়া
ছেন, প্রবন্ধটি অনুশীলনের উপযুক্ত। সাহিত্যসেবিগণ এই প্রবন্ধে অবহিত হইলে উপ-
কারের সম্ভাবনা। “বারভলাব মেলা” একটি গ্রাম্য চিত্র। পত্রীগ্রামেব নানাবিধ ছবি লেখকের
বর্ণবিজ্ঞানগুণে বেশ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রটি শিল্প-হিসাবে অসাধারণ না হউক,
বাস্তব বস্তুর একটি চলনসই আদর্শ ও দৃষ্টরমণীয় বটে। “মেবেলি ব্রত” প্রবন্ধে ‘সাঁত্রপুজনী’

বিজয়া বাটিকা।

জুরাদির একমাত্র মহোষধ।

লক্ষ লক্ষ লোক সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রতী-
পন্ন হইয়াছে, জ্বর-শ্রীহাদি রোগ বিনাশের—এমন উৎকৃষ্ট মহোষধ ভারতে এ
পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ রাজ্যখবর-রাজ্য-অটালিকার এবং দরিত্রের
কটরে, বিজয়া বাটিকা সমভাবে বর্তমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু-
স্থানবাসী, কি পঞ্জাববাসী,—সকলেই বিজয়া বাটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজ-
শ্রীর বিজয়া-বাটিকা প্ৰথম শ্রিয় বস্তু। বহু ইংরেজ-পুত্র এবং ইংরেজ-রমণী
বিজয়া-বাটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসাবে
আর নাই বলিলে অতুক্তি হয় না।

বিজয়া-বাটিকার এক আশ্চর্য গুণ এই যে, ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।
হুতরাং, যাহার জরভাবের উপক্রম হইয়াছে, যাহার চক্ষু জ্বালা, হাত-পা জ্বালা
করিতেছে, যাহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, বা কোমর কানড়াইতেছে; যাহার
ক্ষুধা হয় না; যাহার কোষ্ঠি খোলসা হয় না, যাহার কাসি-সর্দি হইয়াছে,—এই-
বলা বিজয়া বাটিকা সেবন আরম্ভ করুন, যালেরিয়া জরে আর ভুগিতে হইবে
না। বিজয়া বাটিকার শক্তি প্রকৃতই মন্বশক্তিবৎ অদ্বত।

অদ্বিকৃতর আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যিনি জ্বর-শ্রীহাদি রোগে
ভুগিতেছেন, হাত-পা পর্যন্ত কুশিয়াছে, ২৪ ঘণ্টাই যাহার নাড়ীতে অর আছে,
ডাক্তার কবিরাজ যাহাকে জবাব দিয়াছেন,—এমন রোগীও বিজয়া বাটিক
দ্বারা সহজে আরাম হইতেছেন,—ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া, রোগীর
প্রতিবেশী বৃন্দ মুগ্ধ হইতেছেন। কাম্পজর, পালজর, জসিনের কালজর,
অমাবস্তা-পূর্ণিমায় জর, কুইনাইনে আটকান জর, মজাগত জর,—সর্বপ্রকার
জররোগই ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।

বিজয়া বাটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাকমান্ডল	প্যাকিং
১নং কোটা	১৮	১৮/০	১০	৮/০
২নং কোটা	৩৬	১৮/০	১০	৮/০
৩নং কোটা	৫৪	১৮/০	১০	৮/০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কোটা অর্থাৎ

৪নং কোটা	৫৪	৪১০	১০	৮/০
----------	----	-----	----	-----

বিজয়া বাটিকা প্রাপ্তি-স্থান।

আদিস্থান—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি-স্থান বেজুগ্রাম, পোষ্ট সাদিপুর্, জেলা বর্ধমান—স্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জে, সি, বজর নিকট প্রাপ্তব্য; অথবা—
৭৯নং হার্লিংগন রোড, পটলভাঙ্গা; কলিকাতা—ভারতে একমাত্র এজেন্ট—
দি বস এন্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

এইচ বসু এসেন্স ও পুষ্পসার



এসেন্স চামেলী

এসেন্স মতিয়া

এসেন্স দেলখোস

এসেন্স হোয়াইট রোজ

এসেন্স কুমুদিনী

এসেন্স মিল্ল কুমুম

নতুন প্রস্তুতি-নানাবিধ সুগন্ধি-পুষ্প-ইহাতে অতিনব উপায়ে সার সংগ্রহ
করিয়া, উল্লিখিত এসেন্সগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। মিষ্ট এবং মনোহর গন্ধে
বিলাত ইহাতে আগদানী অধিক মূল্যের এসেন্স অপেক্ষা এতদধিক
প্রাপ্তি নিকট নহে। অধিকতর এই সকল এসেন্সের সৌরভ অধিকতর প্রীতি
প্রদ এবং বিলাতি এসেন্স অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী। সুগন্ধি-প্রিয় নহোদয়-
গণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বিলাতি এসেন্স ফেলিয়া বাহি-
র্য করিবেন ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। ঠিক বিলাতি
এসেন্সের সার সুদৃশ্য কাচের ছিপিয়ল চতুর্কোণ এক আউন্স গাঢ়
বিশুদ্ধ হয়।

মূল্য প্রতিগাণি ১ এক টাকা মাত্র।

এইচ, বসু,

গ্যান্সকাচারীং প্রাক্ষিত্তার,

২৪ নং নুললম্পন থাড়া রোড, কলিকাতা।

বোস এণ্ড কোং।

১৪৪ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফেশনারিস্, কলিশন-এজেন্টস্ ও জেনারাল্

অর্ডার সাপ্লায়ান্।

আপাততঃ কলিকাতায় বিখ্যস্ত অরডার সাপ্লাই এজেন্সি স্বাতি বিব্রল।

বিদেশীয় বনী মহাভন, জমিদার, দোকানদার, প্রভৃতি সর্ব সাধারণের সুবিধার্থে উপরোক্ত এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের জয় ও বিজয়ে সকলেই সম্মত হইবেন। আমরা আমাদের বহুকালপরিচিত নানাবিধ জব্যের কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের সন্নিহিত সুতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছি। তাঁহারাও বারতীয়-জব্যাদি আমাদের নিকট পাইকারী দরে বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। চরদেশবাসী দোকানদার মহাভন অথবা ভদ্রলোকদিগকে অনেক সময় বিস্তর ব্যয় স্বেচ্ছায় করিয়া জয় করিতে আসিতে হয় ও তাঁহারা নূতন জেতা বলিয়া অনেক সময় বিলক্ষণ প্রভাবিত হইয়া থাকেন। কলিকাতায় যে ভিনিব যে স্থানে অল্প মূল্য পাওয়া যায়, তাহা আমাদের অবদিত নাই, এক্ষণে আমরা আশা করিতেছি যে, অজস্র অত্যন্ত এজেন্সি সমূহ অপেক্ষা আমাদের প্রেরিত জব্যাদির মূল্য সুলভ হইবে এবং কলিকাতায় আসিয়া বাহারা জব্য খরিদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার আমাদের পরীক্ষা করুন, এই প্রার্থনা। আমরা সকল প্রকার দেশী ও বিলাতি শাল, আলোবান, বেনারসী, বোম্বাই, ঢাকাই, শান্তিপুর, কুরাসউল্লাহ, এবং অত্যন্ত নানাপ্রকার বস্তাদি, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের বডি, শার্ট, ক্যানিজ, কোট ইত্যাদি সর্ব প্রকার গোষাক, জুতা, মোজা, ক্রমাল, গারটার, তোরালো, বোতাম, সৌগন্ধ জব্য (Essence), সাবান, ছাতি, ছড়ি, পুস্তক কাগজ কলম, লিপিরাহ ও রবার-ষ্ট্যাম্পের কালি, জাপান ও চীন দেশীয় খেলনা ইত্যাদি। কবিরাজি ইংবাজি, হোন্নিওপ্যাথিক, সুপ্রোপ্যাথিক, ইলেকট্রোপ্যাথিক, হার্কিন প্রভৃতি ও সর্বপ্রকার পেটেন্ট ওষধ, টেবিল, চেয়ার (Furniture), কলকজা লৌহ জব্যাদি (Hardware), রং, বিলাতি-মাটি (Cement), দুই চাকার গাড়ী (Bicycle), তিন চাকার গাড়ী (Tricycle) ইত্যাদি, সর্বপ্রকার কাচের জব্য (Glassware), এবং এনামেল জব্যাদি, খড়ি, আংটা, হারমোনিয়াম, ফুল-বাশী, দেশী ও বিলাতি বাস্তবস্ত্র এবং সর্ব প্রকার প্রবোজনীয় জব্য ও ঐরোপযোগী (Ice and Aerated water) সরবরাহ করিয়া থাকি।

মানেক্জার

শ্রীসনৎকুমার বসু।

N.B.—নাম ও ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিলে বাধিত হইবে।

XX চাহকগণের নিকট নিবেদন।

ভাদ্র ও আশ্বিনের "সাহিত্য" একত্র আশ্বিনের শেষ দিবসে প্রকাশিত হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া দুই সপ্তাহের অধিক হইল, শয্যাগত আছেন, এজন্য "সাহিত্য" প্রকাশিত হইতে অগত্যা বিলম্ব হইল। অমুস্মতঃ বশতঃ সম্পাদক মহাশয় এবার সাহিত্যের আচ্ছন্ন দেখিতে পারেন নাই—এজন্য বেদেন ও ক্রেতা ঘটিয়াছে, পাঠকগণ তাহা অমুগ্রহ-পূর্বক মার্জিত করিবেন। ইতি— কার্য্যাদ্যক্ষ।

কবিরাজ অভয়চরণ গুপ্ত কবিরত্নের

সুধাবটী।

১২০ বটীকার এক কোটা—১৭ এক টাকা। প্রতি ১২ কোটা—১০৭ দশ টাকার
ইহা পাচক, বিরোচক, রক্তপরিষ্কারক এবং বলকারক, সুতরাং শরীরের ব্যাধি সমস্ত দূরীকৃত করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং লাবণ্য ও পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। ইহা কোষ্ঠপবিকারক এবং অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহা আহার পরিপাক করিয়া মল নির্গত করে, অথচ ক্ষয়ও ভেদ হয় না। এবং শরীর বিকৃত করে না। আকস্মিক ব্যবহারকারিদিগেরও বেশ কোষ্ঠ পবিকার হয়। কোন পীড়ার উপক্রমে ২১ দিন সেবন করিলে আর পীড়া হয় না। যে প্রকার জ্বরই হউক না কেন, ইহা অগমনি সেবনেই সম্পূর্ণ স্থায়ীরূপে স্থায়ী হয়। ইহাতে কুইনাইন কিম্বা অল্প কোন দ্রব্য নাই। অস্ত্রান্ত ঔষধে প্রায় অল্প দিন পরেই পুনরায় জ্বর হয় না। অল্পশিশুজনিত সর্বপ্রকার উপদ্রব একেবারেই দূর হইয়া যায় ও অমিয়ুদ্ধি হয়। ডাক্তার, কবিরাজ ও চিকিৎসক বৌদ্ধিগণ প্রশংসাপত্র ঔষধালয়ে আনিগে দেখিতে পাইবেন। অনেক সুখ লেখার দোষে ঔষধ গ্রহণ করা হয় না। অতএব লেখা যেন কড়ান না হইয়া স্পষ্ট হয়। বিদেশে মহোদয়গণ ব্যবস্থা ও ঔষধের ক্ষমতা ও মনি অর্জার আশার নামে পঠাইবেন।

শ্রীবিজ্ঞানচরণ গুপ্ত কবিরাজ,

দার্য্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১নং নীলমাধব সেনের গুলি, সানকীভাঙ্গা, কলিকাতা।

প্রেম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি-এ প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা। ডাঃ গাউল ১০ এক আনা।

ইহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। ইহাতে উভয় পাণ্ডিত্য ও হৃদয় সম্মিলিত আছে। ইহাতে অনেক স্থলে হৃদয়োন্মাদক কথা আছে। শ্রীবিজ্ঞানচরণ বসু। প্রকাশক শ্রীবিজ্ঞাননাথ সিংহের নিকট ২ নং প্যারীমোহন জরুর-লেন, সোয়াবাগান, প্রিন্সা পোঃ, কলিকাতা।—এই টিকনিয় প্রাপ্তব্য।

সারদা ।

— কান্ডন মাসে লুনার কুলে কুলে আর জল নাই। এক ধারে-বিস্তৃত বাগির-

চর। শুধু এক পাশে একগাছি রক্ততরুজের ছায় ক্ষীণাঙ্গী লুনা বহিরা গিয়াছে।

অল্পপরিদৃশ্য হইলেও-চঞ্চলা কিশোরীর ছায় লুনা-খরশ্রোতা।

নদীতীরে একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন অঙ্গন বেড়িয়া তিন চারিখানি কুটার। কুটা-

রের চারিদিকে কেয়া ও সুপারী গাছের বেড়া। কয়েকটি কেয়া গাছ জলের

উপব ভ্রাসিয়া পড়িয়াছে। সেই মধ্যাহ্নবিকররোবী-কেতকীপত্রের আ-

রণের ভিতর সন্ধ্যাব সময় একজন রমণী লুনার ক্ষটিকজলে গাত্রমার্জন করিতে

করিতে গাহিল—

“তুমি সঙ্গ চলি না-পারই-হে নাগর,

কুমারকণ্ঠা ব্যথাইল চরণ।”

উৎকলরমণীর হ্রবে পঞ্চশ্রোতা-কুশাকুরব্যথিতচরণ। সুনরীর অবনাদ।

ঈর্ষ্যাবশতঃ নদীতীরস্থ এক কাঞ্চনবৃক্ষ হইতে কোকিল বন্ধার দিয়া উঠিল।

সারদা কৃষ্ণপুয়ের দধিবাস্নন দেবের মন্দিরের নর্ত্তকী। দশ পনের বিধা

নিকর দেবত্র জমী সে ভোগ করিয়া থাকে। পক্ষ উপলক্ষে তাহাকে দেবতার

সম্মুখে বিভাগতিষ্ঠাকুর ও কেন্দুবির-কবির কোমলকাস্ত পদাবলী গাহিতে হয়।

আলৌকিকমালানুজ্জল প্রশস্ত নাটমন্দিরে-সারদা স্বখন স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া সংস্কৃত

গাথা গাহিত, সকলে মুগ্ধ হইয়া নীরবে শুনিত। তাহার কোমল স্বর স্বখন

সম্মুখে উঠিয়া সমস্ত নাটমন্দির ছাইয়া ফেলিত, তখন বৃষ্টি-প্রাষণ-দেবতারও

চমক-ভাদিত।

পিতার স্রোতা কন্ডা বলিয়া কুলপ্রথা অনুসারে সারদা চিরকুমারী। তাহার

অল্প দুইটি ভগিনী বিবাহিতা ও স্বামিগৃহে বাস করিয়া থাকে। বাটীতে

পরিবারের মধ্যে শুধু ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভায়া স্তভদ্রা। ভ্রাতার নাম স্ববলঃ সারদার

জমীর উপরত্ন ভিন্ন সংসার চলিবার আর কোন উপায় নাই। স্ববলের কখনও

মনে হইত না, সংসারে তাহার কিছু উপার্জনের দরকার। সে নিশ্চিন্তভাবে

অহিফেনস্বপ্নে মায়াময় মানবজীবনটা কোন প্রকারে কাটাইয়া দিতেছিল।

নিতান্ত খোঁয়াল হইলে কখন বা দেবমন্দিরে সারদার সহিত সারেক বাজাইত।

নুনর তীর হইতে কে বলিয়া উঠিল, “কুলের কাঁটার না কুলের কাঁটার !”

সে রূপসী স্তম্ভজা । “তবে লো স্তম্ভি, আমার সঙ্গে চাট্টি, তোকে মজা দেখাচ্ছি”

এই বলিয়া সারদা ছুটিয়া গিয়া ভাতৃজারার অকল ধরিয়া তীর হইতে জলে

নামাইল। কানুন মাসে তখনও বেশ একটু শীত ছিল। সন্ধ্যার সময় জলে

নামিয়া গাঞ্জমাঙ্কন করিতে স্তম্ভজা ঠাকুরাণী বিশেষ উৎসুক ছিলেন না।

কিন্তু নাচার। সারদা ভবী, তিনি হুলাসী ; কাজেই অনেক-সময় বনদের

বাহে স্তম্ভজাকে হার মানিতে হইত।

তিনাটানিতে অজ্ঞাতসারে সারদার নাসিকা হইতে সোনার “বেশর”টি

স্থলিত হইয়া স্তম্ভজার বস্ত্রের উপর পড়িয়াছিল। স্তম্ভজা নাসিকাভরণটি

করতলমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ভাতৃজারার অঙ্গে সজোরে গাঞ্জমাঙ্কন

প্রয়োগ করিবার সময় সারদার বেশেরের খোঁজ পড়িল। ভবিষ্যৎ ক্রতির

আশঙ্কায় তাহার মুখ ম্লান হইয়া আসিল। স্তম্ভজা বলিল, “হারিয়ে যাবে না।

সন্ধ্যার সময় আমাকে এত কষ্ট দেওয়া—ধর্ম্ম আছেন !” কিন্তু ঈশৎ ক্ষুবিভা-

বরের মধ্যে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না—স্তম্ভজা-হাসিয়া কেলিল। গালের

মাঝখানে টোল খাইয়া তাহার অঙ্গোল সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধিত হইল। সারদা

স্তম্ভজার ছটি ঝাল অঙ্গুলী দিয়া চাপিয়া বলিল, “পোড়ারমুখী, আগাব বেশর

বেশর কুন্দ”—কিন্তু তাহাকে নাসিকাভরণের জন্ত বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না।

স্তম্ভজা স্বয়ং তাড়াতাড়ি নাকছাবিটি সাবদার হস্তে সমর্পণ করিয়া এক হাত

ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইল।

সারদা তীরের দিকে চাহিয়া দেখিল, একজন লোক অনিমেষনে

তাহাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে। সে ভয়ঙ্কর কুক্ষিত করিয়া

নিভান্ত অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। লোকটি কিছু অপ্রতিভ হইয়া

বিস্ত্রাস্তা করিল, “দখিবামন রেবের মন্দির কোন দিকে ?” সারদা বলিল, “বয়স

বয় উত্তর দিকে গিয়া দক্ষিণ দিকে কিরিও। তাহার পর একটা বাগানের

পাশ দিয়া পশ্চিমমুখে হইয়া পূর্বদিকে যাইও। কেন, পথ বিস্ত্রাস্তা করিবার কি

আর বেশে লোক ছিল না !” লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান ত্যাগ করিয়া

গেল। সারদা মনে মনে হাসিল ; ভাবিল, লোকটা ভারি বোকা, একটা কথা

পার্থক্য কহিতে পারে না। কিন্তু মানুষটা সুপুরুষ বটে—আলাপ পরিচয়ের

নিভান্ত অযোগ্য নহে। বয়স অতি অল্প,—মোটে গোঁকের রেখা দিয়াছে

নাথ। হয় ত সেই জন্ত এত মুচোরা। স্তম্ভজা বলিল, “দিদি, তুমি বড় চোঁট-

কটা। তোমার কথায় লোকটা পালাইবার পথ পায় না। সাবদা একবার
ব্রাহ্মায়ার দিকে চাহিল। তাহার পর অন্তমনস্কভাবে শুধু একটা হুঁ দিয়া
দক্ষিণ হস্তে চুল জড়াইতে জড়াইতে ঘাট হইতে উঠিল। লম্বরক্ক কৈনদান
হইতে বিন্দু বিন্দু বারি ভূপৃষ্ঠে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

২।

দোলঘাত্তা উপলক্ষে সন্ধ্যার সময় দুধিরাশ্রম দেবের মন্দিরে লোকারণ্য।
সকলের হস্তেই-পুষ্পমালা। দূর হইতে দোলমণ্ডপের উপর-মালা পড়িতে
ছিল। কিন্তু অনেক সময় বেদীতে প্রৌছিবার পূর্বেই-মালা হইতে-ফুলের
পাপড়িগুলি ঝরিয়া প্রাণনে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ছই-তিন জন পুরোহিত
ধারাবাহিক দ্বারা লোকারণ্যের মধ্যে স্থবাসিত বারি সিঞ্চন করিতেছিল। প্রস্তর-
খচিত মন্দিরকুটুম প্রমদাদিগের কপোতানিপতিত সিন্দুররাগে ও আধিরে
অরুণাত।

দর্শকদিগের মধ্যে পরিচিতকে লক্ষ্য করিয়া কেহ-কেহ হুঁ একটা কুহুম
নিক্ষেপ করিতেছিল। কচিং কুহুম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কোনও অপরিচিতা রমণীর-
গায়ে আসিয়া পড়িবারাজ, চারিদিক হইতে হাসি-টিটকারি উঠিতেছিল—
উঁহারাও যে নিতান্ত-নীরবে এ ব্যবহার সম্বন্ধ করিতেছিলেন, এমন নয়।

দেবতার মন্দিরে ক্ষটিকাধারের উপর ছইটি স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্নপ্রদীপ। পুষ্প-
পাত্রে স্তরে স্তরে চন্দনসিক্ত পদ্ম। সেই স্নিগ্ধালোকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত
ভাগবতের মশম স্কন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি সচন্দন
রক্তোৎপল দেবতার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছিলেন।

প্রধান-পুরোহিতের ললাটে চন্দনবিন্দু। অদীর্ঘ-বগু উল প্রাচীরে আচ্ছা-
দিত। আনন প্রসন্ন ও প্রতিভাদীপ্ত।

চন্দ্রালোকে নুনার উপর মন্দিরের-বৃহৎ ছায়া পড়িয়াছে। যাজ্ঞপূর্ণ
এক এক ধানি নৌকা সেই-ছায়া-ভেদ করিয়া ঘাটে আসিয়া লাগিতেছিল।
নৌকার বিচিৎরবজ্ঞপরিহিতা রমণী ও বালক বালিকার সংখ্যাই অধিক।
উৎকলরমণীরা রোপ্যভূষণের ভায়ে-গুপ্তিভা ব্রততীর ভার অবনতদেহ। চকু
প্রায়ই ডাগর ও উজ্জল। বিস্তৃত জয়গমধ্যে উল্কা,—সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে মত-
ভেদ সর্বত্র।

নিশাগমের সহিত দর্শকসংখ্যার ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছিল। নদীকুলোদগমস্থল
সোপানশ্রেণীর উপর রমণীদের অলঙ্কারশিখিত অবিশ্রান্ত শ্রুত হইতেছিল।

সারদা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল।

নুপুরশিল্পনে সকলের চক্ষু সেই দিকে আরুঠ হইল।

সারদার পরিধানে একখানি বারাগনার স্বর্ণপচিত নীলাম্বরী। হস্ত-প্রাকোষ্ঠে স্বর্ণবলয়। দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিতে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী। কর্ণা-

ভরণ ছুথানি পাশা। কেশপাশ মদ্রজাদেব মত বাম দিকে ফিরাইয়া বাধা।

বেণীর উপর কটকী রূপার ফুল। গুচরয় তাবুলরাগে রঞ্জিত। হস্তে তাবুলপূর্ণ

একটি সুদৃশ্য তাবুলগায়ার। সমস্ত অঙ্গে ইত্যাদির সৌরভ। সারদা উৎকলাঙ্গনা-

দিগের চিরপ্রথা ত্যাগ করিয়া বঙ্গরমণীদের শ্রায় বস্ত্র পরিসাছিল।

সারদা দেবতাকে প্রণাম করিয়া নাটমন্দিরের মধ্যে বিস্তৃত গালিচার

উপবেশন করিল। সম্মুখের আর-একখানি জাগরণের উপর সেই প্রদে-

শের তিন চারি জন তালুকদার। সকলেরই মস্তকেন সমুখভাগ মণ্ডিত।

গরদের কাপড়, জরির ছুতা, সাটিনের বেনিয়ান ও গাত্রের পলাশগুপ্পাভ

প্রাবারে মন্দিরের বর্ণ-বৈচিত্র্য বর্ধিত করিয়াছিল। তাহাদের পার্শ্বে একজন

বাক্সাণী ভদ্রলোক, — পুলিশের ছতন দারোগা। সকলের সম্মুখেই রোপ্যপাত্রে

আবির ও গোলাপজল।

দারোগা বসন্তকুমারের বাটী বরিশালে ক্রধার এখনও স্নায়ু ভ্রাজ্জ নাই।

স্বল্প মূল্যের না হইলেও পরিচ্ছদে সাবিপাটোর সম্পূর্ণ অভাব।

বসন্তকে দেখিয়া সারদা একটু হাসিল। হাসির স্বর, — তুমি না সে দিন

দর্শিবামন দেবের মন্দিরে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিতেছিলে? তখন বড়

পলাইয়াছিলে, কিন্তু আজ আমার জালে আবার তোমার পড়িতে হইল।

বসন্তকুমার একটু মুখ ফিরাইয়া ভাবিল, “ছি ছি! এত লোকের মধ্যে।”

লুনার ভায় সারদারও হৃদয়তট প্রায় শুষ্ক; স্বধু একধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ধারা ঝির ঝির করিয়া বহিত। কিন্তু অল্প হঠাৎ প্রবল বস্ত্রার উপক্রম হইল।

সুদূরপ্রান্ত বস্ত্রার বারিকম্বলের ন্যায় আজি তাহার বেগমান অন্তরের ছক ছক

স্পন্দন হৃদয়প্রাণী প্রেমের বাকী বহিয়া আনিতেছিল।

বাণীর মধুর শব্দের সহিত মৈথিল কবি- “দহিন পবন বহ বীতর” মিথিয়া

জারও মধুর হইল। সারদার চক্ষু উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। সমস্ত নবনাবীর

অস্তিত্ব সে একবারে তুলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে জাগিতেছিল, শুধু সেই

বিরহবিধুরা রাধিকার কথা।

সারদা পূর্বরাগ গাহিতেছিল। দিবসান্তে রাধিকা চকলা। শত বার বিনা-

কারণে গৃহ হইতে গৃহান্তবে বাইতেছিল। সন্ধ্যাগয়ের সহিত পায়ের উপর নুপুর 'কসি' দিয়া বাঁধিতেছিল। পরিধানে "তম-সম চীর।"

তাহার পর গাহিল প্রথম অভিসাব। "উল্লোর" রজনীতে সুন্দরী ওৎ-সুকোর সহিত কুঞ্জবনে উপস্থিত, কিন্তু হৃদয়ের কাছে বাইতে পদে পদে লজ্জা-আসিয়া বাধা দিতেছিল। ত্রিক্ষের করম্পর্শে সমীরান্ধোলিতা লতার-জায় ধর ধর করিয়া সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতেছিল। শুকপত্রের মূর্ধ্নে আসকম্পিতা হরিণীর জ্বর রাধা ভীত-চকিতদর্শনা।

লুনার শিশিরশীতরসিক্ত উদ্যানিল অপর পার হইতে আশ্রয়কুলের গন্ধ-বহিরা আনিতেছিল। নাটমন্দিরের ক্ষুদ্রিকপাত্রস্ত ক্লীণপ্রভ-বর্তিকালোক লেখ-কম্পমান। স্তম্ভসংলগ্ন প্রস্তরমূর্তির কঠিন পুষ্পমালা হইতে চম্পকের পাগড়ি-গুলি খসিয়া পড়িতেছিল।

সারদার প্রক্ষুটিতপদ্মবৎ আগরণাক্রম নয়ন বসন্তকুমারের উপর স্থাপিত। সমীরম্পর্শে অলকজঙ্ঘ কপোলের উপর স্বেদবিন্দুর সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। মন্ডিনার গাহিতে গাহিতে তাহার কথা-অম্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। পা-পিয়া মধ্যে মধ্যে নৃত্যের তালভঙ্গ হইতেছিল। হৃদয়াবেগসংবরণার্থ কিশলয়-নিম্নল করতল বন্ধের উপর-রক্ষিত।

হঠাৎ নদীকূলে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। সারদা গাহিল,—

"হে হরি হুনিএ শ্রবণ ভবি
অব ন বিলাসক বেবা;
গগন নকত ছিল সেহো অবনত ভেল
কোকিল কবইছি কেরা।
চকবা মোব-সোর কয় চুপ-ভেল
ওঠ মলিন ভেল চন্দা।
নগরক যেমু ডগবক লক্ষর
কুমুদিনী বহু নকরনা।

চারিদিক হইতে আঁবির ও কুঙ্কম সারদার গানে আসিয়া পড়িতেছিল। বসন্তও একটা কুঙ্কম ছুড়িয়া মারিল। কুঙ্কমস্পর্শে সারদা শিহরিয়া উঠিল। সঙ্গীতান্তে চারিদিক হইতে স্ততিহুচক অক্ষুট ধ্বনি উঠিল। সারদা এক-বার অপাঙ্গে আবেশতরলনেত্রে বসন্তকুমারের দিকে চাহিয়া নৌকাভিমুখে চলিল। তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপ দর্পিত হৃদয়ের পরিচায়ক। মানবের পূজা স্বতঃই তাহার প্রাপ্য বলিয়া লোকের প্রশংসায় সারদার ভ্রক্ষেপ নাই।

সারদা জলের উপর পা দুখানি ভাসাইয়া নৌকার বসিয়াছিল। তাহার সতৃষ্ণ-
চরম মন্দিরপ্রাঙ্গনাতিমুখী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁচিমালা পদমূল হইতে অলঙ্করণ-
ধেতি করিয়া লইয়া বাইতেছিল।

স্নান আর লোক নাই। সমস্ত লোক প্রাঙ্গণে আগ্রহের সহিত যাত্রা
শুনিতেছে। বসন্তকুমার ধীরে ধীরে নৌকার কাছে আসিয়া-সারদাকে সোধেন
করিয়া-বলিল, “আমাকে নৌকায় লইবে কি?”

সারদা একটু-মধুর হাসিয়া-বলিল, “যদি নৌকা ডুবিয়া যায়?”

“নৌকার দাম দিব।”

“যদি আমি ডুবিয়া যাই?”

“সঙ্গে-সঙ্গে ডুবিব।”

“এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকে।”

“আচ্ছা, না-হয় আমাব কথা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা।”

“তবে উঠিয়া আইস—কিন্তু দেখিও যেন ভরা-ডুরি না-হই।”

উদ্যমমার্গমে আপাণ্ডুব মলিন-চক্রেয় ছায়া নদীবক্ষে তুলিতেছিল। দূরে
নদীসেকতে চক্রবাকিমুখের রব ক্ষত হইতেছিল। এক-দল-কোঁক-সুদূর
জলাশয় উদ্দেশে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া-গেল। ক্ষুদ্র তরঙ্গী খানি নদী-
তীরজাত শিরীষপুষ্পের পরাগে আবৃত। বসন্তকুমার সারদার চক্ৰলোকবিভা-
সিত অধর-সম্পৃহণোচনে নিরীকণ করিতেছিল। কিন্তু সেই তাৎক্ষলিক-
রঞ্জিত কোমল রক্তোষ্ঠি-স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছিল কি! সারদা হাসিয়া
বাহুযুগল-দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেঁধেন করিল।

৩।

মেঘস্তর ভেদ করিয়া অপরূহের স্ব্যাকিরণ হঠাৎ মাঠের মধ্যে পুষ্পিত পলাশ-
বৃক্ষের উপর ছড়াইয়া-পড়িল। কোশের পর কোশ শুধু শুধু ধাত্তের মূলে
আচ্ছাদিত। দুই মাস-পূর্বের সজ্জল মৃত্তিকা প্রথর রোজতাপে কঠিন-প্রস্তরবৎ
হইয়াছে।

কৃষকেরা স্থানে স্থানে আমি দিয়া-ধাত্তের মূল গোড়াইতেছিল। কৃষকবাল-
কেরা গৃহ হইতে কৃষকদিগের জন্ত মধ্যাহ্নভোজন বহন করিয়া আনিয়া আর
বাড়ী ফিরিয়া যায় নাই; ক্ষেত্রমধ্যস্থ এক-ক্ষুদ্র-পঙ্খিল হ্রদে সস্তরণ দিয়া
পদ্মকুল তুলিতেছিল।

হ্রদের পাশ দিয়া একজন লোক একটি সাত আট বৎসরের বালিকাকে

সঙ্গে করিয়া গইয়া বাইতেছিল। বালিকাকে দেখিয়া একজন কৃষকবালক বলিল, “কল্পিণী, আর না একটু সঁতার দি। তোকে পোটাকতক পদ্মকুল তুলে দেবা।” কল্পিণী একটু গভীর হইয়া বলিল, “আমি-পায়রা আনতে যাচ্ছি; এখন সঁতার দিতে পারবো না। আমার সঙ্গে পদ্মের ফোঁপল রাখিস, আমি ফিরে আসবার সময় নিজে বাব।” কল্পিণীর সহিত একজন নতুন লোক দেখিয়া বালিকেরা অনেকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

কল্পিণী দ্বিপ্রহরে বাটার পার্শে বাগানে আত্ম কুড়াইতেছিল। সুবল গ্রামান্তর হইতে গৃহে ফিরিবার সময় সেই আত্মকাননের পার্শে দিয়া আসিতেছিল।

কৃষ্ণপুর হইতে দুই তিন কোশ দূরে কোনও ক্ষুদ্র গ্রামে তাহার এক প্রপ-য়িনীর বাস। সেইদিন প্রাতঃকালে তাহার সহিত সুবলের কলহ হইয়াছিল।

কলহের কারণ সুবলের অর্থাভাব। কিছু অর্থ না আনিতে পারিলে সে সুবলকে তাহার অঙ্গনে প্রবেশ করিতে দিবে না।—সুবল নিরুপার হইয়া

গ্রামান্তরে এক সুহৃদের কাছে কিছু টাকা কর্ত্ত করিতে গিয়াছিল। কিন্তু

ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিমর্ষবদনে গৃহে ফিরিতেছিল। আত্মকাননেব ভিতর দিয়া আসিতে

পশ্চাৎ হইতে কল্পিণী বলিল, “ওগো! আমায় একটা পায়রা দেবে না?” এই-পথে বহুদিবস হইল সুবলকে এক পারাবত হস্তে গমন

করিতে দেখিয়া কল্পিণী পারাবতটি চাহিয়াছিল। কিন্তু অস্ত্র-বাহে-দ্বিবার অঙ্গীকার করিয়া সুবল চলিয়া গিয়াছিল। সুবলকে দেখিয়া কল্পিণীর সে

কথা মনে পড়িল। কল্পিণী পিতার একমাত্র কন্যা, বড় আদরের,—তাহার

মার্কজার পারাবত প্রভৃতি গৃহপ্রাপিত-পণ্ডপক্ষীর উপর অসীম মেহ।

কল্পিণীর হাতে হুগাছি মোটা রূপার রান্না-দেখিয়া সুবলের হঠাৎ লোভ

পড়িল। প্রলুব্ধ হৃদয়কে কোন-প্রকারে ফিরাইতে পারিল না। সুবল বলিল, “আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় ভাল পায়রা দেব।” কল্পিণী রক্তাকলে

কোমর বাঁধিয়া সানন্দে দ্রুতপদে সুবলের পশ্চাতে আসিতেছিল।

ক্ষেত্রের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডশৈল—স্বর্ধরশব্দে শৈল হইতে শৈলা-স্তরে নামিয়া একটি ক্ষীণ বারিপ্রবাহ গিরিমূল ধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই গিরিতটিনীর কাছে আসিয়া কল্পিণী বলিল, “আমি আর চলিতে পারি না। আমায় বাড়ীতে মার কাছে নিয়ে চল।” কল্পিণীর চোখে জল আসিল।

সন্ধ্যার অন্ধকাবের সহিত তাহার একটু ভয়ও হইতেছিল।

সুবল বলিল, “তোমার হাতের বালা হুগাছি দাও, আমি এই পাহাড়েব

উপর হইতে পায়রা কিনিয়া আনি। কন্সিলী কঙ্কণ দুগাছি খুনিয়া সুবলের হস্তে নমস্কার করিল। সুবল-কন্সিলীকে সেইখানে বসিতে বলিয়া শৈলশিখরে আরোহণ করিবাব উত্তোগ করিতেছিল। কন্সিলী ছুটিয়া গিয়া তাহার কাপড় ধরিল। সে একলা সুবলের অপেক্ষায় সেখানে বসিয়া থাকিতে কোন প্রকারে সন্তুষ্ট নয়। পূর্নকৃত সমস্ত বাঘের ও ভূতের গল্প তাহার মনে গড়িতেছিল।

সুবল জোর করিয়া কন্সিলীকে হিনাইয়া ফেলিল। গগুনৈলের উপর পড়িয়া গিয়া কন্সিলীর কপাল কাটিয়া গেল। ক্ষত হইতে রক্ত পড়িয়া তাহার অকল ভিক্ষিয়া যাইতেছিল। সুবলের দে দিকে দৃষ্টিপাত নাই; সে মুহূর্তমধ্যে বালিকার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

চারিদিক হইতে বালিকার আকুল ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি হইতেছিল। চতুর্দিক জনশূন্য। রক্তস্রাব বন্ধ হইরাছিল, কিন্তু ভূতল হইতে উত্তীর্ণ সময় দুর্কলভাবশতঃ কন্সিলী বসিয়া পড়িল। কাদিতে-কাদিতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদযন্ত্রাণি ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

বালিকার পদনিম্নে নিব্বিরলীতটে একটি কপোত আসিয়া জলপান করিতেছিল। কন্সিলী কান্না ভুলিয়া গেল। তাহাব একাধি দৃষ্টি কপোতের উপর। বাগিয়া মনে মনে দেবতাকে ডাকিতেছিল, যেন কপোতটি না উড়িয়া যায়। পারাবতটি নদীতটে প্রাকিলে অন্ততঃ তাহাব ভয়ের একটু উপশম হয়। কিন্তু জলপান শেষ করিয়া কপোতটি উড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে কন্সিলীও ডুকরিয়া কাদিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর লোকজন কন্সিলীকে অবেষণ করিতে আসিয়া দেখিল, বালিকা এক কঠিন উপলব্ধি শিখান কবিতা অকাতরে ঘুমাইতেছে। কঙ্কণ-হীন ম্রগ ভুজলতা ভূমির উপর নিদ্রিষ্ট।

সারদার গৃহচত্বরে একটি কপোতপালিকা। অরণ্যলোকে একদল পারাবত চক্রাকারে নদীর উপর উড়িতেছিল। সারদার আস্থানে তাহার স্বপ্নে নামিয়া আসিল। একটি কপোত সারদার স্বপ্নের উপর বসিয়া চকু দিয়া বারংবার তাহার রক্তোৎপল-ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছিল। সারদা হাসিতে হাসিতে তাহার ঠোঁট সরাইয়া দিতেছিল।

সারদার পায়দার মতন একটি পায়রাকে পোষ মানাইবার স্বভাবের অনেকে

দিন হইতে ইচ্ছা। কিন্তু স্তম্ভজকে দেখিলে কপোতবৃন্দ স্তনীল আকাশের
দিকে উড়িয়া যায়, ইহাতে স্তম্ভজার বিশেষ ছুৎ। অস্ত্র অনেক কষ্টে দৌড়া-
দৌড়ি করিয়া অঞ্চল দিয়া একটি পায়রা ধরিয়াছে। কিন্তু কপোতটি নিতান্ত অর-
সিক—স্তম্ভজার স্তন্যর কোমল ওষ্ঠ স্পর্শ করিতে তাহার বিন্দুবাত্ত স্পৃহা নাই!

সারদা হাসিয়া বলিল, “জোর করিয়া—কি কাহ্ন?” ও পোষ মানান যায়?”

স্তম্ভজা হাসি কামা মিশাইয়া উত্তর করিল, “দে, তুমি যে ভাল পোষ
মানাইতে পার, তাহা বেশ জানি—ঐ দেখ।” এই কথা অভ্যাগত বসন্ত-
কুমারের উদ্দেশে বলিয়া স্তম্ভজা দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিল। বলা বাহুল্য,
স্তম্ভজা ঠাকুরাণীর রাগ ভগিনীৰ উপর হইতে শেষে ভ্রাতার উপর পড়িল।
কিন্তু স্তম্ভজার তাহাতে নিজার কিছু ব্যাঘাত হয় নাই।

অসময়ে বসন্তকে অন্ধনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সারদা একটু আশ্চর্য
হইল। বটে, কিন্তু আনন্দে তাহার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে সম্মিত
নেত্রে বসন্তকুমারকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, “আমার বে-বড় ভাগ্য!” কিন্তু
বসন্তকুমারের মুখ গভীর, হাসির রেখামাত্র নাই। সারদা ধীরে ধীরে বসন্তের
হাত ধরিল। কিন্তু সে আদর কোথায়? বসন্তকুমার হাত না সরাইয়া
স্বধু একটু মুখ কিরাইবা জিজ্ঞাসা করিল, “স্ববল কোথায়?” সারদা একবার
অপাঙ্গে বসন্তকুমারের প্রাবুটের তমসচ্ছন্ন অঙ্গের আয় মুখ দেখিয়া চম-
কিয়া উঠিল। স্ববলের স্বভাব-চৰিত্রের কথা তাহার কিছু অবিদিত ছিল
না। সে বুঝিল, ভ্রাতার কোন আসন্ন বিপদ।

উঠানে কথাবাত্তা শুনিয়া স্ববল চোক মুছিতে মুছিতে শয়নগৃহ হইতে
উঠিয়া আসিতেছিল। বসন্তকুমারকে দারোগার পরিচ্ছদে দেখিয়া তাহার
মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বসন্তকুমার বজ্রনধ্য হইতে এক ভোড়া
কপার বালা বাহিব করিয়া স্ববলকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই বালা আর কোন
দিন দেখিয়াছ কি?” স্ববল বজ্রাহতের স্তম্ভ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইবা বহিল।
শেষে অনেক কষ্টে বলিল, “না।”

বসন্তকুমার বলিল, “আমার কাছে গোপন করিয়া আর লাভ কি? আমি
সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। প্রায় দুই মাস হইল, তুমি একদিন সন্ধ্যার সময়
রক্তগিবির কাছে কুকুম্বাস্তির ছোট মেয়ের হাত হইতে এই বালা কাড়িয়া
লইয়াছিলে। আমাব সহিত থানায় চল—নতুবা বাঁজাবে জ্ঞান কয়েক
কনেষ্টবল রাখিয়া আসিবাছি, তাহাদের এখানে ডাকিব।”

স্ববল করুণনয়নে ভগিনীর দিকে চাহিল। তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত
কাতরতা শ্রুতকোড়স্থ মুম্বু শিশুর দৃষ্টির দ্বারা সারদার মর্শ স্পর্শ করিল। সারদা
একবার অভয়প্রদ কটাক্ষে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বসন্তকুমারকে বলিল,
“তোমার সহিত-নিজনে একটা-কথা আছে; ওনিবে কি?” বসন্তকুমার
বলিল, “আপত্তি কি? কিন্তু পূর্ব হইতে বলিয়া রাখিবেছি, আমি কোন
অনুরোধ রক্ষা করিব না।”

সারদা বসন্তকুমারের সহিত অদ্বন্দ্ব হইতে বাহির হইয়া বরাবর নদী-ব-তীরে
আসিল। প্রাণ-মাসে-শুনায় উভয় কুল দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীর প্রস্থেতে
তীরস্থ বেতসলতা-অবনম্বী-প্রক্ষুটিত-কেতকী-কুমুম বারিপ্রবাহে সাগরাস্তি-
মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। দূরে-কোন-জলপ্লাবিত তড়াগ হইতে উৎপল-কুমুদ-
প্রভৃতি জলজপুষ্প নদীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

সারদা দুই হস্তে বসন্তকুমারের হাত ধরিয়া সকাঁতরে বলিল, “আমার
ভাইকে রক্ষা কর। আমি চার বৎসর বয়স হইতে পিতৃমাতৃহীন। স্ববলের
বয়স তখন সাত কি আট। সেই দিন হইতে আর আজ পর্যন্ত তাহাকে
স্বাধীন করিতেছি। পৃথিবীতে স্ববল-আমার একমাত্র স্নেহের জিনিস। তুমি
ইচ্ছা করিলে স্ববলকে বাঁচাইতে পার, এবং মারিতেও পার।” এই কথা
বলিতে বলিতে সারদার চৌক কাটিয়া জল আসিল।

কিন্তু-রমণীর-মহাদ্রও-ব্যর্থ হইল। নয়নজলে বসন্তকুমারের মন টলিল-
না। বসন্ত অতি শুষ্ক ভাবে বলিল, “আমার ইচ্ছাতে কোন হানি নাই-
উপর হইতে ছকুম আসিয়াছে।”

“কিন্তু সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি মনে করিলে স্ববলকে
ছাড়িয়া দিতে পার। পড়িগায়ে দারোগার দ্বারা ইচ্ছা করিতে পারে।”

“আমাকে বুঝা অনুরোধ করিতেছ; আমি আসামী চালান দিব।”

সারদা বসন্তকুমারের পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, “আমার কথা-
সর্বস্ব এইয়া আমার ভাইকে ছাড়িয়া দাও।”

বসন্ত কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের ভিতর একটা
কাটকা বহিয়া বাইতেছিল। সারদার অশ্রুসিক্ত কাতন মুখ দেখিয়া এক এক
বার স্ববলকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভবিষ্যৎ-
পদোন্নতির উজ্জল-চিত্রে মন প্রলুব্ধ হইতেছিল।

বসন্ত এন্ট্রেন্স ফেল হইয়া গুলিসের কক্ষ গ্রহণ করিয়াছে। গুলিসের

উচ্চ কর্মচারী হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রথম কার্য আরম্ভ করিয়াই যদি একটা কলঙ্ক রটিয়া যায়, তাহা হইলে পদোন্নতি হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা। একজন রমণীর স্নানর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া এতদূর স্বার্থত্যাগ বসন্তের বিবেচনায় নিতান্ত মূর্থতা। এই সমস্ত ভাবিয়া বসন্ত অতিরুদ্ধ স্বরে বলিল, “বুধা কেন আসাতন করিতেছ, আমি তোমার ভাইকে ছাড়িয়া দিতে পারি না।”

সারদা অশ্রুজলপরিপূর্ণ বিস্ফারিত লোচনে বসন্তকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, “আমার ভলিবাসারও কি কোন শক্তি নাই?” সারদার স্মৃতিকিরণে জল অশ্রুবিন্দু মুক্তার তায় নদীতটস্থ হরিৎ শম্পের উপর পড়িতেছিল। বসন্ত-কুমার হাসিয়া বলিল, “বেঙ্কার ভলিবাসা।”

পদদলিতা কণিনীর তায় সারদা উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানে ও রোবে তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছিল। প্রবল অশ্রুধারায় তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতেছিল। হঠাৎ বিদ্রুৎবেগে তাহার মনে হইল, বসন্তকুমার সন্তরণে নিত্যন্ত অপরূপ। এই কথা স্মরণ হইবামাত্র, সারদা ছ’এক পদ অগ্রসর হইয়া সবলে বসন্তকুমারকে নদীর দিকে ঠেলিয়া দিল। বসন্ত অন্তমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, একবারে নদী-গর্ভে পতিত হইল। সেই সঙ্গে পদস্থলিত হইয়া বা স্বেচ্ছায় সারদাও জলে পড়িল। সেই স্বর্ধ্যালোকপ্রভাসিত বারিপ্রবাহে কেতকী ও পদ্মের সহিত আর একটি ফুল সমুদ্রাভিমুখে ভাসিয়া গেল।

অতি কষ্টে ও দৈবযোগে এক খণ্ড কাষ্ঠ ধবিয়া ও নিকটবর্তী নৌকার সাহায্যে বসন্ত অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাদে উঠিল। কিন্তু সারদাকে আর কোথা উঠিতে দেখিল না।

পর দিন দধিবান দেবের মন্দির নিয়ে সারদার মৃতদেহ দৃষ্ট হইল। এখনও যেন সে পুষ্পমালাশোভিত আলোকাকীর্ণ দেবমন্দিরসংলগ্ন নৃত্যশালায় কথা ভুলিতে পারে নাই।

শ্রীমলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

আকাশের নীলিমা।

আকাশ নীল কেন, এ প্রশ্ন সহজেই মানুষের মনে উদ্ভিত হইতে পারে। সন্ধ্যার প্রাকালে সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে পশ্চিমাংশে সিন্দূরবর্ণে বর্ণিত হয় কেন? না, বড়ী আকাশে সিন্দূর ছড়াইয়া দিয়াছে। এ সমুদায় প্রশ্নের এই এক-রূপ উত্তর হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান আর একরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বক্তৃতি, এ অবস্থায় তাহাই আলোচিত হইবে। আশ্রয়।
প্রধানতঃ মহামতি টিঙালের মতের অনুসরণ করিব।

প্রথমতঃ, আকাশের নীল আলোক যে প্রতিফলিত আলোকমাত্র গতিগতগণ তাহার নিশ্চিত প্রমাণ করিয়াছেন। সূর্যালোকের গতিপথের পার্থক্য হইতে এবং সূর্য্যরশ্মির বিপরীত দিক হইতেও এই নীল আলোক আসিতে দেখা যায়। সূর্য্যর বিপরীত দিক হইতে আগত এবং পার্শ্বাগত এই আলোকতরঙ্গ সমুদয়ে অথবা বায়ুস্থ ভাসমান পদার্থকণাসমূহ হইতে প্রতিহত সূর্যালোকের তরঙ্গমাত্র, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে। কিন্তু প্রতিহত আলোক যেই নীল, অতএব বুঝিতে হইবে, ইহাতে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গসমূহের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। কেন একরূপ হয়, তাহাও কাণে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

একটা স্বল্প পর্য্যন্তে যেমন সাগরের প্রাচীরবৎ অত্যন্ত তরঙ্গ এবং ক্ষুদ্র বীচি, উভয়ই সমভাবে প্রতিহত হয়, একটা ক্ষুদ্র প্রতিরথণ্ডে তাহা হয় না। যদি প্রতিবাতকারী প্রকৃত তরঙ্গের সহিত তুলনা করিলে অতি ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তরঙ্গের অধিকাংশই প্রতিহত হইতে পারে না, অতি সামান্য অংশই বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসে, অবশিষ্ট অংশ চলিয়া যায়। সেইরূপ মনে কর। বায়ুতরঙ্গই অল্প কণাসমূহ ভাসমান রহিয়াছে; বড় ছোট সমুদায় আলোক-তরঙ্গই তাহাদের উপর পতিত হয়, এবং প্রত্যেক সংঘর্ষে পতিত তরঙ্গের

সূর্য্যরশ্মির বিশেষণে যে সমস্ত আলোকতরঙ্গ প্রাচুর্য্য থাকে, তন্মধ্যে দোহিত পীত ইত্যাদি বর্ণের তরঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত বহু এবং তাহা হইতে নীল প্রতিহত তরঙ্গ অতি ক্ষুদ্র, লোহিতের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত-ক্ষুদ্র না, পৃথক ৩০০০-তরঙ্গ সাজাইয়া গেলে এক ইঞ্চি পরি-মিত স্থান অধিকৃত হয়, এবং তাহা হইলে তরঙ্গের ৬০০০ গুলিতে সেই স্থান অধিকার করে।

অতি ক্ষুদ্র একটু-অংশ প্রতিকলিত হয়। লোহিত হইতে ভায়লেট পর্য্যন্ত সমুদায় তরঙ্গের-সম্বন্ধেই ইহা ঘটে, কিন্তু প্রতিকলিতাংশ সকলের পক্ষে সমান হয় না। বড় ছোট সম্বন্ধসূচক কথা-মাত্র; কোনও একটি নির্দিষ্ট কণা নইলে, তবঙ্গ যতই ক্ষুদ্র হয়, তাহার পক্ষে কণাটি তুলনায় তত বড় হয়, এবং বৃহৎ তরঙ্গের-সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র-তরঙ্গের-প্রতিকলিতাংশও অধিক হয়।

পৃষ্ঠবর্ণের মধ্যে ক্ষুদ্র বীচির গমনপথে একটি ছোট-প্রস্তরকণা ধরিলে, সমাগত বীচির যে অংশ (Fraction-) প্রতিকলিত হয়, একটা বড় তরঙ্গের প্রতিকলিতাংশ তাহার সহিত তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এখন-স্ব্যালোক খেত-প্রকৃতিস্থ থাকিতে হইলে তাহার অন্তর্গত সমুদায় তরঙ্গের আলুপাতিক-পরিমাণের পরিবর্তন হইলে চলিবে না; প্রত্যুত, বাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, অতি সূক্ষ্ম পদার্থকণা দ্বারা যদি আলোক বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সমুদায় তরঙ্গের আলুপাত পরিবর্তিত হইয়া যায়। এইরূপ-প্রতিফলিত আলোকে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গসমূহের আধিক্য হয়, (কারণ তাহার অধিক-পরিমাণে প্রতিফলিত হয়) অতএব নীলবর্ণই ইহার মধ্যে প্রবলতম বর্ণ হইবে; অবশিষ্ট বর্ণগুলিও নীলের সহিত কিছু-না-কিছু মিশ্রিত থাকিবে, এবং ভায়লেট হইতে লোহিত পর্য্যন্ত বর্ণগুলির পরিমাণ ক্রমশঃ অল্প হইয়া আসিবে।

যুক্তি দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যদি ঐখবতরঙ্গের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র পদার্থকণাসমূহ বায়ুতে ভাসিতে থাকে, তবে তাহাদিগের দ্বারা ক্ষুদ্রতম তরঙ্গগুলির (নীল ইত্যাদির) অপেক্ষাকৃত অধিক অংশই প্রতিফলিত হইবে, সুতরাং প্রতিফলিত আলোকে নীলতরঙ্গের আধিক্য ঘটবে। কিন্তু অপরাপর তরঙ্গগুলিও স্বল্পাধিকপরিমাণে মিশ্রিত থাকিবে। বাস্তবিকই যদি আকাশের নীল আলোকের বিশ্লেষণ করা যায়, তবে ক্রমশঃ হ্রাসশীল পরিমাণে ভায়লেট হইতে লোহিত পর্য্যন্ত সকল রঙেরই অস্তিত্ব অনুভূত করা যায়।

একটির পর একটি করিয়া এই কণাগুলির সহিত সংঘর্ষে খেত আলোকের নীলবর্ণের উপযুক্ত পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। ইহার কলে এই হয় যে, কিয়দূর হইতে দেখিলে সঞ্চারিত আলোক পীতভ-হইয়া পড়ে; কিন্তু যখন সূর্য্য পশ্চিম গগনের প্রান্তে ডুবিতে থাকে, তখন আলোকরশ্মিকে অনেকটা বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, সুতরাং পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক কণার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে ক্রমে ক্রমে ভায়লেট,

ইণ্ডিগো, নীল, সকল-গুলিই একে একে কমিয়া যায়, এবং সবুজেরও পরিমাণ কতকটা পরিবর্তিত হয়। একুণ-অবস্থায় সঞ্চারিত আলোক-পীত, কমলাবর্ণ এবং রক্তবর্ণও হয়।

এইরূপে দেখা-বাইতেছে, প্রতিফলিত আলোকে দ্বিপ্রহরের-গাঢ়-নীল-মাব উৎপত্তি হয়, এবং সঞ্চারিত আলোকে-স্বধ্যান্তগমনকালের রক্ত-পীত-প্রভৃতি-নানাবিধ-বর্ণের সমাবেশ সমুদ্ভূত হয়।

কেবল-কল্পনা ও যুক্তি নয়—অতি-সূক্ষ্ম-পদার্থকণাসমূহের-এরূপবিধ-ক্রিয়া-নিঃসন্দেহরূপে দৃষ্টিগোচর করা-বাইতে-পারে। সজ্জরস-জলে-দ্রব-হয়-না, কিন্তু-সুস্থাসারে-দ্রব-হয়, এবং সজ্জরস-মিশ্রিত-সুস্থাসার-বুথন-জলে-নিষ্ক্ষেপ-করা-যায়, তখন-সেই-দ্রবীভূত-সজ্জরস-তৎক্ষণাৎ-অতি-সূক্ষ্ম-কণাসমূহে-বিক্টিপ্ত-হয়, এবং-তাহাতে-জল-ঘোলা-হইয়া-যায়। এই-সজ্জরসের-পরিমাণের-উপর Precipitate-এর-সূক্ষ্মতা-নির্ভর-করে, এবং-যদি-উপযুক্ত-পরিমাণে-সজ্জরস-দ্রব-করা-হয়, এবং-পরে-জলে-নিষ্ক্ষেপ-করা-যায়, তবে-এই-সূক্ষ্ম-কণাসমূহের-দ্বারা-অতি-সূক্ষ্ম-নীলবর্ণ-গমুৎপন্ন-হয়। প্রোফেসর-ক্রকে-এই-অল্পপাত-দিয়েছেন;—এক-গ্রাম-পরিষ্কৃত-সজ্জরস-৮৭-গ্রাম-সুস্থাসারে-দ্রব-করিয়া-পরে-এই-নির্মল-দ্রব-পরিষ্কার-করা-দাড়ে-বীরে-ধীবে-ঢালিতে-হয়; এবং-এই-সময়ে-জল-বারংবার-আলোড়ন-করিতে-হয়। এইরূপে-অতি-সূক্ষ্ম Precipitate-উৎপন্ন-হয়, এবং-ইহার-পরে-আলোক-পাতিত-করিয়া-একটি-কাল-জিনিষ-এ-প্রাক্তের-প্রকাতে-বিরিয়া-দেখিলে, অতি-সূক্ষ্ম-আকাশের-আম-নীলবর্ণ-দৃষ্টিগোচর-হয়। অনেক-সময়ে-দুইয়ের-নীলবর্ণ-এই-কাবণেই-উৎপন্ন-হয়। হেল্ম-হোল্টজ-রুমীকুলের-প্রতি-ঈষৎ-অসহ্যের-সহিতই-প্রকাশ-করিয়াছেন—নীল-চক্ষু-আর-কিছুই-নয়, কেবল-একটি-মোলা Medium-মাত্র।

এতদ্ব্যতীত, ব্রজিম-আকাশ-প্রভৃতি-করিয়াও-টিঙাল-এই-বৃত্তান্তের-সমর্থন-করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রনীধর-রায়-চৌধুরী।

✓ আকবর সাহের শিকার।

হরিণশিকার।

শিকারী-সৈন্য পাতিয়া হরিণ ধরে, যোদ্ধারা-ভীক্ষু বধা, তরবারি বা গুলির
আঘাতে হরিণ শিকার করেন, ইহাই-চিরপ্রচলিত কথা;—কিন্তু-বাদশাহী
আমলে হরিণ-দ্বারা-হরিণ-শিকার করান হইত। বনেব-চুক্কল নিঃসহায়-পশুকে
নহা অতর্কিতভাবে অজ্ঞাদির সাহায্যে আক্রমণ করিয়া বধ করা, বীরবর
আকবর অভ্যস্ত ঘৃণিত কার্য বোধ করিতেন। বিশেষতঃ, হরিণজাতির উপর
তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। * এই জন্য তিনি অজ্ঞাদির সাহায্যে হরিণ-নিহত
না করিয়া, হরিণের দ্বারাই হরিণ শিকার করাইতেন।

সরকারে-অনেকগুলি হরিণ কেবলমাত্র-শিকারকার্য্যেব-জুড়ই পালিত
ও শিক্ষিত হইত। ইহাদের শিক্ষা ও আহার প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য
উপযুক্ত-বেতনে কর্মচারী সকল নিযুক্ত হইতেন। শিকারের-সময় বাদসাহ
অমাত্র্যবর্ণ লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন; সঙ্গে এইরূপ আট দশটি শিক্ষিত
হরিণ থাকিত। শিক্ষিত হরিণগুলির শৃঙ্গে ছোট ছোট জাল বাঁধিয়া বনের
মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বন্য মৃগের সাক্ষাৎ পাইলেই শিক্ষাগুণে ইহারা
তাহাদের আক্রমণ করিত। ভীষণ যুদ্ধেব পর-বখন-ক্লান্ত ও-সমরপরিভ্রান্ত
বন্য জীবের শৃঙ্গদ্বয় সেই জালের মধ্যে জড়াইয়া পড়িত, তখন তাহারা-সহজেই

* আকবর হরিণশিকার ভালবাসিতেন, অথচ হরিণের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল।
একটি সহসা অনমঙ্গল বলিবা বোধ হয়। কিন্তু আবুল ফাজল বলেন—“গৌরবান্বিত
বাদসাহের পিতা মৃত সম্রাট-হুমায়ুন যখন মৈবদুর্জিপাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া
রাজপুতানার বালুকামর মরুমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার
অন্তর্দ্বন্দ্বী পত্নী হামিদা বেগমের অতিসামান্যতর ঘোহরসংগ্রহেও তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম
হইরাছিলেন। একদিন এক হুদের তাঁরে একটি বৃদ্ধষ্ট হরিণ শিকার করিয়া, বাদসাহ-বীর
পত্নীর ঘোহর আকাজক্ষা পরিপূর্ণ করেন। সামান্য অর্ধসিদ্ধ হরিণের শল্য নাগসেই হুমায়ুন-
পত্নী (আকবরের-পর্জন্যদারিণী) সেই সময়ে যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করেন। আকবর পরে এই
ঘটনা অবগত হইয়া হরিণজাতির রক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করেন।” ইংলণ্ডের Forest
Law অনুসরণে একটি বিধান প্রচার করিয়া, তিনি সাধারণেব হরিণশিকারের বাসনা
সম্পূর্ণরূপে সংযত ও নিয়মবদ্ধ করিয়া দেন। ইহাকে প্রবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও,
কেবলমাত্র উদ্যাবপ্রবৃত্তিবে আকবর যে নিঃসহায় নির্ভীক ইতর প্রাণিবর্গের রক্ষার জন্য চেষ্টা
করিতেন, তাহা অবিধাস করিবার কোন কারণ নাই।

শিকারীদের দ্বারা ধৃত হইত। এই প্রকারে ধৃত বহু মৃগ কেবল শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইত।

শিক্ষিত হরিণগুলির শিক্ষানৈপুণ্যের কথা শুনিতে অতিশয় বিস্মিত হইতে হয়। যখন যুদ্ধ করিতে করিতে নাথীর জাল ছিড়িয়া যাইত, তখন তাহারা স্তব্ধ

প্রবৃত্ত হইয়াই রক্ষকদের কাছে ফিরিয়া আসিত। সামান্য বংশীধ্বনি বা সঙ্কেতশব্দ শুনিলেই, শিকারী হরিণ নিজ পালকের নিকট প্রত্যাবর্তন

করিত। বহু হরিণের সহিত যুদ্ধকার্যে একটি পালিত হরিণ পরাস্ত হইলে, তৎপরিবর্তে আর একটি প্রেরিত হইত। কখনও বা ৪৫-দফা এইরূপে হরিণ

পাঠাইরা, অনেক কষ্টে সমস্ত দিনের পর হয় ত একটিমাত্র মৃগ কর্তৃক বলিত হইত। শিকারী হরিণগুলি এত দূর পোষ মানিত যে, গভীর রাতে

শিকার উপলক্ষে তাহাদের হৃদয় বন্ধ ছাড়িয়া দিলেও, তাহারা রক্ষকের সঙ্কেত শ্রুতি শুনিবামাত্র প্রত্যাবর্তন করিত। শিক্ষিত হরিণগুলি পালককে এত

চিনিত যে, এক সময়ে একটি হরিণ তাহার পূর্বপালক হইতে বিরহিত হইয়া, কিছুতেই থাকিতে না পারিয়া, এলাহাবাদ হইতে পঞ্জাবে তাহাব প্রথম

রক্ষকের নিকট দণ্ডাইয়া গিয়াছিল।

উল্লিখিত উপায় ব্যতীত আরও চারি প্রকারে হরিণ শিকার হইত। “আক-বর-নামা”-র বর্ণনায়, বাদসাহ নিজে ঐ প্রকার প্রধার উপর বড় শঙ্খাবান

ছিলেন নান শিকারের অন্তর্গত গুলি বড়ই আমোদজনক। আজ চারি শত বৎসর পূর্বে, আম্রাদেব পাঠকবর্গ সেই মনত ঘটনা অবগত হইয়া যাহাতে

বণ্ঠে আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আমরা তাহার মধ্যে বিশেষ কথটির উল্লেখ করিব।

প্রথম,—শিকারী চান দিয়া নিজের মুখটি ঢাকিয়া ধীরে ধীরে বনের মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢালের যে দিকটি গভীর, সেই দিকটিই সমুখে থাকে।

শিকারীর হস্তে বা কটদেশে কতকগুলি বট্টা বাধা থাকে। ঢালের সেই শূন্য গর্ত দিকে একটি ব্রাহ্ম ব্রহ্মণ আলোকিত করিয়া আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

বট্টার শব্দ শুনিয়া মুগ্ধ হরিণ বেগম অগ্রসর হয়, অমনি প্রচ্ছন্ন শিকারী শূন্য স্থান হইতে বাহির হইয়া তাহাকে হত্যা করে। এই প্রকার প্রথাকে “বণ্ঠে-হেরা” বলে। কখনও কখনও বা শিকারী কেবলমাত্র গান গাহিয়া হরিণ

দিককে নোহিত ও উদ্ভাস্ত করিয়া বধ করিত।

দ্বিতীয়;—কোন কোন সময়ে শিকারী শূন্য মস্তকে, শূন্য গাত্রে উদ্ভাদের

তার হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বা মাথা নাড়িতে নাড়িতে বনের মধ্যে প্রবেশ করিত। কোতুলী হরিণ ইহাকে কি এক অন্তত-নূতনতর জীব ভাবিয়া যেমন নিশ্চিন্তচিত্তে দেখিবার জন্ত অগ্রসর হয়, অমনি প্রচ্ছন্ন শিকারীর তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার জীবলীলার শেষ হয়। এই প্রকার শিকারপ্রথাকে “খাঙ্গি” বলিত।

তৃতীয়;—শিকারীরা প্রচ্ছন্নভাবে চারি দিকে সহসা লুকাইয়া পড়ে, এবং দুই জন লোক একত্রানি সাদা কাপড়-মাথার-ঘোরাইতে-ঘোরাইতে বনপথ-দুই হরিণকে ভয় দেখাইতে থাকে। হরিণ ভয় পাইলে, তাহার। তড়াকরিয়া তাহাকে শিকারীদের কাছে লইয়া আসিত; তার পর সকলে মিলিয়া তাহাকে বধ করিত। এই প্রকার নাম “বোকাবা”।

চতুর্থ;—দুই জন ভাল তীরন্দাজ, বা বর্ষাবাজ সর্বদা সবুজ বর্ণের পোষাকে আচ্ছাদন করিয়া, দুই দিক হইতে বনমধ্যে পথহারা হরিণকে তাড়া দিয়া নিষেদের মধ্যে আনয়ন করিয়া বধ করিত। হরিণ ভয় পাইয়া যখন এদিক ওদিক করিতে থাকে, তখন শিকারীরা তাগান দিয়া হাসিয়া অস্থির হইত।

এই প্রকার শিকারকে “দাদাওয়ান” বলিয়া থাকে।

পঞ্চম;—শিকারীরা তাহাদের আপাদমস্তক বস্ত্র গুলবে আচ্ছাদন করিত। সেই পল্লবাচ্ছাদনের মধ্যে তাহাদের তীব্র গন্ধ লুক্কায়িত করিয়া ধীরে-ধীরে সমুদ্রে অগ্রসর হইত। বনমধ্যে হরিণচক্ষু নিশ্চিন্ত নানাবিধ ফাঁস ও ফাঁদ প্রচ্ছন্নভাবে ইতস্ততঃ পাতা থাকে। হরিণ, শিকারী দেখিলেই ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইত, এবং অবশেষে ফাঁদে পতিত হইত। কখন কখন শিকারীরা গাছের আড়ালে প্রাক্রিয়া হরিণের স্বরের অনুকরণ করিয়া ডাকিতে থাকিত। ডাক শুনিয়া হরিণ অগ্রসর হইবামাত্র শিকারী সহসা তাহাকে অজ্ঞাঘাত করিত। এইরূপ শিকারের প্রথাকে “আজারা” বলে।

ষষ্ঠ;—শুভ্র মস্তকে কখন কখন শিকারী বনের মধ্যে উল্লাসের-ভান দেখাইয়া ছুটিতে থাকে। তাহার সমস্ত বস্ত্রাদি লোহিত-রঙে আগাগোড়া রঞ্জিত হইয়া থাকে। অন্যান্য-বস্ত্র প্রাণিগণ ও সেই সঙ্গে মৃগদলও সেই রঙটিকে

আহত মনে কবিয়া তাহার পতন ও মৃত্যুদর্শনার্থ চারিদিকে দৃষ্টিমান হয়। এই সময়ে শিকারী তাহাদের আক্রমণ করে। এই প্রকার নাম “তাছাজী”।

মহিষশিকার।

এ সময়ে অতি অল্প কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শিকারী দুইটি ফাঁদ লইয়া বনমধ্যে গমন করে। একটি দড়িতে ফাঁস লাগান থাকে—আর একটি দড়ি

তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, খুব বলবান এক ব্যক্তি শিকারীর একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া থাকে। কঁাসের নিকট একটা পোবা জী-মহিষ বাধা থাকে। বস্ত্র-মহিষ সেই পথে আসিলেই ফাঁদে পা দেয়। শিকারী নিকটে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া খিনট করে। এই প্রকার মহিষশিকারি বড় বিপজ্জনক। কখন কখন ইহাতে শিকারীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়।

বিতীয় প্রকারসারে শিকারী-একটি মহিষের উপর চড়িয়া বনমধ্যে কোন জলাশয়ে নামিয়া পড়ে। বস্ত্র মহিষ জল ধাইবার জন্য সেখানে আসিলেই, সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বর্ষা দ্বারা নিহত করে। এই প্রকার শিকারে শিকারীর বিপৎসম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু, এরূপ শিকার প্রায়ই সফল হয় না। বস্ত্র মহিষেরা এত সতর্ক যে, জলের মধ্যে শিকারী দেখিলেই তাহারা দ্রুত পলায়ন করে। গৃহপালিত মহিষ অপেক্ষা বস্ত্র মহিষ আরও ভয়ঙ্কর। ইহাদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে কখনও কখনও সিংহ ব্যাড়াদিও মহা ফাঁপরে পড়ে। মহিষশিকারে আকবর সাহ বিশেষ আস্থা বান ছিলেন না।

বাজ ও শিকরী ।

মোগল বাদশাহদের বাজ ও শিকরী পক্ষীর দ্বারা শিকার একটা প্রধান আয়োজনের ব্যাপার ছিল। “নাজ”, “সাহিদ”, “শফর”, “বুরকান”, “বাসা” প্রভৃতি নানাপ্রকারের বাজ পক্ষী বাদশাহ-সরকারে প্রতিপালিত হইত। এই সকল শিকারী পক্ষীদিগকে রীতিমত শিক্ষিত করিয়া শিকারের সময় শ্রেষ্ঠ ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বিমানবিহারী ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাজাতীয় সবল দুর্বল পক্ষীকে লইয়া শূন্য পথে বুদ্ধ দ্বারা পরাস্ত করিয়া, কখনও বা জীয়াস্ত, কখনও বা মৃত্ত অবস্থায়, শিকারীর হাতে আনিয়া দিত। বাজপক্ষীগুলির নামকরণ করা হইত। বাদশাহ নিজেও কয়েকটি প্রিয় শিকরীপক্ষীর নামকরণ করিয়া ছিলেন। শিকারী বাজগুলি পালকের একদূর অধীন ছিল যে, মহাশূন্রে যখন তাহারা শিকারের চেষ্টায় ফিরিতেছে—সেই সময়ে নাম ধরিয়া বা শিশু-দিশা-ডাকিলে, তাহারা পালকের নিকট ফিরিয়া আসিত। পক্ষীর পক্ষ কখন কখন নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাহাদের প্রাকৃতিক বর্ণের পরিবর্তন করা হইত। কাহারও বা গলায়-ছোট ঘণ্টা বাধা থাকিত; কাহারও পাদ্রে আদরের চিহ্নস্বরূপ ছোট ছোট যুঁহুর গাঁবিয়া দেওয়া হইত। এগুলি অবশ্য তাহাদের কার্যদক্ষতার বিশেষত্বের চিহ্নমাত্র।

বাজ পাখী পালন করিবার জন্য অনেক কর্মচারী নির্দিষ্ট বেতনে প্রতিপালিত হইত। ভৃত্যদের মধ্যে বাহাদের বেতন সর্কাপেক্ষা অধিক; তাহার মাসিক ৭৫০ হিসাবে পাইত। সর্কাপেক্ষা অল্প বেতনের পরিমাণ তিন মুদ্রা। ইহার সরকার হইতে বেতন ব্যতীত খোরাকী ও পালিত পক্ষীর শিকার দফতারে অল্প পুরস্কারও পাইত। "মীরশিকার" শিকারের প্রধান কর্মচারী। রাজ পক্ষীরা যদি শিকার করিয়া জীবিত পক্ষী আনিতে পারিত, তবে সেই ধৃত পক্ষীর ঊণালসারে পুরস্কার নির্ধারিত হইত। পুরস্কারের অর্দ্ধাংশ শিকারীরা পাইত, অপরংশ "মীরশিকারের" আপ্য ছিল। যে বারে বাহাদুরের নিজ পালিত বাজপক্ষী শিকার ধরিতা আনিত, সেবারে তাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হইত না। মোগলসংসারে আর দুই শতের উপর বাজ পক্ষী প্রতিপালিত হইত; ইহাদের প্রত্যেকটির মূল্য ১৬ মোহর হইতে একটাকা পর্যন্ত স্থির হইত।

শস্ত্র ব্যতীত এই সমস্ত পক্ষী প্রত্যহ মাংস পাইত। মাংস-কুচি কুচি করিয়া ছোট ছোট ভালপাকাইয়া শস্ত্রের সহিত মিশাইয়া খাওয়ান হইত। মাংসভোজী বাজেরা কখনও কখনও নিজের শিকারের মাংস পরিতোষপূর্বক আহার করিত। আহার ও প্রকৃতিগুণে ইহাদের হিংস্রস্বভাব এত বর্ধিত হইয়াছিল যে, অনেক তীক্ষ্ণচক্ষু পক্ষীও ইহাদের অক্রিমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত।

জলচর পক্ষী।

জলচর পক্ষী শিকার মোগল বাদশাহদের অন্ততম আমোদ। এ সমস্ত ব্যাপার সবক্কে কয়েকটি সামান্য বিবরণমাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমন্য তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। নদী, হ্রদ ও ভড়াগাদিতে হংস, ক্রৌঞ্চ, বক প্রভৃতি নানা জাতীয় জলচর পক্ষী বিচরণ করে। এই সমস্ত পক্ষী জীবিত ধরিয়া বাদশাহের প্রসাদের মধ্যে কৃত্রিম সরোবরে রক্ষা করা হইত। শিকারীরা একটি কৃত্রিম পক্ষীর খোলস দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিত। ধীরে ধীরে জলচরের নিকটস্থ হইয়া তাহার পা ধরিয়া জলে ডুবাইয়া দিত। কখনও নিজেরা পক্ষীর স্বরের অনুকরণ করিয়া ডাকিয়া পাখীকে নিকটে আনিয়া ধৃত করিত। "বদনা", "দোরাজ", "লাষাই", "চৌষাই" প্রভৃতি নানাবিধ শিকার-প্রণালী দ্বারা এই সমস্ত পক্ষীকে জীবিত অবস্থায় পিঞ্জরাবদ্ধ করা হইত।

এতদ্ব্যতীত, তেল ও মাকড়সাদিগকে শিক্ষিত করিয়া, তাহাদের দ্বারা কীট

পতঙ্গাদি শিকার করান হইত। শেখোক্ত শিকার সর্বাপেক্ষা আমোদজনক।
আকবর সাহ নিজে ইহাতে বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতেন। এ সম্বন্ধে
কোনও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই।

শ্রীহরিশাধন-মুখোপাধ্যায়।

নারায়ণ রাওয়ের বখর ।

“নারায়ণরাও রাজ্যভীর গ্রহণ করিবার পর ছয়-মাস অভিযাহিত হইল। তিনি সর্বশুদ্ধ নয়মাস
রাজত্ব করিলেন। এদিকে জমাদার ও “পণ্ডাব” রাজপ্রাসাদের সমস্ত সৈন্তগণকে ভাঙ্গাইবা
বদলভুক্ত করিল। প্রাসাদরক্ষার জন্য পাঁচ সহস্র বৈদেশিক পাবদী (regular infantry) (১)
সৈন্য ছিল; তাহার সকলোই এই বড়ঘরে বোণ দিল। এই সংবাদ “চাপাকী টিলেকর” ও
অপর কয়েক জন অন্তঃবৈর কণ্ঠোচ্চ হইবামাত্র তাহারা নারায়ণ রাওকে গিয়া জ্ঞানাইল
যে,—“প্রাসাদে আনন্দী রাইর গুপ্ত বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা বাইতেছে। হুই জন-জমাদার ও
ডুনাঙ্গী পণ্ডাবর এই বড়ঘরে বোণ দিয়াছে। অতএব অগ্রে এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে
আজ্ঞা হউক।” নারায়ণ রাও উত্তর করিলেন,—“আচ্ছা, ইহার বন্দোবস্ত করা বাইবে।
তাহাদিগের দ্বারা কি হইতে পারে?” পরে, সখাবাম বাপু (২) নানা ফড়নবাস ও
হরিপত্ত-কড়কে এই বড়ঘরের বিরয় অবগত হইয়া নারায়ণ রাওর সমীপে গিয়া নিবেদন
করিলেন যে,—প্রাসাদমধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণই দেখিতেছি। প্রভু আমাদের কথায় কণ্ঠপাত
করেন না; বাবাজী ববগয়ে বাধা করেন, তাহাই আর্গনাব সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু
অগ্রে এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করা উচিত। এইরূপে তাহারও এই বিদ্রোহসংবাদ তাহার
(শ্রীমন্তের) কণ্ঠগোচর করিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার (নারায়ণ রাও ও বাবাজী
ববগয়ে) এ কথাতে মনোনিবেশ হইল না।

সংক্রান্ত হত্যাকাণ্ডের ৭৮ দিন পূর্বে সমস্ত পারদীপণ সমবেত হইয়া দরজার বাহিরে
আসিয়া বলিতে লাগিল,—“আমাদের বাকী হিসাব পৰিষ্কার করিয়া দেওয়া হউক; আমা-
দের আর চাকুরী করিবার ইচ্ছা নাই।” তখন চাপাকী টিলেকর শ্রীমন্তের নিকট গিয়া
পুনরায় নিবেদন করিলেন যে,—“পারদীপণ বৈ সকলে সমবেত হইয়াছে, তাহারা কোনও
উদ্দেশ্য নহে। তাহার নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হইয়াছে। এ বিষয়ে আর উপেক্ষা প্রদর্শন না
করিলে শীঘ্র ইহার বন্দোবস্ত করুন।”

ইহার পর, যে দিন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবে হির হইয়াছিল, সেই দিন প্রাতঃকালে
নারায়ণ রাও গৃহের “পর্বতা” নামক শৈলে দেবদেবেবরের (৩) দর্শনার্থ গিয়াছিলেন।

(১) যেমি-হন, ইংরাজী Guard (পোষ্ট গার্ড Guardia) শব্দ হইতে, “পাবদী” শব্দের
উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) “পেশওতগঞ্জের রত্ন” নামক গ্রন্থে সখাবাম বাপু নাম দৃষ্ট হয় না। বরং
সখাবাম বাপু গোপনে দাদা সাহেবের বড়ঘরে বোণ দিয়াছিলেন, একপ কথা স্পষ্টই নির্দিষ্ট
আছে, এবং তাহাই অধিকতর সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

(৩) দেবদেবেবর শিবমূর্ত্তি বিশেষ।

সেখানে নৈলোপরি স্নানার্থিক ও ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া, কুলাবা-পাতি রাবোজী আঙ্গু সখেলের সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তে গমন করিলেন। আঙ্গু, সাক্ষাৎ কবিত্তে আসিলে, পেশওবে তাঁহার প্রত্যাগমন করিতে, এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। এই কারণে আঙ্গু, ব. আগমনবার্তী শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত তাঁহার প্রত্যাগমন করিবার জন্য “গনেশখিণ্ডি” বস্ত্র হান পর্যন্ত গমন করিলেন। সেখানে আঙ্গুর সহিত সাক্ষাৎ হইল (১)। অনন্তর শ্রীমন্ত ও আঙ্গু, “লকড়ীপুল”-পর্যন্ত একত্র আসিলেন। চাপাজী টিলেকব সেখানে গিয়া নারায়ণ রাওকে জানাইল যে,—“প্রভু, অদ্য প্রাসাদ পবিত্রাগ পূর্বক বহির্গমন করিলে পর, গাররীগণ, অদ্যই আপনাকে প্রাসাদমধ্যে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছিল। ভক্তের আপনি পুনরায়-পার্বতী গৈলে-প্রতিগমন করুন। অত্র প্রাসাদরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া পরে আসিবে প্রবেশ কবিলেন। আসার বিবেচনায় এক্ষণে ইহাই কর্তব্য মোহ-হইতেছে।” নারায়ণ রাও একপাশ-ভাঙ্গি মনোযোগ প্রদান না করিয়া বলিলেন,—“বৈকালে-এ বিবয়ের বন্দোবস্ত করা যাইবে।” এই বলিয়া শ্রীমন্ত গৃহে (প্রাসাদে) প্রবেশ কবিলেন। আঙ্গু ও বগুহে গমন করিলেন।

“সেই দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীমন্ত “দেওয়ানখানার” (দোয়ানখানায়) গিয়া দেওয়ান বসিয়া তাহুল চর্চণ করিতেছিলেন, এমন সময় জামাদার (হুসের সিং ও ধরগ সিং) গারুদী সৈন্যগণকে রাজবাটীর মধ্যে আনয়ন করিয়া সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। (অবিলম্বে) চরিত্রিকে “দীন দীন” শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। নারায়ণ রাও এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া চাপাজী টিলেকব বলিল,—“আজ পর্যন্ত আমি মহারাজকে এ-বিষয়ে সতর্ক হইবার জন্য মিনতি করিতে করিতে রাখি হইয়াছি কিন্তু প্রভু কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত কবিলেন না। বাহা হউক, এখনও আমি বাহা নিবেদন করিতেছি, তথা শ্রবণ করুন। এই রাজবাটীতে এক গুপ্ত হুড়ু আছে। আপনি আমার হত-ধাবণ করুন; আমি আপনাকে সেই হুড়ু-পথে বাটীর বাহিরে লইয়া যাইতে পাবিব।” ইহা শুনিয়া শ্রীমন্ত নারায়ণ রাও সাহেব বলিলেন,—“হুড়ু প্রবেশ করিতে-আমার সাহসে কুলহিতেছে না। দাদা সাহেবই এই বড়ব-করিয়াছেন; অতএব চল, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা যাউক। তাহা হইলে তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করিবেন।”

“অনন্তর, নারায়ণ রাও ও চাপাজী টিলেকব উভয়ে “দেওয়ানখানা” হইতে নামিয়া বহুৎ প্রাঙ্গণে আসিলেন। ইতিমধ্যে অপর-দিক হইতে ধরগ সিং, হুসের সিং ও তুলাজী পওয়ার উল্লভ তববারি হস্তে তাঁহার পশ্চাত্তাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময় সহসা শ্রীমন্তের পূজার গাভী তাঁহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডিত্য জমাদার ও পওয়ার গাভীকে সম্মুখে দেখিয়া তববারি আঘাতে হত্যা করিয়া নারায়ণ রাওএর পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অপর-দিক হইতে “নাবোজ ফটক” নামক শ্রীমন্তের জনৈক ব্রাহ্মণ অনুচর দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদের পথরোধের চেষ্টা কবিল। পামর-দণ তাহাকেও ধও ধও করিয়া কেলিল। ইত্যরসরে নারায়ণ রাও, যেখানে দাদা সাহেব বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া-তাঁহার গলা-কুড়াইয়া ধরিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন যে, “এখন আমিও ব্রহ্মী করুন।” মূহুর্তমধ্যে পওয়ার ও জমাদার (যমদুতের জ্ঞায়) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাদা সাহেব “ধাম, ধাম” বলিয়া হত প্রসাব, পূর্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তখন তাহা-বলিল, “আজ আমরা ইহাকে ছাড়িয়া দিই। আর কল্যা

সে আমাদের পরিবারবর্গের প্রাণহত্যার আদেশ করুক। 'মারিবে' এই অক্ষরগুলি আগনিই হু হুতে লিখিয়া দিয়াছিলেন। তবে এখন বাসিতে বলিতেছেন কেন? উহাকে আমাদের সম্মুখে ঠেলিয়া দিন; নচেৎ উভয়কেই বিনাশ করিব।" এই বলিয়া তাহার নারায়ণ রাওকে ধৃত করিবার জন্ত হস্ত-প্রসাধন করিল। তাহাদিগের হস্ত সম্মোহে দ্বাদশ মাসের মন্তকে জারিরা-তাঁহার পাপদ্বীপ্তি প্রলিখা গেল। তখন তিনি ভয়ভীত চিত্তে স্বীয় গলাদেশ হইতে নাবাঘ রাওএব হস্ত দ্বয় ছাড়াইয়া তাঁহাকে তাহাদের সম্মুখে ঠেলিয়া যিলেন। এমন সময় (ঐতুস্তত) চাপাজী টিলেকব নারায়ণ রাওকে রক্ষা করিবার জন্ত আত্মব্যাধা সহ তাঁহার শরীরের উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল। এবং বলিল, "অগ্রে আমাকে মারিয়া ফেল।" ইহা বলিবারাত্র তুলাজী পণ্ডার অস্ত্রাঘাতে উভয়কে তিন খণ্ড করিয়া ফেলিল। (১)-এই সময়ে রাজকী "ইচ্ছারাম পদ্ম চেরে" নামক জনৈক নরকারী "পাগেদার" (সাদীনায়ক) তুলাজীকে বাধা দিতে আগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও তাহার তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী হইলেন। রাজবাগিচে তুমুল বিপ্লব ঘটিল। (২)

(১) চাপাজীর এই কার্যের পুরস্কারস্বরূপ তাহার বংশধরগণ এখনও ইন্দাপুর জায়গার অন্তর্গত "হরেশংপুর" নামক গ্রাম নির্ধন ভোগ করিতেছে। নারোজী কটিক ও ইচ্ছারাম পদ্ম সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া যায় না।

(২) এ সম্বন্ধে "পেশওয়ারগণের ববর" নামক গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

"নারায়ণ রাওএর সিংহাসনাগ্রেহণের ছয় মাস পরে আনন্দী বাই তাঁহাকে হত্যা করিবার যত্নস্বরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। * * * নারায়ণ রাও রাজকাব্য লিখাই করিতে ছিলেন। আশা মাসের উৎসব (প্রাক্ষণগণকে দক্ষিণাবিতরণাদি) পরিসমাপ্ত হইয়া গণেশচতুর্থীর উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে কুলাচাপতি-রাখোজী আক্রে নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্ণাঘ আগ্রসর করিয়াছিলেন। উৎসবসমাপনান্তে রাও সাহেব (নারায়ণ রাও) আক্রে সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন; এবং তাঁহাকে কয়েক দিন থাকিতে অনুরোধ করিয়া পূর্ণাঘ শৈলে গিয়া দেবদর্শন পূর্বক ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে তিনি পর্বে আনন্দী বাইর যত্নস্বরূপে ত্রিভিৎ আভান প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গে-হরিপদ্ম কড়কে (সেনাপতি) ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীমন্ত বলিলেন, "এমন কি শুনিতেছি? এ বিষয়ে তোমার মনোবোধ আকৃষ্ট হইয়াছে কি না?" হরিপদ্ম উত্তর করিলেন, "আহারাদিসমাপনান্তে বেকালে এ বিষয়ের বধাকর্ত্তব্য নিকগণ করা বাইবে।" এই বলিয়া হরিপদ্ম ভোজনার্থ গৃহে গমন করিলেন। শ্রীমন্তও প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীমন্ত গৃহে আসিয়া যখন আহারে উপবেশন করিলেন, তখন বড়যন্ত্রসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা তাঁহার কর্ণপাচর হইল। কিন্তু ভাবিতব্য কে ধ্বন করিতে পারে? শ্রীমন্ত (এ বিষয়ে বিশেষ মনোবোধ প্রদান না করিয়া) ভোজনাগ্রে তাহুল গ্রহণ পূর্বক বিশ্রামার্থ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়া দাদা সাহেবের অন্তর্জন-তুলাজী পণ্ডার গারদীগণকে মিথ্যা জানাইল; যে, "তোমাদের কার্যসাধনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। আমাদের বড়যন্ত্রের বিষয় প্রাসাদস্থ প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছে। অতএব আর বিলম্ব উচিত নহে। নতুবা সকলকেই কংপে পড়িতে হইবে।" এই বলিয়া তুলাজী দুই সহস্র গারদী সম্বন্ধে সজ্জিত করিয়া সিংহদ্বার দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিতে লাগিল। দ্বাররক্ষক চৌকিদারেরা বাধা দিতে গিয়া গারদীগণের অস্ত্রাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। এনাদে প্রবেশ করিয়া গারদীগণ প্রাসাদের ভূটোপনি গমন করিল। এমন সময় শ্রীমন্তের সাদীনায়ক ইচ্ছারামপদ্ম চেরে ভোজন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি গারদীগণকে একগু ভাবে প্রাসাদে প্রবেশ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহা শুনিয়া তুলাজী গারদীগণকে বলিল, "দেখিতেছ কি? ইহাকে মাঝ।" আদেশপ্রাপ্তিমাত্র তাহার ইচ্ছারামের অভিমুখে ধাবিত হইল। তদধর্মে ভীত হইয়া ইচ্ছারাম "গাভী আশ্রয় গ্রহণ করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারি" এই ভাবিয়া, শোশালাব

“নারায়ণ-রাও বিদ্রবকারিগণের দ্বারা হৃত হইয়াছেন, এইরূপ সংবাদ নগরসমূহে প্রচারিত হইল। তখন সখাবান-বাপু, ত্রিধররাত্ত সান্না, নানা কড়ম্বরীস, হরি গড় কড়কে, রাধো সীতকর ও রাধোজী আদ্যে প্রভৃতি সকলে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্যও দ্বারের নিকটে আসিয়া একত্র হইল। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ, প্রাসাদে প্রবেশের পথ নাই। তখন আদ্যে বলিলেন,—“বৃহৎ অধিবাহিনী ব উপব-উগ্রিয়া কবাট ভাঙ্গিয়া ফেল, এবং নারায়ণ রাও সাহেবকে মুক্ত কর।” এমন সময় দ্বারপাল (ভিতর হইতে) উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল,—“আর কেন কবাট-ভাঙ্গিতেছ? নারায়ণ-রাও ত নিহত হইয়াছেন।” ইহা শ্রবণ করিয়া আদ্যে ও অপর্যাপর সমস্ত কর্মচারিণী শোকাবুল হইলেন—এবং বলিতে লাগিলেন,—“আর প্রাসাদান্তরে গিয়া কি হইবে?—এবন যে কোনও উপায়ে দাদা সাহেবকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করা হউক।”—(১)।

প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গারদীগণ নিষ্ঠুর-তাহাদের দ্বারা কোথাও ইচ্ছানুসারে পশুকে পাঠীর পশুতে লুণ্ঠিত দেখিয়া তাহারা পাঠীর ইচ্ছানুসারে নিহত করিল। এইরূপ নারায়ণী করিয়া তাহারা জেওরানুখানায় প্রবেশ করিল। সেখানে আবাজী পশু ছিলেন; তিনি ভাড়াভাড়া দ্বার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেখিয়া গারদীগণ বলিল,—“দ্বার রুদ্ধ করিলে কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলিব।” আবাজী তথাপি দ্বারদ্বারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন করেক জন গারদী দৌড়িয়া তাহাকে নিহত করিল ও ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রাসাদমধ্যে এইরূপ ভুল্লম্বল বিদ্রব কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া—ও—গারদীগণকে প্রাসাদশিখরোপরি আক্রমণ দেখিয়া নগবে মহা হলম্বল পড়িয়া গেল। সকলেই ভয়বাকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, দোকানীগণ দোকান পাট বন্ধ করিল।

এদিকে রাও সাহেব শয়নশালার নিকটে ছিলেন। সহসা এই পোলমাল শ্রবণে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উগ্রিয়াই দাদা সাহেবের একোষ্ঠাভিমুখে দ্রুতগমনে চলিলেন। সঙ্গে চাপাজী টিলেকর ও নারোজ ফটিক, এই দুই জন ছিল। ইহাদের সহিত তিনি দাদা সাহেবের নিকট গিয়া বলিলেন,—গারদীগণ প্রাসাদমধ্যে বিদ্রব করিয়া দ্বারকাটি-আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। এই সকল বড়বড় আপনাদেরই কৃত। অতএব এক্ষণে গারদীগণকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করুন। আপনাদের বহিঃ-রাজ্য করিবার ইচ্ছা থাকে ত আপনাদের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আপনাদের নিকটকে রাজ্য-ভোগ করুন। এই সকল কথা শ্রবণ হইতে না হইতে গারদীগণ দ্বারানুসরণপূর্বক হইয়া সেইখানে আগমন করিল। তদর্শনে নারায়ণ রাও দাদা সাহেবের কোমর জড়াইয়া ধরিলেন। তখন সন্দের সিংহ, ধরগ সিংহ ও মহম্মদ ইমাম তরবারি-নির্ধাণিত করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল। তুলাজী—“আর কেন পলাইতেছিস?” বলিয়া নারায়ণ রাওকে দাদাসাহেবের নিকট হইতে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে অনমন করিল। তখন চাপাজী টিলেকর গারদীগণকে বলিতে লাগিল—“আছা! এ—ছেলেমানুষ। ইহাকে দ্বারিও না।” এই বলিয়া চাপাজী (তাহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে) নারায়ণ রাওয়ের দেহের উপর পতিত হইল। গারদীগণ অস্ত্র তাহাকে ধুও ধুও করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া দাবোবা ফটিক স্রীমন্তের উপর পতিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারও দেহ মস্তকশূন্য হইল। তদর্শনে ভয়ে নারায়ণ রাও সাহেবের চেতন বিলুপ্ত হইল। তাহার মস্তক বিঘৃণিত হইতে লাগিল।—কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তখন গারদীগণ তাহার উপর তরবারি বর্ষণ করিতে লাগিল। (তরবারির জ্বালাতে) পেট কাটিয়া নাজী-ভুড়ি বাহির হইয়া গেল। * * * ১৬৯৯ শকাব্দে জরনাম সংগ্রহের ভাঙ্গানাম-গুরুপাকার জরোদস্তী সোমবার-বিপ্রহরের সময় নারায়ণ রাও নিহত হইলেন।

(১) এ সম্বন্ধে “গেশওয়েসের বখর” নামক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়; যথা,—“এ দিকে সহর মধ্যে মহা হলম্বল পড়িয়া যায়, সমস্ত সেনানায়কগণ সজ্জিত হইয়া আসিলেন। প্রথমতঃ হরিপত্ত বড়কে অধিরোধে প্রাসাদের নিকটে আসিলেন। কিন্তু গারদীগণকে নিষ্ঠুরতাপ্রাপ্ত ও উন্মত্ত করিয়া, সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

“পর দিন সন্ধ্যা কক্ষচরিত্রগণ আসিয়া দাঁড়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আদর্শ-
 চরিত্রমতে দাঁড়া সাহেব রাজকাব্য পঠ্যাবেষণ করিতে লাগিলেন। (১) অনন্তর একদিন
 তিনি বেদশাস্ত্রমসন্দর্ভ ব্রহ্মমনি রামদাস্ত্রী ভাষ্যাবিশেষে আস্থান করিয়া বিজ্ঞানা করিলেন,
 ‘সদাধোষে অস্মি অকারণ-অপ্রাপ্যব, অশুকাণ্ডি ও অভিশাপের ভাগী হইয়াছি। এতদ্ভ
 আমার কোন প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত?’ ইহা শুনিয়া শরী বহাশয় শাস্ত্রকারের উত্তর
 করিলেন যে, ‘দেহাধি প্রায়শ্চিত্তে ভিন্ন এই স্থাপের আব-কেনিও প্রায়শ্চিত্ত নাই।’ এই
 বলিয়া তিনি সদাধোষেরে গুনা-পরিভাষ্য করিয়া ‘ও ভাদ্র নামক তারকক্রেত্রের ৩-এ ক্রোশ
 দূরবর্ত্ত ভূগণ্ডি নামক গ্রামে ক্রকাতারে গিয়া বসতি করিয়া, দ্বান্নাভিকারি বট কাশ্মব-
 অমৃতনি দ্বারা স্বর্ষে কালান্তিগাত করিতে লাগিলেন।’

শ্রীসখারাম গণেশ দেউকর।

গঙ্গোত্রীর পথে ।

ক্রমাগত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের ক্লান্তিবুদ্ধির জন্য আমি আবার আর একটি নতুন পথের কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। এবার গুণ্যামলিলা ভাগীরথীর উৎস দর্শন করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। পর্বতপ্রদেশে একটা গন্তব্য স্থান স্থির না করিয়া-চলা যায় না; যে দিকে চক্ষু যায়, সেই দিকেই চলিব, এরূপ বন্দোবস্ত হইলে, চাই কি; জীবনের অবশিষ্ট করটি দিন বৃক্ষতলে ও পর্বতগর্ভেই কাটিয়া যান। আর অনাহারে ও পরিশ্রমে সে দিন করটিও সংকীর্ণ হইয়া আসে। আমার যে

সফলবাসী, সবারাস বাপ ও হরিপত কড়কে, এই চারি জনে এক পাশে বসিয়া বাধুকামর
খিরলিদি নিখাদ পুস্টক সেই লিঙ্গ-স্পর্শ করিয়া সকলে ভগ্ন ও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,
‘নানা মাংসেবের বোধধরকে রাজ্য করিতে হইবে। রত্ননাথ রাজ্যের বংশকে কখনও নষ্টকার
করা হইতে না।’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগ্নাপার সকলেই সহিত তাহারিও পু-
স্টকে গমন করিলেন।—পুণ্ড্রপুণ্ড্রের বংশ।

(১) "নারায়ণ রাওয়ের উত্তরকণ্ঠ সমাধা হইলে দাদা সাহেব পাঞ্জীর পুত্র পণ্ডিত নিকট স্বাধীন কবিত্ব প্রেরণ করিয়া স্বীয় নামে অভিবেকবসন, রাজমুখা ও কটার (রাজ চিত্রবল্লভ ভরদ্বাজ) আনাইরা লইলেন।"—গোলাপী বাজীর বধর।
 ব্রহ্মসংশোধন।—স্বাধীন নামের সাহিত্যের ২৭৬ পৃষ্ঠার ২য় পংক্তির পর, সেই পৃষ্ঠার সর্বশেষ প্যারারাজিটি বাধের ২৭৭ পৃষ্ঠার ৮ম পংক্তির "সদাশিব রাও ভাও (বালাজী বাজীর রাওয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র) ও বিবাস রাও"—হলে "সদাশিব রাও ভাও ও বালাজী বাজীর রাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবাস রাও" হইবে। ২৭৬ পৃষ্ঠার ২০ম পংক্তির "শিত পৌত্র"—হলে "শিতুব্য পৌত্র" হইবে।—লেখক।

তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল-না, এমন নহে। অশান্তি অশান্তি লইয়া আনি
হিমালয়ের-মহানহিমায় সৌন্দর্য-সাগরে ডুবিতে-পারিতাম না। স্বর্গের সুন্দর
মনোমোহন দৃশ্যপট সকল আমার নয়ন-সমক্ষে নূতন-শোভার উদ্ভাসিত হইয়া
আবির্ভূত হইত; আমার অশান্ত প্রেমহীন নীরব-দৃষ্টির তাক্সীল্য তাহাদিগকে
দূরে অপসারিত করিয়া দিত; নন্দনকাননের অপূর্ণ শোভা আমার তাপিত
বক্ষে প্রেমের সঞ্চার করিত না। এত বিড়ম্বনা এত নিরাশাকে সঙ্গী করিয়া
পথ চলিবার কষ্ট-বুঝাইবার নহে—কাহারও অনুভব করিবারও আবশ্যকতা
নাই।

গঙ্গোত্রী বাইবার সর্বজনপ্রসিদ্ধ পথ একটু, তবে পর্বতবাসিগণ হিমা-
লয়ের বক্ষে আজ্ঞাপ্রতিপালিত, তাহার নিজেদের জ্ঞান-সর্বমাই স্বতন্ত্র
পথের বন্ধেবিন্ত করিয়া লয়। সে পথে আমার জ্ঞান অন্নভোজী বাঙ্গালী বীরের
কথা দূবে থাকুক, বাহার প্রতিবেলায় সেরতর আটা ও তত্পবুত অস্ত্রাস্ত্র
জব্যের সদ্যবহার করেন, তাহাদেরও চলিবার সাধ্য-সাই; সে-সকল ‘পাক-
দাণ্ডী’ দৃঢ়কায় ক্ষুদ্রদেহ পর্বতবাসিগণেরই যাতায়াতের পথ। গঙ্গোত্রীর বাজী-
দল হরিদ্বার হইতে দেৱাজুন আইসে, দেৱাজুন হইতে বাহির হইয়া খেতকার-
গণের বিলাস-কুঞ্জ মুন্সুরী ল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া ‘তিহরী’ রাজ্যে উপস্থিত হয়;
সেখান হইতে গঙ্গোত্রীর একই পথ। আমরা অপর পথে তিহরী গিয়াছিলাম;
পর্বতপ্রদেশে অনেক দিন বাস করায় আমাদের পথ বাট অনেকটা পরিচিত
হইয়া গিয়াছিল।

আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—‘তিহরী’ হইতে আরম্ভ করিতে হইতেছে। বখন
লোটা-কম্বল সঞ্চল করিয়া পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন যদি
জানিতাম যে, সাহিত্য-সম্পাদক গহাশয়ের জবরদস্তিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সেই
সুন্দর হিমালয়ের কথা লিখিয়া তাহার কাগজের কয়েক পৃষ্ঠা অধিকার করিতে-
হইবে, তাহা হইলে সেই কম্বলের মধ্যে একখানি ট্রেলের ভাইরি বাধিয়া
লইতাম। ভবিষ্যৎদৃষ্টির অভাবে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়, তাহার এক
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আরম্ভ ‘তিহরী’ হইতে।

‘তিহরী’র ভৌগোলিক অবস্থানের একটা বিবরণ দিতে হইতেছে;
সাধারণতঃ আমাদের জ্বলের ছাজেরা যে ভূগোল পাঠ করিয়া থাকে, তাহার
মধ্যে ‘তিহরী’ রাজ্যের নাম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। গড়োয়াল
রাজ্যের সীমান মধ্যে তিহরী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। গড়োয়াল রাজ্য দুই ভাগে

সামান্যতর-রায়বক্ষার জন্ত প্রতিনিধি সভা (Council of Regency)

গঠিত করেন, এবং মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (Regent) প্রতিনিধি বা সভার সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহারই হস্তে স্টেটস্কার ভার প্রদত্ত হয়। এই রাজ-ভ্রাতার নাম কুমার বিক্রম-সিং। সচরাচর লোকে কুমার সাহেব বলিয়াই সম্বোধন করে।

সম্পত্তিভোগের কি বোহিনী-পক্ষি; যেখানে সম্পত্তি, যেখানে ক্ষমতা, সেইখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেইখানেই গোলযোগ। সামান্য ভূমিখণ্ডে সহস্র সন্ন্যাসীর স্থান হয়, কিন্তু এই বিশাল-পৃথিবীতে দুই জন রাজার স্থান কুলায় না। আমরাদ্বিজ, — সম্পত্তি-ধনগৌরবের মহিমা জানি না; এই দেশি, সেখানে অর্থ, সেখানেই অনর্থ; আর দেখি, যেখানে ক্ষমতা, সেখানেই তাহার অপব্যবহার, সেখানেই প্রতিযোগিতা। বিশ্বনিরস্তর এই-বিশ্বরাজ্যে এই গোলযোগ আমরা বাধাইয়া দিতেছি; রাজপ্রতিষ্ঠিত-প্রশাসিকগণে বসিয়া নিরপেক্ষ বিচারকগণ প্রতিদিন আমাদের এই সমস্ত সম্পত্তি, ক্ষমতা, জ্যেষ্ঠ জ্বরদত্তির নীমাংসা করিতেছেন; ধনীর বহনকৃত অর্থ-পুষ্টি, উকীল আর ষ্ট্যাম্পবিক্রেতা ভাগ করিয়া লইতেছে; এ দৃষ্টের অভিনয় পুনঃপুনঃ হইতেছে। সামলা যোকদ্দমার দ্বারে বিপুল অর্থশালী ব্যক্তি পথের ভিখারী হইতেছে, তবুও কেহ সাবধান হয় না। তবুও বধাসর্বস্ব উদ্ধারের জন্ত বধাসর্বস্ব গণ; আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই।

কুমার সাহেব-অভিভাবক হইয়া সমস্ত রাজ্য স্বহস্তে পাইলেন। তাঁহার পরামর্শদাতা-হিতৈষী বহু অনেক ছুটিয়া গেল। তাঁহার অস্ত্র অনেক গুলি থাকিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিবিশয়ে তিনি বড় ভাই অপেক্ষা অনেক হীন; পরামর্শদাতাদের হস্তে কলের গুলির মত তিনি পরিচালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষম এই হইল, রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিচারবিলাট বা বিচারবিফল। অনেকে, অভিভাবকের নাম দিয়া নানী প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল।

এদিকে রাজ-ভ্রাতাপুরে আর এক পক্ষ-বীয়ে-ধীরে-বলসঞ্চয় করিতে ছিলেন। মহারাজ-প্রতাপ-সাহেবের মৃত্যুর পর বিধবা রাণী সাহেবা অভিভাবক-পদপ্রার্থিনী ছিলেন; কিন্তু ইংরেজ গবর্নমেন্ট মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রম-সিংকে অভিভাবক করাই কর্তব্য স্থির করায়, বিধবা রাণী নিরস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তাঁহার পক্ষেও অনেক ছিলেন; অভিভাবক-সভাব সভাগণের মধ্যে দুই এক জন রাণীব পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গোপনে

তাহাতে বিশেষ কতিবুদ্ধি ছিল-না, এমন নহে। অস্বাস্থ্য অশান্তি হইয়া আশি-
হিমালয়ের সহামহিমাময় দৌলখ্য-সাগরে ডুবিতে পারিতাম না। স্বর্গের সুন্দর
মনোমোহন দৃশ্যপট সকল আমার নবন-সমক্ষে নূতন শোভার উদ্ভাসিত হইয়া
অবিভূত হইত, আমার অশান্ত প্রেমহীন নীরব দৃষ্টির তাক্ষীল্য তাহাঙ্গিতে
দূরে অপসারিত করিয়া দিত; নন্দনকাননের অপূর্ণ শোভা আমার তাপিত
বক্ষে প্রেমের সঞ্চার করিত না। এত বিড়ম্বনা এত নিরশিকে সঙ্গী করিয়া
পথ চলিবার কষ্ট বুঝাইবার নহে—কাহারও অমুভব করিবারও আবশ্যকতা
নাই।

গঙ্গোত্রী যাইবার সর্বজনপ্রতিষ্ঠিত পথ একটি, তবে পর্বতবাসিগণ হিমা-
লয়ের বক্ষে আজ্ঞাপ্রতিপালিত, তাহার নিজেদের অস্ত-সর্বদাই স্বতন্ত্র
পথের বন্দেবিস্ত করিয়া লয়। সে পথে আমার জ্ঞান অন্নভোজী বাঙ্গালী বীরের
কথা দূরে থাকুক, যাহারা প্রতিবেলার সেরতর আটা ও তরুণযুক্ত অস্ত্রাস্ত্র
দ্রব্যের সচিবহার করেন, তাহাদেরও চলিবার সাধ্য নাই; সে-সকল 'পাক-
দাতী' দৃঢ়কার ক্ষুদ্রদেহ পর্বতবাসিগণেরই যাতায়াতের পথ। গঙ্গোত্রীর বাজী-
দল হরিষার হইতে দেয়াছল আইনে, দেয়াছল হইতে বাহির হইয়া ধৈতকায়-
গণের বলাস-কুঞ্জ মুন্ডরী ল্যাঙরের ভিতর দিয়া 'তিহরী' রাজ্যে উপস্থিত হয়;
সেখান হইতে গঙ্গোত্রীর একই পথ। আনন্দের অপর পথে তিহরী গিয়াছিলাম;
পর্বতপ্রদেশে অনেক দিন বাস করার আমাদের পথ ঘাট অনেকটা পরিচিত
হইয়া গিয়াছিল।

আমার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—'তিহরী' হইতে আরম্ভ করিতে হইতেছে। যখন
লোটা-কদল সম্বল করিয়া পর্বতেব মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন যদি
জানিতাম যে, সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের জ্বরদস্তিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সেই
সুন্দর হিমালয়ের কথা লিখিয়া তাহার কাগজের কবচ পৃষ্ঠা অধিকার করিতে
হইবে, তাহা হইলে সেই কদলের মধ্যে একখানি টেলের ডাইরি বাধিয়া
লইতাম। ভবিষ্যৎদৃষ্টির অভাবে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়, তাহার এক
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আরম্ভ 'তিহরী' হইতে।

'তিহরী'র ভৌগোলিক অবস্থানের একটা বিবরণ দিতে হইতেছে;
সাধারণতঃ আমাদের স্থলের ছাজেরা যে ভূগোল পাঠ করিয়া থাকে, তাহার
মধ্যে 'তিহরী' রাজ্যের নাম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। গড়োয়াল
রাজ্যের সীমার মধ্যে তিহরী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। গড়োয়াল রাজ্য দুই ভাগে

বিভক্ত; ব্রিটিশ-গড়োয়াল ও স্বাধীন গড়োয়াল। স্বাধীন অর্থে নেপাল বা ভূটানের স্বাধীন নহে, ইংরেজের আশ্রয়ীভূত রাজ্য—Protected State। পূর্বে এই রাজ্যদের রাজধানী শ্রীনগরে ছিল, নেপালের অভ্যুত্থানে তিষ্ঠিত না পারিয়া বর্তমান রাজ্যের পূর্বপুরুষেরা পলায়ন করিয়া তিহরীতে আগমন করেন; নেপাল যুদ্ধের পরে ইংরেজেরা গড়োয়ালের এক অংশ অরাজ্যভূত করেন; বর্তমান শ্রীনগর তাহার রাজধানী; ইংরেজের আফিম আদায়ের সমস্ত সেখানে। গঙ্গানদীর একপারে ইংরেজের সীমানা, অপর পারে তিহরীর রাজ্য।

তিহরী রাজ্যের সবিশেষ ইতিহাস সংগ্রহ করা আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইলে, আমি তাহার অনুসন্ধান করিতাম। এমন কি, সে সময়ে তিহরীর ইতিহাস জানিবার সামান্য আগ্রহও আরও মনে উদ্ভিত হয় নাই, সংসারত্যাগী সদ্যাদীর রাজ্য রাজ্যের খবরেব আবশ্যক কি, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর জানিয়া কোন লাভই নাই। তাই বলিয়া তিহরী রাজ্য সম্বন্ধে আমার যে কোন জ্ঞানই ছিল না, তাহা নহে; কোন বিশেষ কারণে তিহরী রাজ্যে অনেক সংবাদ-আনাকে শুনিতে হইয়াছিল।

আমি এক জন শ্রমের বন্ধু তিহরী-রাজ্যের একটি গোলযোগের সময়ে গোলাযোগকারিগণের এক পক্ষের যোদ্ধার ছিলেন; তাঁহার কল্যাণে আমি পূর্বেই অনেক বিবর জানিতাম। অস্ত্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, বা বাহার সহিত আমার কোন সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, এমন-গোলযোগের আমূল অনুসন্ধান করিয়া ব্যক্তি বা পরিবারবিশেষের দোষগুণের সমালোচনার আদি পক্ষপাতী নহি। পরেব দোষোদ্ঘাটন পূর্বক সেই কথা লইয়া বিশ্রামসময় অতিবাহিত করা সময়েব যথেষ্ট সদ্যবহার বটে, পরনিন্দা পরচর্চা না করিলে আমাদের অনেকেই দিনটা বুধা যায় বলিয়া মনে হয়; পরের ঘরের কথা আলোচনা করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করি, কাহারও কোন গুপ্তরহস্তের সন্ধান পাইলে আমরা সহজচক্কু হই; তিহরী-ব্যাপারে আমিও সেই প্রকার-হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমার সেই সময়ের উদাস দৃষ্টির সম্বন্ধে কেহই বড় স্থান পাইতেন না; হুতরাং তিহরী রাজ্যের কথা সবিশেষ আমার অগ্রগ নাই।

বর্তমান রাজ্যের স্বর্গীয় পিতা শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপ সা, ১৯৪৩ সম্বতে পরলোক গমন করেন। তিহরী রাজ্যের আর অতি সামান্য, রাজ্যও ক্ষুদ্র; এখানে

ইংবেজ রেসিডেন্ট প্রভৃতির উৎপাত নাই। রাজা প্রতাপ সা অতিশয় ইংরেজ-প্রিয় ছিলেন, তাহার কলে তিহরী সহরের অবস্থা কিরিতা গিয়াছিল। তিহরী সহরের অবস্থানভূমি অতি সুন্দর। যিনি প্রথমে এই স্থানে রাজধানী স্থাপনের সঙ্কল্প করেন, তিনি অল্প-যাহাই হউন, কবি না হইয়া বান না। পর্বতের মধ্যে এমন মনোরম স্থান আমি আব দেখি নাই, প্রকৃতি-দেবী এই হিমালয়ের মধ্যে এই ক্ষুদ্র সহরটিকে সমস্তে রক্ষা করিতেছেন। প্রসন্ন-সলিলা-গঙ্গানদী এই সহরের একপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, ভিলং নামে আর একটি নদী আসিয়া-তিহরীর নীচেই-গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের উপরেই একটি ত্রিভুজের স্থায় ধানিকটা সমতল স্থান;—ত্রিভুজের দুই বাহু দুইটি তবঙ্গিনী; ত্রিভুজের ভূমি এক প্রকাণ্ডকার দ্বারোই পর্বতপ্রকৃতির স্বহস্ত-নির্মিত পাষণপ্রাচীর। সহর সুরক্ষিত কুরিবার অল্প কোন-আয়োজনেরই আবশ্যকতা নাই; নদীদ্বয় এমনই ধরপ্রোত যে, কাহারও সাধা নাই, নদী পার হইয়া এই স্থানে রাজধানী। মহারাজ প্রতাপ সা গঙ্গানদীর উপরে একটি টানা সাঁকো-প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সাঁকো পার হইয়াই মন্সুরী বাইবার পথ;—তিহরী প্রবেশের এইটাই প্রকৃত-পথ। আর একটি পথ আছে, তাহা দ্বারা মন্সুরের-সকল সময়েই তিহরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে। এই পথ ত্রীনগর হইতে বাহির হইয়া পর্বতের পার্শ্ব দিয়া তিহরীতে আসিয়াছে, এ পথের মুখও প্রকাণ্ড গেট ও শাস্ত্রীপাহারায় সুরক্ষিত। কিন্তু এ পথে যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে সন্দেহাহর, এখন সে পথে লোক-চলিতেছে-কি না। সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার উপরের সাঁকোর অংশবিশেষ টানিয়া ভুলিয়া রাস্তাবন্ধ করা হয়, তখন আর কাহারও সহরে প্রবেশের পথ থাকে না।

রাজা প্রতাপ সা ইংবেজের অনুকরণে হাইকোর্ট স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইংরেজী আইনের সহিত দেশীয় প্রথা-পদ্ধতি মিশাইয়া রাজ্যশাসনের সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; ভিলং নদীর অপর পারে একটি উচ্চ পর্বতের উপরে ‘প্রতাপ নগর’ নামে গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত করেন। অনেক-অর্থ-ব্যয় করিয়া-কতকগুলি পাহাড়ীকে মন্সুরি প্রভৃতি স্থানে রাখিয়া ইংরাজী ব্যাঙ-শিখাইয়া লইয়া বান;—আসি-মখন-তিহরী গিয়াছিলাম, তখন ইংরাজী ব্যাঙ-গুলিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

এই প্রকারে সুনিয়মে সুশৃঙ্খলার রাজ্যশাসন করিয়া মহারাজ প্রতাপ সা পরলোক গমন করেন, তাঁহার তিনটি পুত্র তখন-নাবালাক। ইংরেজ গবর্নেন্ট

নাবাবজের-রাজ্যবন্ধার জন্ত প্রতিনিধি সভা (Council of Regency)

গঠিত করেন, এবং মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (Regent) প্রতিনিধি বা সভার

সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহারই হস্তে ষ্টেটস্কাব ভার প্রদত্ত হয়। এই রাজ-

সভার নাম কুমার বিক্রম সা।। সচরাচর লোকে কুমার সাহেব বলিরাই সম্বোধ-

ন করে।

সম্পত্তিভোগের কি মোহিনী-শক্তি; বেথানে সম্পত্তি, বেথানে ক্ষমতা, সেই

খানেই প্রতিবন্ধিতা, সেইখানেই গোলযোগ। সামান্য ভূমিখণ্ডে সহস্র সন্ন্যাসীর

স্থান হয়, কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীতে ছই জন রাজার স্থান কুলায় না। আররা-

নরিক, —সম্পত্তি-ধনগোরবের মহিমা জানি না; এই দেখি, সেখানে অর্থ, সে-

খানেই অনর্থ; আর দেখি, বেথানে ক্ষমতা, সেখানেই তাহার অপব্যবহার,

সেখানেই প্রতিযোগিতা। বিশ্বনিরস্তার এই বিশ্বরাজ্যে এই গোলযোগ আমরা

মাথাইরা দিতেছি; রাজপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণে বসিমা-নিরপেক্ষ বিচারকগণ

প্রতিদিন আমাদের এই সমস্ত সম্পত্তি, ক্ষমতা, জোর-জবরদস্তির নীমাংসা

করিতেছেন; ধর্ম্মীর বহনক্ষিত অর্থ-পুলিশ, উকীল আর ট্যাম্পবিক্রেতা ভাগ

করিয়া লইতেছে; এ দৃশ্যের অভিনয় পুনঃপুনঃ হইতেছে। মামুল-মোকদ্দমার

দ্বারে বিপুল অর্থশালা ব্যক্তি পথের ভিখারী হইতেছে, তবুও কেহ সাবধান

হয় না। তবুও স্বধার্ম্মিকের উদ্ধারের জন্ত স্বধার্ম্মিক পণ, আমরা প্রতিদিন

দেখিতে পাই।

কুমার সাহেব-অভিভাবক হইরা সমস্ত রাজ্য স্বহস্তে পাইলেন। তাঁহার

পরামর্শদাতা-হিতৈষী বহু অনেক ছুটিয়া গেল। তাঁহার অন্ত অনেক গুণ

থাকিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিবিষয়ে তিনি বড় তাই অপেক্ষা অনেক হীন;

পরামর্শদাতাদের হস্তে কলের পুতুলের মত তিনি পরিচালিত হইতে লাগিলেন।

তাঁহার ফল এই হইল, রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিচারবিভ্রাট-বা বিচারবিক্রম।

অনেকে, অভিভাবকের নাম দিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল।

এদিকে রাজ-অন্তঃপুরে আর এক গচ্ছ-বীয়ে বীয়ে-বলসঞ্চয় করিতে

ছিলেন। মহারাজ প্রতাপ সাহেব মৃত্যুর পর বিধবা রাণী সাহেবা অভিভাবক-

পদপ্রার্থিনী ছিলেন; কিন্তু ইংরেজ গবর্নেন্ট মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রম

সাকে অভিভাবক করাই কর্তব্য স্থির করায়, বিধবা রাণী নিরস্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তাঁহার-পক্ষেও অনেকে ছিলেন; অভিভাবক

সভার সভ্যগণের মধ্যে ছই এক জন রাণীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গোপনে

যড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। অবশেষে রাণী সাহেবা প্রকাশ্যভাবে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে স্পষ্টভাবে কুমার সাহেবেব শাসনের উপরে দোষারোপ করিলেন,—তিনি বিচার বিক্রয় করিতেছেন, তাঁহার হস্তে রাজ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

নাবালকগণের মাতার এই আবেদনপত্র ছোটলাট উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, উপেক্ষা করা কর্তব্য বোধ করিলেন না। ১৯৪৮ সন্থতে কি তাহার কিছু পূর্বে, বিভাগীয় কমিশনের শ্রীযুক্ত মেজর রস সাহেবেব উপন্যাসস্থানের ভার অর্পিত হইল; সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু বঘুনাথ ভট্টাচার্য্য রাণীর পক্ষের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। রঘুনাথ বাবু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি ভ্রাতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-বাকালী-রঘুনাথ বাবুর যত্নে ও চেষ্টায় রাণীর পক্ষ জয়লাভ করিল। কুমার সাহেব অভিভাবকের পদ হইতে অপসারিত হইলেন; রাণী সাহেবা সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

গৃহ-বিবাদ-বহিঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; কুমার সাহেবেবের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল; তিহরীরাজ্য হইতে তাঁহার চির-নির্বাসন দণ্ড হইল। অল্প উপায়ে না দেখিয়া কুমার সাহেব আর এক জন বুদ্ধিমান বাঙ্গালীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত গড়োয়ালের এক ক্ষুদ্র রাজ্যে দুই পক্ষের উন্মীল হই। বাঙ্গালীর উর্বর মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতে লাগিল; পর্ত্তবাসী গড়োয়ালীগণ মসী ও বাক্যুদ্ধ-অবাক্-হইয়া দেখিতে লাগিল। ছোটলাটের আসন টলিল, তিনি সমস্ত অন্তঃস্থানের অল্প বহুদূরবর্তী পর্ত্তবেষ্টিত তিহরী রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কূটবুদ্ধিবলে উভয় পক্ষকেই পরাজিত করিলেন; কুমার সাহেব স্বপদে না হউক, সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নাবালক রাজকুমারের গদি-প্রাপ্তির আর অধিক দিন বিলম্ব নাই; এ সময়ে অল্প কোন পরিবর্তন করিলা লাভ নাই; ইত্যাদি-বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া রাণী সাহেবাকেই অল্পদিনের জন্য অভিভাবক স্থির রাখিয়া, ছোটলাট নাইনিতালে প্রস্থান করিলেন। তিহরী রাজ্যের গৃহবিবাদ মিটিয়া গেল; রাজভাণ্ডারে-সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি উভয় পক্ষের-বিবাদে জলের মত খরচ হইয়া গেল।

এই সমস্ত ব্যাপারের অল্প দিন-পরেই আমি-তিহরী বাই। কুমার সাহেবেব পক্ষীয় বাঙ্গালী বাবুর সহিত আমার বিশেষ-পরিচয় আছে, এজন্য অনেকে আমাকে তিহরী বাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হয় ত আমার উপরে কোন

প্রকার অত্যাচার হইতে পারে ; কেহ কেহ বলিলেন, আমি হয় ত সহরেই প্রবেশ করিতে পারিব না । কিন্তু আমার ভায় গোটাকুললধারী ব্যক্তিব মনে সে-সব কথা জাগে নাই ; আর রামের রাজ্য গ্রামের হস্তেই বাড়ক, আব হবির হস্তেই বাড়ক, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ; সুতরাং আমার উপরে কোন প্রকার অত্যাচার হইবে, তাহা আমি মোটেই বিখ্যাস করিতে পারি নাই ।

এই অবস্থায় একদিন অপরাহ্নসময়ে আমি ও আমার একজন সন্ন্যাসী বন্ধু তিহরীতে প্রবেশ করি ; স্বাধীন রাজ্যে এই আমাদের প্রথম পদার্পণ ।

লীজলধর সেন ।

প্রতিশোধ ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

বিনোদবিহারী পূজার পর নৌকারোহণে নবদ্বীপের দিকে চলিয়াছেন । সচবাচর তাঁহার চরণযুগল ছাড়া অস্ত্র যানের তিনি বড় তোয়াক্কা রাখেন না । কিন্তু এবারে একটু কথা ছিল,—সন্ন্যাসতি বিশ্বনাথের হাতে আবার পড়িতে তাঁর বিশেষ আপত্তি । এখন আর ভয় ছিল না—কিন্তু লজ্জা রাখিবার তাঁহি ছিল না । সরলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার অব্যবহিত পরেই বিশ্বনাথের সেই ব্যঙ্গ-মিশ্রিত তিবন্ধার ভগবৎপ্রেরিত দণ্ডতুল্য সুখোপাধার মহাশয়ের হাড়ে-হাড়ে বাজিয়াছিল । ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জায় পড়িয়া তিনি সরলার আব কোন খোঁজ খবর করিতে পারেন নাই । সে ঘটনার পর আর বাটীর বাহির হন নাই । পান্নাখেনায় বিনোদের বড় আসক্তি—সন্ন্যাস পর বসিয়া দেড় প্রহর না থেলিলে তাঁহার চলিত না । কিন্তু গৃহে-বিশ্বনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পব তিনি সে আমোদ ত্যাগ করিয়াছিলেন । সন্ন্যাস পর কোথাও বাইতেন না ।

জগদ্ধাত্রীপূজার কিছু দিন আগে বিনোদবিহারী এক লোভে পড়িয়া গৃহ-কোটর ত্যাগ করিয়া চলিলেন । নিমন্ত্রণ চিঠি পাইয়াছেন, সমুদ্রগড় অঞ্চলে এক ধনশালিনী অনুচ্চ কুলীনকন্ডার কুল রক্ষা করিতে হইবে । বাটী হইতে সমুদ্রগড় পদব্রজে দেড় দিনের পথ, কিন্তু পথে প্রায় সর্বত্র বিশ্বনাথের আড্ডা । কালনার ডাকাতির পর বিশ্বনাথ গা-ঢাকা দিয়াছে, দেশময় সে খবর রাষ্ট্র হইয়াছিল । নিশ্চিন্ত মনে বিনোদ শান্তিপুরে আসিয়া নৌকায় চড়িলেন ।

সন্ধ্যার একটু আগে নৌকা মুন্সাপুরের খালের কাছাকাছি হইল, সমুদ্রগড় অদূরে। এমন সময়ে খালের ভিতর হইতে এক খানা দীর্ঘ পান্সী বেলে আসিয়া গুল্মবক্ষে পড়িল। তাহার দাঁড়ি মারিদের উল্লাস কোণাহলে, তাহাতে লোড়পাতনের ধারাবাহিক শব্দে, একটা স্মৃদুত সংকল্পের ভাব সূচিত হইতেছিল। “গল্প মারী কি জয়! কানী মারী কি জয়!” শুনিয়া বিনোদ বুকিলেন, ডাকাতের দল তাহার সম্মুখে।

কিন্তু পান্সী আপন মনে বাহিরা চলিল, বিনোদকে কিছু বলিল না।

নৌকাও উজ্জানে পাইল বাহিরা চলিতেছিল। সন্ধ্যাতিমির ঘনাইয়া সমুদ্রগড়ের ঘাট দেখা যাইতেছিল। সহসা সেই পান্সীর দাঁড়পতন নক ঘুরিয়া স্রোতোমুখে ঘনতব হইয়া আসিল। মাঝি উদ্ভিগ্ন হইয়া বিনোদকে জানাইল, সমুদ্রগড়ের ঘাটে পৌছিবার আগে পান্সী নৌকায় উপর আসিয়া পড়িবে।

হইলও তাই। দৃশ্যহস্তে বন্দী হইয়া বিনোদ পান্সীতে নীত হইলেন।

তাহার ক্ষুদ্র পুটলিটি পর্যন্ত তাহার উঠাইয়া লইল, কিন্তু মাঝি মাল্লাদের কিছু বলিল না। অধিকাংশ দস্যু সমুদ্রগড়ের কাছে নামিয়া গেল। অল্পকালে, তাবৎ কিছুকালে বিনোদ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কি উদ্দেশ্যে ডাকাতেরা তাহার চন্দ্র বাঁধিয়া দিল, সকলের উপর তাহাই ভাবিয়া তিনি অতিশয় বিব্রিত হইতেছিলেন।

পান্সী যখন তীরলগ্ন হইল, তখন রাজি প্রায় প্রের-উত্তীর্ণ হইরাছে।

খুগালেরা সহসা সম্মুখে চাঁৎকাব করিয়া উঠিল। সর্বত্র শান্ত নীববতা, জাহ্নবী স্রোতের কুল কুল রবও সেই শান্তির সঙ্গীতমাত্র। অল্পকালে, ক্রমশঃ বিনোদ বুঝিলেন, ডাকাতেরা তাহাকে পান্সীতে পুর্লিল। বিনোদ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। প্রাণের ভয়-ভরসা কিছুই তাহার ছিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জিজ্ঞাসিত অপমানিত কৃষ্ণ সর্দার মনে মনে শপথ করিল, বিশেষ ডাকাতের আজ্ঞা সম্বন্ধে ক্রতনিষ্কণ্ট না হইয়া সে আর মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মুখ দেখাইবে না।

এ দিকে বৈষ্ণনাথ বিশেষে ধরাইয়া দিতে পারিল না বটে, কিন্তু অনিষ্ট বা করিবার, সেই করিয়া গিয়াছিল। তাহার কাছে কৃষ্ণ সর্দার বিশ্বনাথের নাড়ী-

নক্ষত্র সকলই জানিয়া লইয়াছিল। স্বরূপগঞ্জের কাণ্ডের পর বাড়ী না গিয়া সে

শান্তিপুত্রের দিকে গেল। ইচ্ছা, সেখানকার বিখ্যাত উপর-গতিদেব-হরের
মিশিবা-বিশে ডাকাতকে ধরবে, পারৎপক্ষে আর-সাহেবদের শরণাপন্ন
হইবে না।

এ দিকে স্বরূপগঞ্জে কৃষ্ণ সর্দার এবং বৈজ্ঞান্যের নাকালদের কথা উনিয়া
ব্রাহ্মণীতলার শিবিরে মহাষ্টমীনিশায় ভারি উল্লাস পড়িয়া গিয়াছিল। হলের
লোকেদের উৎসাহে বিশ্বনাথ সে আমোদে যোগ দিয়াছিল বটে, কিন্তু সর্বান্তঃ-
করণে নহে। নেতৃত্বে বতগুলি অসামান্য গুণের-দরকার হয়, দরদর্শন তদ্ব্য-
সর্গপ্রবান। বিশ্বনাথের তাহা ধখেই ছিল। স্বরূপগঞ্জের ঘটনায় সে-বা-

কারাক্ষ বৈজ্ঞান্য অতঃপর তাহার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান সাক্ষী দাঁড়াই-
চিরশত্রু কৃষ্ণ সর্দার “মরিয়া” হইয়া পিছু নাগিরাই রহিবে। নরমীর নিশা-
সংবাদ আসিল, কৃষ্ণ সর্দার উপর-গতিদেব নিশিয়া শান্তিপুত্রে বসিয়া-আছে।
বিশ্বনাথ বুঝিল, এতদিনে-বিপদ ধনীভূত হইয়া উঠিল।

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যাকাল-উত্তীর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণীর নিবিড় জঙ্গলে, বে-
খায় প্রান্ত পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডের উপর বিশ্বনাথ বাবুর দরবার বলিয়াছে, সেখায়
এক বার বাই। প্রকাণ্ড-পাইকড়-পাছের নীচে তৃণমণ্ডিত-চণ্ডীদণ্ডগতলে-একটি-
মাত্র মুগায় দীপ জলিতেছে। তার চেয়ে গাঢ়াঙ্ককার ভাঙ্গ। তাহাতে গত কর
রাজির আনন্দোৎসবময় স্থিতি একটা অনির্বচনীয় কারুণ্যবিজড়িত বিষাদে
পরিণত হইতেছে। অদূরে উৎসব উপলক্ষে রচিত তৃণপত্রাবৃত দীর্ঘ গৃহশ্রেণী
চল্ল্যলোকে ক্ষুদ্র শিবিপার্শ্বীয়-প্রভীতমান হইতেছে। গৃহমণ্ডল প্রান্তবে
প্রায় পাঁচ শত মহিম্যমূর্তি-বিশৃঙ্খল ভাবে বসিয়া গিয়াছে। অনেকেরই হাতে
তরবারি, জ্যাংদালোকে তাহার কলক জলিতেছে।

এই সমবেত বৃত্তাজ্ঞমণ্ডলীয়ধ্যে দুইটি পরিচিত মূর্তি উপস্থিত ছিল না।
বিশ্বনাথ এবং মেঘা। প্রতিমাবিসর্জনের পর বিশ্বনাথ মাতাকে প্রণাম করি-
বার জন্য গৃহে গিয়াছে। মেঘা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। কৃষ্ণ সর্দার
শান্তিপুত্রে গিয়া উপর-গতিদেবের দলে মিলিত হওয়ার সংবাদ দলের মধ্যে কেবল
মেঘা জানিত। অতএব নবমীর নিশা প্রান্তত হইতে না হইতে সে বিশ্বনাথকে
অন্বেষণ করিল, ডুলি পাঠাইয়া মাতাকে আনাইয়া লওয়া হউক। নহিলে কি
জানি শত্রুরা যদি গাড়িয়া ভাঙছালায় * স্রোষণে বুঝিয়া আত্ম “ওৎ” করিয়া
পাকে। হাদিয়া বিশ্বনাথ বলিল, “মেঘ, চিরকাল কেবল ডাকাতই করলি,

* বিশ্বনাথের জন্মভূমি। এই গ্রাম নদীয়া জেলায় চাণ্ডা বানাব চাঁব জোশ পুর্কদিকে।

স্বাম্বর-কখন চিনুলিনে। শান্তিপুত্রের বণ্ডারা আজ বাইচ খেলা ছেড়ে কোথাও
নড়বে না, সে ভাবনা করিসনে। তাতে আজ ঘাটে ঘাটে ডুবে-পরা বত রঙ্গী
এসে ছুটবে। তুই নিশ্চিন্ত থাক।”

মেঘা-ভাষাপি সশস্ত্র হইয়া বিশ্বনাথের সঙ্গে গেল। যদিই কোন বিপদ
ঘটে। বিশ্বনাথের অজ্ঞাতসারে সে নিজের দলের বাছা বাছা গড়কীওয়ালাদের
পথের স্থানে স্থানে লুকাইয়া রাখিল।

নদীরের কিরিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া, উদ্ভূত ডাকাতেরা কিছু ব্যস্ত
হইয়া উঠিল। সকলকেই আজ বাড়ী কিরিয়া আশ্রয় বন্ধুদের সঙ্গে কোলাকুলি
করিতে হইবে। কিন্তু হুকুম ব্যতীত-মাইবার বো নাই। বাত্যানোলিত মধু-
ক্রমবৎ সেই পাঁচ শত ডাকাতের কথার ব্রাহ্মণীতলার বন-শক্তি হইতেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গাড়িয়াভাতছালা গ্রামে এক ঘর মাজ ব্রাহ্মণের বাস। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথের

অখালকুলে দুর্গোৎসব করিতেন। বিশ্বনাথের বুদ্ধমাতা এই পূজাতেই সন্তুষ্ট

ছিল, নিজে কখন “ঠাকুর আনিতে” সাহস করিত না। অল্পকল্প হইলে বলিত,

“বাপুয়ে, ছোট লোক বাগী আমরা,—ও সব কি আমাদের সর।” এ দিকে যে

বিশ্বনাথ স্বরূপগঞ্জে মহা ধুমধামে দুর্গোৎসব করিত, সে কথা কেহ বলিলে বুড়ী

রঙ্গিত, “সে ত আর বিশ্বর ভিটার নয়। গঙ্গাতীরে কোন দোষ নেই।” মাই

হউক, সাত্ততক বিশ্বনাথ পূজাব সময় প্রায় প্রত্যহ একবার বাড়ী আসিয়া বৃদ্ধা

মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। মার আর কেহ ছিল না, একটি মেয়ে, আর এই

ছেলেটি। এবারে কিন্তু বিস্ত্র প্রয়োজন ছলনা করিয়া পূজার ভিতর এক দিনও

বাড়ী আসে নাই। কোম্পানি বাহাদুর যে বিশ্বনাথকে ধরিবার লন্ত হলিয়া

করিয়াছেন, দেশের সর্বত্র তাহা রাষ্ট্র হইয়াছিল। বুড়ীও তাহা শুনিয়াছিল।

জানিত, কিন্তু যেখানে থাক, বিজয়াব ভাসানের পর সে-তাকে প্রণাম

প্রভে আসিবেই। এ দিকে মেঘার নিরীক্কাতিশয়ে বাধ্য হইয়া বিশ্বনাথ জন-

প্রমাগমমাজপুত্র অপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল, তাহাতে বিলম্ব ঘটিল।

আশার পথ চাহিয়া চাহিয়া বুড়ী ক্রমে হতাশ হইল, এবং কোন অজ্ঞাত ঘোর

বিপদ নিশ্চয় করিয়া সকল ভাবিতে বসিল। ছ জনেরই ভারি কান্না পাইতে

ছিল, কিন্তু বৎসবকার দিন আজ, কাঁদিলে বিস্তর অকল্যাণ হবে।

মাতা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বচন এই অবস্থা, কিন্তু তখন সহসা আসিয়া

মেঘা দিল। বুড়ী পুত্রের কল্যাণকামনার তাহার অনুপস্থিতিতে অকপ্রবাহ

আমার অমন কথা মুখে আনিসনে, বিত্ত !” চক্ষু মুছিয়া বড়ী-দাঁড়াইয়া উঠিল। — “মা'কালী আমার বাস্তব দেবতা। উর কি বাপ ? আমি মানত করছি রক্ষাকালীর পূজা দেব।”

তখন মাতার চরণধূলি মাথায় মাখিয়া বেগে বিশ্বনাথ গৃহ হইতে নিকট হইল। গ্রামেব কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিল না। একেবারে গ্রামের বাহিরে উপস্থিত হইল। সেখানে দীঘির ঘাটের উপর বটগাছের ছায়ায় লুকাইয়া সমস্ত দিন মেঘা-লোৎসবকে অপেক্ষা করিতেছিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

রণপায় উঠিয়া দুই-জনে পাশাপাশি ছুটিয়া চলিল। জনশূন্য, সচরাচর বন্ধ ওদাদিশূন্য, লীমাপরিশূন্য প্রান্তরের পর প্রান্তর উভয়ে দ্রুতগতি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শরদ কোমলী সূর্যেরে রক্তত সুযুগ্ম বিস্তার করিতেছে। মাতা প্রকৃতি সর্বসৌন্দর্যশালিনী হইলেও-রক্তের সুধোৎসব অবসানদিনে শিথিলবিধানে আচ্ছন্ন হইয়া-আছেন। আম্রসমিহিত যে সব শ্রামল প্রান্তর কালিকার নিশীথে উৎসব-বাত্তে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, আজ তাহারা নীরবে ভারকাসনাথে স্নানীল আকাশের বিরচিমুগ্ধির প্রানে বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। সকলই শান্ত সমাহিত—কেবল বিল্লীরব আপন মনে শব্দিত হইতেছে। ভাব-চক্ষে বিজয়াদশমীর জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী সান্ত্বিক বড় অবসাদময়ী। বিসজ্জনের যে করুণ তৈরবী প্রভাতে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সন্ধ্যার পূরবীর বিদায়গানে তাহা অশ্রুনির সঞ্চিত করিয়াছে। নিশসিমাগমে, বিষন্ন প্রকৃতির মুখে তাহাই আবার বেহাগ রাগের উদ্রাস গান্ধীয়া প্রকটিত করিতেছে।

বিশ্বনাথ কি ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিল, ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মনটা ভাল ছিল না। বিত্ত নিম্নে হইতে কোন কথা বলে না দেখিয়া মেঘা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। “বিত্ত, এমন হুকিরে হুকিরে আর কী চলবে বল ? এত দিন আমি ভত্ত ডরাই নাই, কিন্তু এখন আর ভরসা না।”

বিশ্বনাথ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, “বতক্ষণ বাস, ততক্ষণ আশা আনিস তো ?”

মেঘা চুপ করিয়া রহিল। বিশ্বনাথ বুঝিল, কথাটা মেঘার ভাল লাগে নাই। বলিল, “তুই কি করতে বলিস ?”

মেঘা। আমি বলি কি, বিত্ত, আজকে তুমি দরবারে সব কথা খুলে বল।

“আমার, এমন কথা মুখে আনিম্বে বিত্ত !” চক্ষু মুছিয়া বুড়ী দাঁড়াইয়া উঠিল।—“মা কালী আমার বাস্তব দেবতা ! উর কি বাপ ? আমি মানত করছি রক্ষাকালীকে পূজা দেব !”

তখন সাতার চব্বিশখুলি মাথায় মাথিয়া বেগে বিশ্বনাথ গৃহ হইতে নিকট হইল। গ্রামেব কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিল না। একেবারে গ্রামের বাহিরে উপস্থিত হইল। সেখানে দীঘির ঘাটের উপর বটগাছের ছায়ায় লুকাইয়া সমস্ত দিন মেঘা-সোৎসুক অপেক্ষা করিতেছিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

রূপায় উঠিয়া ছই অর্ধে পাশাপাশি ছুটিয়া চলিল। জনশূন্য, সচরাচর বৃক্ষ-শ্রমাদিশূন্য, সীমাপরিশূন্য প্রান্তরের পত্র-প্রান্তর উভয়ে ক্রতগতি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শারদ কৌমুদী সর্বত্রই রজত স্রুষ্টি বিস্তার করিতেছে। মাতা প্রকৃতি সর্বসৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও বঙ্গের সুখোৎসব-অবসানদিনে স্নিগ্ধবিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। গ্রামসমিহিত বেসব শ্রামল প্রান্তর কাগিন্দার নিশীথে উৎসব-বাগ্মে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, আজ তাহার নীরবে তারকাসিনাথ-সুনীল আকাশের বিরাটসুষ্ঠির-পানে-বিস্ময়ে-চাহিয়া আছে। সকলই শান্ত-সমাহিত—কেবল ঝিল্লীরব আপন মনে শব্দিত হইতেছে। ভাব-চক্ষে বিজয়াদেশীর জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী রাস্তাবিক বড় অবসাদময়ী। বিসর্জনের বে করুণ ভৈরবী প্রভাতে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ববীর বিদায়গানে তাহা অশ্রুনির-সঞ্চিত করিয়াছে। নিশাসমাগমে, বিষম প্রকৃতির মুখে ভাহাই আবার বেহাগ-রাগের উদাস গান্ধীর্বা প্রকটিত করিতেছে।

বিশ্বনাথ কি ভাবিতে-ভাবিতে যাইতেছিল, ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মনটা ভাল ছিল না। কিছু নিজে হইতে কোন কথা বলে না-দেখিয়া মেঘা কথোপকথনে আবৃত হইল।—“বিস্ত, এমন মুকিরে মুকিয়ে আর ক-চলবে বল-? এত দিন আমি- তত ডরাই নেই, কিন্তু এখন আর ভরসা না।”

বিশ্বনাথ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, “বতকণ স্বাস, ততক্ষণ আশ-
—যানিস্ তো?”

মেঘা চুপ করিয়া বহিল। বিশ্বনাথ-বুঝিল; কথাটা স্নেহার ভাল লাগে না—বলিল, “তুই কি করতে বলিস্?”

মেঘা। আমি বলি-কি বিত্ত, আজকে তুমি দরবারে সব কথা-খুলে বল-।

বুড়ী বিত্তর হাত ধরিল । আবার সেই-লোল গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারার উপর
অশ্রুধারা প্রড়িতে লাগিল । বলিল, “বিস্ত, ছেলেবেলার কোম্পানির সিপাইদের
নাম শুনে কত ডবাতিন্; সে শোলোক বলে নাচতিস্, তা কি তোর এখন
মনে পড়ে না—

কি হলোরে জান ।

গলানীর মরদানে নবাব হারাগ পরাগ ॥

ছোট ছোট তেলঙ্গাগুলি নাল কুষ্ঠি গাষ ।

হাঁটু গেড়ে সারবে তীব মীরমদনের গায় ॥

তীব পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে-রয়ে ।

একেলা মীরমদন সাহেব কত নেক-নয়ে ॥

মীরমদন পীর ছিল, কোম্পানির সঙ্গে নড়তে গিয়ে সে মরে গেল । অমন নবাব
সেরাজউদ্দৌলা, তার রাজ্যি ছারখার গেল । হুংখিনী বাগদীর ছেলে তুই, কি
ভরসার তুই কোম্পানির সঙ্গে ঘুঝতে চাস ? দিদি তো ঠিকই বলেচে, এ ছাই
ব্যবসা ছাড় ।”

বিস্বনাথ চুপ করিয়া শুনিতেছিল । যা বলিয়া চলিল,

“কতবাব বলেচি বাবা; এ ছাই ব্যবসা ছাড় । এতদিন জন্মিনি, এখন
শোন্ । এত টাকা বে আনিলি, ঘরে কি রাখতে পেরেচিস্ বাপ ? পাগের
টাকা থাকে না । নিজের সুখ বাড়াতে পেরেচিস্ ? তোর-দৌলতে কত পুজো
স্বস্তেন্ করলাম, কত বাসুনেব বিরে পেতা দেলাম, তাতে কি হলো বল ? বুড়-
মাটি পর্যন্ত ছেলে-বিরতে গিরে মারা গেল ! আহা অমন লক্ষী বুড় কি আর
হয় ! ডাকাতি এমনি পাপ ! ও পাপ ছেড়ে বাপ আমার চাঁদবাস কব, আবার
বিরে কর ; ছোট মেয়ে যদি বিরে না কন্তে চাস, ইটলের সেই মেয়েটিকে এনে
মা কর । আমাদের ভেঁতুলে বাগদীর ভেতর ত সে চলন আছে ।”

বিস্বনাথ হাসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল । বলিল, “মা তোমার কথা এইবার সত্যি
সত্যি শুনব । আর একদিন মাস্তর একটা জায়গায় ডাকাতি কবব । অনেক
গুলো টাকা পাব । তার পর সত্যি সত্যি এ ছাই ব্যবসা ছেড়ে দেব । দলের
লোকগুলোকে আজই বিদায় দেব । কিন্তু মা, মা কালী বুরি আর তোমার
বিস্তকে রক্ষা করেন না ।”

শেষের কথা-কয়টি বিস্ত অক্ষুট স্বরে বলিয়াছিল, মাতাকে শুনাইবার জ্ঞত
নহে । কিন্তু বুড়ী শুনিয়া “ঘাট, ঘাট” করিয়া উঠিল ।—“ঘাট, ঘাট বাপ

রোধ করিয়াছিল, সাক্ষাতে সে সন্ধ্যায় রক্ষা করিতে পারিল না। বিষনাথ মার

পায়ের কাছে বসিয়া পদধূলি লইল, এবং হাসিয়া নিজ উত্তরায়ে মাতার

চোকের জল মুছাইয়া দিল। মা হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া বলিল,

“তা হাঁ বাবা, এত লোকেব ছকু বুঝিস, মায়ের ওঁকু বুঝিসনে ক্যান বাপ ?”

আমাব যে আর কেউ নেই বিত্ত ! এমন পূজো গেল, এক দিন তুই দেবা

দিলিনে। এক দিন তোকে হাতে করে মা হুগুগার পেসাদ খাওয়াতে পারলান

না। লোকে বলে, বিত্তকে কোম্পানি ধবে নিনে গিয়েছে।”

বিত্তকে দেখিয়া দিদি বেশী করিয়া সিন্ধি বাটিতে গিয়াছিল—মাতার কথা

শেষ হইতে না হইতে সে সিন্ধি এবং সিন্ধিব বাটা আনিয়া ভাইয়ের সম্মুখে

রাখিল। বিত্ত দিদিকেও প্রশংসা করিল, এবং তার পদধূলি মাথায় মাখিয়া বলিল,

“মা না হয় বুড়োমানুষ, একটুতে ভয়ে কেঁদে সারা হয়। তোর মুখটো

অমন শুকনো শুকনো কেন দিদি ? তুইও কেঁদেছিস বুঝি ? তোর ভাবিস

কি যে বিশেষ একটা পাখ পাখালি, অমন ধরলেই হলো—নয় ?”

দিদি বলিল, “বিত্ত, কেনই বা তুই ও ছাই ব্যবসা করিস ? বাপ পিতেমহ

চাঁবাস কানে রা-করেছিল, ডাকাতি করে তার চেয়ে বেশী তুই কি কবলি

ভাই ! কেবল পরের পেট ভরাচ্চিস, আর নাম কিচ্চিস ! নন্দী ভাই আসান,

ও সব ছাড়, মা তোকে আর কোথাও বেরুতে দেবে না।”

বিষনাথ হাসিয়া দিদিকে কহিল, “তুই বুঝি, মাকে এই সব বু-পরামোশ

দিয়েছিস ? তাই বেশী রা-প্রশ্ন করে ত-কখন কান্দে না, আজ কেন বছরকার

দিনে কান্দবে। তা আর দেখি করিসনে। এক ঘটা জল আন। থেয়ে পানি।”

মা বলিল, “হা, ষারি বই কি ? আজ রাত্তিরে কোথাও ঘেতে পাবিনে।”

বিষনাথ কোন কথা শুনিয়াও ভুলিল না। কথাটা চাপা দেওয়ার ভর

সার সে বলিল, “মা। কাপড় সব বিলি করে দিইচিস ? ঐ জামা আর

পুটুলি এনেচি। যদি কাউকে দেওয়া বাকী থাকে, দিস।”

বুড়ী হাসিয়া বলিল, “ও সব ভোগা রেখে দে ! তুই আমার পেটে হয়েচি,

কি আমি তোর পেটে হয়েচি ! আর তোর কোথাও যাওয়া হবে না। যদি

যাস, আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব,—ঠিক বলচি বিত্ত।”

বিত্ত মাতার পৃষ্ঠে আদরের হাত ব্লাইয়া ক্ষীণ হাসি হাসিল। “মা,

কোম্পানি যে-রকম-বাদে লেগেচে, তোমার কোনো থাকতেও ভয় হয় !

এই বিপদ কেটে গেলে, তুমি বা-বদাবে, তাই করব। আজ বিদায দাও।”

সাম্রা-কখন চিনুলিনে! শান্তিপুত্রের মণ্ডারী আজ বাইচ খেলা ছেড়ে কোথাও
নড়বে না, সে ভাবনা করিস্নে। তাতে আজ ঘাটে ঘাটে ভূরে-পবা যত রঙ্গিনী
জু-এসে জুটবে। তুই নিশ্চিন্ত থাক!”

মেঘা-ভথাগি-সশস্ত্র হইয়া বিশ্বনাথের সঙ্গে গেল। যদিই-কোন বিপদ
ঘটে। বিশ্বনাথের অজ্ঞাতসারে সে নিজের দলের বাছা বাছা সড়কীওয়ানাদের
পথের স্থানে স্থানে লুকাইয়া রাখিল।

সদারের ফিরিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া, উন্মুখ ডাকাতেরা কিছু ব্যস্ত
হইবা উঠিল। সকলকেই আজ বাড়ী ফিরিয়া আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে কোলাকুলি
করিতে হইবে। কিন্তু হুকুম ব্যতীত হাইবার যো নাই। বাত্যান্মোহিত মধু-
ক্রমবৎ সেই পাঁচ শত ডাকাতের কথায় ব্রাহ্মণীতলার বন শব্দিত হইতেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গাড়রাভাতছালা গ্রামে এক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণের বাস। দরিদ্র-বাহুব-বিশ্বনাথের
অধামুকুল্যে দুর্গোৎসব করিতেন। বিশ্বনাথের বুদ্ধমাতা এই পূজাতেই সন্তুষ্ট
ছিল, নিজে কখন “ঠাকুর আনিতে” সাহস করিত না। অল্পকদ হইলে বলিত,
“বাপু, ছোট লোক বাগ্দী আমরা;—ও সব কি আমাদের সম!” এ দিকে যে
বিশ্বনাথ স্বরূপগঞ্জে মহা ধুমধামে দুর্গোৎসব করিত, সে কথা কেহ বলিলে বুড়ী
বলিত, “সে ত আব বিশ্বর ভিটার নয়। গঙ্গাতীরে কোন দোষ নেই!” হাই-
হউক, মাতৃভক্ত বিশ্বনাথ পূজার সময় প্রায় প্রত্যহ একবার বাড়ী আসিয়া বুড়া
মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। মার আর কেহ ছিল না, একটি মেয়ে, আর এই
ছেমেটি। এবারে কিন্তু বিপদ প্রয়োজন-ছননা করিয়া পূজার ভিতর এক দিনও
বাড়ী আসে নাই। কোম্পানি বাহাদুর যে বিশ্বনাথকে ধরিবাব জন্ত হাঙ্গিয়া
করিয়াছেন, দেশের সর্বত্র তাহা রাষ্ট্র হইয়াছিল। বুড়ীও তাহা শুনিবাছিল।

জানিত, কিন্তু যেখানে থাক, বিজয়াব ভাসানের পর সে-তাকে প্রণাম
রূতে আসিবেই। এ দিকে মেঘার নির্বুদ্ধান্তিশয়ে বাধ্য হইয়া বিশ্বনাথ জন-
মাগমমাত্র শূন্য অপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল, তাহাতে বিলম্ব ঘটিল।
আশার পথ চাহিয়া চাহিয়া বুড়ী ক্রমে হতাশ হইল; এবং কোন অজ্ঞাত ঘোর
বিপদ নিশ্চয় করিয়া সূক্তা ভাবিতে বসিল। দু জ্বনেরই ভারি কান্না পাইতে
ছিল, কিন্তু বৎসরকার-দিন আজ, কাঁদিলে বিস্তর অকল্যাণ হবে!

মাতা এবং ভ্রোষ্ঠা ভগিনীর বখন এই অবস্থা, বিপদ তখন সহসা আসিয়া
মেঘা দিল। বুড়ী পূজার কল্যাণকামনায় তাহার অনুপ্রস্থিত-অশ্রুপ্রবাহ

ভাই, বাড়ীতে আঁব এ মুখ দেখাব না । তুই আমার গঙ্গার পথে নবদ্বীপে নিয়ে চল !”

ও দিকে কালনার সেই ব্যাপারের পর ভগবান মেয়েটিকে তাহার মামার বাড়ী রাখিয়া আসিল । বিশ্বনাথ বুঝিয়াছিল, বৈষ্ণবনাথ যখন গোয়েন্দা দাঁড়াইয়াছে, আড্ডাগুলিতে তাহার নিজের বসবাস আর কর্তব্য নহে । স্বরূপ-গঙ্গের আড্ডার উপর যে শত্রুদের সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি পড়িলে, তাহাও দলপতি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল । বিশ্বনাথ ইংরেজ-চরিত্র কতকটা বুঝিত । জানিত, এই বীরজাতি জীলোকের মর্যাদা যেন নোবে, আর কেহ তেমন নহে । সরলার নৌকা ঘুরির স্রোতোমুখে গিয়াছে, সে খবর পাইতে তাহার দেহি মাজ হইল না । ভগবানকে অনুরোধ করিল, মাঠাকুরাণীকে বুঝাইয়া সুকাইষা যেন স্বরূপ-গঙ্গের বাটীতে বাস করিতে প্রবৃত্ত করে । ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ আঁটিবা নিজে বিশ্বনাথ বিক্রম সিংহের গৃহে গেল । মীরাকে সবলাব সকল সংবাদ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি সেই দুঃখের দিনে অনাথা বালিকার কোন উপকার-কবিত্তে পায়েন কি না । মীরা তখনও নিজে শোকাচ্ছন্ন । চক্ষু মুছিয়া বলিল, “দাঁর বলে উপকার কিছু করলে করতে পারতাম তিনি ত আর নেই ! আমি কি করতে পারি ?” পীতাম্বর বলিল, “দিদি, বিশ্বনাথ আমাদের বড় ভেয়ের মত । বাবার মৃত্যুকালে তিনি যে উপকার করেচেন, আমাদের বংশে কেউ কখন তা ভুলবে না । তুমি শোকে ভুলে গিয়েছ । বাড়ীতে থেকে সামলে উঠতে পার বোধ হয় না । তুমি কেন দিন কতক সরলাকে নিয়ে গঙ্গাতীরে বাস কর না !” বিশ্বনাথ ইহাই চায়, বালিকা সরলাব কাছে এক জন অভিভাবিকা জীলোক থাকার একান্ত প্রয়োজন সে অনুভব করিতেছিল । প্রকাশ্যে পীতাম্বরের কথায় সমর্থন করিয়া বলিল, “এতে দিদিঠাকুরগণের মনও ভাল হবে, সে অনাথা মেয়েটিরও উপকার হবে !” অন্তএব কিছু দিনের মধ্যে পীতাম্বর নিজে দিদিকে স্বরূপগঞ্জে রাখিয়া গেল ।

সেখানে দুই-চারি দিন বাস করিয়া পীতাম্বর অভিলাষ হইল, পিতার দাহ-স্থলে একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া দিবে । পীতাম্বরের সঙ্গে যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিল, একটি শিরমন্দির এবং সচরাচর গঙ্গাবাসের জন্ত একটি বাড়ী নির্মাণ করিবে । স্বরূপগঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য পীতাম্বরের এরূপ ভাল লাগিয়াছিল যে, অবিলম্বে এই পরামর্শ কার্যে পরিণত করিবার আয়োজন করা হইল । ইলিফট সাহেব যখন শিকার খেলিতে আসেন, বাসেব জন্ত মাটির ঘর

বড় বড় দল পুবে এখন কেবল বেহাত হওয়া। বেশীভাগ লোককে বিদায় দিয়ে কেবল বাছা বাছা কালীর পাক্ জন কয়েককে সঙ্গে রাখ।

বিশ্বনাথ একটু ভাবিয়া বলিল, “মেঘু, তোর কথাই ঠিক, কিন্তু আমি বলি, একটু আশা ভরসা না থাকলে এই ছদ্মদিনে দলের লোকগুলো শত্রু হয়ে উঠতে কতক্ষণ? স্পষ্ট করে সব কথা খুলে বললে দলের বেশীর ভাগ লোকের চোকে আমার মানসজ্ঞম কিছুই আর থাকবে না, মেঘু। তা আমি করচিনে। সাহসই লম্বী। আজ আমি সবাইকে মিষ্টি কথায় বিদায় দেব। ফেডি * সাহেবের কুঠী লুট করি আগে। তার পর তোর পরামর্শ মত চলাই ঠিক।”

মেঘা বলিল, “কিন্তু ফেডি সাহেবের কুঠী লুট করা কি বড় সহজ ভাণ্ডার বিষ? ম্যাজিষ্টার সাহেবের কুঠীর অত কাছে! তা ছাড়া, কথায় বলে গাছে কাঁটাল, গায়ে তেল। দাদনের টাকা এখনও এসে পৌছায়-নি।”

বিশ্ব। নৌট খবর না পেয়ে কি কোন কাজে আমি কখন যাই? টাকার ভঞ্জে জরুরি ভাগিদ ক দিন হলো কলকাতায় রওনা হয়ে গেছে। এলো বলে টাকা। অমাবস্তার ভেতর কাজ সাফ করতে হবে।

আর কোন কথা হইল না। রাজি পাঁচ দণ্ডের ভিতর উভয়ে ব্রাহ্মগীতলায় ফিরিয়া আসিল।

সেই সমবেত উন্মুখ দস্যুসেনার সঙ্গে সে রাতে দলপতির কি কথাবার্তা হইল, তাহার সবিশেষ পরিচয়ের স্থল এ নাহি। বিশ্বনাথ সকলের সঙ্গেই কোলাহল করিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিল। প্রত্যেককে অমরোদ্ধ করিল, দেওঘর লীর দিন রাতে যেন কৃষ্ণনগরের নীল বনে লুকাইয়া থাকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মাঝখানে গোটাকতক কথা ছাড়িয়া গিয়াছি। এইবার সে ক্রটি সংশোধন সাঙ্গ্যব।

প্রত্যাহ্বাতা সরলা নৌকার আসিয়া উঠিলে, একটু পরে বদনও আসিয়া উঠিল। নিজের অপহৃত সেই পেটারিটি তাহার হাতে দেখিয়া সরলা অতিশয় বিস্মিত হইল। বদনের কাছে শুনি, এইমাত্র স্বয়ং বিশ্বনাথ দিয়া গিয়াছে। মনের তখনকার অবস্থায় সেই উত্তরেই সরলা নীরব হইল—তখন আর কিছু জ্বাইল না। বদন দিমির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল—“এখানে আর কেন? নৌকা বাড়ী ফিরে চলুক।” সরলা বলিল, “না।”

সব তখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। শিবমন্দিরের মালমসলা সংগৃহীত হইয়াছিল।

পূজার পর স্নান হওয়ার কথা।

বিশ্বনাথের কোণল এবং দূরদৃষ্টি কতটা সফল হইয়াছিল, ইতিপূর্বে তাহা

বর্ণিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

✓ সাহিত্যে খুন।

সকলেই, বোধ হয়, জানেন, আমাদিগের আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন—শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য। বাহার শ্রবণ এবং অধ্যয়ন পর্য্যন্তই শেষ হয়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য বলে, এবং বাহার সেই পর্য্যন্তই শেষ নহে, বাহাকে অভিনয়ে পবিণত এবং জীবনদান করিয়া কাব্যকল্পনাকে কার্যে এবং রসবাহারে আবার প্রতিফলিত এবং দশজনের চক্ষু সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়া হয়, তাহাকেই দৃশ্য কাব্য কহে। এক্ষত দৃশ্য-কাব্যের অন্ততম নাম রূপক— বাহাতে কাব্যে রূপ আরোপিত কবে, তাহাই রূপক। বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণ সংক্ষেপে এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন :—

বাক্য রসাস্বকং কাব্যম্।

রসাস্বক বাক্যের নাম কাব্য। বাহা দ্বারা মনের প্রীতি ও আনন্দ না-
-করে, তাহা রসই নহে। সহৃদয় জনগণের চিত্তে করুণাদি স্থায়ী ভাব, বিভা-
বাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে, তাহাকেই রস বলে। কাব্য-
শরীরকে এক্ষপে গড়িতে হইবে, যদ্বারা সহৃদয় লোকের চিত্তে আনন্দ জন্মিতে
পারে, এবং সেই কাব্য অধীত বা অভিনীত হইলে কোন বিশেষপ্রকার
ফলোদয় ঘটে। যদ্বারা কোন বিশেষ প্রকার ফলোদয় না ঘটে, তাহা কাব্যই
নহে। দৃশ্য কাব্যশরীরের এইরূপ লক্ষণ দেন :—

“শরীর ভাবদিষ্টাৰ্থ ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।”

সে পদাবলীর কোন বিশেষ ইষ্টার্থ আছে, তদ্বারা কাব্যশরীর গঠিত হয়।

ষ্টার্থ কি ? না

সহৃদয়বৈদোষ্যঃ।

তবেই দেখা বাইতেছে, কাব্য প্রীতিপ্রদ হইয়া চাই, এবং তদ্বারা কোন
ইষ্টার্থসাধন (desired effect) চাই। কাহাদের ইষ্টার্থ ?—সহৃদয় জনগণের।
বাহারা স্নরুচিসম্পন্ন এবং কাব্যের রসান্বাদনে সমর্থ, এক্ষণ লোককেই সহৃদয়

বলা যাইতে পারে। শ্রব্য কাব্যই হউক, বা দৃশ্য কাব্যই হউক, সকল কাব্যই উক্তকূপ রসাত্মক হওয়া চাই। বোকের কচি নানাবিধ হওয়াতে, শ্রব্য কাব্য নানা মূর্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রব্য কাব্য কেবল অধ্যয়ন বা শ্রবণ মাত্রেই শেষ হয় বলিয়া, তাহাতে স্মৃতিকে বজায় রাখিয়া যত দূর স্বাধীনতা চলে, দৃশ্য কাব্যে তত দূর চলে না; যেহেতু দৃশ্যকাব্যকে আবার অভিনয়ে জীবিতমূর্তিতে দেখাইতে হইবে। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য-বিপ্লব, মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি প্রভৃতি শ্রব্য কাব্যে চলিতে পারে, কিন্তু দৃশ্য কাব্যে তাহা মূর্তিমান করিয়া অভিনয়ে দেখাইতে হইলে, তাহা সহস্র জনগণের প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে। একত্ব দৃশ্য কাব্যের নিয়মাদি অনেকপরিমাণে আরও বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে।

কেবলমাত্র পড়িয়া বাহাতে আনন্দলাভ করা যায়, বাস্তবিক কাব্যক্ষেত্রে অভিনয় দ্বারা তাহাকে মূর্তিমান করিলে হয় ত তদ্বারা তত দূর আনন্দ না জন্মিতে পারে। বাহাতে সেই আনন্দের ব্যাঘাত হয়, নাটককারগণ তাহা অতি সাবধানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, বাহা সহস্র জনগণের কচির প্রতিবিরোধী হয়, বাহা ব্রাহ্মদৃষ্টে ও ব্যবহারে লজ্জাকর, এমন সকল অনুল্ঠান কাজেই দৃশ্যকাব্যে সংযোজিত হইতে পারে না। একত্ব সাহিত্য-দর্পণ-কার বলিতেছেন :-

“দুরাখ্যান বধো যুদ্ধ-রাজ্যদেনাদিবিপ্লবঃ ।

বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গো মৃত্যুরতস্তথা ॥

দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যামস্তদ্বীড়াকরকং যৎ ।

নয়নাধরণানাদি নগরান্নাগরণোধনম্ ॥

হানামুলেপনে চৈতির্বিজ্জিতো নাতিবিস্তবঃ ।

নাটকে কি কি পরিবর্জনীয়, আলঙ্কারিক তাহা বলিতেছেন—দুরাখ্যান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্যদেনাদিবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপ, উৎসর্গ, মৃত্যু, রতি, দন্তচ্ছেদ, এবং নখচ্ছেদ প্রভৃতি বীড়াকর ব্যাপার, শয়ন এবং অধরণানাদি, নগরাদির অবরোধ (Blockade) এবং ন্নান ও শরীরে অল্লেপন ।

তবেই দেখা যাইতেছে, আমাদের আলঙ্কারিকেরা নাট্যকে হত্যাব্যাপার নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন। কারণ, বাস্তবিক কাব্যক্ষেত্রে হত্যাব্যাপারে লো। প্রীতি উৎপাদন করা দূরে থাক, তদ্বারা সহস্র জনগণের মনে অত্যন্ত ঘৃণা উৎপাদন হয়, এবং সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে। হত্যাকাণ্ড কাব্যক্ষেত্রে দেখিতে কাহারও ভাল লাগে না। সময়ে সময়ে তদ্বারা অসহ ক্রোধ সঞ্চারও

সম্ভাবনা। সেরূপ ক্রোধাদ্রেক, হইলে লোকে এত দূর উত্তেজিত হইতে পারে যে, বঙ্গভূমে হয় ত সহস্র শ্রোতৃবর্গ সেই অভিনীত হত্যাকাণ্ডের উপর আর একটা হত্যাকাণ্ড বাধাইতে পারেন। রক্তমাংসশরীরে এরূপ একটি হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া স্থিরভাবে বলিয়া কে সহ্য করিতে পারে?—

Desdemona. O. Banish me, my lord, but kill me not.

Othello. Down Strumpet!

Des. Kill me to-morrow, let me live to-night.

Oth. Nay, if you strive,—

Des. But half an hour,

Oth. Being done,

There is no pause,

Des. But while I say one prayer.

Oth. It is too late.

(He smothers her.)

এ দৃষ্ট কখন ঘটতেছে, যখন সমস্ত শ্রোতৃবর্গ বিলক্ষণ জানিয়াছেন, ডে-
ডিমোনার কোন দোষ নাই। সেই নিরপরাধা, সরলা, বিশ্বদ্রুপ্রেমপ্রাণা-
পতিপরায়াণা-কেবল মূর্থ ও নিকোঁধ পতির সন্মোহনিত পতিতা হইয়াছেন।
পতি, সেই সন্মোহনিত কোপান্বিত হইয়া অনর্থক সেই সরলাকে হত্যা
করিতেছেন। কোন সহস্র ব্যক্তি স্বচক্ষে এই ভয়ানক দৃষ্ট দেখিয়া চূপ
করিয়া বলিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহারও কি কোপাশ্রিত প্রেমলিত হয় না?
তিনিও কি বঙ্গভূমিতে দৌড়িয়া গিয়া, ওথেল্লোকে নিরতিশয় প্রহার দিয়া
গায়ের-রাগ মিটাইতে বাইবেন না? তাহা হইলেই বঙ্গভূমিতে আর এক
বিবম ব্যাপার উপস্থিত হয়। একজন প্রভাবিত বুদ্ধিহীন মূরের মত লোকের
প্রতি কিছু এত সহায়ভূতি জন্মিতে পারে না যে, নিতান্ত নিরপরাধা
স্ত্রীর হত্যা তাহার সহ্য হইবে। কোন যৌর মহাপাতকীর খুন হইলে তব লোক
বলিতে পারে, কি হইবে? রাগের মাথায় হইয়া গিয়াছে। তথাপি স্ত্রীহত্যা
সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পাপীয়সী স্ত্রীকে পরিভ্যাগ করাই বিধেয়। গৌরার
লোকের প্রতি কাহার দয়ার সঞ্চান হইতে পারে? হিন্দুর চক্ষে যে আদর্শ
রহিয়াছে, প্রকৃত সহস্র হিন্দুর বাহা রুচি হওয়া উচিত, হিন্দু সমাজের এবং
হিন্দু ধর্মের বাহা বিধান, স্ত্রীহত্যা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং সেই
স্ত্রীকে যখন নিরপরাধা বলিয়া বিলক্ষণ জানা যাইতেছে, তখন তাহার হত্যা

কোন হিন্দু পড়িতে বা দেখিতে পারেন? দেখিলে, সহ্য করিতে পারেন? সে-
রূপ জীহত্যা দেখাতে কি মনের মলিনতা জন্মে না, অন্তরে পাপস্পর্শ হইবে না?
সুতরাং তাহা দেখাতেও পাতক আছে ।

প্রকাশ রঙ্গভূমিতে এই জীহত্যার অভিনয় প্রদর্শন করা হিন্দু ধর্ম্মাদর্শের
সম্পূর্ণ বিপরীত । রঙ্গভূমিতেই তদ্বারা যে অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা, তাহাও
আমরা প্রদর্শন করিয়াছি । পাছে রঙ্গভূমিতে এইরূপ অনর্থ ঘটে, পাছে হত্যা-
দর্শনের পাপ লোকের কলনাকে মলিন করে; তাই আমাদের নাটককারগণ
কোনখানে এরূপ হত্যাব্যাপার প্রদর্শন করেন নাই । আমাদের সব নাটকে
এরূপ একটিও দৃশ্য নাই । বাস্তবিক যাহা ইউরোপে Tragedy বলিয়া
বিখ্যাত, আমাদের দেশে দশরূপক মধ্যে তাহার স্থান হইতে পাবে না । কারণ,
তাহা হিন্দু ধর্ম্মাদর্শের বিপরীত হওয়াতে নাট্যকীয় নিয়ম ও আদর্শেরও বিপরীত
হইয়াছে । সেই ট্রাজিডি এ দেশে আসিয়া কি অনর্থই না ঘটয়াছে ।

আমাদের দেশে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে যে রূপ উচ্চ আদর্শ পাওয়া যায়,
তাহা হিন্দু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় । হিন্দুর ক্রটি এবং হিন্দুর হৃদয়ের সহিত
তাহা মেলে । ইউরোপে সে আদর্শ কোথায় পাইবে? আমরা সাহিত্য-দর্পণ
হইতে নাটকের যে নিষেধবিধি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে আমাদের নাট-
কীয় আদর্শ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । ইউরোপে নাট্যকীয় আদর্শ গ্রীস হইতে

প্রথমে গৃহীত হয় । তৎপরে তাহার বিবিধ ব্যতিক্রম করা হয় । নানা
ইউরোপীয় জাতির ক্রটি অনুযায়ী এই সকল ব্যতিক্রম ঘটয়াছে । কিন্তু কি
গ্রীক জাতি, কি অপরাপর ইউরোপীয় জাতি, কোন জাতিরই ধর্ম্মাদর্শ হিন্দুর
সমত নহে, সুতরাং তাহাদের ক্রটিও বিভিন্নতা ঘটয়াছিল । এ জন্য ইউরোপীয়
নাট্যসাহিত্য কোন কালে হিন্দু নাট্যসাহিত্যের আদর্শে উঠিতে পারে নাই ।

ইউরোপীয় জাতিসমূহ যে রূপে কথিতপ্রিয়, যে রূপে কঠিন স্বভাব, তাহাদের নাট-
কীয় আদর্শে তাহা প্রতিকলিত হইয়াছে । স্পার্টার নিয়মাদি কিরূপ নিষ্ঠুর ছিল,
তাহা প্রাচীন গ্রীস ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই বিদিত আছে । এথিনীয়েরা
দেশের অনেক বড় বড় ভদ্র ও দেশহিতৈষী লোককে নির্দয়রূপে নিপীড়ন

করিয়াছিলেন । ধর্ম্মাঙ্গা সক্রোটসকে তাহারা এক রকম-ব্রিষণে বধ করিয়া
ছিলেন । বিষপান করিয়া সক্রোটস আপনায় ধর্ম্মানুরাগ ও ভেদ রক্ষা করিয়া
ছিলেন । সেই মহাজনের বিষপান তাহারা স্বচ্ছন্দে দেখিয়াছিল । স্ক্যাম্বুসি
তাহারা জাগিত না । দেশের বিধানশাস্ত্র অতি নির্দয় করিয়া রাখিয়াছিল ।

সেই নির্মম ও নির্দয় দেশ হইতে ট্রাজিডির উদ্ভব। সে ট্রাজিডি যে রক্তাক্তি ও নির্দয় ব্যবহারে পর্যাবসিত হইবে, তাহা আর বিচিহ্ন কি ?

আর যাহারা এই ট্রাজিডি গ্রীক সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সেই-অপরূপ ইউরোপীয় জাতিগণ কিরূপ ছিলেন ? আমি বার বারও পূর্বে “আধ্য-দর্শনে” বাহা লিখিয়াছিলাম, আজি তাহা আর একবার আবৃত্তি করি :—

“জতি প্রাচীন কালে সেই যে ভাঙাল, গণ প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্বর-জাতিসমূহ-অত্যন্ত নির্দয়স্বভাব ছিল, আজিও যেন তাহাদিগের উচ্চ শোণিত আধুনিক জাতিমধ্যেও প্রবাহিত হইতেছে। পূর্বে ইউরোপীয়গণ নৃশংসচরণে বেরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হইত, সে আশ্রয় বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীনগণের নৃশংসচরণ, রোমানদিগের প্লাডিয়েটরের ক্রীড়া-আনাদিগের কথার মাধ্যমে প্রতিপাদন করে। মধ্যযুগেব ইতিহাস নরকধিরে, কি ভয়ঙ্কররূপে প্রাবৃত্ত রহিয়াছে। ক্রুসেডের-রক্তপাক, ইনকুইজিশনের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিবরণ পড়িলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। আবার দেখ, ইহুদিজাতির প্রতি উৎপীড়ন, উইচকাক্টের শাস্তির বিবরণে যে প্রকার-নৃশংসচরণের পরিচয় হয়, কোন্ জাতির ইতিবৃত্তে তত ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত আছে ? আবার ঐ কি ? আয়লণ্ডের ঘোর ইতিবৃত্ত—ইংরাজগণ ও স্কটগণের ঘোর হত্যাকাণ্ড, ফ্রান্সের গ্রেটেস্টাণ্ট এবং ক্যাথলিকগণের হত্যাকাণ্ড। এ সমস্ত পড়িলে আর কি ইউরোপীয়গণকে সন্তোষিত করা যায় ? স্পেন আমেরিকা জয়ের সঙ্গে-কি অধমতম বর্বরতারই পরিচয় না দিরাছে ? ইউরোপীয় ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করিয়া দেখ, তাহাদিগের পূর্বকালের দণ্ডবিধান কেমন রূপের লোহিত বর্ণে অঙ্কিত ছিল। এই সমস্ত ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে বোধ হইতে থাকে যেন, ইউরোপীয়গণের প্রকৃতিই কেমন নৃশংস-উপকরণে গঠিত। তাহা কিছুতেই নরম করিতে পারে নাই। খৃষ্টান ধর্ম যে এত উন্নত বলিয়া গর্ব করা হয়, তাহাও ইউরোপে ব্যর্থ হইয়াছে, ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের নৃশংসতার অপনয়ন করিতে পারে নাই।” কারণ :—What is bred in the bone, can not come out of the flesh.

—“ইউরোপীয় জাতির উল্লিখিত প্রকৃতিমূলক দোষ শুদ্ধ যে তাহাদিগের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে এমন নহে, তাহাদিগের সেই বর্বর স্বভাব তদীয় সাহিত্যের এক প্রধান ভাগকেও দূষিত করিয়াছে। তাহাদিগের নাট্য-

বচনায় তাহা ট্র্যাজিডির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ট্র্যাজিডি শুধু ইউরোপীয় সাহিত্যের সম্পত্তি। তাহা সেই সাহিত্যের প্রায়বন্ধি না, তাহা যিচার্য্য বিবরণ।

বর্ধরসভাব এবং রক্তপ্রির অস্ত্রান্ত ইউরোপীয় জাতিগণ গ্রীক ট্র্যাজিডিকে প্রতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। তাঁহাদিগের প্রকৃতি ও রুচি ট্র্যাজিডির বিষয় পরিণামে আনন্দপ্রাপ্ত করিত। তাই ইংরাজী সাহিত্যেও এই ট্র্যাজিডি অনার্য্যসে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সেক্সপিয়রের অতুল্য প্রতিভা ট্র্যাজিডির আনন্দে মাতিয়া ছিল। তাহার রুচি এমন পরিশুদ্ধ হয় নাই যে, সেই ট্র্যাজিডির দোষ দর্শন করিয়া তাহা পরিবর্তন করে। তিনি তাহার সমস্ত গুণপনা ও কবিত্বশক্তি সেই ট্র্যাজিডির মধ্যে নিরেশিত করিয়াছেন। সেক্সপিয়রের ট্র্যাজিডি সমস্ত ক্ষুদ্রতায় অগতের এক অতুল্য পদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। লোকে সেক্সপিয়রের প্রতিভাসমুৎপন্ন কবিত্বের স্বর্ণময় নল দিয়া বিষণ করিতেছে। আজি আমি রাত্রে সেক্সপিয়রের পাঠক, পাঠক কি! তাঁহাকে পূজা করিতেছি, তাহার কবিত্বের স্বর্ণময় নল দিয়া বিষণ করিতেছি। কালিদাস যে সাহিত্যের নিঃসার সনে বসিয়া তাহা শত শোভায় শোভিত করিয়াছেন, এবং শত মাধ্যমে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সে সাহিত্যে আজি আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ব্যাস, বাস্করীক অন্ধকারে বসিয়া কাদিতেছেন। ভবভূতির অলৌক-সাধারণ "উত্তরচরিত" অবজ্ঞাত হইয়াছে। আমরা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি-সুতরাং সেই সেক্সপিয়রের সমুদায় ট্র্যাজিডির সম্মান বাড়াইতেও শিখিতেছি। সেক্সপিয়রের অসংখ্য অনুপূর্ণ সমালোচকগণ আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া বাইতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র রুচির বিকার সাধন করিয়া দিতেছেন। পাঁচ জনের সঙ্গে আমরা বাগ্মীবলি শিখিয়া কেবলই বলিতেছি, সেক্সপিয়রের ট্র্যাজিডিগুলি অগতের অতুল্য সম্পত্তি।

কেবল এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই নাই, আমাদের নতুন রঙ্গভূমে সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথের অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। নাটক বলিলেই আমরা সেই নাটক আরম্ভে ট্র্যাজিডি লিখিয়া বসেন। শুদ্ধ রঙ্গভূমে নহে, শুদ্ধ হাতেকলমে নহে, বাস্তবিকই আমরা এক এক সময়ে নিজে ট্র্যাজিডির অভিনয় করিয়া থাকি। বিলাত হইতে এ দেশে নানাবিধ শাসিত অস্ত্র লগত করিয়া দিয়াছে, সেই শাসিত অস্ত্র লইয়া আমাদের কোন সরলা অপরাধহীনা ললনা

রক্তকে ডেস্‌ডিমোনার মত নৃশংসকণে হত্যা করিতেছি। আমাদের হত্যা ব্যাপারের দৃষ্টান্ত চারিদিক প্রচারিত হইতেছে। শেষে কি ভদ্র কি ইতর, কি ইংরাজী ওয়ালা কি নিরক্ষর মূর্খ, সবাই অস্ত্র চালাইতে মজবুত হইয়াছে, এবং ট্রাজিডির অভিনয় করিয়া রক্তগদ্যার দোষ প্রাবিত করিতেছে।

একপ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কারণ, ইংরাজী নাটকে, গল্পে, কাব্যে এবং সাহিত্যে বিশেষ আদর করিয়া আমরা নানাবিধ ট্রাজিডি পড়িতেছি। কল্পনায় খুন রাজি দিন বহিয়াছে। মনে মনে সর্বদা যে খুন দেখে, খুনে তাহাব আর ঘৃণা জন্মে না, পাপের অপবিত্রতা অপনীত হয়। বিশেষতঃ, সাহিত্যে শিথি, বত বীর, বত বড় লোক, বত মাছু গণ্য লোক রক্তারক্তি করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আমবাও সেইরূপ বীর হইতে চাই, বড়লোকের সেইরূপ কার্যের অনুগামী হইতে শিথি, এবং রক্তারক্তি ও খুন করিয়া গুরুত্ব দেখাই। খুনে আমাদের ভিতর অনুরাগ। ইতরোপীয় সমাজে সে অনুরাগ শিথিল হইয়া গিয়াছে।

এই ট্রাজিডি সম্বন্ধে আমি বার বৎসর পূর্বে “আর্য্যদর্শনে” বাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

“প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যে যদিও ইউরোপীয় বিরোগান্ত * রীতি অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিরোগান্ত রীতির-বাহা প্রধান গুণ, তাহা আর্য্যসাহিত্যে ছিল। যে করুণ রস বিরোগান্ত রীতির প্রধান গুণ, তাহা আর্য্য সাহিত্যে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়।— আমরা সেক্সপিরারের ডেস্‌ডিমোনার অস্ত্র ধরুণ সন্তুষ্ট হই, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, মাগবিকা, মাণবিকা, মহাশ্বেতা, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি কবিকল্পিত নারিকার অস্ত্র কি ভদ্রপেক্ষা অনধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া থাকি? অথচ তাহারা কেহই ডেস্‌ডিমোনার জায় নৃশংসকণে নিহত হইয়া নাই। বাস্তবিক মহাকাব্যের জার কেমন কাল্পনিক স্বন্দর, দুস্ত্রে সীতাকে আপন কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়াছেন। সরলা, নিম্পাপিনী ডেস্‌ডিমোনা নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়া স্বর্গে বাইলেন; সীতা কবি-কল্পিত স্বর্ণরথে দেবতা-গণেব পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দধ্বনি সহকারে স্বর্গারোহণ করিলেন। কিন্তু অমৃত্যুখিনী

*—ট্রাজিডিকে বিরোগান্ত বলিলে কিছুই বলা হইল না। বিরোগ অনেক রকমে ঘটিতে পারে, কিন্তু ট্রাজিডির বিরোগ বিশেষ প্রকার; তাহাতে রক্তারক্তি, কাটা কাটা চাই। এ অস্ত্র ট্রাজিডি বিরোগান্ত বলিলে ঠিক অনুবাদ হইল না। অথচ সচরাচর লোকে বিরোগান্ত শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সীতার দুঃখে ও ক্রেশ তাঁহাকে চিরদিনের জন্য মানবহৃদয়ের সহানুভূতি-মন্দিরে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে।”

“সীতার দুঃখে কাতর হইয়া আমরা বাস্তবিক সহিত প্রতি-বটনাম, প্রতি-পক্ষে কাঁদি, কাঁদিয়া হৃদয় কাতরতায় তাঁহাকে পবিত্র জ্ঞান করি, তাঁহার হৃদয়-মাধুরী শনৈঃ শনৈঃ আমাদের হৃদয়ে জাগিতে থাকে, সীতার সকল গুণে-পক্ষ-পাতী হই, সরমার-সহিত অশোকবনে তাঁহার জন্য কাঁদিতে থাকি, বনবাসে লক্ষ্মণের সহিত অশ্রুপাতে ভাসাইয়া দিই। সীতা আমাদের মনোমন্দিরে অতি পবিত্র মূর্তিতে চিরদিনের জন্য স্থাপিত হইলেন। সীতা ভারতবাসিগণের হৃদয়-বিগলিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবাসিগণ সীতার জন্য চিরকালই অশ্রুবর্ষণ করিবেন।”

ভবভূতি বা বাস্তবিক সহিত এখানে সেক্সপিয়রের তুলনা হইতেছে না।

আমরা জানি, সেক্সপিয়রের অনেক গুণ আছে, যে জন্য তিনি-চির-দ্রশ্যীয় হই-বার যোগ্যপাত্র। তিনিও এক জন মহাকবি। কিন্তু এখানে Tragic রসের বিচার হইতেছে; সন্তাপের স্থায়ী কলের কথা হইতেছে। এ প্রত্যাব-কবিত্বের বিচার নহে। তাহা স্বতন্ত্র কথা। সীতা-সম্বন্ধে-যাহা বলা হইয়াছে, দময়ন্তী সম্বন্ধে সেই কথা খাটে। চিরদুঃখে তাঁহাদের পতিভক্তি পবিত্র হইয়া গিয়াছে। চিবহুঃখিনী হইয়া-তাঁহারা জগজ্জনের হৃদয়মন্দির চিরদিনের জন্য অধিবাস-করিয়া আছেন। নিহত-না হইয়াও তাঁহাদের বিয়োগ অগন্তের-নিকট চির-সন্তাপের কারণ হইয়াছে। সকলেই তাঁহাদের-জন্ত-কাতর। তবে ত-হত্যা-ব্যতীতও সন্তাপ সমান স্থায়ী হইতে পারে ?

সে-যাহা হউক, অনেকে-হয় তো-বলিবেন, ডেসডিমোনার জন্য কি আমা-দের হৃদয়-কাঁদে না ? হৃদয় কাঁদে-বটে, কিন্তু হত্যাকাণ্ড দ্বারা-নিহত হইলে-যে অশ্রুপাত-হয়, তাহার সহিত সীতার মত বিয়োগ হেতু অশ্রুপাতের-একটু-স্বতন্ত্রতা আছে। আমরা-ক্রমে-ক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

সেক্সপিয়রে আমরা আইমজিন এবং ডেসডিমোনার মত-পতিপ্রাণতা ও-প্রেমের দৃষ্টান্ত অল্পই-দেখিতে পাই। ডেসডিমোনার প্রেম জুলিয়েটের-মত ‘বুকচাপড়ানি’-প্রেম নহে। তাহা-অতি-গভীর, অতি-শান্ত ও-হৃদয়ব্যাপী, অথচ-তেমনই-উগ্র, উষ্ণ ও-প্রবল। সে-প্রেম চক্ষুর-নেশা নহে। সেই-প্রেম-ভূমিতা ডেসডিমোনা সর্বজনমনোহর, তাঁহার হৃদয়মাধুরীতে-তিনি-সকলের-মন-হরণ-করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চিত্র আঁকিয়াই সেক্সপিয়র মূবের-চরিত্র

ফুটাইতে-ফুটাইতে ডেস্‌ডিমোনার খুনের জন্ত বড়বস্ত্র করিতে বসিলেন। তার পর পাঠক ডেস্‌ডিমোনার খুনের নিমিত্ত বড়বস্ত্রে ও ঘোর হত্যাব্যাপারে নিমগ্ন হইলেন। ডেস্‌ডিমোনা নির্দয়রূপে নিহত হইলেন! কি বীভৎস-ব্যাপার! ডেস্‌ডিমোনার স্থিতি কি কেবল এইরূপ-ঘোর হত্যাব্যাপারের নিমিত্ত? তাহার হত্যাব্যাপার দেখিয়া কি অশ্রুপাত হয়? না, নরীর-শিহরিয়া উঠে? ডেস্‌ডিমোনার পর এমেলিয়া নিহত হইল। মনে হয়, সেই ছুরিকাঘাত যেন নিজ বক্ষে বিধিল। কি ভয়ানক!

ম্যাকবেথে আরও ঘৃণিত-ব্যাপার। ম্যাকবেথের সর্বত্র হত্যা;—তাহার গোড়ায় হত্যা, তাহার মধ্যে হত্যা তাহার শেষে হত্যা। প্রথমে ডনক্যান, মধ্যে ব্যান্কো, শেষে নিজে ম্যাকবেথের হত্যা;—নাটকের প্রায় সমুদায়ই কসাইখানা। মধ্যে-বধন লেডি ম্যাকবেথ উদয় হইয়া বলিতেছেন, আমার রক্তহস্ত যে কিছুতেই ক্যানিত হইতেছে না; তখন যেন সেই কসাইখানা আরও ঘেরীপা-মান হইতে থাকে। তাহার শাস্ত্র অমৃত্যুপের চিত্র-যেই রক্ত-গঙ্গাকে আরও উজ্জলরূপে দেখাইয়া দেয়। একাণ্ড গৃহদাহে দু-কোটা জলের স্রোত সেই অমৃত্যু-তাপ অগ্নিশিখাকে আরও যেন প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। সে অমৃত্যু-তাপ বিষকুন্তে কীরমাত। সেক্ষণ-নাট্য-অমৃত্যু-তাপটিতে কি ভয়ানক হত্যা ব্যাপার থাকে? নাটক মধ্যে কোন্ চিত্রের গৌরব অধিক? সমস্ত হত্যা-কাণ্ডের না সেই অমৃত্যু-তাপটিতের? হত্যা, নাটকের সর্বত্র; অমৃত্যু-তাপ, এক স্থানে মাত্র। সে অমৃত্যু-তাপটি রক্ত-গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। তাহা ঘোর হত্যা-পূর্ণ নাটকের প্রলোভন-স্বরূপ।

সেক্সপিয়রের সমস্ত বড় বড় নাটকে এই বীভৎস-ব্যাপার। হামলেটের শেষ অঙ্কত কসাইখানা। রিচার্ড দি সেকেন্ড, এবং থার্ড, জন, লিয়ার, কোরাণ্ড-লেনস প্রভৃতি সকল নাটকই হত্যা-কাণ্ডে পরিপূর্ণ। জুলিয়স সিজরে-কি ভয়ানক-ব্রবে-এই কথাগুলি প্রতিপদিত হয়! Beware the Ides of march! সিজরের হত্যার পর এই শব্দগুলি মনে হইলেই হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। কোথায় নাটকীয় করুণ রস। আজিও আমরা ম্যাকবেথের নাম করিলে শিহরিয়া উঠি, রিচার্ড দি থার্ডের ঘৃণিত ব্যাপার হইতে শত হস্ত দূরে বাই! নাটক পড়া দূরে থাক, মনে হয় আর Tragedy গড়িব না।

সেক্সপিয়র কি শুদ্ধ তাহার ট্রাজিডিতেই শানিত ছুরিকা বাহির করিয়া-

ছেন ? লিখিতেছেন Comedy, সেখানেও সেই ছুরিকা। Merchant of Venice পাঠ কর, সেখানেও তোমার চক্ষু সমক্ষে ছুরিকা শাণিত হইতেছে ! নাটকে কসাইখানায় পরিণত করা শিষ্টাচারবিকদ্ধ এবং অতি-রুগ্নিত-ব্যাপার। এই দেখুন স্কটসম্পন্ন প্রসিদ্ধ ইংরাজ-সমালোচক Addison-কি বলিতেছেন :

But among all our methods of moving pity or terror, there is none so absurd and barbarous, and which more exposes us to the contempt and ridicule of our neighbours, than that dreadful butchering of one another, which is so very frequent upon the English stage. To delight in seeing men stabbed, poisoned, racked, or impaled, is certainly the sign of a cruel temper; and as this is often practised before the British audience, several French critics, who think these are grateful spectacles to us, take occasion from them to represent us as a people that delight in blood. It is indeed, very odd to see our stage strewn with carcasses in the last scenes of a tragedy, and to see in the wardrobe of the play-house several daggers, poniards, wheels, bowls for poison and many of the instruments of death.

এডিসন রক্তভূমিতে রক্তারক্তি করাকে বেক্লপ জঘন্ত ও বর্বরতার পরিচায়ক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হত্যা ও খুন কখন মানুষের আনন্দজনক হয় না। নাটক নবরসের আশ্রয়ভূমি। Tragedy করুণ ও ভয়ানক রসের আশ্রয়। হত্যা বা খুন কখন ভয়ানকের চরমসীমা নহে। রসের পরিপূষ্টিসাধন করিতে হইলে তাহাকে আনন্দজনক করা চাই। বাহা আনন্দজনক না হয়, তাহা রসের পরিচায়ক নহে। কিন্তু শাণিত ছুরিকা বনাইয়া হত্যা করাতে কি আনন্দানুভব হয়, না ঘৃণার সঞ্চার হয় ? হত্যা বা খুন দ্বারা আশ্রয় ভয়ানকের নিশ্চয় রসভঙ্গ সাধন করি। নাটকে কসাইখানায় পরিণত-করাতে, রসের পরিপাক হয় না; তাহা কবিশ্বের হানিজনক এবং রসভঙ্গদোষে দুষ্ট-ব্যয়। Butchery is not poetry.

আমরা এ কথা বলাতে, সেঙ্গিয়াক্সের সকল ট্রাজিডিতে যে একেবারেই

ক'বিত্ব নাই, এমন কথা বলিতে চাহি না। আমরা সাহিত্যে শুদ্ধ খুনেরই নিন্দা করিতেছি। খুন না করিলে কি করণ রসের পরিপুষ্টিসাধন করা যায় না? যিনি না করিতে পারেন, তিনি বিভাবাদি দ্বারা রসের পরিপাকসাধনে নিতান্ত অসমর্থ। তাঁহার সে রস গ্রহণ করাই অসম্ভব। খুনের প্রতি মানুষের স্বভাবতই ঘৃণা। খুনের প্রতি ঘৃণার উদ্বেগ করিবার জন্য নাট্যসাহিত্যের সাহায্য আবশ্যক হয় না। যে কার্য্য হইতে ভয় সমাজ স্বতঃই নিবৃত্ত, সাহিত্যে তাহার উজ্জল চিত্র-ধরাতে বয়ং বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা।—একটা সমগ্র রাজবংশ মধ্যে কয়টা হত্যাকাণ্ড ঘটে? আমি যুদ্ধের কথা বলিতেছি না। রাজ্যলোভে অসংখ্যজীবের হত্যাকাণ্ডের মত-হত্যার কথা বলিতেছি। প্রকৃতপ্রস্তাবে ওথেলোর জ্ঞান কয় জন জোক-দেখা-যায়? বাস্তবিক, সেক্স-পিয়ার ওথেলোকে বেকপ অতিরঞ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ওথেলোও যেন কিবৎপরিমাণে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। লোক তত দূর নিকোঁধ হয় কি না সন্দেহ,—বিশেষতঃ ওথেলোর মত একজন বীর সেনাপতি। সেক্স-পিয়ারেব কিংজনে যে স্থলে হিউবার্ট উত্তপ্ত গৌহললাকা দ্বারা আর্থরের চক্ষুঃ-উৎপাটন করিতে আসিয়াছে এবং সেই কার্য্যের উত্তোপ হইতেছে, সে স্থানের অভিনয় কতই না ঘৃণার উৎপাদন করে! রক্ষা এই, শেষে সে কার্য্য ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু দেখা গেল, নুশংস (John) জনের পীড়নের জালায় সেই রাজপুত্র কারাবাসের উচ্চপ্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া পড়িয়া মরিল। তাহার আত্মহত্যা-কাহার না হৃদয়ে অনর্থক বেদনার উৎপাদন করে? এরূপ বীভৎস চিত্রের ফল কি? রাজ্যলোভের স্থগিত পাপচিত্র দেখাইবার জন্য কি এ চিত্রের অবতারণা? কয় জন রাজাই বা সেক্সপিয়ার স্থগিত হইতে পারেন? হইলেই বা কিসে সে লোভ হইতে তাহাকে নিবারণ করিতে পারে? তবে সে চিত্র সাধারণ লোকের সম্মুখে কেন? নাটক, কিছু ইতিহাস নহে। ইতিহাসের সম্পত্তি ইতিহাসে রাখিয়া দিলেই ভাল ছিল। সেক্সপিয়ার যেখানে Butchery না করিয়া ট্রাজিডি রচনা করিয়াছেন, আমরা সে রচনার ব্যর্থপনাই প্রশংসা করিয়া থাকি। তাঁহার অনেক Tragi-Comedy এই ধাতুতে গঠিত। সেক্সপিয়রচনাকে আমি ট্রাজিডি শ্রেণীভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত নহি। আইমজিন তত কষ্ট সহ করেন নাই যে, তিনি চিরদুঃখিনী দময়ন্তী বা সীতার মত জগতের সম্ভাপ্তাজন হইতে পারেন। সিঘেলিন বিরোগাস্ত হইলে যদি আইমজিনের সহিত লিয়নিটসের মিলন না ঘটত; তাহা হইলে আইমজিনেতে লোক অধিকতর কাতর হইত।

সীতার সহিত শেষে শ্রীরামের মিলন না হওয়াতে—তাহার বিরোধ ব্যাপার

এবং বনবাস-অধিকতর কাতরতার কারণ হইয়াছে। সীতা জনকালমে প্রেরিত

হইলে এ কাতরতা বটত না। সীতার বনবাস কাব্যের করুণরসকে চরমদীর্ঘ

নইয়া গিয়াছে। বিরোগান্ত উত্তরচরিতের স্থায়ী ফল প্রকৃত—এত অধিক।

ভবভূতির "ছায়াতে"—সে ফল অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। বিরোগে

কাতরতা উৎপাদন করে, কিন্তু হত্যাভ্যাঙ্গে বীভৎস রসের সঞ্চার হইয়া রসভঙ্গ

ঘটে। ভেদভিমোনাতে মনে হইলেই তাহার খুন মনে হয়, অমানি স্বদরে

ভয়ানক আঘাত লাগে। স্মরণ্য রসভঙ্গ ঘটে।

Horace বলেন, রক্তভূমে প্রকাশ্যরূপে খুন করাতেই দোষ; খুন যদি

প্রকাশ্য রক্তভূমে কৃত না হয়, তাহাতে দোষ নাই। এ কথা কোন কালেরই

নহে। খুনের নাম শুনিলেই লোকে শিহরিয়া উঠে। কলিকাতায় যে সকল

খুন হয়, লোকে তাহা কি প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকে? না দেখিলেও হত্যাকাণ্ড

শুনিলেই মনে মনে তাহার চিত্র অঙ্কিত হয়, কল্পনা রক্তারক্তি মনে চিত্রিত

করিয়া দেয়। শিশুহত্যা, নারীহত্যা, স্বামিহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যার নান

শুনিলেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। লোক স্বচক্ষে যেন সেই হত্যাকাণ্ড জাজ্ঞ্যমান

দেখিতে থাকে। স্মরণ্য নাটকের মধ্যে হত্যাকাণ্ড আনিলেই, তাহাতে রস-

ভঙ্গ ঘটে, এবং প্রকাশ্যরূপে সেই খুন দেখান বা না দেখান উভয়ই সমান

কুফল প্রসব করিয়া থাকে। গ্রীক-ট্র্যাজিডি এই বোর হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত

হিয়া বহিয়াই যে সে দোষ গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

ইউরোপে নাটককারগণ তাহা গ্রহণ করিয়া কুরুচিরই পরিচয় দিয়াছেন; তাই

বলিয়া আমরাও কি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের হিন্দু নামেও অর্থাগৌরবে

জলাঞ্জলি দিব? ইংরাজীর অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার দোষগ্রহণে আমা-

দের সতর্ক হওয়া উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি চাহিয়া দেখ, সে সাহিত্য

নে দোষে কলঙ্কিত নহে। সুদেশীয় রত্নরাজি উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয়

বর্জ্যতার একশেষ রক্তারক্তিতে হাত কলুষিত করি কেন?

সেক্সপিয়র এদেশে সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বসাধারণগ্রাহ্য বলিয়া, আমি

তাহারই দৃষ্টান্ত দিয়া এ প্রস্তাব লিখিয়াছি। সেক্সপিয়রের ট্র্যাজিডি সমস্ত

যত লোকে পড়িয়াছে, তত অস্তিত্ব ইংরাজী নাটক নিশ্চয় পড়ে নাই। এমন

কি, সেক্সপিয়র আমাদের কলঙ্কের ছাত্রগণ পর্যন্ত পড়িয়া থাকেন। অতি

তরুণ বয়স হইতেই আমাদের কৃতি কলুষিত হইতে থাকে। তাই, পরীক্ষায়

নিষ্ফলতা হেতু কখন কখন কোন কোন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রকেও আজিকালি
আত্মহত্যা করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। আত্মহত্যা পাপে তাহাদের ঘৃণাবোধ
হয় নাই। আত্মহত্যার প্রতি তাহাদের ধর্মভীকতা জন্মে নাই। কারণ, যে
সাহিত্যে তাহারা শিক্ষিত, তাহাতে যে আত্মহত্যা করা মহাপাপ, এমন চিত্র
অঙ্কিত হয় নাই। সে আদর্শ সংস্কৃত কাব্য ভিন্ন অন্য কোন জাতির সাহিত্যে
আছে কি না, জানি না। ইংরাজেবা-রাহাই বলুন, তাহাদের কুচি লইয়া
আর্য্য কুচিকে দূষিত করা কখনই বিধেয়-নহে। এ বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যা-
লায়ের সভ্যগণের বিবেচনা করা কর্তব্য।

এই কুরুচিতে আমরা এত দূর-পরিবর্তিত হইয়াছি যে, এখন আমরা
ইংরাজী সাহিত্যের কোনরূপ নিন্দা সহিতে পারি না। বাহা বাস্তবিক নিন্দাই,
তাহারও নিন্দা করিলে শরীর জলিয়া উঠে। আমরা সেই সাহিত্যের এত দূর
পক্ষপাতী হইয়াছি যে, তাহার নিন্দা শুনিলে দেশীয় সংস্কৃত সাহিত্যের তজ্জপ
দোষ-খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে যাই। কিন্তু একজনের দোষ ও পাপ
অন্তের দোষ ও পাপ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না, তাহা স্ববণ করি না।
শ্রাম, রাম ও হলধরের দোষ দেখাইতে পারিলে কি জলধরের দোষ ঢাকে ?
তথাপি কেমন পক্ষপাত, সংস্কৃত সাহিত্যের দোষ উল্লেখ করিয়া ইংরাজী
সাহিত্যের দোষ চাফিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ জ্ঞান করি। আমরা বাস্তবিক
এ কথার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। Merchant of Venice নামক নাটকে বেক্সপ-
ছুরিকা শাপিত হইয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করাতে কোন লোক বলিয়া
উঠিয়াছিলেন, তোমাদের সীতার অগ্নিপরীক্ষা কি ? আমি উত্তর করিয়াছিলাম,
তাহা পরীক্ষামাত্র, তাহাতে সীতা গুড়িয়া মরেন নাই, যদি সংস্কৃত কোন কোন
কাব্য বা নাটকে অগ্নি দ্বারা নায়কনায়িকার হত্যাব্যাপার সাধিত হইত, তাহা
হইলে অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপারে ভয় হইবার সম্ভাবনা পড়িত। এবং সদৃশ কাণ্ড
বলিয়া উল্লেখযোগ্য হইতে পারিত। কিন্তু যখন অগ্নিদাহ ব্যাপার সংস্কৃত সাহিত্যে
দৃষ্ট হয় না, তখন অগ্নিপরীক্ষা ও ছুরিকা শাপিত করা, সমান বা সদৃশ ব্যাপার
নহে। জুতুগুহদাহ একটি প্রহসন (-Farce) মাত্র। রানায়ণে যেমন অনেক
অদ্ভুত কাণ্ড আছে, অগ্নিপরীক্ষা তন্মধ্যে অন্যতম।

ইংরাজী সাহিত্যের খুন সমর্থনার্থ অনেকে বলেন, তাহা স্বাভাবিক
ব্যাপার ; কিন্তু সীতার স্বর্গারোহণ অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ব্যাপার। ট্রাজি-
ডিব ঘোর হত্যাকাণ্ড চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া চূপ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকা

কিছুপ স্বাভাবিক ব্যাপার, বলিতে পারি না। পাগলামিই মানুষের স্বাভাবিক ব্যাপার বটে, কিন্তু এ-কাণ্ড যে পাপের চূড়ান্ত। হত্যার মত অবশ্য ও সর্বজন-ঘৃণিত পাপ কি আর আছে? এই স্বাভাবিক ব্যাপার কবি নাটকমাধ্যে আনেন কেন? তাহা নাটকীয় কৌশলমাত্র। যখন সীতা স্বর্গারোহণ করিলেন বা পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন, যখন যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলেন, রাস সত্রযুতে শিশাহিরা-গেলেন, দ্রৌপদী, অজু ন, ভীম প্রভৃতি হিমালয়ের মহাপ্রস্থানে অদৃশ্য হইলেন, তখন সকলেই জ্ঞান করিলেন, কবি সেই কৌশলে তাহাদিগকে কাব্য হঠতে অপসৃত করিয়া লইলেন। খুন করিয়া স্বাভাবিক ভাবে অপসারণ করা অপেক্ষা-এরূপ অপসারণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। খুন কবির অপসারণ করা নাটকীয় কৌশল ব্যতীত অল্প কিছু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তদ্রূপ পাতালপ্রবেশ ও স্বর্গারোহণাদিও কৌশলবিশেষ ভিন্ন অল্প কিছুই নহে। সকলেই তাহা সেই অর্থে বুঝিয়া থাকেন। তদ্বারা গ্রন্থ “মধুরেণ সুপায়েৎ” হয়। কিন্তু ট্যান্ডিডির হত্যাকাণ্ড দ্বারা গ্রন্থ সমাপ্ত করিলে, এক বীভৎসভাৱে পর্যাবসিত হয়। এরূপ পর্যাবসান নিতান্ত নিন্দনীয়।

কেহ কেহ বলিবেন, হত্যাকাণ্ড যে সকল স্থানেই নাটকীয় কৌশল, এমন নহে; কোন-কোন স্থানে তাহা অবশ্যজ্ঞাবী। ডেস্‌ডিমোনার হত্যা-এইরূপ অবশ্যজ্ঞাবী ব্যাপার, তাহা ওথেলোর আখ্যানবীজমধ্যে নিহিত; নহিলে ওথেলো-চরিত্রের পরিপুষ্টি সাধন হয় না। ওথেলোর পরিণাম ঘটনাব-পর্যায়-ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। এ কথা সত্য। কিন্তু আমি বা বলি, এরূপ স্থলে বিষয়-নিরূপণের দোষ। যে প্রতিভা ঘটনাচক্রে অল্প দিকে ফিরাইয়া দিতে না পারে, সে-প্রতিভাও ক্রটি আছে। সেলপিয়ারে প্রতিভার দোষ নহে, সেলপিয়ারে-কচির দোষ—সে কচি এরূপ হত্যাব্যাপারে আনন্দ পাইত, সে কচি একজন কৃষ্ণকায় নুবকে এরূপ নির্দয় পায়র রূপে চিত্রিত করিতে বড় আমোদ লাভ করিত। সেলপিয়ারের শুদ্ধ নিজের কচি নহে; তখনকার কালের কচি এরূপ ছিল, ইংরাজ জাতির কচি ও প্রবণতা একজন নুবকে একপ চিত্রিত দেখিতে বড়ই আনন্দলাভ কবে। আজিও এই কচির পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি। তবে দুই দশ জন যদি এ কচির বিরোধী থাকেন, তাহা-দেব কথা স্বর্ভাব্য নহে।

আমাদের বেণীসংহারের বিষয়নিরূপণে এইরূপ দোষ দেখা যায়। যে আখ্যায়িকার পরিণামে হুশাসনের রক্তপান করিতে করিতে দ্রৌপদীব বেণী-

বন্ধন হইবে, সে বিষয় নিরীচনের দোষ বলিব না ত কি ? ভট্টনারায়ণের অন্তবিধ পর্যাবসান করিবার সাধ্য ছিল না।

ইংরাজী ট্রাঙ্কিডির দোষ এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে প্রচুরপরিমাণে গৃহীত হইতেছে। নিজে বঙ্কিমও এই দোষে দূষিত হইয়াছেন। তাঁহার কুন্দনন্দিনীর বিবপান এক্ষণে অনেক গৃহস্থসংসারে কাণ্ডে পরিণত হইতেছে। আত্মহত্যায় যে ঘোর পাপ, এখন সে ঘোর পাপের ভর আমাদের অনেক জীলোকের মন ও করনা হইতে অপসারিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্মভীরুতা বিনষ্ট হইতেছে। তাহার রক্তভূমে ম্যাকবেথ দেখিয়া আসিয়া সাহসিনী হইতেছে। ম্যাকবেথের বিব ছিল কেবল ইংরাজী ভাষায়, এক্ষণকাব কুরুচিসম্পন্ন লোকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় আনিয়াছেন। পরের পাপ ঘরে আনিয়াছেন।

ইংরাজীওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত বলিয়া উঠিবেন, তোমাদের সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে কি খুন নাই ? আমরা বলি, যথেষ্ট আছে। মহাভারতে অনেক খুন আছে। পাণ্ডব-শিবিরে পঞ্চাশ-হত্যা কি ? আতিথ্যধর্মরক্ষার কর্ত্তের পুত্রবলি কি ?

এ সমস্ত ব্যাপার আমাদের সংস্কৃত দৃষ্টকাব্যে নাই, তাহা শ্রব্যকাব্যে আছে। শ্রব্যকাব্যের সহিত দৃষ্টকাব্যের যে প্রভেদ, আমরা প্রথমই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। তাহার বিচার করিলে শ্রব্যকাব্যের এ দোষ, দোষ বলিয়াই ধর্তব্য হইবে না।

মহাভারত ও রামায়ণের অধ্যয়নফল বা ইষ্টার্থ অতিশুভজনক। বাস্তবিক, সমুদয় রামায়ণ ও মহাভারতের অধ্যয়নফল হেতু আজিও হিন্দুসমাজে ধর্মের বল ও প্রভাব এত প্রবল রহিয়াছে। যে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবল সেই ছই মহাকাব্যের প্রাণ, তাহা সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। যখন আমরা দানবীরের পুত্রবলি দেখি, তখন আমাদের ধর্মভাব এত উচ্চে উঠে যে, অস্ত্র সকলই নিম্নতলে যায়। আমরা কর্ত্তের ধর্ম ও দানবীরের মাতিয়া পড়ি। যে দান ধর্মের জন্য তিনি সর্বত্যাগী হইতে পারিতেন, তাহার নিকট পুত্রবলি কি ? সেই বলিতে ত্যাগের গৌরব এবং দানবীরের ধর্মভাব পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ধর্মের উচ্চতায় আমরা ক্ষণিকের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া কর্ত্তের বশ্যনিবন্ধ মত্ত হই। পুত্রবলি তখন তুচ্ছ রোধ হয়। আর্ধ্যধর্মপ্রাণ শুদ্ধ স্বাধি-চরিত্রে ছিল না, বধার্থ ক্ষত্রবীরেরও তাহা বর্ত্তমান ছিল। ব্যাস পুরাণে তাহা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। কুরুকুলের সহিত যখন কর্ণ রণমগ্নে মত্ত হইয়াছিলেন,

তখনও তিনি দানবীরের ধর্মপালন করিতে কুস্তি না হইয়া অকাতবে ইজের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া নিজ অমোঘ অস্ত্রধর দান করিয়াছিলেন। এই আখ্যান-পাঠেব-কল ধর্মের উত্তেজনা, ধর্মবলে বলীয়ান হওয়া। তদ্বারা প্রকৃতি দূষিত হয় না, কিন্তু আরও উন্নত হইয়া উঠে। ধর্মের জন্ত, দানবীরের জন্ত হিন্দু দানবীভাগী হইতে শিক্ষা করে।

আর, পক্ষ-শিশুহত্যা কি? তাহা রণব্যাপারের মধ্যে একটি ভ্রান্তি মাত্র।

যে ভ্রান্তিতে দুয়োমথনেরও হরিবে বিষাদ জন্মিয়াছিল। দুয়োধন এত বে

পাণ্ডব-বিধেয়ী ছিলেন, তিনিও তাহাতে বিবাদিত। রণকাণ্ডের গোলামলে

কত ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, ব্যাস সেই যুদ্ধ ও গৃহবিবাদের ভীষণ পরিণাম-এবং

বিষময় কল প্রদর্শন করিবার জন্ত ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার

মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাদের নিকট এ

ঘটনার কোন দোষ নাই। তাহার কাব্যরূপে মহাভারতকে দেখেন, তাহার

দেখিবেন, যুদ্ধকাণ্ড কি ভয়ানক ব্যাপার। জাতিবিরোধের বিষম পরিণাম কি

ভয়ানক। যে কাব্যে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা পুরাণ। আপামর

সামান্য জনগণের ধর্মোন্নতি এবং হিন্দুসমাজকে ধর্মবলে বলীয়ান করিবার

জন্ত পুরাণের সৃষ্টি। সুতরাং, পুরাণের মহদুঃসমিধির অভ্যন্তরে কোথায়

একপ বধকাণ্ড লুকাইত থাকে, তাহা অসম্ভব হয় না। ট্রাজেডিতে বধকাণ্ড

প্রধান ঘটনা হইয়া পড়ে; পুরাণের প্রকাণ্ড ব্যাপারে তাহা আচ্ছন্ন থাকে।

কেবল পুরাণপাঠের কলমাত্র হৃদয়ে অস্বস্ত ও অন্ধিত হইয়া থাকে, এবং সেই

কল-চিরদিনের জন্ত জীবনকে নিয়মিত ও শাসিত করে। ত্রীপূর্ণচক্র বহু।

সহযোগী সাহিত্য ।

সমাজ-নীতি ।

তুর্ক রমণী ।

গভীর জাহাজ সংখ্যক কর্তনাইটলি-পাশে-তুরস্কেব মুসলমান রমণীগণের বর্তমান-অবস্থা-সংক্ষেপে একটি হুপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রিচার্ড ভেভি সাহেব বলেন—
“তুর্ক রমণীর চরিত্র।”
মানের গুণপুঞ্জক কোবাণে মানবের অকীংশভাষিনিগদের উপর বড় কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সহস্র তাহার শিষ্টব্যের বিধবা দুহিতা ধন-শালিনী কাদিজাকে ভাল বাসিতেন, ইহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। পরিণামে কাদিজাকে বিবাহ করিয়া তিনি স্বকীয় বিশাল উদ্দেশ্যের সাধনার্থ তাহার ধনসম্পত্তির সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি “Mahomet invariably speaks of women with arrogance and contempt.” মানবের-গৃহাধিপাতী কোবাণিসহিষ্ণু ভূসম্পত্তির সহিত তুলিত।
কোরাবেব মন্তব্য।
শয্যা বাসরে নববিবাহিতা বধূকে শয্যা বাসরের দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। উহা বিবাহসংস্কারের একটা অঙ্গস্বরূপ। কোরাণ বলেন,—“কেবল স্বামীর ইচ্ছানুসারেই স্ত্রী অনন্ত যুগের অধিকারি হইতে পারেন।” স্বামীর অনুমতি পাইলে তিনি পরকালে চতুর্থী চাঁদেব-মত-চিরযৌবন ও চিরসৌন্দর্যের অধিকারিণী হইবেন। তাহার স্বামীও কখনো একত্রিশ বৎসরের অপেক্ষা অল্প বা অধিকবয়স লক্ষিত হইবেন না।
এইরূপে স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের অসীম প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া মহম্মদ অভ্যন্তরীণ মহিলা-শাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন। “স্ত্রীভগ্না যদি শাসন না মানে, বেত লাগাইও।” ক্রীতদাসী-দিগের সম্বন্ধে এই বেত্রাবাজের সংখ্যা পর্যন্ত নির্দিষ্ট বহিয়াছে। কিন্তু সড়ই-বিশ্বের কথা—যে-পক্ষীগণের পক্ষে একপ কোনও সীমা নির্দিষ্ট হয় নাই। এ বিষয়েই বিচারভার সম্পূর্ণরূপে স্বামী মহাশয়ের উপর নিহিত। মহম্মদ সাধারণতঃ বহুবিবাহ মন না উঠে, উপরি উপরি চারিটি পর্যন্ত গ্রহণ করিতে রিধিবিহিত। “কিন্তু যিনি এই-পক্ষী-চতুষ্টয়ের সুখসম্ভোগ করিতে চান; তাহার দক্ষিণ হইলে চলিবে না। কান, কি গৃহ, কি ভৃত্য, কি অলঙ্কার, যান, বাহন প্রভৃতি সকল বিষয়েই চারিটির পূর্বক বনোবস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই। ইহাতে কোনও গুরুপাত কবিলে চলিবে না। এইরূপ চতুর্দশ বাহিনীর ধোঁরাক ঘোণাইতে অনেক তুর্ক পুরুষকে নিষ্ঠুর বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং তাহাদের অর্থপিপাসাটা একবারে মায়া ছড়াইয়া উঠে। এ বিষয়ে মূলপ্রবন্ধ-লেখকের একজন বন্ধু তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন,—
“তুর্ক-রাজপুত্রদের বড়-বড় বেতনভোগী হউন না কেন, আয়ব্যয়ের-ভালিকাটা উভয় দিকে সমভাবে রক্ষা করা সকলের পক্ষেই বড় কষ্টকর। তাহার স্বপ্নাধিপাতীপণ সম্পাদেব

আমাদ পাইয়া নিভাঙ্গ অপবায়ী হইয়া উঠেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাব হৃদয়ের বিকৃতি

চারিটি অঙ্গের একটু খাটো; তাহাব ভিতর একটি বই দ্বিতীয় স্থান সংকলন করিতে পানি নাই।—তাই কোনও নতুন চলিবা যাইতেছে। কিন্তু, আমার চাবিপোওয়া ব্যবস্থা।

প্রতিবাসী অমুকের কথা একবার ভাবিবা দেখ। তাহাব চাকি গৃহিণী। চারিজনেন-পুথক পুথক চারিটি বাড়ী। প্রত্যেকেবই দশটি হইতে বিশটি পর্যন্ত দাসী। অঙ্গের স্নেননোর সংখ্যা ঘোড়ের উপব আশিটি। তার উপব আবার দুইটি পুথক ভৃত্য। এই বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, চারিটি বিবি অপকপাতে প্রতিপালন কবিয়া মহামুদেয় নিয়ম বন্ধা করা, বস্ত্রানি সময়ে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পাড়ইয়াছে। সুতরাং চারিটি-প্রলোভন এখন অনেককেই পরিত্যাগ কবিতে হইতেছে। তবে আসল ব্যাপারটা বন্ধ হয় নাই। পত্নীর স্থান ক্রীতদাসীগণ অধিকার করিয়াছে। ইহাদের সম্ভান্যি হইলে, তাহাবও বিবাহিতার বংশধরগণেব তুল্যাসনে উপবেশন করে।

বিচার্ড ডেভি মহোদয় মহিলাকুল সম্বন্ধে মহামুদেব কঠোর ও মজ্জাকব বিবিধ উল্লেখ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমবা-বড়ই দুঃখিত যে, সে সকল কথা আরো কোনও

বিদেশীয় কথা প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। কারণ, আমবা কোবাপ্রসবিক্ অভিজ্ঞ নহি। ভবসা কবি, কোনও মুসলমান ভ্রাতা-বর্তমান বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিবেন। “যুজ নার্যাস্ত পূজ্যভে-বনন্তে উজ্জ

বনভাং,” আর্ধ্য-ওনিব এই মহিলামণ্ডলী উক্তির সত্য সমগ্র কোরণে কি কিছুই নাই।

পৃথিবী বা রিহদী রমণী-বিবাহ করিতে তুর্কের কোনও বাধা নাই। একপ বিবাহে পত্নী-দ্বিগকে ধর্মপরিবর্তন করিতে হয় না। তবে উহাদের সম্ভানগণকে মহামুদেব-বার্ধ-দ্বিক হইতে হয়। কিন্তু-ঐশ্বীন্যেব ক্রোড়ে লালিত গ্রুপীর্গর অঙ্গনার গঞ্

আন্তর্জাতিক বিবাহ। মুসলমানের অস্থায়্য-অঙ্গারের ভিতর বাস করা, এবং উহার আশ্রয়-নিঃ আদর কাম্বা বন্ধা করিয়া উঠা, অঙ্গারিনের মধ্যেই অতি অসহ হইয়া উঠে। সুতরাং এই সকল আন্তর্জাতিক বিবাহবন্ধন প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

তুর্ক এই সিচ্ছেদের ব্যাপারটা অতি সহজ। উহা আমেরিকাবাসীরও বিশেষ্যেব স্থল।

তুর্কবালী বখন দেখিলেন, কোনও বিশেষ রমণীতে আর তাহার হৃৎ নাই, তিনি তাহাকে তাহার জীবনপ্তুলি কিরাইয়া দিয়া অনারাসে গৃহের বাহির করিয়া দিতে পারেন। তবে উচ্চ-শ্রেণীর ভিতব একটু আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় বটে। তথাপি লেখক বলিতেছেন,—“উচ্চতন

রাজকর্মচারীদিগের পরিবারে এমন কয়েকটি রমণীব কথা আমি বলিতে পারি, যাহাদের বয়স তেমন বেশী হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই কেহ দুই বার, কেহ তিন

বিবাহরিচ্ছেদ। বার, কেহ বা দশ বার পর্যন্ত স্বামিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই বিচ্ছেদের কাণ্ডখানাকে একরূপ প্রহসন বলিলেও চলে। এখনও কুড়ী পার হন নাই, এমন অনেক হন্দরী স্বামিবাব পুনর্রিহিতা হইয়াছেন। পূর্বকালে তুর্ক-পুত্রগণ-পত্নীদ্বিগকে ধলীর ভিতর পুরিয়া বাসকোবসের জলে বিসর্জন দিতেন—এখন ফেল

সম্পর্কেব-ঐশ্বনটা বিচ্ছিন্ন করেন। কনস্তানতিনেপলের অধিকাংশ ভিখারি এইরূপে-পতি-ত্যাগ পত্নীমাত্র। তাহাদের বয়স সিরাজে; পথের কোনও ভিখারীর-আশ্রয়লাভও আর

তুর্করমণীর হৃদশ। তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। হতভাগিনীগণ নিভাঙ্গ অসহায়

হইয়া, অশেষবিধ হস্তগা ভোগের গব অবশেষে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তুর্করমণীদিগের হৃদশার কথা আব-অধিক অম্ববাদ করিয়া আমবা পাঠকের

হৃদয় ব্যথিত করিব না। গগবান এই-অভাগিনীদিগের উদ্ধারের উপায়বিধান করুন। তুর্ক

পুরুষদিগকে তাহাদের পবিত্রাবস্থা কোনও মহিলাব স্বাভাৱ্য সম্বন্ধে প্রশংসাও বিবৰণ বেরাদবী বলিবা পরিগণিত। “তুৰ্কবাসীকে তাহাব গ্ৰী, বিশেষতঃ তাহাব দুহিতাব কণা কখনও জিজ্ঞাসা কৰিও না।”

অতঃপৰ মূলপ্রবন্ধেৰ লেখক, ধনশালী সম্ভ্ৰান্ত তুৰ্কগণেৰ জীবন আশৈশব-কিৰ্দ্দাপে অভি-
বাহিত হয়, তাহাব একটা নমুনা দিয়াছেন। আনবা বাল্যেৰ কথা ছাড়াই-দিবা বিবাহবয়স
হইতে আৱশ্য কৰিভেছি। “পূৰ্বকালে বিবাহ ব্যাপাবটাও বড় সহজ ছিল। যুবক্কেৰ মাতা

জীবনপ্রণালী। নিম্নসম্পৰ্কীয় অথবা পৰিচিত কোনও ধনী সৱিধাৱেৰ কন্তাব সহিত

সম্বন্ধ স্থিৰ কৰিভেন। তাহা না হইলে, বৰেৰ বাপু বাপ্পাৱে গিয়া,
হুম্মনী দেখিবা, একটা দাসী ক্ৰয় কৰিয়া আনিভেন। এ বিষয়ে স্বৰং বিবাহকৰ্ত্তাব কোনও
মুঠাসিত গ্ৰহণ কৰা হইড না। কিন্তু সে দিন এখন আৱ নাহি। এখনকাৰ বিবাহে কেবল

পাড়াপড়শীৰা ঘুম বন্ধ কৰিয়া বেড়াইলে চলে না; বাহাৰ বিবাহ, তাহাৱও মনেৰ একটু আঁধটু
খবৰ লইতে হয়। কিন্তু সে খবৰ অতি সামান্য। বৰ, কন্তাব সহিত
বিবাহেৰ ‘সম্বন্ধ’।

স্বৰং কোনও কণা কৰিভে পান না, চৰিত্তটা কিন্তু, তাহাব কোনও
অমুসমান কৰিতে পান না। এমন কি, চেহাৰা-খানাও একবাৰ দেখিভে-পান না। সকল
নিম্নেই তাহাকে মাৰেৰ মুখে ঝাল খাইতে হয়। উভয়পক্ষীৰ জননীৰাই বিবাহকাণ্ডে প্রধান
কৰ্মী, অবশ্য পিতৃদেৱেৰও মতটা লইতে হয়।

“তাৰ পব বৰেৰ বাপ কন্তাব বাটীতে মুদাম্ব এক-উপচৌকন পাঠাইবা দেন। লোকৈৰ
বিবাস, এ অৰ্ধবাশি কন্তাব দেহভাৱেৰ সমভূল। অবশেৰে বিবাহেৰ নিৰ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত
হইল। বিবাহহলে যাক-ক-পুৰোহিত না হইলেও চলে। কাৰণ, কোৱাণে পৱিৰ্ণয়েৰ ব্যাপাবটা

ধৰ্ম্মসংকাৰেৰ মধ্যে পৰিপণিত নহে। যুৱোপীপ্ৰৱিণেৰ অমুকবণে এখন
পুৰোহিতেৰ আমদানী আবশ্য হইয়াছে। তুৰ্কী-বিবাহ বিকলবেলা

সম্পন্ন হয়। সদলবলে বয় মহাশয় কন্তাব গৃহদাৰ উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সেখানে বাশি
রাশি লোক জমা হইয়াছে। দেশেৰ মেৰে জড় হইয়া বৰ-কন্তাব সমালোচনা জুড়িয়া দিয়াছে।
আশীৰ্বাদ শুভাকাঙ্ক্ষাব ছড়াছড়ি। তপন বৰকেও মিকি চুয়ানীৰ মত ছোট ছোট সুদ্বাব
কিছু ছড়াছড়ি কৰিতে হয়। পৈঠাৰ ধৰে ডাবী যন্তৰ-মহাশয়, আসিয়া বৰকে আলিঙ্গন
করেন। অতঃপৰ অজ্ঞাৰ স্বজন বন্ধুবান্ধবেৰ সহিত বসিবা কাকি, সৱৰং প্রভৃতি পান
কৰা হয়।

“ইত্যবসৰে অম্বৱেৰ ভিতৰ এক মজাৰ কাণ্ড হইভেছে। কন্তাকে নানা বেশ ভূষাৰ সজ্জিত
কৰা হইয়াছে। তাহাৰ মাথাৰ উপৰ একছড়া নেবুলেৰ মালা বিজড়িত; আৱ গোলাপী-
বস্ত্ৰেৰ একবালা আবৰণ ঘোমটাৰ মত-মুখ ঢাকিয়া মুক্তিকা স্পৰ্শ-কৰিভেছে। এই অবস্থায়

হুম্মনী, গৃহেৰ এক কোণে কুজিৰ গোলাপকুহমে বচিত এক বিচিত চল্লাতপতলে একবালা-
সিংহাসনেৰ উপৰ গঠিত মুৰ্ত্তিৰ মত বসিবা বহিয়াছেন। ঘনুৰে ভিতৰ
তুৱন্ধেৰ ‘স্ত্ৰী-আচাৰ’
লোক জাব ধৰে না। চীৎকাৰে, গোলমালে কান পাতাৱাৱ না।

কোথাও ভোজ, কোথাও নাচ, কোথাও গান। চাৱিধাৱে পুনাবাবীৰ্ণেৰ হাসি-তামাসাৱ
ছড়াছড়ি। কন্তা কিন্তু মনসা-বুড়ীৰ মত সেই একভাবে ঠিক বসিয়া ৰহিয়াছেন। সন্ধ্যাৰ
পূৰ্বেই নিমন্ত্ৰিত মহিলাগণ বিদায় লইবা চলিবা বান; কাৰিণ, বনজানেৰ দিন ভিন্ন যৱ ছাড়াই
রাতিবাস কৰা মুসলমান বমণীৰ পক্ষে নিষিদ্ধ।

“এ দিকে বৰেৰ দুৰ্গতি দেখ। বেচাবী ছেঁড়া জুতাৰ বুট সামুলাইতে না পাৱিৰা আঁপভয়ে
অম্বৱেৰ পাণে ছুটিগা আসিভেছে। ইংৰাজদেৰ ভিতৰ হনিমুনেৰ প্ৰাৱন্তে বৰ-কন্তাৰ এতি

যে ছেঁড়া চুটি নিকপের প্রথা আছে, তাহা হব ত এই তুর্ক প্রথাই অনুকরণ। তুর্কী গৃহ-
পাছকাবুটি ।

গীরা বলেন, এই ছেঁড়া-জুতা কদুড়ি নিবারণের অবার্ষ উৎসব। বাসব-
গৃহগণ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইলে, বাড়ীর মধ্যে সকলের বুড়ী যিনি
তিনি ববকে ধরিয়া কজ্জাব-কাছে লইয়া যান। কজ্জা ত সেই আপাদমস্তক ঘোমটার মস্তি
হইবা জগদল পাথরের নত বসিরাই-আছেন। তখন বর সেই বস্ত্রমণ্ডিতা হৃদযবী পদতলে
পতিত হইবা, বিবিধ বাক্যলঙ্কারে; একবার হুলস বুধখানি দেখিবার ভিক্ষা করেন। তিনি
তুর্কদের বাসব।

বলেন, 'আমার নবনৈব আলোক তুমি। নামটি তোমার বলিবে কি ?'
'কজ্জা-ভিনরার উত্তর করেন, 'গোলাপ, গোলাপ, গোলাপ।' তখন
সেই-বুঝা আসিয়া তাঁহাব ঘোমটা পুলিয়া দেন। বুধক বুধতী একত্র কিছু আহ্বার করেন।
আহারাদি শেষ হইলে, আর তাহাদের নিকটে থাকা কর্তব্য নহে বুধবা, আটানা সজ্জিয়া
পড়েন। এইবা দুই জনের হৃদযাস রসাতল্য আবৃত্ত হয়। 'গোলাপটি তেমন চালাক চতুর্
হইলে সত্যনৈব আলা রত্ন ভূমিতে হয় না।' বহিলে বহু ন। কিরিতেই আর একটি, তার পর
আর একটি এইরূপে একটি একটি কথিখা প্রারম্ভ চারিটি পর্যন্ত হইয়া যাব।

'অন্ধরের আদব-কার্য্য বড় বিচিত্র।' পূর্বাঙ্কে সংবাদ প্রেরণ না কথিখা, অথবা অনুজাত
না হইবা, কোনও রমণী তাঁহাব স্বামীব সমুপে উপস্থিত হইতে পারেন না। এই সংবাদ-প্রীত-
দাত্রী কথিখা খোজি চাকরের দ্বাৰা প্রেরিত হয়। প্রত্যেক স্ত্রী পালা-
স্বপ্নের
ক্রমে স্বামী-মহাশয়ের সেবা করেন। তাঁহার কাপড়চোপড়ের ভাবিত
আদবকার্য্য।

করেন, তাঁহাব তাম্বাকি বা কাফি যোগাইয়া দেন, এবং অভ্যবসি নানা
উপায়ে তাঁহান বন যোগাইতে চেষ্টা করেন। এ দৌড়াপা রত্ন বেশী দিন থাকে না; স্বামী
নবজি হইলে বড় জোব বধবাগী হইতে দেখা যাব। স্বামীজি ইতিপূর্বেই শ্রান্ত হইবা পড়িলে,
হৃদযীকে হুসি। উপ কিঞ্চিৎ উপহার-দিয়া-বিদায় করিয়া দেন। তার পর কতদিনে আবার
প্রভুর মনে পড়িলে, এই ভাবিতে ভাবিতে দিন গুণিয়া তাঁহাকে কালবাপন কথিতে হয়।

ভেড়ী-মহোদয়ের এক বান্ধবী শিক্ষিত্রীরূপে কয়েক বৎসর তুর্ক বাঙ্গলপুত্রদিগের
পরিবারে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "তুর্করা জ্যো আমি মৌটের উপর দশ
বৎসর বাস করিয়াছি। অনেক পরিবাবে ভিভবকান-বৃদ্ধান্ত-জানি। জ্যো ইহা স্বীকার
করিতে বাধ্য যে, ইংলণ্ডে থাকিয়া দশ বৎসরের মধ্যে দাসীদিগের উপর অত্যাচারের মত
দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, তুর্ক পরিবাবের ভিতর তত দেখি নাই। সাধারণ তুর্ক পরিবাবে নৈতিক

নৈতিক অধোগতি। অবস্থা বিষয়ে আমি বাহা-জানি, তাহা প্রকাশ করিতে চাহি না। বহু

সংখ্যক কামিনী, এমন-কি স্ত্রীকুমারী বালিকাদিগেরও, গুপ্ত প্রেমের
বৃদ্ধান্ত এবং তদপেক্ষাও দুঃখী ব্যাপার আমার স্মৃতিগোচর হইয়াছে। ভাবাপি, কথাবাত্রীর
অসীমতা ছাড়া দিগে, তুর্কবংশীয়দিগকে, সেকলীষের ভাবাব, সাধারণতঃ সাদী (Honest)
বলা নাইতে পারে। কিন্তু যে অসীম কথোপকথনের কথা বলিতেছিলাম, 'তত্ত্ব লা কদর্য আর
কিছুই হইতে পারে না। তুর্ক-হৃদযবীর কঠিনের মাধুর্যমতঃ উহা আবও অপ্রীতিকর
হইয়া উঠে। তুর্কবা কুৎসিত রহস্ত ও কদর্য কানোন্নিয়ক গল্পের বড়ই বিবদ-ভক্ত।'

তুর্ক বংশীয় ধর্মোপাধীনতাও আছে। স্বামী-অনুমতি না হইবাও তাঁহার রাজ্য হাটের
জুতা অথবা রজ্জ্বাচ্ছব সহিত সাক্ষ্য করিবার উদ্দেশে হৃদযার হইতে হৃদযাত পর্যন্ত গৃহের
বাহিরে কাপ্তানিপাত কথিতে পারেন। গৃহীণীদিগ কখনও কখনও রত্ন গৃহে গিয়া, দাসদাসী
পুত্রকজ্জাব সহিত সপ্রাৎকাল পর্যন্ত কাটাইবা আসেন। এইরূপ অতিথ্যেব নিদর্শনরূপ
অতিথ্যকাণিশীকে অন্ধরের দাবদেষে তাঁহাব জুতাজোড়াটি রাখিয়া দিতে হয়। ইহাতেই

স্বামী মহাশয় বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার গৃহিণী আপন আত্মীয় বান্ধব লইয়া আশ্রয়

তুলক বমণীর

স্বাধীনতা।

কবিতাহেঁন, — তাঁহার “প্রবেশ নিবেদন” অগ্ণব দ্বী বাসিতে থাকিলে

পুত্রদিগেরও তদাধো-প্রবেশেব-অগ্রিকাব-নাই। — প্রীতকালে-তুঙ্গ-ও

রবিবার দিন দেখিতে পাইবে, দলে দলে-তুঙ্গরমণী-কোনও উদ্ভুক্ত

ভূমিতলে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া রহিয়াছে। সেখানে পুত্রবেব-সমাগম নিবিদ্ধ। রমণীগণ

পৰম্পরেব সহিত কথোপকথনকালেও অতি সূক্ষ্ম স্বর অবলম্বন করেন। বাজার হাটের

নম্র অপবা সঙ্কসন্দর্শনকালে তুঙ্গ বমণীর স্বামী গর্বাঙ্ক তীহাব সঙ্গে পার্শ্বে পার্শ্বে বাইতে-পায়েন

না। তাঁহাকে ২০২৫-হাত-তকাৎ হইবা থাকিতে হয়।

ক্রীতদাসীদিগকেও চিরদিন দাসীত্ব করিতে হয় না। — ত্রিশ ক্রিষা চন্দ্রিশ-বৎসর পাব হই-

বার পূর্বেই তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ কবে। গৃহের কর্তা তাহাদের বব-ছুটাইয়া দিয়া বিবাহ-

মৌতুক, বাসগৃহ, এমন কি গৃহসজ্জা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

ক্রীতদাসী। — তুঙ্গ রমণীর শ্রিতর আজকাল লেশাণ্ডারও বিশেষ উন্নতি লক্ষিত

হইতেছে। তবে, ইহাদের সম্বন্ধে কুয়াদ পাশার রূপধর্ম সকল হইতে-এখনও বহু বিলম্ব

রহিয়াছে।

সাহিত্য।

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।

সর্বদাই দেখিতে পাওবা যায় যে, সাহিত্যব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থায়, সকল সাহিত্যসেবকই

সর্বতোভাবে অসমুদ্র। — আবার মানব যেকোন বর্তমান অবস্থার-অনুসারে-সে-পান-সে-নব-নব-ই

কল্পনাকৌশলে অবিচ্যুতের অনিশ্চিত বাস্তব নির্ভরকলনাদমুখরিত পুষ্টিতরঙ্গমলতচ্ছাদিত

কোকিলকুলকুজিত কুপ্রকাননমণ রম্য মন্দনবনের স্বল্পনে রূপাণ্ড হব। দূব বলিয়াই সে ভবিষ্য-

তের চিত্র এত হৃদব; কারণ। —

“Tis distance lends enchantment to the view.”

সম্প্রতি সার ওবাল্টার বেসাট সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। — আমরা

তাঁহাব সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ভবিষ্যতের সাহিত্যজীবনের-কথার আলোচনা করিলে প্রথমই-মনে হয় যে, তাঁহারা

ভবিষ্যতে সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা অতীতকালের-সাহিত্যসেবকদিগের ইতি-

হাসে লিখিত অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহারা-এই প্রশ্ন উত্থাপিত করি-

বেন যে, ইহা-কি সম্ভব যে, একজন লেখক—সকলে যদি অর্থ করে—

নূতনে পুস্তকেনে। তবে ১২ কোটি শ্রোতা সমুদ্রে প্রকাশকের অধীন এবং ত্রিশ থাকিতে

পারেন? — প্রকাশক তাঁহার হইয়া পুস্তক বিক্রয় করিত, আবার অবস্থা এমনই শোচনীয় যে,

তিনি প্রকাশকের হিসাব পৰীক্ষা করিতে সাহস করিতেন না, তাহা ঠিক কি না সে বিষয়ে

সম্মত করিতে সাহস করিতেন না, কোন তর্ক না করিয়া বাহা পাইতেন লইতেন, এবং

তাঁহাব স্বাপনাব সম্পত্তি পুস্তক-হইতে তাঁহার-প্রকাশক কত লইত, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে

ভীত হইতেন। আবার প্রকাশক সেই পুস্তক নিজ সম্পত্তি বলিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করিলেও

কিন্তু বলিতেন না। অতীত এবং বর্তমানের-সাহিত্য-সম্বন্ধীয় এই সকল কঠোর সত্য-ভবি-

ষ্যতে থাকিবে না।

বাহারী অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমান সময়ের অবস্থা বুঝেন, তাহার জ্ঞানের সাহিত্য-ব্যবসায় কেন ঘৃণিত। কাব্য সাহিত্য দ্বিধা, অসহায়-এবং পৰমুখাপেক্ষী, কাজেই একপাশ ব্যবসায়ের উপর মানবজাতির যুগ-স্বভাবতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

সাহিত্যের এই পদমুখাপেক্ষিতাব কাব্য কি? প্রকাশকের হস্তে সাহিত্যের সম্পূর্ণ নন্দনান্তর-ভাব-ধাকাতাই হইবার উৎপত্তি। প্রকাশকগণ নিতান্ত গোপনীয়-ভায়ে সাহিত্য-ব্যবসায় চালাইত, পুস্তকে কত বসন্ত পড়িয়াছে, গ্রন্থরূপ-কত পাইলেন, বিজ্ঞাপনপ্রচারে কত ব্যয় হইয়াছে, তাহার পুস্তকবিক্রেতাগণকে জানিতে দিত না। তাহার প্রত্যেক অধ্যক্ষ, জীবনকে চিত্রিত করিত—তাঁহাকে সস্তুষ্ট করাই দায়, মুদ্রাকর, কণিকাগুণজা, দণ্ডবী, নকলেই অর্থলোভু, সকলেই অর্থের তৃষ্ণা-নিবৃত্ত করা অসম্ভব। এতোক পুস্তকপ্রকাশই

ভয়ানক সুখের কাজ, আব তাহাতে ক্ষতি ত নিশ্চিত। তাহার প্রকাশকের
বাংকে পুস্তকের ব্যয় এবং মোকাদি দর জানিতে দিত না, তাহাদের
অভ্যুত্থান।

কথা পুস্তকবিক্রেতা-অসাধারণ-লোভী, পুস্তকের ব্যয় অসামান্য, সুখি ভবানক, আব প্রকাশকের ব্যবসায় বিপদের ত অন্তই নাই। বাহারী জীবিকার জন্য কেবলমাত্র সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতেন, দুই এক জন ঔপাচারিক ব্যতীত তাহাদের জীবন সাধারণতঃ অর্থভাবমাতন নিপীড়িত। এক সময় থাকারেরও কষ্ট ছিল, লে-হট-কি চিবদরিজ। কে কোন প্রতিষ্ঠানালী যুবকে একপাশ ব্যবসায় অবলম্বন কবিত্তে পদাৰ্পণ দান করিবে? কিন্তু এই অদূরদর্শিতা ও অসততার ফল প্রকাশকগণকে ভোগ কবিত্তে হইয়াছিল। অতিবিক্রম লাভের আশায় তাহার স্বর্ণভিষ প্রসবকারিণী মারালীকে মাঝি-বান উদ্যোগ করিয়াছিল। কিছু দিন বোধ হইল, যেন আর স্বর্ণভিষ প্রাপ্ত হইবে না। বর্তমান-সময়ে ইংরাজি সাহিত্যের পুনরুত্থানের কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, কতকটা পুস্তকের অধিক আদর হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, নতুন নতুন প্রকাশকের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে; তৃতীয়তঃ, প্রকাশকেরা একটু বুঝিয়াছে যে, সর্বব্যগ্রাস চলিবে না, চতুর্থতঃ, লেখকগণ উৎসাহবশতঃ হইয়াছেন, দলবদ্ধ ও অমুসন্ধানপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন।

অবস্থা-এবনও-শোচনীয়, তবে পূর্বাপেক্ষা কতকটা ভাঙা। ভবিষ্যতের সাহিত্যের লোক-বাধীন। তাহার সময়ের পূর্বেই পুস্তকপ্রস্তুতকরণ নতুন এবং উন্নততর ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। তাহাতে সাধারণের প্রভাব অধিক, ভাল পুস্তক লেখকের লেখকের সম্পত্তি। লেখকের বাধীনতার সহিত অস্বাভাবিক পরিবর্তন

প্রচলিত হইবে। প্রকাশকের ব্যবসায় দুই বা তিন-বৎসর ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথমতঃ, পাইকারী ব্যবসায়ীর মত বড় প্রকাশক থাকিবেন, তিনি ব্যবসায়ের প্রধান। তিনি এনসাইক্লোপিডিয়া, অভিধান, মানচিত্র, সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন। তাহার মূলধন অগাধ, তিনি অর্থ দিয়া প্রতিষ্ঠান লেখক-গণকে কার্যে নিযুক্ত করিবেন—তাহাতে তাহাদের কোন অপমান থাকিবে না। তাহার পণ এবং কার-মত সাধারণ প্রকাশকের দল থাকিবেন, তখন তাহার মনঃ, তাহাদের আশা, কোন লেখকের প্রথম-ভাল-পুস্তকখানি প্রকাশ করা। প্রথম পুস্তক প্রকাশই তাঁহার কেরণ-মাত্র আশা; কাব্য লেখক যখন হইলেই তিনি তৃতীয়শ্রেণীর প্রকাশকের নিকট যাই-বেন। এই তৃতীয়শ্রেণীর প্রকাশকগণ প্রত্যেকের হইয়া প্রত্যেকের পুস্তক প্রস্তুত করিবে।

মূল্য আদায় করিবেন; পুস্তকখানি ছাপাইয়া তাহাকে দেওয়া হইবে, তিনি প্রত্যেক বিক্রীত পুস্তকে নির্দিষ্ট কিছু পাইবেন, এবং অল্প কোন প্রকার প্রকাশের ভাব হইতে পারিবেন না। যদি তিনি জন ছবেক প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকের পুস্তক প্রাপ্ত করেন,

তবে তাঁহার বেশ চলিয়া বাইবে। ভবিষ্যতে পুস্তক দুই একত্রের এক গ্রন্থ হইবে—হং-অত্যন্ত নুমান, নূর অত্যন্ত সম্ভা। তখন লোকে বুঝিবে যে, যে পুস্তক কিনিবাব ও রাখিবার উদ্দেশ্যে, সে পুস্তকের ছাপান বাঁধান প্রভৃতি বড়ই ভাল চষ্টক না কেন, আরও ভাল আবগার। ভবিষ্যতে পুস্তকে কি রূপের শিল্পকার্য্য, কি বিচিত্র বাঁধাই, কি মনোরম মুদ্রণ আবগার হইবে, তাহা আশা—এখনও ভাবি নাই। আর প্রত্যেক প্রতিভাবান লেখকের এত্রেব একটা সাহিত্যসংস্কার থাকিবে। সে সংস্কারের কাগজ এবং বাঁধাই ভাল—তখন বৈ-বাণি রাশি পুস্তকালয় হইবে—তাহাদের স্তম্ভ ঐ সংস্কার। আবার সর্বসাধারণের জন্য সুলভ সংস্কার থাকিবে। কিস্তির Westward Ho! বই কথাই ধরা যাইক, এখন পুস্তক প্রকাশিত হইলে একটা ভাল সংস্কার হইবে—মূল্য ৫ পিনিং, তাহা পুস্তকালয়ের স্তম্ভ। আবার ভাল ছাপা বাঁধা ২ বা ৩।০ পিনিং দামেব আর একটা সংস্কার থাকিবে—পাঠক ইচ্ছা করিলে বাঁধিয়া লইবেন। এখন পুস্তকখানা Classic হইবে, তখন উল্লিখিত প্রধান প্রকাশক তৎ-সময়ের প্রধান চিত্রকরণ কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত একটা সচিত্র সংস্কার বাহির করিবেন—মূল্য ১ পিনিং।

এখন সাহিত্যব্যবসারের কথা বলা যাইক। এখন ইংলি কল কাবখানা সহজীকৃত ও উন্নীত হইবে, এখন এই সকল পরিবর্তন সংঘটিত হইবে, তখন ইহা যে কেবল মহৎ এবং সাহিত্যব্যবসার। সম্মানিত ব্যবসাকে পরিণত হইবে, তাহা নহে, ইহা মহৎ, সম্মানিততম ব্যবসায় হইবে। এ ব্যবসায় প্রধান কারণ হইবে, প্রত্যেক পিতাই সন্তানকে এই ব্যবসায়ের স্তম্ভ শিক্ষা দিতে চাহিবেন। অল্প সকল ব্যবসায় জান-ইহা পড়িবে, তুলনায় জান নহে, যথার্থই জান হইয়া পড়িবে। কেবল সাহিত্যব্যবসায় দিলে দিনে অধিকতর উচ্ছল হইয়া উঠিবে।

এ বিষয় ভাল কবিতা বুঝান যাইক। কথাটা সহজে বিবাস হব না। লেখক লগুন কি ঘটতিছে, তাহাই বলিবেন এবং সেই সকলের অর্থ বুঝাইবেন। প্রতিবর্তনের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, মহাপরিবর্তন সংঘটিত হইবে, সন্দেহ নাই। তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই জীবনধারণ কষ্টকর ব্যাপার হইয়া পড়িবে।

এই পরিবর্তন তাহাদেরও অজান্তে উচ্চাশা প্রণোদিত প্রমজীবী বালকদিগের দ্বারা সাধিত হইবে বলিয়া বোধ হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ। এখন প্রত্যেক বড় সহরে প্রম-জীবী বালকগণ অল্পকোর্ড বা কেবিলেরই মত শিক্ষা লাভ করিতে পাবে। Polytechnics এ তাহারা পণ্ডিত নুতন ভাষা, বিজ্ঞান, শিল্প, বাহা ইচ্ছা, শিক্ষা করিতে পাবে। সেখানে বিষয়বিদ্যা-লগের হৃদয়, ব্যক্তিগণ কর্তৃক শিক্ষাদান হইয়া থাকে। বালকগণ ইচ্ছা পূর্বক শিক্ষা করে, তাহাদের শিক্ষার ইটন বা হারো-শিক্ষার অবসায় নাই। তাহারা পুস্তক হইতে শিক্ষা বাহিব কবিতা নয়। তাহারা এ সকল শিক্ষা করে কেন? শিক্ষার উৎসাহে বা শিক্ষার প্রতিবে কি তাহারা বজরীর পর বজরী অধ্যয়নরূপে অতিবাহিত করে? তাহা নহে। তাহারা আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্যই শ্রম করে। হয় ত কর্মে নিরত থাকিবার সময় তাহারা তাহা ভালবাসে, নহিলে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে না। কোন বিষয় ভাল না বাসিলে কোন যুবক তাহা আরম্ভ করিতে পারে না। কিন্তু এই পরিবর্তনের মূল কারণ আপনাদিগের উন্নতিসাধনহেতু। Polytechnics হইতে বাহির হইয়া তাহাদের কি কি পথ উন্মুক্ত থাকে? বাহারা ছাত্র পড়িহতে পারে, তাহাদের স্তম্ভ শিক্ষকতাকার্য্য, বিবিধ কেরাণী-গিরী এবং সংবাদপত্রের রচনা, এই তিন ব্যবসায়ই মুক্ত ছিল। বর্তমান সময়ে কেরাণীগিরী ব আর তেমন আকর্ষণ নাই। দশ সহস্রেরও অধিক কেরাণী কর্মচারী হইবা লগনের বাস্তব

দ্রাস্তার ঘুরিয়া বেড়ায়, কেমন করিয়া যে তাহাদের দিনাতিপাত হয়, তাহা একটা প্রজ্ঞাত রহস্য। কিছু দিন পূর্বে কেবাঙ্গিগিরীৰ কার্যে বড়ই একটা প্রারম্ভ আনিয়াছিল—এবং শ্রোত মন্দ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল সংবাদপত্রসেবা (Journalism) আছে। বর্তমান জনের সংবাদপত্র-সেবকেরা জ্ঞানাদিক্য একটা সময়েই বিশেষ ফল না চিহ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসিয়া অনেক চতুর যুবক সংবাদপত্রসেবক হইয়া দাঁড়াই। কেহ কেহ আদালতে বা প্রাঙ্গণক্ষেত্রে উন্নতিলাভের চেষ্টা করে ও তৎকালে জীবিকার জন্য সংবাদপত্রসেবার ব্যাপৃত হয়। বর্তমান সময়ের কৃষ জন-খ্যাতনামা রাজনৈতিক প্রথমে সংবাদপত্রসেবক ছিলেন। অনেকেই সংবাদপত্রসেবা ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছাই-করা যুবকগণ সম্পাদকীয় প্রধান এবং লিখিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সেগণ অবশ্যে সংখ্যা আধিক নহে, কাজেই তাহাদিগের কতককে তাহা অপেক্ষা নীচ কর্তৃক কবিত্তে হয়—কেহ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কেহ স্বা বর্ণনাপ্রদান, প্রবন্ধ-বচনা করেন। তাহার পর এখন সংবাদপত্র সেবাতত্ত্ব মহিলাগণ-প্রবেশ করিতেছেন; তাহারা আপনাদিগের কর্তৃক-ছাড়িয়া-সমস্ত সময় অধ্যক্ষে পায়চারি করিতে আসেন। শুনা যায়, তাহারা যে ব্যবসায়ে গমন করেন, সেই ব্যবসায়েই সাহিনা কমািয়া দিয়া থাকেন*। শেষকালে Polytechnics এবং যুবকগণ আছে তাহারা চতুর, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, কিন্তু বিদ্বান নহে। তাহারা রেখাক্ষর লিখিতে পারে, কর্তৃক-কবিত্তে ব্যাও স্থানে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছুক, এবং অল্প বেতন গ্রহণ করিতে সম্মত। সংবাদপত্রসেবার ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তাহারা সর্বদাই ঐ কার্যে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহারা আধিক বেতন পাইবে। তাহার পর ক্রমে কার্য সংস্থান পত্র সেবা। শাওরা-হুফ-ইইয়া উঠিবে। সংবাদপত্র এখন যেমন আছে, তেমনই রহিবে বা আরও ভাল হইবে। এই কথা বুদ্ধি-অস্তান্ত ব্যবসায়ের কথা বিবেচনা কর। সকলেই সংবাদপত্রব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু ইংলণ্ডে এক জন যুবকের পক্ষে ডাক্তার, সলিসিটর বা ধর্মযাজক হইতে হইলে এক শত পাউণ্ডের অয়োজন। মারিটোর-হইতে হইলে দুই শত পাউণ্ডের অয়োজন। ব্যবসায়ের দ্বারে দ্বারান বলিবে, এক শত পাউণ্ড দাঁড়, তবে মধ্যে যাইতে দিব।

জীবনসংগ্রাম-যতই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া দাঁড়াইবে, ততই যুবকগণের নিকট এই-দ্বারবানের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। লেখকের বিশ্বাস যে, এক দিন তাহারা তাহাকে দূর-করিয়া দিবে। তাহারা এই অর্থেই পরিবর্তে পরীক্ষা চাহিবে, এবং প্রাবেশিক-প্রশ্ন না দিয়া ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে চাহিবে। তাহার পর অন্তর্গত আইন ব্যবসায়ের স্তম্ভ সকল ব্যবসায়ে ভীষণ ভিড় হইবে; ভিড় ভূর্ষে সকলের আর কম হইবে, ব্যবসায়ের কায়দা আর থাকিবে না, সলিসিটরও ক্রমেই কম অর্থে কাজ করিতে আরম্ভ করিবে; যে সকল ব্যারিষ্টার মোকদ্দমায় পাঁচ শিলিং লইত, তাহারা পাঁচ শিলিং মাত্র লইয়া কার্য করিবে; হয় গেলে তখন এক জন ডাক্তার পাওয়া যাইবে, মারিটোর এবং পর মুখাপেক্ষিতার জন্য তখন এই সর্বল ব্যবসায়-দুগ্ধিত হইবে। কিন্তু সাহিত্যের এ হুর্গতি হইবে না।

এখন যে সকল পুস্তক পাঁচ শিলিং দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তখন সে সকল এক শিলিং মাত্র পাওয়া যাইবে, কিন্তু এখন যত-লোক পুস্তক ক্রয় করে, তখন তাহার পক্ষাণ্ড গুণ লোক পুস্তক ক্রয় কবিত্তে শিখিবে। বর্তমান সময়ে এক জন গ্রন্থকার বৎ-পাঠক প্রাপ্ত করেন, এক শত বৎসর পরে একজন গ্রন্থকার যে তাহার কৃত-গুণ অধিক-পাঠক প্রাপ্ত হইবেন, তাহা

নির্ণয় করাই হুজুর। প্রতিযোগিতায় অন্ত্যস্ত ব্যবসায়ের যে ক্ষতি হইবে, সাহিত্যব্যবসায়ের তাহা হইবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে শত শত নরনারীর আগমন হইলেও, বাহারা তথায় অবস্থিতি করিবেন, তাহাদিগের কোন ক্ষতি হইবে না। কাবণ, প্রতিভাবান লেখকদিগের হানাতাবেব সম্ভাবনা নাই। যিনি সাধারণের নবোদগমন করিতে পারিবেন, তিনিই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন। কাজেই বর্তমানেই চেষ্টা করুন না কেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি জানে বাব না। কারণ, সাহস, শিক্ষা বা সংগ্রাম কোন পুরুষ বা মহিলাকে সাধারণের নবোদগমক বা অন্যপ্রিয় লেখক হইবার উপযুক্ত করে না।

কবল উপায়ে নহে, সাহিত্যের সকল বিভাগেই দুই দল-জয়প্রিয় লেখক দৃষ্ট হইবেন। কোনকদিগের মধ্যে, স্থানীয় এবং সর্বদেশীয়, এই দুই তাগ থাকিবেই। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতবর্ষ প্রভৃতির সর্বপ্রকার বিশেষ স্থানীয় সাহিত্য থাকিবে।

সকল স্থানের স্তম্ভ বিশেষ স্থানীয় সাহিত্য আবশ্যক হইবে, স্থলপাঠ্য পুস্তক, ইতিহাস, প্রবন্ধ, ধর্মগ্রন্থ, উপস্থান, সকল স্থানেই, এ সকলের এক পুস্তক স্থানীয় সাহিত্য রাখিতে হইবে। তাহা ভিন্ন প্রত্যেক পুরুষে দুই বা তিন জন করিয়া লেখক বা লেখিকা সমগ্র ইংরাজীভাষী জনগণের জন্য পুস্তক রচনা করিবেন। এই অঙ্গসংগ্রহ লেখকই অত্যন্ত সম্মানিত হইবেন। বর্তমান সময়েই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যের অধিকাংশ স্থানীয় আটলান্টিক মহাসাগরের অপরপারস্থ মানবগণের মনোরঞ্জক, তাহাতে বড় কিছু নাই; আবার লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমেরিকানগণ ইংলেণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকে প্রকৃত স্থানীয় ভাব দেখে।

ভবিষ্যতে সাহিত্য সম্মানিত হইবে, কারণ, তখন তাহাতে যশ, অপরিমিত প্রশংসা এবং কৃপণেরও বন্ধের লাগোচর ধনরাশি উপাধিযুক্ত হইবে। তখন সাহিত্যে কতকাঁথাতা প্রভূত মনোভেদ দার উপস্থিত করিবে। তখন সাহিত্যে অপরিমাণ ধনলাভ হইবে, ইংলেণ্ডের মন্যগণের দেশে মদের কাঁথানা বা রৌপ্যের খনিতেও তত ধনলাভ হইবে না। সাহিত্যের পথে এই প্রভূত ধনলাভ ভাল কি মন্দ, লেখক তাহা বলিতে চাহেন না; তিনি কে বাহা ঘটিবে, তাহাই বলিতেছেন। সাহিত্যে সাফল্যের জন্য লেখকের স্বাধীনতা নিত প্রয়োজনীয়। কত পুস্তক বিক্রয়ে কত লাভের সম্ভাবনা তাহা ঘেঁষাইয়া লেখক বলিতেছে যে, বর্তমান সময়ে লোকে যেরূপ আগ্রহের সহিত এক পেনি মূল্যের সংবাদপত্র ক্রয় করে, তদ্বিধাতে নোকে তাহা অপেক্ষা অধিক আগ্রহের সহিত খ্যাতনামা-লেখকগণের গ্রন্থ ক্রয় করিবে। লোকে সহজেই মনে করিতে পারে যে, অর্থোপার্জন্যের উপায় এইরূপ অগম হইলে লেখকগণ তাড়াতাড়ি কবিয়া, ভালরূপ চিন্তা না করিয়া, বাহা হয় লিখিতে আনত করিবেন, আমলে কিন্তু তাহা নহে। কাবণ, এইরূপে সফলকাম হইবার জন্য গ্রন্থকারগণ হুচিস্তিত ও স্থলিখিত পুস্তকনাম প্রকাশ করিবেন। অধিক প্রশংসার ন্যায় অধিক লাভ ও উচ্চমনোবৃত্তি উদ্বেজিত করে। প্রত্যেক পুস্তকের জন্য লেখক অধিক এবং আকর্ষণীয় কার্য করিবেন; নায়েঞ্জার বিপুল স্মারিতাশিষ্ট যশ যখন লেখকের পদপ্রান্তে পতিত হইলে, প্রত্যেক দেশে এবং সাগরের উপর দিয়া যখন পবন তাহার মনোগীতি বাহিত হইবে, তখন তিনি পুস্তক-বচনায় নিশ্চয়ই অধিকতর যত্নশীল হইবেন, সন্দেহ নাই। শিষ্টতম মনীষীর সাধুই যে মনোগীতির সাধুরী নিকট কিছুই নহে। তখন লেখক তাহার সেই খ্যাতির উপযোগী হইবার জন্য এবং সেই খ্যাতিরক্ষার জন্য নিশ্চয়ই অধিক চেষ্টিত হইবেন।

এইখানে যাব ওয়াটারের স্বপ্ন শেষ হইয়াছে। তিনি অতি উজ্জলবর্ণে ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে ভবিষ্যৎ দৃশ্যবস্তুর নৈজিক বর্ণনায় দিকে চাইয়া আছে, আর এই

বহুদূর সেই ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ব্যথিত বিবাহান্তের ব্যাকুল দীর্ঘ নিখাস পরিভ্যাগ কবিত্তে ।

সাহিত্যসেবকের দারিদ্র্য সর্বদেশে এসিদ্ধ । অন্যদেশেও মধুসূদনের জন্য পোষণীতিতে হেগচন্দ্র বলিয়াছেন:—

‘হায় মা ভাবতী,

চিরদিন তোমার

কেন এ কুখ্যাতি হবে ?

যে জন সেবিবে,

ও পদস্থগল

সেই সে দবিত্ত হবে ।’

তবে সার ওয়াস্টার ভবিষ্যতের সাহিত্যসেবকের যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ব্রিত্ত হতাশ সাহিত্যসেবকের আশাবিত্ত করিবে, সন্দেহ নাই ।

তবে এই যে লেখকের রূপ, ইহা ইংলণ্ডে বলিয়াই সম্ভব । অন্যদেশে সাহিত্যের যে জন তাহাতে একপঞ্চমও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ।

বিবিধ ।

ভারতমহিলা ।

গত ঐক্লান্ত সালের সাহিত্যে আমরা ভারতমহিলাদিগের সম্বন্ধে একজন বিদেশবাসিনীর মতের সারসংগ্রহ করিয়া দিয়াছি । এবার তাহািগের সম্বন্ধে আর একজন বিদেশিনী মতের সারসংগ্রহ করিয়া দিচ্ছি ।

“কুইন” পণ্ডে এইমতী আর্নেস্ট হার্ট যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাই এ ক্ষেত্রে আমাদের বসলধন ।

ব্রজবিহারিণী হরিণীর মত অবাধ মুক্ত স্বাধীনতার মধ্যে অবস্থান করিবা ইংরাজমহিলা । এখনিই এ দেশের মহিলাদিগের অবরোধপ্রণালীর উপর পতিত হয় । লেখিকা বলেন যে,

ইংলণ্ডের লোকের বিশ্বাস এই যে, ভাবতবন্দীদিগের অবরোধপ্রণালী বড়ই কঠোর, ভাষ্য মহিলাদিগকে অবশুষ্ঠনমুক্তা এবং আগনার উপযুক্ত কর্মকরণে প্ররোচিত দেখিতে পাওয়া কতকটা অসম্ভব । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ।

ভারতে বন্দীদিগের দশ ভাগের নয় ভাগ পুরুষেরই—মত স্বাধীন—তাহারা মুক্তাবশুষ্ঠনে একাকিনী গর্ভে বাহির হইবা থাকেন, এবং অন্তান্ত দেশের স্ত্রীরা এখানেও তাহারা অনুশীলা । এক জন বক্তার মতে, দশ ভাগের এক ভাগ অবরোধবাসিনী বলাও সত্যকথা; তিনি বলেন, ভারতমহিলাদিগের শতকরা চারিজনমাত্র অবরোধবন্দী । কেবল তাহাবাই পদাধি

আবরণান্তরালে, পল্লবের নিষ্কল্লারায় অবরণান্তরালে কুহমের মত, পতি পুত্র ভিন্ন অস্ত্রের পাপদুষ্টির অদোচরে থাকিয়া বায়ুরী ও সৌন্দর্য বিস্তার করিয়া থাকেন ।

লেখিকা ইংরাজশাসিত ও বৈদেশশাসিত ভারতবর্ষে মহিলাদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন । তিনি বলেন যে, সর্বত্রই মহিলাদিগের অবস্থা—বাসিনীর মানসিক এবং নৈতিক অবস্থা ।

অবস্থার উপর নির্ভর করে । একটি মুসলমানশাসিত রাজ্যে একজন বন্দী, স্বকল্যাণালিনী বন্দীর সহিত সাক্ষাতের কথা তাহাবি বিশেষ মনে আছে । যে কক্ষে লেখিকা তাহাব সঙ্গী বসিয়াছিলেন, সে পুষ্ক-হবি, কটোগ্রাক প্রভৃতি দ্বারা ইংরাজের যবের মত সজ্জিত । সেখানে ইংবা দ্বি ক্যাননে চা-দেওয়া

হইয়াছিল। গৃহকর্তা প্রাচ্যদেশের বেশে সাদী পরিধাছিলেন এবং বহুমূল্য হীরকাদি পরিবার লজ্জা তাঁহাব কর্ণে ছিন্ন ছিল; কিন্তু তিনি হুন্দর ইংরাজী বলিতে পাবেন—তাঁহার উচ্চাঙ্গেরে সাংসারমাত্র টান লব্ধ হইয়াছিল। লেখিকা তাঁহাকে কতকগুলি ছবি দেখাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন—তিনি মনোযোগের সহিত সমস্ত ভ্রমণ কবিতা শেষে বলিলেন, “এ সকল দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে।” লেখিকাব সঙ্গী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং সেই নিমন্ত্রণসমাগমে পুষ্কর-সংস্পর্শও থাকিবে না, বলেন; তদাশি—সেই পিঞ্জবাবছা বিহঙ্গিনী-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই—তাহা তাঁহার স্বভাবের অভিপ্রেত নহে। তাঁহাব স্বামী শিক্ষিত এবং তিনি ইংরাজসমাজে মিশিয়া থাকেন; পক্ষীর এই নিমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁহার কোনও আপত্তিই ছিল না—কেবল পিতার অমত বলিয়া তিনি কিছু করিতে পারিলেন না—এ বাটীর একটি বালিকা একদিন গৃহসংলগ্ন উদ্যানে খেলা করিতেছিল, রাজ্যের বড় কর্তা স্বাদশবর্ষীয়া বালিকাব এই অসাধারণ স্বাধীনতা দেখিয়া ভীত (।) হইয়া পড়েন ও তাহাকে পদাশ্রয় করিবার আদেশ প্রদান করেন। অল্প বয়সেই (প্রায় ৭ বৎসর হইতেই) বালিকাদিগকে অববোধবস্ত্রিনী করা হয়—তাঁহাব অববোধে-অত্যন্ত হইয়া গড়ে।

ভারতবর্ষে যে বহুবিবাহ বিশেষ প্রচলিত, এ বিখ্যাত জগদ্বাসক; হিন্দু না মুসলমান, কাহারও মধ্যে ইহা বিশেষ প্রচলিত নহে। কেবল বড়লোক ও রাজা মহারাজারাই বহুপত্নীয় সম্মান-বর্জক বলিবা মনে করেন। কিন্তু যে কোন ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত পুষ্করগণ এক বিবাহেই সন্তুষ্ট, এবং যদি কেহ স্ত্রী বর্তমানে আবার

বিবাহ করে, তবে তাহাকে যথেষ্ট উপহাস সহ্য করিতে হয়।

লেখিকা কোন মুসলমানরাজ্যে বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার লজ্জা নবাবের অববোধে গমদ-প্রিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—নে আটটার সময় তাঁহাদিগকে লইয়া ঘাইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার সন্ত গাড়ী ও একদল সৈন্য নবাবসম্মিলে। আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সুবহু প্রাচীরমধ্যস্থিত একটি ঘর।

তাঁহার জীহীন উপবনমধ্যে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে প্রাচীন পাব হইবা কত শুভ্রশ্রেণী অতিক্রম করিবা, কত অপবিকাষ পথ দিয়া, শেষে তাঁহার অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। একটা উচ্চ এবং বৃহৎ কক্ষে তাঁহার উপস্থিত হইলেন—তাঁহার তিন দিক প্রাচীরবদ্ধ, কেবল এক দিকে বারান্দার মত খোলা। আগতাদিগের লজ্জা চেয়ার আনিবা দেওয়া হইল—সে কক্ষে হস্তান্তর-আচ্ছাদনকাষী শ্যাটিং ভিন্ন অল্প কোন আসবাবই নাই। কত যুবতী, কত বৃদ্ধা খাতারাত করিতে লাগিল, বেগমের আগমনাপেক্ষাব ইহারা বসিয়া বহিলেন। রত্নগণের নিকলনবই বেশ উজ্জলবর্ণ শাটিন বা বুটিনার কাপড়ের প্যাটালুন ও উপবে বক্ষের নিম্ন পর্যন্ত-শাটো বড়িসে ঢাকা। প্যাটালুনগুলি উপবে ঢিলা; কিন্তু আত্ম নিয় হইতে এতই আটো যে, পরিবাস পর-সেলাই করিতে হয়; স্থানের লজ্জা নগ্নাহে এক বার কবিবা সেলাই খুলিবা প্যাটালুন খুলিতে হয় (।।) তাঁহাব পূর্ব দেহ বেটন করিয়া অল্প মস্তকের উপর দিয়া মসলিন-অথবা বেশমের শাটী ঘুরিবা আসিয়াছে—তাহা হুন্দর তাঁজে—তাঁজে আসিবা পড়িয়াছে। বেগমের আসিতে বিলম্ব হইতে-লাগিল; শুনা-গেল, তিনি অতিবিশিষ্টক-নন্দানিত কবিবাব লজ্জা অলঙ্কারমণ্ডিতা হইতেছেন। কিছুকাল-পরেই কুদ্রকর্তা যুবতী বেগম আসিলেন। তাঁহার-পদধানে সবুজ রঙের পাজামা ও জরীর শাটী। তাঁহার অনাবৃত পদে মবকত ও হীরাব অলঙ্কার—মূল্য নাকি ৪০,০০০; প্রকোষ্ঠে হীরকখচিত নানা অলঙ্কার,—অঙ্গুলিতে হীরক ও চুনি বসান অঙ্গুরী, পদদেশে মুক্তাহার, আদ্র উজ্জল হীরক দিয়া হুই কর্ণে আদ্র অলঙ্কার চুলের উপর দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহাতে-নৃত্য, ইন্দক ও

পদ্মবাগ মণি শোভা পাইতেছে। অলঙ্কার পরিবারে অল্প তিনি কর্ণের নানা স্থানে ছিদ্র
করিয়াছেন; এবং তাহার নাসিকান্তেও একখানি হীবক খলিতেছে। এই ক্ষুদ্র হীবকান্তরণ
তুবিজা-বেগম-ইংরাজী বলিতে পারেন না, কাজেই অতিথিরা তাহার অলঙ্কারের প্রশংসা
করিবার পরই কথারাজ্য শেষ হইয়া গেল। বেগমের ক্ষুদ্র শিশুকে আনা হইল। তাহার
বেশ রঙ্গিন বেশমেব, তাহার কেশদীন মস্তকে একটা জরীর কাজ করা টুপিন নবাব
আসিয়া উল্লিখিত হইলে, বেশিকার অমরসমক্ষে নানা কথা হইল। এতদপাশে পদ্মবাগ
অববোধে থাকিতেই বাধ্য; পদ্মবাগ কপাটার একটু কৈফিয়ৎ দিতে হয়—বেগমই নবাবের
একমাত্র পত্নী নহেন, প্রথম-বেগমের বিবাহেব পূর্ব-দিবস ইহার বিবাহ হইয়াছিল। একগ
অন্যভাবেব নৈতিকজন্য এটি লেখিকা এক বাব ঘূর্ণাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

পদ্মাব অন্তবালে থাকিলেও পতি ও পুত্রের উপর হিন্দু ও মুসলমান ব্রহ্মীগণের
প্রভাব প্রায় সুস্থ। বরং স্বাধীন নানাব্যবস্থা-পাপুতা ব্রহ্মীগণের অপেক্ষা তাহাদের প্রভাব
অধিক, কারণ তাহাদিগের মনোযোগ সেই সকল ভালবাসার পাঠেই
প্রতিষ্ঠিত। গৃহের কর্তব্যশাসন অবহেলা করিতে প্রায় কেহই
সহিস্ কবে না।

যে সকল মহিলা অববোধে থাকিতে বাধ্য নহেন, তাহাদিগের অন্তরে লেখিকা প্রথমে
ব্রাহ্ম মহিলাগণের কথা প্রাতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশে নিত্যন্ত পরিচিত; লেখিক
সাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলেন যে, বর্তমান শতাব্দীর
প্রথমভাগে বামমোহন রায় কর্তৃক এই সমাজ সংস্থাপিত হয়। বামমোহন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ
ছিলেন—তাহার পিতা বৈষ্ণব ছিলেন—রায়মোহন পারস্য, আরবী ও সংস্কৃত ভাষা জানি-
তেন। রায় রমেন সিংহ প্রভৃতি করিয়া বুদ্ধিরাছিলেন যে, পৌত্তলিকতা বেদের অন্তর্ভুক্ত
নহে। তিনি তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এই বিশ্বাস
কিন্তু তাহার পর বোধে ও ধর্মের দৃষ্টিতে তাহার এই বিশ্বাস
কিন্তু তাহার পর বোধে ও ধর্মের দৃষ্টিতে তাহার এই বিশ্বাস

ব্রাহ্মসমাজ। প্রথম করিতে স্বীকৃত করেন নাই। ২৮০ খৃষ্টাব্দে একেবৎসার-ভিত্তি
করিয়া সমাজ সংস্থাপিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বামমোহনের মৃত্যু
হয়, তাহার পরেই সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাহারই নেতৃত্বাবলি সমাজের নিয়-
নাদি স্থিরীকৃত হয়। সমাজে অবশেষে সময় সভাগণ পৌত্তলিকতা পরিহার করিবার জন্য
অনুত দিবসের উপাসনা করিবার জন্য, পবিত্র জীবন যাপন করিবার জন্য ও পাপ হইতে
দূরে থাকিবার ইচ্ছার জন্য প্রার্থনা করিবার জন্য, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অনুতাপই ক্রমা ও
মুক্তির একমাত্র উপায়; ক্রিষ্টধর্মের মধ্যে সংকার্য, দান, চিন্তা ও তপ্তি; ত্যাগের মধ্যে
স্বার্থত্যাগ; এবং পবিত্র অন্তঃকরণই একমাত্র ধর্মমন্দির। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব
রূপে আবির্ভাব। তিনি প্রতিভাশালী রচিত করেন, ব্রহ্মীগণকে সমাজভুক্ত করেন, এবং
বিবাহের সংস্কার করেন। যখন কেশবচন্দ্র কতকটা হিন্দু মতে স্বীয় অপরিণীতা বয়স কতাব

সহিত চুচবিহারের মহারাজার বিবাহ বিবাহিলেন, তখন সমাজে বড়
অপমান
গতপোষ হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের পাকা সভ্যের সংখ্যা প্রায় ১০০
ও সভ্যবলীদিগের সংখ্যা প্রায় ৫০০। ব্রাহ্ম মহিলাগণ অসংখ্য; অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্য-
গণ ইংবাজি জাতি, এবং কেহ কেহ বিবিবিদ্যালয়ের উপাধিও পাইয়াছেন। গৃহে তাহার
ইংবাজি মহিলাদিগের মত বাস করেন। লেখিকা ও তাহার পানী তাহাদিগের গৃহে
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং লেখিকা আশা করেন যে, মহত্ত্ব ধর্মবিদ্যা ও উচ্চতম সভ্যতা
স্বলপন করিয়া, তাহাদিগের হিন্দু ভগিনীগণের সহিত তাহাদিগের সহানুভূতির বন্ধন ছিন্ন

হইবে না। তাহাও, তাহারাই শেখোক্তদিগের সংস্কারের, শিক্ষার এবং ভারতমহিলাগণের অবস্থা উন্নত কবিবার নেত্রী। কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজগৃহে পর্দা দিয়া ঢাকা আসনের বন্দোবস্ত আছে। যে সকল মহিলা পর্দা পরিহার কবেন নাই, তাহাদিগের জন্য এই বন্দোবস্ত; বাস্তবিক পিতা পুত্রপতির সমস্ত সম্বন্ধ সহসা পর্দা পরিহার করা তাহাদিগের পক্ষে বড় সহজসাধ্য নহে। কিন্তু কেহ কেহ পর্দা পরিহার করেন, অথচ কোন ধর্মসমাজে প্রবেশ করেন না। তাহাদের যত্নপ্রধান ভাব বড়-বিবর্তনজনক। ব্রাহ্মমহিলাদিগের বেশ হুল্লর। আটো বডিস ও নিম্ন-বরণের উপর কোঁচান রেশম বা-সলিনের শাটী—এক ক্ষম্বে উপর তাহা ছুটাইয়া—আনা হয়। গৃহের বাহিরে যাইতে হইলে তাহার টুপী ব্যবহার কবেন, তাহাতে প্রায়ই জরী-কাজ করা। অনেক মহিলা চিকিৎসাবিদ্যা, বাজীবিদ্যা ও শুক্রবাবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ—১৩ জন দেশীয়া মহিলা পাঠ কবিতেছিলেন।

মুসলমান মহিলারা অবরোধবস্ত্রী, কিন্তু তাহারা স্বাধীনতা প্রার্থনা কবিতে আনন্দ কবিতা-ছেন, এবং পুরুষেরা তাহাদিগের জন্য স্বাধীনতা দাবী কবিতেছেন। কোন মুসলমানপ্রধান নগরে একজন শিক্ষিত ক্ষমতাশালী মুসলমান লেখিকাকে বসিয়াছিলেন—দে, স্বাধীনতা ভিন্ন লোকের উন্নতি হইবে না—স্বাধীনতা প্রদান করিতেই হইবে; অবরোধপ্রথাই মুসলমানের পাপ সন্দেহ-বর্তমান। ইনি আগনির দ্বিতা ও ভগিনীকে ভ্রমণ, আবাদে, টেনিস খেলা, অধ্যয়ন-ও ইংরেজিগৃহে গমন কবিতে অনুমতি দিয়াছেন। ইহার পত্নী অবরোধে অপরিহার্য অংশ অধিকার করেন-না, পবস্ত্র গৃহের সর্বোৎকৃষ্ট কক্ষ রক্ষাই তাহার অধিকারে। বোম্বাইতে মুসলমান-মহিলারা অবরোধচ্যাবিগী হইলেও হুশিক্ষিতা, এবং তাহাদিগের কার্যের স্বাধীনতাও অনেকটা আছে। শিক্ষাই স্বাধীনতার সোপান। মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে, শিক্ষার আলোকরশ্মি বড়ই প্রবেশ করিবে; ততই এ দুঃখ দুর্দশার অন্ধকার দূর হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে পার্শ্বের সংস্কার-অঙ্গ হইলেও তাহাদের প্রভাব অল্প নহে। তাহার মননাত্মক সিদ্ধান্ত; আবার সাধুতা, সত্যপ্রিয়তা ও দানশীলতার মজ্ঞও পার্শ্বের প্রসিদ্ধ। পারস্যেই তাহাদিগের আদিম-নিবাস। পবিত্র চিত্তায়, পবিত্র কথায় ও পবিত্র ক্রমাবৃত্তানেই পার্শ্বদিগের

পার্শ্ব সমুদায়। মতে নৈতিক সর্বস্ব-তাহাদিগের দানশীলতার প্রভাবে পার্শ্ব ভিত্তিক দৃষ্ট হয় না। পার্শ্বদিগের মধ্যে মহিলাগণ সম্মানিত-এবং স্বাধীন-

তাহারা হুশিক্ষিত এবং পার্শ্বের মনী পতিগৃহের কর্তা। পার্শ্বের মনীদিগের স্রোত্রে দেখিলেই তাহাদিগকে চিনিতে পাওয়া যায়। সোজা খাটো পোশাকের উপর শাটী ঘুরিয়া স্বর্ষার উপর দিয়া আসে। তাহারা সাধারণতঃ অমুল্যবর্ণের কোমল রেশমের পোশাক পরিধান করেন; শাড়ীর পাড়ে হালকা জরী-কাজ করা। স্ববেশসজ্জিত একদল পার্শ্ব মহিলা কুম্ভকুম্ভমাসম্পদ বাসন্ত কুম্ভকাননের মত মনোরম।

গুরেশিয়ানগণ ভারতবর্ষীয় ও যুরোপীয়ের মিশ্রোৎপন্ন বর্ণসম্পন্ন। তাহার বৃত্তধর্মাবলম্বী এবং যুরোপীয় বেশধারী উভয় জাতির মধ্যে থাকার তাহারা কাহারও সহায়ত্ব পায় না। দেশীয় ভাবজ্ঞান যাহাতে আবদ্ধ হয়, যেখানেই এমন কোন কার্যের ব্যবস্থায়। প্রয়োজন, সেখানেই ব্যবস্থায় আছেন। হীনপাতাল ও ডিসপে-আবাব শুক্রবাবিদ্যা-বিদ্যা এবং হীনপাতালে চিকিৎসকরূপে তাহারা যথেষ্ট কার্য করিতেছেন। লেখিকা বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবস্ত্রী কে কেবল ভারতমহিলাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাধীন, তাহা নহে, জগতে তাহাব মত স্বাধীন বস্ত্রী আব কুড়াপি দৃষ্ট হয় না। *

* ব্রহ্মবস্ত্রীদিগের বিবরণ আগ্রহের সাহিত্যে দ্রষ্টব্য।

জীশিক্ষাবিতারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পক্ষে আর-এক শুভদিনের অরূপোদয় হুচিৎ হইতেছে। ভারতমহিলাগণ ব্রহ্মশাস্ত্রী হইতে আত্মত্যাগ, নম্রতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহারি অন্তরে সাবু ও বর্ষনিষ্ঠ। যখন তাঁহারা জ্ঞানের উপসংহার।

দারিদ্র্য, একক কৰ্ম করিবার ক্ষমতা, এবং বেচ্ছাপসন্দের বাধানতা পাইবেন, তখন অতীতের কঠোর শিক্ষা বিফল হইবে না। পবিত্র উর্বর জমিতে বীজ বপন করিলে যেমন প্রভূত শস্যের আশা করা যায়, সেইরূপ তাহারিগকে এই সকল প্রদান করিলে প্রভূত ফলের আশা করা যায়।

মেক প্রদেশে যাওয়া ।

ক্রিষ্টের মৌর্যপুত্রার বলিয়াছেন- যে, উগ্রাচ, প্রেমিক ও কবি, ইহারা সকলেই কল্পনাময়। কিন্তু কল্পনা কেবল-ইহাদিগের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। অদ্ভুতজিজ্ঞাসু, কঠোরতম সত্যের উপাসক বৈজ্ঞানিকও কল্পনার দাস। বিংশতি বৎসর পূর্ব বাহা কল্পনাজীবীর স্রষ্টামাত্র বলিয়া বোধ হইত, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইতেছে; কল্পনাব্যবহারতা না-পাইলে বিজ্ঞান এত ইচ্ছাকালোব হুচিৎ কবিত্তে পারিত কি ?

সেদিন Geographical Congress-এর অধিবেশনে, সাব-আডিটর বেলুনযোগে হসেক্স স্ট্রাইট-নতলব নামক একটি শব্দ পাঠ করিয়াছেন। আমরা সেই শব্দের সন্নিবেশই করিয়া দিলাম। আডিটর মতে তাহা প্রত্যাব-কেবল-বৈজ্ঞানিকের আসবাব।

কল্পনামাত্র নহে, তাহা-কার্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ সম্ভব। প্রথমতঃ, একটি বৃহৎ বেগুন আবশ্যক; সেই বেগুনে-যাহাতে তিন জন আনোহী, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য বস্ত্রাদি, চার মাসের উপযোগী বায়ুদ্রব্য এবং মেক্সিকোতে পরিণত কবিবাল মত এক বাঁদা নোকা থাকিতে পাবে, তাহা বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বেগুনটি যাহাতে-অন্ততঃ এক মাস কাল বায়ুদ্রব্যের ভাগদান থাকিতে পাবে, তাহার জন্য মধ্যে মধ্যে পার্সি পুবিতে-হইবে। সেই অন্ত প্রথম চাপ দিয়া কিছু গ্যাসও সঙ্গে বাইতে হইবে। মেক প্রদেশে বেগুনে গ্যাস পুবিতে-হইবে। সমুদ্রে তাহাজের মত অনন্তরতঃ মণ্ডলগ্যাপী বায়ুসমুদ্রে সেই বৃহৎ বেগুন ইচ্ছামত ঢালাইবার-বন্দোবস্তও করা চাই। প্রথম দুইটা বিষয় সহজসাধ্য। মেক প্রদেশে বেগুনে গ্যাস পূর্ণ করিবার কথায় লেখক বলেন যে, একটি চলনসই ঘর প্রস্তুত করিয়া তথায় বেগুনে গ্যাস পূর্ণ করিলেই হইবে। বেগুন ঢালাইবার কথায় লেখক বলেন যে, সে কাজটা কিছুমাত্র কঠিন নহে। তিনি আপনি এ বিষয়ের পরীক্ষা কবিত্তা দেখিষাছেন। গত গ্রীষ্ম কালে এই বিষয় পরীক্ষার জন্য বে বেগুনবিহার হইয়াছিল, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে-যে, এ কার্য নিতান্ত সহজ। এ উপায়ও লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত। স্কেনে-পাইল ডুলিবার সুরিণ থাকিলে বায়ুসাগরে, বায়ুতরঙ্গের উপর হোলিগা দুদিয়া বায়ুতাড়নে বেগুন ভাঙা-পাইলে বিজ্ঞানের মহিমা কীর্তন করিতে-কবিত্তে ভাসিয়া যাইবে। পাইল-এক বা ততোধিক লম্বিত রঞ্জের-সাহায্যে বেগুন চালান যাইবে। কাজেই লেখক দেখাইয়াছেন যে, বন্দোবস্ত নবই ঠিক। লেখক ভরসা করেন যে, বেগুনে প্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা এই পাওয়া যাইবে।

মেক প্রদেশের বিষয় অবগত হওয়াই এই যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমেরি যাত্রাপথ-যুগোপ-হইতে যাত্রা কবিবেন। যাত্রাপথ-সিপজাবাজেনের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নবকোরণ ষাঁপপুঞ্জে জুনমাসের মধ্যভাগেই উপস্থিত হইবেন। সেখানে কোন দীর্ঘ

বেলুনে গ্যাস পুরিবার জন্য একটা ঘব প্রস্তুত হইবে। তথায় বেলুনে গ্যাস পুরিবার সকল বন্দোবস্ত টিক করিবার আশা হইবে,—যেহ সুবিধা হইলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অজ্ঞাতেব উদ্দেশ্যে যাত্রা করা বাইতে পারিবে। বেলুনে এমন

জাহাজের চাপান হইবে যে, বেলুন কুজ্বাটিকা বাশিষ উপরে ও মেঘমানার নিম্নে ভাসিয়া যাইতে পারে। বেলুন ঘণ্টার ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিবে। লেণকের বিশ্বাস যে, তিনি ৪৩

ঘণ্টার মধ্যে মেক্সিকোদেশে যাইতে পারিবেন ও উত্তর আমেরিকা অথবা সাইবিরিয়ার মানবের অধিবাসপূর্ণ দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন। জুলাই মাসে এক দিন সুবিধা বুঝিয়া যাত্রা

করা হইবে—উত্তরে বাতাস বহিভেদে দেখিয়া যাত্রা করিতে হইবে; কারণ, ভাল জ্বত বাতাস গাইলে বেলুন শীঘ্রই মেক্সিকোদেশে যাইতে পারিবে। ইংরেজ নৃপতি প্রদেশই সর্বাপেক্ষা অগম্য, সেই প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়াই এই যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—অবশ্য সেই নৃপতি

সম্বন্ধে জ্ঞাত প্রদেশ সকলেরও মীমাংসিত সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা বাইবে। ভৌগোলিক আবিষ্কার ভিন্ন এই প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অনেক আবিষ্কারও হইতে পারে। সঙ্গে স্থান ও সময়ের

নির্দেশক যন্ত্রও লইতে হইবে; গতিনির্ণয়ের জন্য যন্ত্র লইতে হইবে; কণ্টোগ্রাফ তুলিবার যন্ত্রাধি লইতে হইবে—আবও কত কি লইতে হইবে; তাহার তালিকা দেওয়া চলে না।

লেখক বলেন যে, বেলুনযোগে যে কয়েক মেরুপ্রদেশে গমনই সম্ভব; এমন নহে; মেক্সিকোদেশে বেলুনে ভ্রমণেবই বিশেষ উপযোগী। প্রথমতঃ, একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, যে সময়

ভ্রমণ হইবে, সে সময় সূর্য্য সর্বদা চক্রবালে অবস্থিত করে। কাজেই অন্ধকারাবরণমুক্ত দৃশ্য দেখিবার সুবিধা যাত্রীদের জন্যই হইবে; বিচ্ছেদবিহীন সূর্যালোকের আব এক

সুবিধা এই হইবে যে, বায়ুপ্রচলনের ও বেলুনের উত্তাপের সাম্য-রক্ষিত হইবে। বেলুনযোগে মেক্সিকোদেশগমনের আব এক বিশেষ সুবিধা

এই যে, সে প্রদেশ জম্মলতাচ্ছাদিত নহে;—এং তাই উজ্জল মেক্সিকোদেশে বিদ্যুৎসকর সচরাচর হয় না। আবার প্রবলবাতার ভয়ও নাই, কারণ—জুলাই মাসে বাতাস বড়ই বিরল।

কাজেই এই সকল দেখিয়া কেহই অস্বাভাব্য কথিতে পারেন না যে, বহু প্রত্যক্ষীয় অননি অসম্ভব কল্পনা হইবে, একবার যাত্রা বেলুনে ভ্রমণে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ হইবার সম্ভাবনা।

অ্যাডমিরাল মার্কহাম ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলেন যে, কণ্ঠাটা ভাল, কিন্তু বেলুনবিহীন ভ্রমণ-কারিগণ নিজে কি আছে, তাহা টিক বলিতে পারিবেন না; কাজেই যদিও লেখক ইংরেজ

প্রদেশ হইতে ক্রিয়া আইসেন, তথাপি তিনি যে কোথায় গিয়াছিলেন, নতামত। তাহা নিশ্চয় বলা অসম্ভব হইবে।—তাহার পর যদি কোনও দুইটিনাই

ঘটে, তখন কি হইবে?

কেহ কেহ বলেন যে, যেরূপ যদিও মেক্সিকোদেশে যাইতে পারেন, তথাপি তাহার প্রত্যাবর্তন বড়ই সম্বন্ধের বিষয় বলিতে হইবে।

মুসো ব্যারো Revue Scieu tdyigue পক্ষে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি আর অ্যাডমিরাল সতলবের কতকটা সমর্থনই করিয়াছেন।

লেখক জ্ঞানবিস্তারকল্পে যে দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন,—আমরা সর্বতোভাবে কামনা করি, তিনি তাহাতে সফলকাম হউন। আমরা তাহার ভ্রমণের কলাফল জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

উর্বাণীপুত্র 'মহু' রাজার আগ্নিপূজা ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতিহাসলেখকেরা একবারে মনুষ্যসৃষ্টি হইতে ইতিহাস লিখিতে বসিতেন। এই ইতিহাসলেখকেরা 'মানব'-নামক মনুষ্যবংশীয়-ছিলেন, এবং পরম্পরাগত কিম্বদন্তী অনুসারে তাঁহারা আপনাদিগকে 'মহু'-নামক প্রজাপতিব সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু মনুষ্য পুর্বেই সৃষ্ট না বিধিয়ে কিম্বদন্তীও নীরব; হুতরাং ইতিহাসলেখকেরা কেবল কল্পনার আশ্রয় লইয়া মনুষ্য-জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায়, মহুই আদি মানব। ঈশ্বর-মনুষ্যসৃষ্টি করিতে বসিয়া অগ্নে মনুষ্যনামক প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন;—বলা বাহুল্য যে, এই বর্ণনায় আমরা অশ্বদ্রেশের প্রাচীন ইতিহাসের শেষ সীমার পৌছিয়া, এইরূপ গণ্য করিতে হইবে।

প্রজাপতি-মনুষ্য উৎপত্তিবিররণ কাল্পনিক-হইলেও, তিনি নিজে যে এক জন বুদ্ধমানের মনুষ্য-ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে কোনও বাধা দেখা যায় না। বেদে এই প্রজাপতির ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়, এবং প্রাচীন স্বক-রচনাকারী ঋষিদের চক্ষে তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য।

তাহা হইতে যখন একটি বিস্তীর্ণ মনুষ্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সার্বজনীন বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন তাঁহার এককালীন অস্তিত্বই সমধিক সম্ভবপর। অধিকন্তু তাঁহার এক কীর্তি ঋগ্বেদে অতিশয় প্রসিদ্ধ। তিনি বিচাৰ করিয়া সজ্জা-দেবতাদের সংখ্যা ত্রয়জিংশৎ বলিয়া অবধারিত করিয়াছিলেন; এবং এক অগ্নিকেই সেই ত্রয়জিংশতের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মানবসমাজে ইহাই একেবারে প্রথম সূত্রপাত বলিয়া বিবেচনা হয়। অগ্নিতে হোম করিলেই সকল দেবতার পূজা করা হইল, মহু হইতেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে। নম্র বেদ এই বিশ্বাসে-আম্লত। আমাদের আরও বিবেচনা হয়,—'মহু' ইহা প্রজাপতির প্রকৃত নাম নহে, উপাধিমাত্র। তিনি একজন চিন্তাশীল ধর্ম ও সমাজসংস্কারক ছিলেন;—'মহু' শব্দের অর্থই চিন্তাশীল। তাঁহার ধীশক্তির জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহার সমকালীন লোকেরা তাঁহাকে 'মহু' এই প্রাচীন পদবী প্রদান করিয়াছিল। এই নিখিল সংসার যে এক অতি অদ্ভুত ঐশী শক্তি দ্বারা নিয়মিত, মহু ইহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া

আদিন, ১৩০২। উর্বশীপুত্র 'আয়ু' রাজার অগ্নিপূজা। — ৩৮৫

ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে আর্যজাতীয় লোকের মধ্যে অগ্ন্যধি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন-অনুশ্রুতিবাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্চনার দেরতা ছিল। মনু তৎকালীন প্রধান প্রধান দেবতাকে ৩৩ সংখ্যা দিয়া, তাঁহারা যে মূলে একমাত্র ঐশী-শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমাত্র, ইহা ব্যাপন করেন। এবং অধিক এই তত্ত্বমুদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রচলিত অগ্নিপূজাতে এক নতুন ভাবের আরোপ করেন। এই ভাব হইতেই সমগ্র বেদশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে, বলিতে হইবে। আর্যসমাজে প্রজাপতি-মনু এইরূপে প্রচলিত অগ্নিপূজার এক নতুন সংস্কার নাথন করেন। প্রাচীন রোমকেরা এবং প্রাচীন পারসীকেরাও অগ্নিপূজা করিতেন বটে, কিন্তু মনুর অগ্নিপূজা পারসীক ও রোমকদের অগ্নিপূজা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার অগ্নিপূজা হইতে বৈদিক উপাসনাপদ্ধতির জন্ম হইয়াছে।

কিন্তু এই মহামান্য প্রজাপতি-কোন দেশে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। ইতিহাসের আকাশে তিনি একটি ভারী-ভায়,—আমরা তাঁহার জ্যোতিঃ দেখিতেছি; কিন্তু সে জ্যোতিঃ কত দূর হইতে আসিতেছে, তাহা বলিতে পারি না।

কালক্রমে তাঁহার বংশে 'ইলা' নামী এক অসাধারণ মহিলা জন্মগ্রহণ করেন, এবং কিছুকালের জন্য তিনি মনুবংশের শাসনকর্ত্রীস্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইলার পুত্র-পুরুষবা-একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। পুরুষবার বিবরণে আমরা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সময়ে উপস্থিত হইয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। তাঁহার পরে বংশ-পরম্পরায় ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিষ্ঠান নগর তদীয় রাজধানী ছিল। আমরা পূর্বপ্রকাশিত পুরুষবার বিবরণে প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বর্তমান কাবুল নগরেরই প্রাচীন নাম 'প্রতিষ্ঠান'। এবং শুর্য্যবংশের নানাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে পুরুষবা বর্তমান ছিলেন।

গন্ধর্ব্ব বা গান্ধারদেশীয় রীতি অনুসারে, পুরুষবা কিছুকালের জন্য উর্বশী-নামী এক সুন্দরী গান্ধারী রমণীর সহিত বিবাহ-সুত্রে আবদ্ধ হইলেন। সন্তান-উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের পরস্পর পতিপত্নী ভাব থাকিবে, এই নিয়মে তাহাদের বিবাহ হয়। উর্বশী-গর্ভবতী হইয়াই পুরুষবাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান; এবং সন্তান প্রসব করিয়া, পরে শিশুটিকে তদীয় জনকের নিকট প্রেরণ করেন।

উর্কশী ও পুরুষবার সেই পুত্রের নাম আয়ু। পুরুষবার পরলোকান্তে আয়ু
মহুবংশের অধিনায়ক হইয়াছিলেন।—আয়ুর পুত্র নহব; নহবের পুত্র ধ্যাতি।

ধ্যাতির পাঁচ পুত্র;—বজ্র, তুর্কশ, অম্ব, জহা ও পুরু,—প্রত্যেকে এক একট

প্রসিদ্ধ কল্লিমবংশের আদিপুরুষ। ইহার সর্বশেষ “মানব কল্লিম” ছিলেন।

ঋগ্বেদের ভূরি ভূবি স্থানে আয়ুর উল্লেখ দেখা যায়।—আমরা অজ্ঞ তাহার
মধ্যে একটির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কুংস ঋষি বলিতেছেন;

স পূর্বরা নিবিদা কব্যতা-বোঃ

ইমাঃ প্রজা অজ্জনয়ন-মনুনাঃ।—ঋগ্বেদ; ১।২৬।২

সায়ণাচার্য্য ইহার ভাষ্য এইরূপ লিখিয়াছেন;

“স অর্থাৎ পূর্বরা প্রধুররা অগ্নিদেবেভ্য ইত্যাদিক্রমে নিবিদা কব্যতা শুশ্রিষিত্ত্বগাতিবান-
লক্ষণাং ভক্তিং কুবতা আয়োঃ মনোঃ সমন্ধিনা উক্বেধন চ তুরমানঃ সোহরিষ্যম নুনাং সংবৎসিনী-
রিমাঃ প্রজাঃ অজ্জনয়ন উৎপাদয়ৎ। সমুদ্রা শুভঃ সন্ মানবীঃ সর্গাঃ প্রজাঃ অজ্জনয়ন ইত্যর্থঃ।”

অগাধ-বেদবিজ্ঞানসম্পন্ন সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য এ দেশে সর্বিশেষ প্রামাণিক
বলিয়া বিবেচিত; এবং তজ্জপ বিবেচিত হইবার সম্যক কারণও আছে। কিন্তু
সায়ণকে অজ্ঞান বলিয়া ঋগ্বেদপাঠে ব্যাপৃত হইলে অনেক স্থলে ঋগ্বেদের অর্থ
অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। সায়ণভাষ্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও, প্রভাবিত স্থলে

তদীয় ভাষ্য আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনোরম বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ, তিনি
মহু ও আয়ুকে অভিন্ন করিয়াছেন, ভবিষ্যে কোনও প্রমাণ মেন নাই।
দ্বিতীয়তঃ, তিনি ‘উক্বেধন চ’ এই অংশ উচ্চ করিয়াছেন, তাহাও নিশ্চয়োজন
ও কষ্টকরিত বলিয়া বোধ হয়।—আয়ু এক জন ‘মানব’ বা মহুবংশীয় ব্যক্তি
ছিলেন। যদি ভাষ্যে ‘মহু’ শব্দে মহুবংশীয় বরা যায়, তাহা হইলে সোল নাই;

কিন্তু ভাষ্যের বোধ হয় তজ্জপ অর্থ নয়।

সায়ণভাষ্য অপেক্ষা এই ঋকের আরও এক অতি প্রাচীন ব্যাখ্যা ঋগ্বেদের
ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পঞ্জিকার ত্রয়জ্বিংশ কাণ্ডিকার দৃষ্ট হয়; তাহা
এই;—

“প্রজাপতির্বৈ ইদমেক এব অগ্নে আস সোহকাময়ত প্রজায়ের তুরান-তান ইতি। স
তপোহিতপাত। স বাচমবজ্জৎ। স বৎসরন্ত পরতাং ব্যাহবৎ দাদিশকৃৎ। দাদিশপদা বৈ এষা
নিবিদা। এভাং বাবতাং নিবিদঃ-বাহিবৎ। তাং সর্গানি তুতানি অম্ব জহজ্জাত। তদেভৎ
ঋবেঃ পতন্ত অভ্যনুবাচঃ—“সপূর্বরা নিবিদা কব্যতা-বোরিমাঃ প্রজা অজ্জনয়ন-মনুনাঃ” ইতি।
ইহার অর্থ এই;—

"আদিতে একমাত্র প্রজাপতি বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কামনা করিলেন, আমি জন্মগ্রহণ করি, বহু হই। তিনি তথঃ অনুষ্ঠান করিলেন, মৌনী রহিলেন। এবং নয়ের পর তিনি বাক্য উচ্চারণ করিলেন। দ্বাদশ বার উচ্চারিত সেই শব্দ অর্থাৎ দ্বাদশপদবিশিষ্ট সেই শব্দ নিবিদ্য বলিয়া গণ্য। এই নিবিদ্য উচ্চারিত হইলে সকল ভূত (প্রাণী) দৃষ্ট হইল।"

সায়ণ এই ব্যাখ্যার অনুসরণ করেন নাই। ফলতঃ এ-ব্যাখ্যাও সর্বাংশে মনো-রম নয়। ঋকের শব্দমাত্র আলোচনা করিলে এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 'কব্যতা' শব্দ লইয়াই যত গোল। 'কু-শব্দে' এই ধাতু হইতে, 'ভৎ-করোতি' এইরূপ অর্থে, 'কব্যৎ' শব্দ নিস্পন্ন হয়। 'কব্যৎ' = শব্দ করিতে-করিতে। ঐতরের ব্রাহ্মণে প্রজাপতিরূপী অগ্নিই 'রাক্ষ্য উচ্চারণ করিলেন', বলিয়া 'কব্যতার' মর্মার্থ প্রকাশিত হইয়াছে।—কিন্তু মূলে কব্যতা তৃতীয়ান্ত পদ ও 'স' প্রথমান্ত পদ; ইহাতে ঐ রূপ অর্থ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভাবিত ঋকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

"তিনি আয়ুর পুরাতন স্ততিগর্ভ উক্বে (ভূষ্ট হইয়া) মনুদিগের সন্ততি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

এই অনুবাদে, সায়ণ 'আয়ুর' যে অর্থ করেন, তাহা গৃহীত হয় নাই।—তাহা ভালই হইয়াছে। তিনি "উক্বেন চ" বলিয়া সায়ণ যে অর্থ প্রকাশ করেন, তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাও আমার বিশেষণায় ঠিক।—কিন্তু দত্ত মহাশয়, মূলের যে নিবিদ্য শব্দ, অনুবাদে তাহা এক-বারে উঠাইয়া দিয়াছেন।—এইটি তাঁহার অনুবাদের দোষ।

মূলের অগ্নি এইরূপ অর্থ প্রস্তাব করি।—স্বার্থঃ—

"স অগ্নিঃ আয়োঃ কব্যতাপূর্ব্বা নিবিদ্য (ভূয়মানঃ)—মনুনাঃ ইমাঃ প্রজাঃ অজানযৎ।—"

কব্যতা = স্ততিঃ স্মরণতা বাক্যের। অর্থাৎ ভূতচিত্তরা 'পূর্ব্বা নিবিদ্য' = প্রাচীনরা নিবিদ্য ইত্যর্থঃ।—

তাহাতে এই অর্থ-পাওয়া যাইতেছে,—

"সেই অগ্নি আয়ুর প্রাচীন নিবিদ্যরূপ বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া মনুদের এই সকল প্রজা উৎপাদন করিয়াছেন।"

এখানে অগ্নির প্রসাদে মনুবংশবিস্তারের উল্লেখ দেখা যাইতেছে।—এবং আয়ুর রচিত প্রাচীন নিবিদ্য-নামক স্ততি তাঁহার স্ততির কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এখন ভিজ্জন্তি এই যে, আয়ুর রচিত এই গ্রন্থিক নিবিদটি কি?—নামগা-
চার্য বলেন,—“অগ্নিদেবেক্” ইহাই সেই নিবিদের আরম্ভ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে
এই নিবিদের দ্বাদশটি পদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সমুদায় নিবিদটির
আরম্ভও প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা এই:—

১। অগ্নিদেবেক্: ৪। হোতা দেববৃত: ৭। রবীরক্ষাবাণাম্ ১০। আদেবো দেবান্ রক্ষৎ

২। অগ্নিদেবিত্ত: ৫। হোতা মনুবৃত: ৮। অতৃতো হোতা ১১। বক্ষদগ্নিদেবো দেবান্

৩। অগ্নিঃ হুমসিৎ ৬। অশীবজ্ঞানাম্ ৯। তুর্গিহব্যাবাট

১২। সো অধরা করতি জাতবেদঃ॥

ঋগ্বেদ অর্পেকা এই নিবিদমন্ত্র দে অতি পুরাতন, তাহা বলা বাহুল্য। কেন-
না, কুৎস একজন অভি-প্রাচীন ঋগ্বেদী ঋষি; তাঁহার যথেষ্ট এই নিবিদ
প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, দেখা যায়। অধিকন্তু, এই নিবিদটিকে
স্থানে স্থানে ‘পুরোহক্’ মন্ত্র বলা হইয়াছে।—বিশ্বদেব নিবিদ প্রভৃতি অস্ত্রা-
ষে কয়েকটি ‘নিবিদ’ মন্ত্র সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের শেষে

“প্রোমাং দেবো দেবহতিঃ অরতু দেব্যা বিয়া।”

ইত্যাদি বাক্য দেখা যায়; কিন্তু এই নিবিদের শেষভাগ তাদৃশ নহে।
বোব হয়, তজ্জন্যই এই নিবিদের ‘পুরোহক্’ এই পৃথক সংজ্ঞা দেওয়া হই-
য়াছে।—পুরঃসে রোচতে ইতি পুরোহক্। যাহা সম্মুখে বলমন্ করিতেছে,
তাছার নাম ‘পুরোহক্’।—ঋগ্বেদী ঋষিদের চক্ষুর অগ্রে এই মন্ত্র সর্বদা দেদীপ্য-
মান ছিল, তাই ইহঁদের নাম ‘পুরোহক্’।

বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এইরূপ হয়,—

১। দেবতার অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন;

২। মনুবংশীরেও অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন;

৩। অগ্নি অতি তুন্দররূপে দীপ্তি পাইতেছেন।

৪। দেবতার অগ্নিকে হোতা বরণ করিয়াছেন;

৫। মনুবংশীরেও অগ্নিকে হোতা বরণ করিয়াছেন;

৬। তিনি প্রকৃষ্ট রূপে যজ্ঞ সূক্তের নেতা;

৭। অধর সূক্তের রক্ষক;

৮। তিনি অজ্ঞেয় হোতা;

৯। শীতগামী হব্যবহনকর্তা।

১০। দেব অগ্নিদেবতাদিগকে আনয়ন করুন;

১১। দেব অগ্নিদেবতাদিগকে যজ্ঞ করুন ;

১২। সেই জাতবেদা অগ্নি আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

ঋগ্বেদী ঋষিদের বিবেচনার, আয়ু রাজার রচিত এই যজ্ঞ অপেক্ষা অগ্নির ঐতিহ্যিক বেদবাক্য দ্বিতীয় নাই। অগ্নি নামক অচিন্ত্য অনির্কটনীয় শক্তিকে দেবতারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন ; অসীম-আকাশের প্রান্তভাগে তারকাপুঞ্জও অগ্নি দেদীপ্যমান, অপেক্ষাকৃত নমিকটে আকাশে সূর্য্যমণ্ডলেও অগ্নি দেদীপ্যমান, তাহার অধোদেশে স্নেহমালায় বিদ্যুৎ আকাশে অগ্নি দেদীপ্যমান ; পৃথিবীতেও গৃহে গৃহে অগ্নি দেদীপ্যমান। এই সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি ভ্রমের মূলাধার,—প্রাণের মূলাধার,—সৃষ্টিরই মূলাধার। মনুবাংশীরেরা এই অচিন্ত্যশক্তির মহিমা চিন্তা করিয়া, উপাসনার জন্ত তাঁহাকে আপনাদের যজ্ঞে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন ; মহারাজ আয়ু তদধর্মে বলিতেছেন,—“অগ্নি-অভি স্তম্ভরূপে দীপ্তি পাইতেছেন।”—অগ্নি যেমন সকল সৌন্দর্যের অভি-ব্যক্তা, তেমনি নিজেও অদ্ভুত লাভণ্যময়, সন্দেহ নাই। তদীয় মহিমা ও রূপে মনু হইয়া রাজা বলিতেছেন ;—“দেবতারা সকলে অদ্ভুত থাকিয়া এই মহা-শক্তিকে মনুষ্যের চক্ষে প্রকাশিত করিয়া নরলোকে আপনাদের প্রতিনিধি-রূপে স্থাপন করিয়াছেন ;—দেবলোক ও নরলোকের মধ্যে অগ্নি দূতস্বরূপ। তিনি দেবতাদের সকাশ হইতে অন্ন লইয়া মনুষ্যের নিকট আনিতেছেন—এবং মনুষ্যদের উপহার লইয়া দেবতাদের নিকট যাইতেছেন। হে অগ্নি ! আমাদের কি সাধ্য দেবতাদের পূজা করিব ? ঐহাদিগকে দেখি নাই, ঐহাদিগকে কিনি লিরা পূজা করিব ?—আমরা তোমাকেই হোতার পদে বরণ করিলাম। তুমি সর্বব্যাপী ; নরলোকেও আছ, দেবলোকেও আছ। তুমিই আমাদের হইয়া দেবতাদের পূজা সম্পাদন কর। দেবতারা আমাদের জন্ত বে অন্ন পানের সৃষ্টি করিয়াছেন, দরিদ্রগণকে বিতরণের জন্ত তাহা যজ্ঞস্থানে সংগৃহীত হই-রাছে,—তুমি দেবতাদিগকে এখানে আনয়ন কর ;—তুমি জাতবেদা, সকলের মনোভাব বুঝিতে পার,—আমাদের মনোভাব তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন কর। তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে দৃষ্টিগাত করুন ; আমাদের প্রতি তাঁহাদের অনুরোধ উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক।”

ইহাই উর্ব্বশীপুত্র আয়ু রাজার অগ্নিপূজা।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

মার্কিণে ইন্দ্রজাল।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে ইন্দ্রজালের প্রভাব বিলুপ্ত হইতেছে, এবং বিজ্ঞানই ধীরে ধীরে ইন্দ্রজালের স্থান অধিকার করিতেছে। বিজ্ঞানবলে আজ সৌদামিনী সংবাদবাহিকা, সূর্য্য চিত্রকর, অগ্নি কল-পরিচালক, সমস্ত ক্ষুদ্র ভগ্ন বিজ্ঞানের পদানত। বিজ্ঞানের এই রাজত্বকালে যদি ইন্দ্রজালের মহিমার কোনও কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা অস্বাভাবিক এবং হাস্যাস্পদ বিষয় বলিয়াই মনে হয়। ঠাকুরমার উপকথার ঝুলি হইতে অনেক ঐন্দ্রজালিক কাহিনীর আমদানী করা যাইতে পারে। বালকগণের নিকট তাহা বিলক্ষণ প্রীতিকর হইলেও চিন্তাশীল পাঠকগণের তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদানের সময় ত্রিতান্ত অল্প; কিন্তু আজ আমরা যে ঐন্দ্রজালিক ঘটনার কথা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাহা 'ইন্সট্রুটেড আমেরিকান' নামক একখানি মার্কিণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল আমেরিকার একখানি প্রধান পত্রিকায় বাহা প্রকাশিত হইয়াছে, অবিস্মৃত এবং বিস্ময়কর হইলেও, তাহা প্রবণযোগ্য, এই বিবেচনায় আমরা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কিণ লেখকের পত্রখানির অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে আমি মিচিগান উপদ্বীপের উত্তরাংশে পর্যটন উপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম। সে সময়ে আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এই প্রদেশের বায়ুর উপকারিতা এবং ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার আবিষ্কারের যথেষ্ট সম্ভাবনার কথা শুনিয়াই আমি এই অঞ্চলে আসিবার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। ভূতত্ত্ব আমার বিশেষ প্রীতিকর বিষয়। এই প্রদেশের গিরিভ্রম এবং অরণ্যানী অনির্বচনীয় স্তম্ভর, এখানকার নিশ্চল বায়ুপ্রবাহ যেন আমাকে নবজীবন দান করিল।

"হানকক নগরের উপকণ্ঠে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল বাস করিয়াছিলাম। মধ্যে একদিন পর্বতারোহণে গমন হইয়াছিল, সেখান হইতে ঘুরিয়া আমার ভূপরীক্ষাণ্ড (Geological hammer) হস্তে লইয়া সন্ধ্যাকালে নগরে কিরিতেছি, এমন সময়ে পথে একটি অসহন যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পরিচয় হওয়াতে দেখিলাম, লোকটি ভারি গল্পশ্রিয়, যে এক ঘণ্টা কাল আমরা

পদব্রজে একত্রে আসিলাম, তাহারই মধ্যে তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান অনেক ঘটনার কথা বলিয়া ফেলিলেন।

“এই যুবকের নাম অলিভারসন। ইনি একজন চিত্রকর। এই সময়ে তিনি কোন চিত্রশালায় Retoucher এর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন সম্রাট তাঁহার হস্তে Nitrate of silver এর কাল দাগ তাঁহার ব্যবসায়ের নামক্য প্রদান করিতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট স্তনিতে পাইলাম, হানকক হইতে সমস্ত মাইল দূরে একটা কারখানায় তিনি একটি সুবিধাজনক কাজ হাতে পাইরাছেন, কাজে যোগ দিবার পূর্বে তিনি কয়েক দিনের ছুতি সেখানে একবার বেড়াইয়া আসিবেন। আমার ডাক্তার আমাকে দেশভ্রমণের অবাধ ব্যবস্থা দিয়াছেন, সুতরাং আমি আমার এই নবপরিচিত সঙ্গী বন্ধে পর্যটনে বাহির হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল, আমরা ঠিক তিন দিনে আমাদের নিকটস্থ স্থানে উপস্থিত হইতে পারি; স্থির হইল, প্রথম দিন রাত্রে ওলব্রাইট নামক একজন লোকের বাসায়, এবং দ্বিতীয় দিন রাত্রে Anderson's place নামক একটা চৌরাস্তার উপর আড্ডা লওয়া যাইবে।

“অক্টোবরের অতি সুন্দর প্রভাতে যাত্রা আরম্ভ করা গেল। চতুর্দিকে স্বর্ণময় বৃক্ষপত্রবিভক্ত ফটিকস্বচ্ছ নীহারবিন্দুতে তরুণ সূর্যের অনুরঞ্জিত আভা বিভাসিত হইতেছিল। সেই নির্মল বায়ুহিলোল কি ক্ষুণ্ণিত্ব। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা ভ্রমণ করিলাম; সন্ধ্যাকালে অলিভারসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ওলব্রাইটের গৃহভ্যন্তরবর্তী দীপের মান আলোকচ্ছটা দেখিতে গাইলেন। এক ঘল-কুহুর চীৎকার করিয়া আমাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। ওলব্রাইটের গৃহপ্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলে একজন লোক ভাল ইংরাজীতে বলিল, ‘ভিতরে আসুন’—আমরা একটি ছোট কুঠুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, দীপালোকে অপরিচিত গৃহস্থামীকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম।

“গৃহস্থামী একজন ফরাসী, স্থলকার, ঝর্কিদেহ, সবলবাহি এবং দৃঢ়বন্ধ। তাঁহার তীব্র জ্যোতিঃপূর্ণ চক্ষু এবং উন্নত নাসিকায় তাহার বৃহত্তা এবং কৌতুকম্পূর্ণ স্বর স্পষ্ট। স্থল ওষ্ঠ ও ক্রমনিরগামী ললাট বুদ্ধি এবং ভেদজ্ঞিতার ব্যঞ্জক। ক্ষুদ্র গৃহে দুইটি কক্ষ, ছাদের উপর একটা কুঠুরী। গৃহস্থামীর নিকট আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সে আমাদের পক্ষে পরম সমাদরে গ্রহণ করিল। আমরা বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম; গৃহস্থামী আহার প্রস্তুত করিতে গেল,

এবং তাহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য একটি বালিকাকে আহ্বান করিয়া
দেখিল। আমি ইতিপূর্বে এই বালিকাকে দেখি নাই, আনানের আসিতে
দেখিয়াই সে সরিয়া পড়িয়াছিল।

“আহারাদির পর উননের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির কাছে বসিয়া গৃহস্থামীর গর-
মুনিতে লাগিল। তাহার নাম বর্জি; সে তাহার স্বদেশীয়গণের জ্ঞান সূদা-
লাপী এবং বাক্যকুশল। তাহার স্বদেশীগণ পিকার্ডি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে
আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে বটে, কিন্তু বর্জির জন্মস্থান নিউ-
জেন্সউইকে, কানাডা হইতে সে ইউনাইটেড ষ্টেটসে উঠিয়া আসিয়াছে।

কথাবার্তার মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। একটি গার্হস্থ্য চিত্র আমার নয়ন-
সমক্ষে উদ্ভূত হইয়াছিল—গৃহস্থামীর গর করিতেছেন, তাহার ক্রোড়ে বালিকা
নিদ্রিতা, তাহার সুবর্ণকাস্তি কেশগুলি ললাটে ও স্বকণ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে।
অলিভারসন সমস্ত দিনের প্রথমে ক্লান্ত হইয়া কেদার উপর বসিয়া চুলিতে
ছিলেন দেখিয়া, বর্জির নিকট শয়নের প্রস্তাব করিলাম।

“বর্জি বগিল, ‘আচ্ছা, উপরের তুঁটরীতে আগ্রনারা শয়ন করিতে যান, এই
বাতিটা হাতে করিয়া যান, আমি আর একটা জ্বালাইয়া লইতেছি।’

“আমি বাতিটা হাতে লইয়া, অলিভারসন আগে আগে চলিলেন; উভয়ে
জীর্ণ সিঁড়ির উপর দিয়া উঠিতে লাগিলাম।

“অন্ধপথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছি, হঠাৎ নীচে গোলমাল শুনিয়া উভয়েই
হিরতাবে দাঁড়াইলাম; দেখিলাম, পূর্বোক্ত বালিকাটি জাগিয়া উঠিয়া বড়
কাদিতেছে, তাই বর্জি তাকে গালাগালি করিতেছে; সে কিছুতেই থামে না
দেখিয়া, বর্জি ভরানক রাগিয়া উঠিল, আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল, ‘দেখ-
ছেন মশায়, মেয়েটা কি প্রাজী।’ তাহার পর বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া
বলিল, ‘থাম্ বলছি, কেন যদি কাদবি তো এখনি নাক টিপে মেরে ফেলবো।’

“বালিকা তথাপি শান্ত হইল না, আরও চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল।
ক্ষিপ্তপ্রায় বর্জি ক্ষণমাত্রও বিবেচনা না করিয়া ক্রোমরবন্দ হইতে একখানা
ছুরি বাহির করিয়া জুহু-হিংস্র জন্তুর জায়-বালিকার দিকে ছুটিয়া গেল, এবং
তাহার কেশরাশি চাপিয়া ধরিয়া সেই ছুরি সর্বল- তাহার গলদেশে বসাইয়া
দিল। ছিন্নশিরা হইতে রক্তস্রোত সবেগে উৎসারিত হইতে লাগিল, বালিকার
মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না; তাহার নির্জীব দেহ ভূতলে পড়িয়া
গেল।

“আমি অলিভারসনের মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, ভয়ে তাঁহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, কণ্ঠদেশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, মুখ মার্কেলের ছায় খেত! আমিও নিরুপায়, আমার নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছিল; নোহারকণার ছায় নীতল-বর্ষজাল মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছিল; হাত তুলিয়া যে সেই বর্ষ অপসারিত করি, এমন ক্ষমতা ছিল না।

“কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই ভাবে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতাম, বলা যায় না; কিন্তু বর্জি যখন আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, ‘বান, শয়ন করুন গে’—তখন আমাদের চমক ভাঙ্গিল। আমাদের হাতে অস্ত্র থাকিলে আমরা নীচে পলায়নের চেষ্টা কবিতাম, এবং প্রতিবেশী ও পুলিশের লোকজনকে ডাকিয়া সেখানে জড় করিতাম। কিন্তু একখানি ছোট ছুরি ভিন্ন আমার কাছে তখন অস্ত্র কোনও অস্ত্র ছিল-না, আমার ব্যাগের মধ্যে একটা রিতলভার ছিল, কিন্তু তাহা নীচে; তখন হাতে পাওয়া শস্ত। আমাদের দুই জনেরই মনে হইল, গৃহস্থানী ক্ষিপ্ত হইয়াছে; যে কোন মুহূর্ত্তে সে আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। এমন একটি গবাক্ষদ্বারও দেখিলাম না, যে পথে আমরা পলায়ন করিতে পারি। প্রভাতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা এবং তাহার পর নীচে নামিয়া প্রয়োজন হইলে একটা হাঙ্গামা করিয়া বাহিরে যাওয়া ছিল অস্ত্র উপায় ছিল না।

“রাজে আমাদের উভয়ের কাহারও নিদ্রা হইল না। বোধ হইল, বুঝি ইহজন্মে আর রাজি প্রভাত হইবে না, কিন্তু অবশেষে বাতায়নপথে প্রভাতের আলোক-রশ্মি প্রবেশ করিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, বর্জি নীচের ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ব্রেকফাস্টের জন্ত কেটলেতে জলগরম হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারা গেল। অবশেষে বর্জি সিঁড়ির উপর উঠিয়া-আগিল, আমা-দিগকে ডাকিয়া বলিল, ‘মহাশয়, আপনারা নীচে আসুন। সমস্ত দিনই কি ঘুমাইবেন?’

“আমরা অতি সাবধানে, কতক ভয়ে ভয়ে নীচের দিকে চাহিলাম; কিন্তু বিবল মুখের বিকট ভঙ্গী করিয়া বর্জি দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার সম্মুখে—
অশচর্য! কেহ বিশ্বাস করিবেন-না—সেই বালিকা সজীব এবং স্বস্থ দেহে বসিয়া আছে। রাজে আমরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছিলাম; আমা-আনন্দের বিষুট হইয়া পড়িলাম। অলিভারসন বিকায়ের রোগীর ছায় শূন্যদৃষ্টিতে একবার

চারিদিকে চাহিলেন, তাহার পর উদ্ভূত-বারণধে ক্রম গ্রহণ করিলেন :

তাঁহার মনে আমার আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই।

"বজ্রি প্রফুল্লচিত্তে ঘরের মধ্যে বসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার মুখে হাত্যাংকুর, আনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পরমেশ্বরের দিব্য, আপনি সত্য বলুন, ইহার অর্থ কি? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আগনি গতহাত্রে এই বালিকাকে হত্যা করিয়াছিলেন।'

বজ্রি সহাত্রে উত্তর করিল, 'না, না, সে আপনার ভ্রমমাত্র; আপনি ভুল দেখিতেছিলেন, অথবা আপনার চিত্তা আপনাকে হুসনা করিয়াছে।'

"এই কথাকটি কথা ভিন্ন বজ্রির মুখে আর কোনও উত্তর পাই নাই।

আমি বালিকাকে সঙ্গেহে ডাকিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। এ-সে সেই বালিকা, তাহাতে আমার আর কোনও সন্দেহই রহিল না। কারণ পূর্ব-রাত্রে বালিকার ওষ্ঠের উপর একটি দাগ দেখিয়াছিলাম, এখন সেই দাগটি ভেদনি দেখিতে পাইলাম।

"ত্রেকফাষ্ট শেষ হইলে গৃহস্থারীর নিকট বিদায় লইয়া হানিককে ফিরিয়া আসিলাম। এই ঘটনার পর কয়েক বৎসর যাবৎ এই রহস্যের কারণপ্রকারের দ্রষ্ট অনেক মাথা ঘামাইয়াছি, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। তখন ইজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান ছিল না, কারণপত্রেও এ কথা লইয়া কোনও আন্দোলন চলিত না। অনেক চিন্তার পর এখন বুঝিতে পারিতেছি, বজ্রি একজন পাকা বাদক, তাহার ইজ্ঞানপ্রভাবে আমার উভয়েই বৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি ইহা ইজ্ঞান না হয়, তবে কি?"

আমিরাও জিজ্ঞাসা করি, এটি গল্প, না সত্য?

শ্রীমতীসুকুমার রায়।

প্রাদেশিক অবস্থা ও মেটোরোলজি।

পড়নিজ্ঞানের উৎতির সহিত, আজ কাল নানা জটিল প্রাকৃতিক ব্যাপারেরও সন্ধান হইতেছে সত্য, কিন্তু প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটির রহস্যোন্মেষ করা, সনীয় মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ আয়ত্ত বহির্ভূত। অপর ঘটনা-বুদের কথা,—জগতের অনেক প্রত্যক্ষ সাধারণ ঘটনাবলীর কারণও অতাপি

অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, এবং যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত মানবের স্বাভাবিক সঙ্ঘর্ষতা চিরসম্বন্ধ, নানাদেশীয় বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদগণের সমবেত চেষ্টাতেও, তাহাদের প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হইতেছে না। প্রাদেশিক অবস্থাবৈচিত্র্য এই অজ্ঞাতকারণ নানা ঘটনার মধ্যে অন্ততম, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রবলবায়ু ও ভূভিকাদি আপদ, ক্রি. মূল কারণে মধ্যে-মধ্যে নানা দেশে উপস্থিত হইয়া লোক-পীড়ন উপস্থিত করে, এবং কি নিয়মেই বা এই সকল উৎপাত জাবিভূত হয়, এ পর্যন্ত তাহা ঠিক জানা যায় নাই। গ্রহ নক্ষত্রের উদয়াস্ত ও গ্রহণাদির সংঘটন কাল, আমরা যে কোন সময়ে গণনা করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু প্রাদেশিক অবস্থাগণনার কোনও প্রকৃষ্ট নিয়ম নাই।

প্রাদেশিক অবস্থার গণনা সম্ভবপর হইলে, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের কার্যের মধ্যে ইহা যে অশেষ মঙ্গলজনক হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রতিবৎসর অনাবৃষ্টি ও ভূভিকাদি উপদ্রবে যে সকল প্রাণী নষ্ট হইতেছে, এবং আকস্মিক ঝটিকাবর্ষে ধনজনপূর্ণ যে সকল অর্ণবপোত সমুদ্রবক্ষে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা ভারিলে বিস্তৃত হইতে হয়। পৃথিবীর অপরাংশের কথা ছাড়িয়া, বৃষ্টিবাত্যাদির অনিশ্চয়তা হেতু কেবল ভারতবর্ষে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা শুনিলেও চমকিত হইতে হয়। গত ১৮৭৬ অব্দ হইতে ভারতবর্ষে যে বৎসরস্বরূপ ব্যাগিনী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রায় সমস্ত লক্ষ ভারতবাসী মিনষ্ট হইয়াছিল, এবং গবমেণ্টের প্রায় নয় কোটি বাটী লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য আদার হয় নাই,—এতদ্ব্যতীত ভারতজাত শস্যের অল্পতা হেতু, বিদেশীয় বণিক-সম্প্রদায়ের যে কত ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার স্থিরতা নাই,—কেবল ইংরাজ বণিকদিগেরই এই হেতু প্রায় সাত-কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল; এতদ্বিত্ত—১৮৭৬ সালের পূর্ব বাঙ্গালার বিখ্যাত জলদ্রাবন ও ১৮৬৬ অব্দের ভূভিক্সে যে কত প্রাণিনাশ হইয়াছে, তাহা গণনা দ্বারাও এ পর্যন্ত স্থির হইল না। গত ১৮৬৪ সালের বিখ্যাত শারদীয়া ঝটিকার সর্বপ্রাণিনী ভীষণ-মুক্তি বোধ হয় আত্মও অনেকের হৃদয়ে আগন্তুক আছে,—এই ভয়ঙ্কর ঝটিকার ষাট হাজার লোক বিনষ্ট হইয়াছিল। দেশের এই সকল আকস্মিক অবস্থাপরিবর্তনের পূর্বাভাস পাইলে, ইহাদের অনিষ্টকারিতা যে অনেকাংশে নিবারিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বৃষ্টিবাত্যাদির অনিশ্চয়তার অস্ত-জগতের অনেক ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া, এই সকল বিষয়সংঘটনের কাল ও প্রকৃতির আবিষ্কারের আশা, নানাদেশীয়

বৈজ্ঞানিকসমাজে বহুকাল হইতে অনেক অমুসন্ধানাদি চলিতেছে। প্রকৃতি-
 জগৎ সহিত রাজস্বকর্তৃক অবস্থাও অস্বাভাবিক পন্থাণে সম্বন্ধ জানিয়া
 প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সীমাত্মি ঋতুবহুল আরম্ভবর্ষেও, ইংরাজরাজ এ বিষয়ের
 পরীক্ষা ও অমুসন্ধানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন—এবং কয়েকটি সুপণ্ডিত
 ব্যক্তি এই কার্য নিরূপণ করিতেছেন। সম্ভ্রান্তগতের শীতস্থানীয় উন্নত জাতিগণের
 এই প্রকৃতিক চেষ্টার যে এ পর্যন্ত কোনও ফললাভ হয় নাই, তাহা বলিতে
 পারা যায় না। ইতিমধ্যে এ বিষয়ের অনেক নতুন কথা জানা গিয়াছে, এবং
 যে প্রকার উৎসাহসহকারে ইহার আলোচনা ও পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে
 আশা করা যায়, শীঘ্রই প্রাদেশিক অবস্থাবৈচিত্র্য ব্যাপারের একটা সর্বব্যাপী
 সম্বন্ধ নীমাণ হইয়া যাইবে।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাপরিবর্তনের কারণসম্বন্ধে, প্রাদেশিক
 নানা অবস্থার প্রতি বিজ্ঞানবিদগণের দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে
 অবস্থাবৈচিত্র্যের বিজ্ঞানসম্বন্ধ মূল কারণের অমুসন্ধান, এবং গুনিদীর বিভিন্নতা-
 শের নানা ঘটনার সংঘটনকাল ও তাহাদের প্রকৃতিবিষয়ক ধারাবাহিক তদ্বিধা
 প্রস্তুত করিয়া, তাহা হইতে উপজবসংঘটনের কালসম্বন্ধে একটা নিয়মাবিষ্কারের
 চেষ্টা—এই দুইটিই আজ কাল বিজ্ঞানবিদগণের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে, এবং
 এই উভয়ের সাহায্যেই তাহা বা এখন মেটেরিওলজি বা বায়ুনভাষ্যের
 প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা হইয়াছেন। বিজ্ঞানবিদ গণ্ডিতগণের নানা গবেষণা
 ও অমুসন্ধানের ফলে, এ পর্যন্ত বায়ুনভাষ্যের যে সকল বিষয় জানা গিয়াছে,
 তাহার অধিকাংশই অনিশ্চিত ও আনুমানিক,—কায়েই বিজ্ঞানের অপূরণ্য
 উন্নত পথের ভুলনায়, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যে বায়ুনভাষ্য ইহার
 শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই, এ কথা সন্দেহই স্বীকার করিবেন। বায়ুর
 চাপের পরিবর্তনের সহিত বায়ুভাষ্যের বিশেষ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হওয়ার চাপমাত্রা
 যন্ত্র (Barometer) সাহায্যে, এখন আমরা আসন্ন বৃষ্টিপাত ও ঋতুকালমের
 কথা জানিতে পারি, এবং উপস্থিত ত্রিপদ নিবারণার্থে যথাসাধ্য সাবধান হই-
 বার ও হিজিৎ অবসর পাই,—কিন্তু আগামী বৎসরের প্রাদেশিক অবস্থাবি-
 বিবরণ, বর্তমান বৎসরে জানিবার, বা বায়ুর গতি ইত্যাদির কথা ঘটনাকালেই
 এক মাস পূর্বেও প্রচারিত হইবার কোন উপায় আজও আবিষ্কৃত না
 হওয়ায়, আমরা সেই উপজবের অনিশ্চিততার সম্যক নিবারণের কোন উপায়ই
 অবগত করিতে পারি না। আজ কাল আমাদের দেশের প্রত্যেক নগরে

গবর্মেণ্ট কর্তৃক যে প্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ কৌতূহলনিবৃত্তি বাতীত ইহার আরও অনেক ব্যবহার আছে,—বহুকালের বিন্যাস-পর্যালোচনা করিয়া, প্রাদেশিক অবস্থার পরিবর্তনের একটি নিরনাবিকার করা, এই বিবরণসংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে ঘন ঘন অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায়, নানাবিধে হেব নানা অসুবিধা হয় দেখিয়া, এই সকল দৈববিঘ্নের প্রকৃত কারণ অবধারণের জন্য, ১৮৭৮ অব্দে গবর্মেণ্ট কর্তৃক একটি অমুসন্ধানসমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সমিতিতে তাত্‌কালিক অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদ যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুকালের প্রাদেশিক অবস্থার তালিকা পরিদর্শন করিয়া, সৌর উৎপাতের (Solar activity) সহিত ভারতবর্ষের প্রাদেশিক অরুণাপরিবর্তনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্থির করেন, এবং এতদ্ব্যতীত সূর্যের অবস্থাভেদে যে বৃষ্টিপতনাদির-স্বাসবৃদ্ধি হয়, এ কথাও প্রচাৰ করেন। সানাতন দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্যমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে, অনেক সময় ইহাতে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ-চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই চিহ্নগুলির সংখ্যা ও স্থান সূর্যমণ্ডলে নির্দিষ্ট নাই, কোন সময়ে ইহা আমরা সমগ্র সূর্য্যাবয়বে পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাই, আবার কখনও বা ইহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না; পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, প্রায় প্রতি একাদশ বর্ষে (১১.০৪) সূর্যমণ্ডলে কৃষ্ণ রেখার আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই সময়ের মধ্যকালে, ইহাতে কৃষ্ণ বেখার লেশমাত্র দেখা যায় না। ভারতের কয়েকটি স্থানে, ঠিক প্রতি একাদশ বর্ষে, সূর্যমণ্ডলের চিহ্নহীন অবস্থার অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাত হইতে দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, * ইহা নিশ্চয়ই পূর্বোক্ত সৌর-চিহ্নের স্বভাব প্রযুক্ত হইতেছে।

পণ্ডিতগণের পূর্বোক্ত অনুমান সত্য হইলে, ইহা যে বর্তমান যুগের একটি মহান আবিষ্কার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিবোধী পণ্ডিতগণের যুক্তি আলোচনা করিলে, ইহার সত্যতা যথেষ্ট অনেক সন্দেহাদিয়া উপস্থিত হয়। বিরোধী সম্প্রদায়ের অগ্রণী অধ্যাপক র‍্যাণ্ডকোর্ড বলেন, সমগ্র ভারতের প্রাদেশিক অবস্থার তালিকা পর্যালোচনা করিলে,

* অমুসন্ধান সমিতির অমুমানের মূল ভিত্তি, সভ্যগণের স্বাধীন অমুসন্ধানলব্ধ আবিষ্কার নহে। ভারতবর্ষে অমুসন্ধান আরম্ভ হইবার অনেক পূর্বে স্থবিধাত মার্কিন জ্যোতির্বেত্তা নর্মান লুকিয়ান সাহেব, সৌর কৃষ্ণ চিহ্নের প্রভাবের কথা সর্বপ্রথমে প্রচাৰ করেন।

বৃষ্টিপাতাদির সহিত সৌর-চিহ্নের অস্বাভাবিকতার-এ বিশেষ কোনও সম্বন্ধ
 আছে, তাহা কোনও ভ্রমেই বলা যায় না। দক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশের
 অবস্থা সৌর-উৎপাতের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া বোধ-হয় বটে, কিন্তু উত্তর-ভারতে
 তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ক্ষদ্র দৃষ্ট হয়। গত-১৮৩৬ ও ১৮৬০-সম্বৎ সৌর-চিহ্ন-
 যিকোনো কাল ছিল, স্বতরাং অনুসন্ধান-সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে, সমগ্র-
 ভারতে উক্ত দুই-বৎসর-স্বৃষ্টি ও প্রচুর শস্ত-হইবার কথা, কিন্তু উত্তরপশ্চিমা-
 ঞ্চলের প্রাদেশিক-বিবরণ পাঠে জানা যায়, উক্ত দুই বর্ষে উত্তরভারতে বৃষ্টির
 লেশমাত্র ছিল না, এবং তৎক্ষণ্যে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ববর্ণিত
 সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই প্রকার নানা যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সৌর-প্রভাবের একটি কর্তৃক নিয়োজিত জ্যোতির্বেত্তা পগুন সাহেব, কুম্ভচিহ্নের
 দ্বারা কোন আলোচনা না করিয়া, জ্যোতিষিক বৃষ্টিবাত্যাদির উৎপত্তির দপ্তর
 একটি কারণাবিকাশের জন্ত কিছু কাল চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার মতে,
 অপসারণের পরিবর্তনশীল তারকার (Variable stars) দ্বারা আমাদের
 সূর্য ও ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে; একত্র সেই পরিবর্তনের কণদগুণ
 পৃথিবীতেও নানা বিসদৃশ ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পরিবর্তনের মূল
 কারণ, সৌরপরিবর্তন-চক্র, বৃহস্পতি ও পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ ব্যতীত আর
 কিছুই নহে, শুক্র ও পৃথিবীর কক্ষপথের সমকালে, প্রতি-মাস-মাসে সূর্য-
 মণ্ডলের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়, এবং প্রতি-৫৬-বৎসরে গ্রহরাজ-বৃহস্পতি
 দ্বারাও সূর্যমণ্ডলের বিশেষ অবস্থাবিশিষ্টতা ঘটে। পগুন সাহেব বলেন,
 এই দুই কারণে, সর্বশক্তির আগ্রহ সূর্যমণ্ডলে-কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইলেও,
 সৌরশক্তির বিকাশস্থল পৃথিবীতে যে-সেই পরিবর্তন অনুভূত হইবে না, তাহা
 কিছুতেই সাহস করিয়া বলা যায় না। পগুন সাহেব, প্রাদেশিক-অবস্থা
 পরিবর্তনের এই মূল কারণ-অবলম্বন করিয়া, সংঘটনকাল-সম্বন্ধে একটি
 নিয়মের আবিষ্কারের জন্ত বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু এই আবিষ্কার-
 কার্যে পৃথিবীর সৌরপ্রভাবের অবস্থার তালিকা-আবশ্যক হওয়ায়, এবং বহু
 অনুসন্ধানও তাহা সংগ্রহ করিতে না পারায়, তিনি অবশেষে অনন্তোপায়
 হইয়া বিষয়টির পুনরালোচনায় বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অনুসন্ধান-সমিতির-কার্য শেষ হইলে, লিওটার্ড (L. Liotard) নামক
 জনৈক বিজ্ঞানবিদ বাধনভোবিদ্যার উন্নতিকল্পে কিছু দিন চেষ্টা করিয়াছিলেন;
 এবং নানা পর্যবেক্ষণাদি করিয়া, অল্প দিন-ইহা, প্রাদেশিক-অবস্থাবৈচিত্র্য

সম্বন্ধে এক অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়াছেন। লিওটার্ড বলেন,—কোন বিশেষ ক্ষোভিতিক ব্যাপার যে এই পরিবর্তনের মূল কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; পৃথিবীর কক্ষের বক্রতা, বা কক্ষসমতলে পৃথিবীর অক্ষরেখার অবনতি প্রভৃতি চিরনির্দিষ্ট ব্যাপার দ্বারা, অতিরুষ্টি প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনা কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। দ্বারা চিরনির্দিষ্ট ও নিয়মিত, তাহা হইতে তদনুরূপ নিয়মিত কার্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়;—কাষেই কক্ষের বক্রতা দ্বারা নিয়মিত ঋতুপরিবর্তন ভিন্ন অপর কোনও অনিয়মিত ঘটনার উৎপত্তি হইতে পারে না। তবে একই ঋতুতে বৎসরভেদে প্রবল ঋতিকা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বিসদৃশ ঘটনা প্রত্যক্ষ হয় কেন? তদ্বত্তরে লিওটার্ড বলেন,—গ্রহ উপগ্রহাগত প্রতিকলিত আলোকের বিশেষ কোনও ধর্ম দ্বারা, এই সকল পরিবর্তন সাধিত হয়। সাধারণ স্তল সূর্যালোক গ্রহ উপগ্রহাদিতে পতিত হইলে, ইহা বিল্লিষ্ট হইয়া যায়, এবং এই বিল্লিষ্ট আলোকের কিয়দংশ উক্ত জ্যোতিষ্ক হরণ করিয়া অবশিষ্টাংশ চতুর্দিকে বিকশিত করে; অপর গ্রহগণ নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কোনও প্রকারে উক্ত প্রতিকলিত আলোকপথে উপস্থিত হইলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ উক্ত কিয়দংশে আলোকিত হইয়া উঠে। লিওটার্ড বলেন,—এই প্রতিকলিত আলোকের প্রভাবেই, দেশের অনিয়মিত অবস্থাপরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে।

স্বীয় মতের সমর্থনকালে লিওটার্ড বলিয়াছেন, সৌরপরিবর্তন প্রত্যেক গ্রহের পরস্পর এক একটি সম্বন্ধ আছে;—এই সম্বন্ধফলেই শনৈশ্চর ও ব্রহ্মস্পতি, ক্ষুদ্র পৃথিবীকে কক্ষলষ্ট করিয়া বহু যোজন দূরে টানিয়া নইয়া যায়। ইন্দ্র, বরুণ, বুধ ও মঙ্গল, সকল গ্রহই পরস্পর এই প্রকার এক একটি সম্বন্ধে শৃঙ্খলে আবদ্ধ,—সুতরাং সূর্য্যপ্রদক্ষিণকালে কোনও এক সময়ে, উক্ত সম্বন্ধ গ্রহগুলির মধ্যে পরস্পর রশ্মির আদান প্রদান হইতে পারে না, এ কল্পনা সম্ভব্ৰ জসম্ভব। এতদ্ব্যতীত গ্রহাগত উক্ত প্রতিকলিত আলোক, দেশের অবস্থাবৈচিত্র্যসাধন করিতে পারে না, এ প্রকার বিশ্বাসেরও কোনও কারণ নাই। আলোকের বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক ও চৌম্বক শক্তির কথা বিজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তিমাতেই অবগত আছেন, সুতরাং এই সকল মহতী শক্তির প্রভাবে প্রাদেশিক অবস্থাবৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে না; এ কথা কে বলিতে পারেন?

কেবল প্রতিকলিত আলোক দ্বারা, কি প্রকারে পার্থিব পরিবর্তন সকল সংঘটিত হয়, লিওটার্ড গাহেব দুই একটি উদাহরণ দ্বারা তাহাও বুঝাবার চেষ্টা

করিয়াছেন। ইনি বলেন, যখন প্রতিকলিত আলোক পার্থক্য প্রবেশ করে, তখন ইহাতে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়; সূর্যালোকের যে সকল সাধারণ গুণ থাকে, প্রতিকলিত আলোকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, সাধারণ সূর্যরশ্মির কিয়দংশ গ্রহণ কর্তৃক হৃত হওয়ায়, প্রতিকলিত আলোকে যেন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আলোকরূপে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। পৃথিবীর আকাশে, সর্বদাই সূর্যালোকের স্তর এক চিরনির্দিষ্ট আলোক প্রবেশ করায়, ইহা সর্বদাই এক নির্দিষ্ট আলোকহিল্লোলে তরঙ্গিত থাকে; পূর্ণোক্ত প্রতিকলিত আলোকের স্তর এক ভিন্ন প্রকৃতির আলোক আকাশে চঠাৎ প্রবেশ করিলে, ইহার পূর্বের নিয়মিত অবস্থা লুপ্ত হইবার উৎকর্ষ ঘটে, এবং তৎক্ষণাৎ মহা আলোলন উপস্থিত হয়। লিওটার্ড বলেন, — এই আলোলনের ফলে এবং চতুঃপার্শ্ব আকাশের পূর্বনিবর্তিত প্রাকৃতিক অবস্থাপ্রাপ্তির চেষ্টাতেই, অনিয়মিত বৃষ্টিপাতাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেশের এই অনিয়মিত অবস্থার স্থায়ীকাল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সাহেব বলেন, — গ্রহদের গতির পবি-
 শাণ দ্বারা, উপদ্রব সকলের স্থায়ীকাল নিরূপিত হইয়া থাকে; — যে গ্রহ অতি বেগবান, তাহাব প্রতিকলিত আলোক শীঘ্রই পৃথিবীর ক্ষুদ্র গীর্গিরি বহির্ভূত হইয়া যায়। কাষেই তৎক্ষণাত উপদ্রবও অত্যল্পকাল স্থায়ী হয়।
 লিওটার্ড সাহেবের মতে, প্রাদেশিক অবস্থাবৈচিত্র্যের এই নুতন শিদ্ধান্ত, যতি-অর দিন হইল, প্রচারিত হইয়াছে; বোধ হয়, আজও বিদেশীয় বিজ্ঞানবিদ-
 গণের দৃষ্টি-ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এই মহান সাবিকাবের দ্বারা লিওটার্ডের নাম-যে চিরস্মরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ভূকৈলাসের রাজকবি ।

৬ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ভূকৈলাসের রাজবংশের প্যাঁতনামা পুঁর্নপুঁর্নকথ; তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের সময় বর্তমান ছিলেন; সেই সময় তাঁহার নামানুসারে জয়নগর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়; - কাশীর সুপ্রসিদ্ধ 'জয়নারায়ণ কলেজ' তাঁহার স্মৃতিজ্ঞাপক কীর্তি। কিন্তু ইষ্টক ও প্রস্তরে অঙ্কিত নাম কালে লুপ্ত হইয়া যায়; বাহারা উচ্চ দেউল দ্বারা আকাশ চুম্বিত, কবিরী স্থায়ী যশের দাবী করিয়াছিলেন, এরূপ কত বিক্রান্ত পুঁর্নধ্বন-নাগ অনাকাঙ্ক্ষিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই; বড় বড় জঙ্গলে বেষ্টিত ইষ্টকাবলী 'জয়সঙ্গ', 'জিপুরাসুর' প্রভৃতি পৌরাণিক নামের সঙ্গে জড়িত হইয়া অকৃতজ্ঞভাবে স্বীয় নিপ্ৰতাপের নাম গোপন করিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা ৬ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের অন্ত এককণ কীর্তির কথা প্রকট করিব। ইহা বোধ হয় কালে তাঁহার স্থায়ী কীর্তি হইয়া দাঁড়াইবে। কাশীবাসী করিবাস সমর রাজা 'কাশীখণ্ডের' একখানি অনুবাদ সংকলিত করিয়াছিলেন; ইহা প্রাচীন অস্ত্রাশ্র অনুবাদগ্রন্থের ভায় নহে, ইহা ঠিক সংস্কৃতের অনুবাদ। অতীতকাল অধ্যায়ে কৃত শ্লোক অনুবাদিত হইল, অব্যাহত হইয়া উল্লিখিত আছে। যথা :-

হাস বিরচিত সন্দর্ভবান অন্তবে।	বেদরত্ন শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বিতীয় অধ্যায়।
কাশীখণ্ড বসুধা পানে পাপ হরে ॥	ভাষ্যহর্ষে দ্বিজ জয়নারায়ণ গায় ॥
রসবহু শ্লোক ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়।	ভুবঙ্গচন্দ্র শ্লোক তৃতীয় অধ্যায়।
ভাষ্যহর্ষে দ্বিজ জয়নারায়ণ গায় ॥	ভাষ্যহর্ষে দ্বিজ জয়নারায়ণ গায় ॥ ইত্যাদি।

এই পুস্তকে অনুবাদকারকের কল্পনার দোষাত্মক নাই, - আজকাল বৈরাগ্য অনুবাদ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রচি ও অভিপ্রায় সঙ্গত, ইহা ঠিক সেইরূপ।

অনুবাদখানি বড় সহজে রচিত হয় নাই; যে কাব্যই সুচক্ররূপে করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহাতেই দৈর্ঘ্য, অধ্যবসায় ও স্বদয়ের একাগ্রতা চাই। রাজা বাহাজুরের এই সমস্ত গুণ সম্পূর্ণপরিমাণে ছিল। তিনি কতগুলি পণ্ডিতের সাহায্যে, কি ভাবে অনুবাদ সংকলিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় নিম্নেই

নিম্নোক্তেন। আমাদের সে-সবকে কোনও বক্তব্য নাই। তারিখের অংশটিতে
লিখিকরের একটু প্রশংসা আছে, তাহা সংশোধন-করিয়া বিবরণটি অবিকল
উদ্ধৃত করিতেছি।

কান্দীবাস কবি পঞ্চগঙ্গার উপর। জীবনগ্রন্থ বিদ্যাবাগীশের প্রাচীন।
কান্দীবাস কবি পঞ্চগঙ্গার উপর। জীবনগ্রন্থ বিদ্যাবাগীশের প্রাচীন।
সমস্ত কবি কান্দীবাস আশা করি লিখি। মুখ্য কবি বদা কবিতা পাঠ্য।
ইহার সহায় হইয়াছে ন। দেখি। তাহারে করে-দাম-তর্জমা-খসড়া।
সততঃ পৌর শাস্ত্র-গৌর-মাস যবে। রায় পুত্রস্বায় সেই গতিভা-লইয়া।
আমার মানস মত-যোগ-হেল তবের। পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত গুরি।
হৃদয়গণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী। এইমতে চলিষ-প্রাচীণ হেল যবে।
জীবিত-বুধিহেমের রায়গত কান্দী। বিদ্যাবাগীশের কান্দীপ্রাপ্তি হেল তবের।
তার সঙ্গে জগদীশ মুখ্য আছিল। ভাষ্যমাসে মুখ্য গেলেন নিজ বাড়ি।
প্রথম কান্দীনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা। বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ-পরিপাটি।
পরন্তু রাজ্যদৌলো গোলা মনে-রায়। তর্জমা-কবিতা-পাঠ্য-বিদ্যাম।
বলরাম বাচস্পতি মিলিলা-অপার। নিজে তার লিখিত করিলা গব্যটন।
পচতরী অধ্যায়-পঞ্চম তার সীমা। ছয় মাসে রচ-গ্রন্থ করি সংকলন।
বদেবের প্রকাশনে-সমাপ্ত পারস। ওড়-নাম-প্রতি-বার বর্ষ-বাঁজা যত।
কান্দী পঞ্চমেশি আর নগর-অপার। পদ্যতে আনিয়া সংকলিত অভিনব।
এ দুই-অধ্যায় পঞ্চমানে-সমাপ্ত। তর্জমা-কবিতা-পাঠ্য-বিদ্যাম।
পবে সমস্তসমাপ্তি স্থগিত রহিলা। সিদ্ধান্ত আখ্যান-অভিধা-পঞ্চম।
সংকলিত-পঞ্চম-তর্জমা-মিলিলা। পঞ্চম ভাষ্যতে করিলেন পরিষ্কার।
বদ্যাপি নগর দুটি দৈবযোগে-অপার। রায় কবিলেন সর্ব-গ্রন্থের প্রচার।
তদাশি তাহার শুণে লোকে লাগে-পদ্য। ঘোষিল বৎসের রাজ্য-অপার।
ইষ্টানিষ্ঠ-বাক্যনিষ্ঠ কান্দীপুত্র-অপার। এইখানে সমাপ্ত করিলা বিরচন।
সংকলিত-পঞ্চম-তর্জমা-মিলিলা। তাহার-আদেশক্রমে কিতাব-কবিতা।
লোকে উপকারে সদা-ব্যাকুল-অপার। রানতহ-মুখ্যপ্রাচীণ লইল লিখিয়া।
এছের সমাপ্তি হেতু হইলেন ভগ্ন-অপার। সেই বহি দৃষ্টি করি নকলন-বিদ্য।
জীবিত-রায়গত-বিদ্যাবাগীশ-অপার। কৃষ্ণচন্দ্র মুখ্যপ্রাচীণ চাত্রা-নিবাসী।

প্রায় এক শত বৎসর হইল, এই অল্পবাদ পুস্তক বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের
বহু বর্ষের চেষ্টায় সংকলিত হইয়াছিল; সুতরাং সাহিত্য-জগতে ইহার-জন্য
একটা স্থায়ী রহনের হান আপ্য-বলিগ্র-প্রীকার করা-বাইতে পারে।

কিন্তু পুস্তকখানি শুধু অল্পবাদ নহে। অল্পবাদের শেষে একটি মৌলিক
অংশ সমিষ্টি হইয়াছে। উহা ১০০ শত বৎসর পূর্বের কান্দীর একখানা মজীফ

চিত্রপট । এই চিত্রপট স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর তুলিতে অঙ্কিত, সুতরাং আমাদের বড় আদরীয়। এখনও এই চিত্রপটের সঙ্গে নর্তমান কালীর কতকটা সাদৃশ্য অবশিষ্ট আছে; কিন্তু আমরা বেরূপ দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে উন্নতির সোপানাবলী অধিরোহণ করিয়া প্রাচীন দুষ্কারলী স্ববনিকার পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছি, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি, আর এক-শত-বর্ষ পরে-৮০০ বৎসরীয় যুগের অঙ্কিত, এ চিত্রখানির মূল্য আশাতীত রূপে বাড়িয়া যাইবে। এখনও এই আলেখ্যখানি ইতিহাসের পৃষ্ঠার একখানি অতিশয় কোতুহলোদ্দীপক, অতিশয় মনোহর দৃশ্য।

পুস্তকবিশেষে পৃথিবীর বড় বড় তীর্থগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; যাগ্গিভিগিরি বেরুজ্জেলানের একখানি আলেখ্য আঁকিয়াছিলেন; ব্যাসদেব ব্রহ্মাও খণ্ডে প্রাচীন কালীর চিত্র আঁকিয়াছিলেন; নরহরি ভক্তিরত্নাকরে নবদ্বীপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন; ইহাদের সঙ্গে ১০০ বৎসরের প্রাচীন কালীর এই চিত্রখানি এক স্থানে রক্ষা করিবার যোগ্য।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বে অংশে কালীর তাত্‌কালিক চিত্র সমিধিষ্ট হইয়াছে, তাহা অম্ববাদ গ্রন্থের পরিশিষ্টমাত্র; এই পরিশিষ্টের আরম্ভ এইরূপ, —
অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা শোভে কাশীতলে। যেন অর্ধ শশী শোভে শশিমৌলীতলে।

একটি কবিতার উজ্জলবর্ণবিশিষ্ট মানচিত্রের পরে প্রয়োজনীয় বিবরণগুলি প্রদত্ত হইয়াছে; কালীর আয়তন; —

গঙ্গাতীরে বারানসী দুই কোশ পথ। তার মধ্যে দেড় কোশ কোকিল বসত।

আমরা অতি সংক্ষেপে এই বিবরণগুলি হইতে নোট সংগ্রহ করিয়া যাইতেছি। প্রথমতঃ ঘাটগুলির বর্ণনা; ইহাদের কোন কোনটির সম্বন্ধে কোতুহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ আছে; নারদ পাণ্ডের ঘাট, প্রয়াগের ত্রিমানসিহের ঘাট প্রভৃতি অসংখ্য ঘাটের স্থিতি ও দিক নির্দিষ্ট আছে। ঘাটের পর পোস্তাগুলির আকৃতি, গঠন ও নিৰ্ম্মাণকারীদিগের বিবরণ; নিরের পোস্তা, সাক্ষাদার পোস্তা, ব্রহ্মার পোস্তা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে; ইহাদের সন্নিকটবর্তী দালানগুলি সম্বন্ধে ইতস্ততঃ মতামত প্রক্লিপ্ত হইয়াছে। যথা, —

তার মধ্যে পঞ্চগঙ্গা ঘাটের উপর।

একশত পনর হস্তের পরিমাণ।

শ্রীনাথব রাধের খাওয়া নাস্ত্রখর।

নবতি হস্তের পর বসিবার স্থান।

হুমেরর দুই শূল যেমত প্রকাশ।

তাহার উপর যদি কোন জন যায়।

মনে লয় তার চুড়া তেদিল আকাশ।

সেই সে কালীর শোভা দেখিবারে পায়।

এই 'ধারার' পূর্বে আত্মহত্যাকারীদিগের একটি উৎকৃষ্ট অবলম্বন।

ছিল; সে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি রাজাবাহাদুরের অবস্থিতিকালে ঐ 'ধারারায়' হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কিম্বা তাহার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। তাহাদের এক জন রমণী-প্রেম-বঞ্চিত, অপর একজন সংসারক্লিষ্ট; কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই মরা যায় না,

অন্ত একজন সেই ধাক্কাতে চড়ি। তরু ডাল সহ পুন হইয়া ভূমিটা।

দৈবক্রমে-তথা হৈতে তরু পরে পড়ি। অনায়াসে নিজ ঘবে হইল এখিষ্ট ॥

তার পর রাজপথ; সংক্ষেপে অনেক কথাই আছে। "শরীরের যত নাড়ী-নির্ণয় হইবে। কপালীকার কুচা পথ প্রসিদ্ধ নহিবে ॥" এই এখন যে কার্য্য মিউ-নিসিপালিটি করবেন, পূর্বে তাহা ধর্ম্মভীক গৃহস্থ কর্তৃক সম্পন্ন হইত;

মহাজনাটালী-মধ্যে রাস্তা নর সর্বদা। একারণ-নিশিবাগে পথিকের প্রীতে।

দিনকর হিমকর কবহীন তথা। দীপশিখা করে সবে নিজ ষিড়কীতে ॥

তৎপরে অধিবাসিগণের বৃত্তান্ত; শুজরাটা, মৈথিল, বাঙ্গালী; পঞ্চজাতিভী প্রভৃতি নানাবিধ লোকের পরিচ্ছদ ও ব্যবসায় বর্ণিত আছে। অসংখ্য দর্শকের জায় সরলভাবে ভাস নন্দ কথা বলিরা যাওয়াতে, সমস্ত চিত্রপটের মধ্যে একটি হস্তরসের উৎস-সঞ্চয়িত হইয়াছে; লামাগণের বৃত্তান্ত এইরূপ,

লামা সম্যাদিব কত শত মতা। সোনাব কদম্ব ফুল সহিত জিজিবা।

বাহো উদাসান নাজ গৃহী অন্তঃপতি ॥ কাব কর্ণে শোভা কবে বেগত মিহির ॥

সরাসরী-মহাজনী-ব্যবসা সবার। মনি সব-বর্ণ-ভুলক কাব কার গলে।

এক এক জনার বাটী পর্কত-সাকার ॥ প্রবাল কনক মালা কাব-গলে-দোলে ॥

বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণগণের ছবি অতি সুন্দর; একজন শ্রদ্ধাশীল হিন্দুর তুলির আলোখ্য; "চন্দনে-চর্চিত অঙ্গ পুষ্পমালা-গলে"—ব্রাহ্মণগণ কি কি বাগ রাগিণিতে বেদপাঠ করিতেন; তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

ক্রান্তিতে সে নবর প্রারই হত্যা কাণ্ড হইত; "এই মত প্রতি মানে প্রায় হয় স্বন্দ।—ক্ষেপে মাত্র গড়াইড়ি যায় কত-কদা ॥"

কপালীনিবাসী শিল্পকবগণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; জোলাদের বিবরণ হইতে কত কাংশ উদ্ধৃত করিতেছি,

কাপালী-বহুতব জোলাব খসতি। কাবচোবি এ সকল জরীবার হয়।

তাহারা যে কর্প কবে কহিব সস্ততি ॥ দিশত পর্যন্ত ঘান মূল্যেব নির্ঘ ॥

কিন্ত্রাপি ভ্রাম্যদারী শাড়ী এক পাটা। সাদাতে বেণম পাড়ি কত বদ করে।

শ্রাঙ্কল, শুদ্ধ ভাস পবে-ধনুকপাটা ॥ শুদ্ধ সাদা অতুত্তম করিতে না পারে ॥

তৎপরে দেবমন্দির-গুলির বর্ণনা; সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে সরল ভাষার আনন্দ-প্রতিবিম্বিত শত শত উজ্জল ও সুন্দর মন্দিররাশির চিত্র মনশ্চন্দে

স্পষ্টরূপ জাগিয়া উঠিয়াছে; তখন অহল্যা বাইর দেব মন্দির নূতন নির্মিত হইয়াছে।

ইন্দ্রী অহল্যাবাই হইল এচাব।

ফুল লতা গাভা তাহে কএ কোটি কোটি।

বিশেষব বাঢ়ি কৈল অপূর্ব বাপার।

সম্মুখে বিশাল বুঝ বিরাজে দক্ষিণে।

আপাদনতক সর্ব পাষাণে নির্মিত।

* * *

দুই মঠ মধ্যে মাটমন্দির শোভিত।

কনক কলস শোভে মন্দির উপর।

পাষাণের খোদগাবী অতি পরিপাটি।

ভিন্ন-স্বচ্ছ বায়ে যেই নহিল কাতর।

ইহার পবে বিষ্ণু মহাদেব নামীয় মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের মন্দিরের বর্ণনা। এই বিবরণে অবগত হওয়া যায়, নবদ্বীপের কারিগরগণ কাশীতে বিশেষ আদর পাইতেন।

মধ্যে মধ্যে শিল্পিক অপূর্ব পাষাণে। নদীযান কারিগর করিল নির্মাণে।

তার পর কাশীবাসিনী জীলৌকিগণের কথা; শুদ্ধচারণা রমণীগণের

ব্রতাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার অতি বিস্তৃত ভাবে

লিখিত হইয়াছে; এই স্থলে সরল কথায় ও কবিতায় দীপ্তি আনিয়া পড়ে;—

কাবো উবঃদেশে মুক্তামালার দোলনী। বাবাগসী জবির ওড়নী তার পর।

হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী। কালবর্ণ বাদলা নিখিঁড়-সনোহর।

নানাদেশবাসিনী রমণীগণের ভিন্ন ভিন্নরূপ ছবি; যেন ফটোগ্রাফের ভ্রাম

প্রকৃত চিত্রন; কিন্তু কবি এ বিষয়ে বড় সতর্ক,—

এ সব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত সনোমধ্যে বৈষ্ণব নহিবে।

কাশীবাসী ধর্মনিষ্ঠ মহাজন লেখনীর মুখের চাকলাও সংযত করিতে পারিতেন।

সর্বশেষে একটি বারমায়া; অর্থাৎ কাশীতে কোন মাসে কি কি উৎসব

হয়, তাহার বর্ণনা। এটি বড়ই সুন্দর, নানা দেশের সমাগত লোকের নানারূপ

উৎসব, বড়ই রম্যজনকভাবে বর্ণিত হইয়াছে; কোথাও দেশোন্নয়নগণের

গুড়ি খেলা, কোথাও বাদ্যলীর জগোৎসব, মহারাষ্ট্রবাসিগণের পূজা-পদ্ধতি।

এ সমস্ত নিপুণ কারিগরের ভ্রাম রাজ-কবি স্বীকৃত চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়াছেন;

অথচ তাহার কারিগরীর গুণ-তত্ত্ব আর কিছুই নহে,—সরল সত্য কথা; বাহা

হইতে উজ্জল, হৃদয়স্পর্শী ও সুন্দর আর কিছুই হইতে পারে না।

এবং দীর্ঘ হইল, তথাপি উপসংহারে আব ছএকটি কথা নিবেদন করিব।

আমার নিকট যে পুঁথিখানি আছে, তাহার লেখক প্রেমানন্দ দাস। ইনি

বোধ হয়, প্রকৃতির ফুল পল্লবের ছবি আঁকিত করিয়াছিলেন, তাই তাহার

সুসংবদ্ধ অক্ষরশ্রেণীতে ফুল পল্লবের ভ্রাম সৌন্দর্যের ছায়া পড়িয়াছে;—

তাহার লেখনী-মুখ হইতে ফুল পল্লবের-দ্রাণ-নিঃসৃত হইয়াছে। লেখাগুলি বড়-পরিপাটী, বড় সুন্দর। সে-কালে সুন্দর লেখা-লেখাইয়া বিবাহ-করিতে হইত; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, প্রেমদাসের ভাগ্যে-সুপাত্রী ঘটয়াছিল। পুস্তকখানি সম্পূর্ণ পাইয়াছি। ইহার হস্তলিপি ১৭৩১ শকের (১৮৫২ খৃঃ) প্রেমদাস লেখক আবার নিজেও এক জন লুকাই, পুস্তকের শেষে তাহার দুইটি সুন্দর গান আছে; গান দুইটি বৈষ্ণবী-মাধুর্য্য-মাধা-দুর্গাবন্দনা। একটি এইরূপ;

রাগিনী ভৈরবী ।

জয় জয় শঙ্কর-মোহিনী গৌরী ।	দশন করক বীজ মোতিম পাতি-।
কাকন গলিত ললিত তনু জোড়ি ।	কুচযুগে মণিময় হার-বিরাজ ।
বীক্সা নকলীপতি বহন হুঁচার ।	চিহ্ন পটাবধ পবিহিত মাক ।
বেণী রচিত কচ কুচিত হেঁক ।	সব তনু-বল মল আভরণ সাজ ।
ভালে কিবীট সপি বিধু আশংক ।	বাহন যুগল বিবাজে সুপবাজ ।
হাটক দরপণ কলসল গণ্ড ।	দশ করে অসি ইহ চর্ণ কোদণ্ড ।
ভুরু ভাজন ধিনি সনমখ-চাপ ।	ত্রিশূল ভুজঙ্গ অহবকুলবণ্ড ।
দমনযুগল ধূপী ধস্তন দাপ ।	জয় জয় অম্বরে অমরসমাজ ।
নাসী ডিল যুগল গজমতি দোল ।	বদিয়ে কুহুম বন হুলুচি বাজ ।
প্রতিযুগ কুণ্ডল গণ্ড হিলোল ।	প্রেমানন্দে কক করণ প্রসাদ ।
বাঁধলী বিদ্র অধব চাক কাতি ।	প্রতিমে গতি তব যুগল-পাদ ।

ভূকলাসের রাজবংশ বহুদের্শে বহমান্য; এই বংশে এককালে মহাজনের উদয় হইয়াছিল। সেই বংশের একজন রাজকবির এই কীৰ্ত্তি আবিষ্কার করিয়া দীন লেখক কৃতার্থ হইয়াছে ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

মহারাক্ষ সাহিত্য ।

আর্যাসমাজে বহুপত্ন্যাত্মক বিবাহ ।

প্রায় ১৮১৬ বৎসর পূর্বে মহানিষ্ঠা-মোশেষ করেক জন কৃতবিদ্যা মহোদয়ের-চেষ্ঠায়, মারাঠী ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই অনুবাদ গ্রন্থ "বেদার্থযত্ন" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে মূল শব্দ, পুঙ্খবিস্তৃত, অর্থ, মারাঠী ও ইংরাজী ভাষাভিন্ন এবং সর্বশেষে বিবিধ ঐতিহাসিক টীকাটীকনী সরিবিষ্ট হইয়াছিল। ইহা বেঙ্গল ভাষে সংকলিত হইতেছিল, সম্পূর্ণ হইলে, মারাঠী ভাষায় এক অগুরু সামগ্রী হইত, সন্দেহ নাই।-দ্রঃশেষ বিষয়, নানা কাবণে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই।

বেদার্থবোধের পর এ পর্যন্ত আর কেহ-নারায়ী ভাবায়-বেদ সম্বন্ধে তেমন আলোচনা করেন নাই। সম্ভ্রুতি বোধাইযেব সেউজ্জৈভিরাব কলোজ্জৈব নংকুত অধ্যাপক, পণ্ডিত গ্রন্থক-
 ১০ নারায়ণ বায়কৃষ্ণ ভাগবত মহোদয়, বিগত-ল্যেট-মাস হইতে “বিবিধজ্ঞানবিস্তার” নামক
 ১১ মাসিক পত্রে, “বেদার্থবোধকাবগণেব ন্যাবক” ইতিশীর্ষক প্রবন্ধে, বৈদিক কালের ইতিহাস ও
 সমাজিক্রিতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধসমূহে গবেষণা ও
 মৌলিকতারও সন্নিবেশ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর দ্বিতীয়-
 প্রস্তাবে তিনি বলেন যে, ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের-১৬৬ স্তোত্রের মন্ত্রানুধাবন করিলে অনুমিত
 হয় যে, প্রাচীন আর্যসমাজে বহুপত্যাক্রম-বিবাহ প্রচলিত ছিল। লেখক মহাশয়ের মত
 বিশদ করিবার জন্য, প্রথমতঃ এই স্তোত্র-তৎকৃত অনুবাদ-এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।-

অনুবাদ—(১) আমি গোপাল সমূহের অধিপতি ‘বিরাজ’। (হে ইন্দ্র) আমাকে শত্রু-
 গণের হস্তা, সপত্নীগণের মস্তকে পরম্পাদনকারী ও আমার সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমাকে
 (“ঋষভ”) শ্রেষ্ঠ কর। (২) আমি ইন্দ্রের স্তায় অপরাধের, অক্ষত ও সপত্নীগণের অবমর্দ-
 কারী। এই সপত্নীগণ আমার চরণতলে অবস্থিতি করিতেছে। (৩) গুপ্তের দ্বারা ধনুকের উভয়
 প্রান্ত বেলুপে বন্ধন করে, আমি সেই রূপে এই স্থানেই তোমাদিগকে বন্ধন করিতেছি। হে-
 বাচস্পতি। ইহাদিগের মন ইহাদিগকে একপুং শত্রু করুক, যেন ইহারা আমার অপেক্ষা
 আপনাদিগকে হীন-বলিয়া মনে করে। (৪) সর্বকর্ম সম্পাদনসমর্থ তেজস্বী দ্বাভা-আদি-
 তোমাদিগের পরিভবেব লক্ষ্য আসিয়াছি। তোমাদিগের চিত্ত, তোমাদিগের মুক্তসাংখ্য ও
 তোমাদিগের পরাক্রম আমি স্বয়ং করিয়া হইতেছি। (৫) তোমাদিগের ‘যোগ’ (উপার্জন-
 ১২ নীতি) ও ক্ষেমেব (রক্ষণশক্তি) দ্বাভা আমি যেন শ্রেষ্ঠ-প্রাপ্ত হই। আমার পদ-যেন
 তোমাদিগের মস্তকের উপর পতিত হয়। যেরূপ জল মধ্য হইতে ভেকগণ শব্দ করিতে
 থাকে, সেইরূপ তোমরা আমার পদতলে থাকিয়া চীৎকার করিতে থাক।

১৩ ঋক ভাগবত অনুমান করেন, এই স্তোত্র উল্লিখিত “সপত্নী” শব্দ, “সপত্নী” শব্দের
 পুংলিঙ্গ। সমানপতিকা। রমণীগণ-বসি “সপত্নী” নামে অভিহিত হন, তাহা হইলে রমণীর
 সহপতিগণকে সপত্নী ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। কলতঃ, ইহাই-সপত্নী-শব্দের
 আদির অর্থ বলিয়া অনুমিত হয়। এতদনুসারে-সুতরাং যেমন জ্যোতিষ-সপত্নী, ভীম সেইরূপ
 অর্জুনের সপত্নী। সপত্নীগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ থাকে, সপত্নীগণের মধ্যেও
 ১৪ সেইরূপ শত্রুতা থাকা স্বাভাবিক। লেখক আরও বলিতে পারিতেন যে, সপত্নীগণের এইরূপ
 বিদ্বেষপরায়ণতা হইতেই পরবর্ত্তিকালে শত্রুসমাজকে লক্ষ্য করিয়া সপত্নী-ব্রত ব্যঞ্জন হইতে
 লাগিল; এবং কালক্রমে বহুপত্যাক্রম-বিবাহ-আর্যসমাজ হইতে দূরীভূত হইলে সপত্নী
 শব্দের প্রাচীন অর্থ বিলুপ্ত হইয়া, উহা “শত্রু” শব্দের পর্য্যায়ভূত হইল।

১৫ সর্বানুগ্রহসংপ্রদাতা কাত্যায়ন-বিরাজের পুত্র, স্ববভুকে (স্বভো-বিরাজঃ) এই স্তোত্রের
 ১৬ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। লেখকের বিবেচনায়, ইহা কাত্যায়নের অমৃত পৌরাণিক-
 গণের কল্পনামাত্র। তিনি বলেন, বস্তুতঃ বিরাজই এই স্তোত্রের ঋষি। কারণ মূলে প্রথম ঋকেই
 আছে, “ঋষভঃ মা সমানানাং... হস্তারং শত্রুনাং কৃষি বিরাজঃ।” অর্থাৎ, “আমাকে সমকক্ষ
 ১৭ ব্যক্তিগণের মধ্যে ঋষভ বা শ্রেষ্ঠ কর; * * * বিরাজকে শত্রুগণের হস্তা কর।” এখানে “না”
 এই দ্বিতীয়ান্ত গণের সহিত বিরাজঃ পদের অর্থ করিলে, অর্থের স্বসঙ্গত ও সঙ্গিত হয়, এবং
 বিরাজই যে এই স্তোত্রের ঋষি, তাহা স্বীকৃতি আর কোনও-কষ্টই হয় না। সুতরাং “স্বভো-
 ১৮ বিরাজঃ” এই কল্পনা শিথিলমূল হইয়া পড়িতেছে।

১৯ লেখক বলেন, এই স্তোত্রের প্রথম ঋকে-বিরাজঃ নামক কোনও ধনবান ব্যক্তি তাঁহার সপত্নী-

পঞ্চম মধ্য প্রেতগণভব জন্ত (ইজের-নিকট) প্রার্থনা করিতেছেন। সমস্ত সপত্নগণকে পরিত্রিত করিয়া বিবাহ প্রতিষেধিত হইয়াছিলেন, ইহাই বিতীর মন্ত্রের তাৎপর্য। অতীত নর পাঠে অস্থিত হইবে, বিবাহের সপত্নগণ বহুদিন না ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল না। জীব সহিত সপত্ন্যোগ কবিত্তে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত তিনি তাহাদিগকে বন্দী বা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। চতুর্থ বৃকে বিবাহ তাহাব সপত্নগণের সমক্ষে আত্ম প্রশংসা কর্তন করিতেছেন। পঞ্চম বৃকে সপত্নগণকে শেষ পর্যন্ত বন্দী তাবে-বাধাই-বিরাগেব অভিপ্রেত করিয়া বোধ হইতেছে। লেখক এই ক্ষুদ্রকে “সপত্নমুক্ত” নামে অভিহিত করিয়াছেন।

উপন্যাসের বক্তব্য এই যে, অধ্যাপক ভাগবত মহোদয়ের অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। কবিগণ অতি প্রাচীন কালে যখন আধা বনবীর্ণের মধ্য সহবাস নবকে, মালাবারেব-নামক জাতির ভ্রমর ঝোড়ার ও নিয়োগ প্রভৃতির বিধি প্রচলিত ছিল, তখন যে কেনিও সময়ে ভ্রাহ্মদিগের মধ্য-বহুপত্যাক বিবাহেব প্রথা ছিল না, একথা বলা যায় না। বিশেষতঃ, যখন মহাভাবতে পৌতমবংশীয়া জটিলাব সপ্ত বানী, বাল্কানারী মুনিজ্ঞারী-রশ্মি শর্মা ও দ্রোণদীপ-পঞ্চ-বানী ব্রহ্মণেব-বিবরণ কখন প্রসঙ্গে এই প্রথাকে “সনাতন-ধর্ম” বলা হইয়াছে, তখন অধ্যাপক ভাগবতের অনুমানকে অমূলক মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ভাস্কর বর্ষাব উপানক সপ্তদাব-নামক গ্রন্থেব প্রথম ভাগেব ভূমিকাব এক স্থলে অথর্ব-বেদসংহিতা হইতে বহুপত্যাক বিন্যাসেব অমূলক যে বিধিব্যাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও পুরোহিত নিত অনুমানের-পরিণামক-পার্বত্য কালে, “নৈকস্তাঃ ব্রহ্মঃ সহপত্যঃ” এই ক্রিতিব্যাক্যেই প্রথা নিবারণিত হইয়াছিল।

জাপানী পুরাণ।

কত বর্ষেব ভয়ঙ্কর সংগ্রামের পর হইতে চীন ও জাপানের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি-পতিত হইয়াছে। চীন ও জাপানের বিবরণ শুনিতে এমনও অনেক সমুদ্রক। বিগত আগষ্ট মাসেব “কেননকোজি” পত্র “জাপানী পুরাণ” সর্বাঙ্গ এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। জাপান-প্রত্যাগত কোনও লেখক সেখানকার পুরাণপাঠগ্রন্থ ও পৌরাণিক আচার্যিক সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনে এই প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত প্রবন্ধের নাক্ষে উদ্ধৃত হইতেছে।

জাপান-প্রত্যাগত লেখক বলিতেছেন, “আমাব জাপানে অবস্থানকালে, ‘চৌতযাজীর মন্দিরে’ প্রায় সাতের ৮ই ১৮ই ও ২৮ পে তারিখে পূর্ণা পাঠ হইয়া থাকে। এই মন্দির-বিজ্ঞাপন-প্রত্যাহ-আমার নিকট আসিত। প্রত্যাহ সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া, একদিন আমার মনে জাপানের পূর্ণা পাঠপ্রবণের জন্ত বিশেষ উৎসাহ জন্মিল। চৌতযাজীর মন্দিরে, আমার ভায়-বৈদেশীষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ নহে শুনিয়া, একদিন আমার দুই বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, পূর্ণা প্রবণের জন্ত মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরের ধর্ম্যাধ্যক্ষ সাদরে এই বৈদেশিক-গণের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমরা যে মন্দিরে পূর্ণা-প্রবণের জন্ত গমন করিয়াছিলাম, তাহাও পূর্নোভাগে এক বিস্তীর্ণ সভানুগুণ; সভানুগুণেব সম্মুখে একটি বিবিধপুষ্পতকপূর্ণ উদ্যান, স্থানে-স্থানে স্থাপিত বহুপ্রস্তরনির্মিত কাককাঁচার নানাবিধ কুজিন-বৃক্ষ ও জটন নমুহ মন্দিরের শোভা বর্ধন করিতেছিল। মন্দিরের একাংশে কবকঠাকুবেব জন্ত ব্যাসপীঠ ও তাহার সম্মুখে একটি বিশোভিত টেবিল স্থাপিত। টেবিলেব উপর একটি দণ্ডী, কয়েকটি ধূপপাত্র, ও এক রেকাবীতে

হলর-বস্ত্রে মণ্ডিত একখানি পুৰাণ-গ্রন্থ। পাশের দিকে ঠেমান দিখা-বসিবার উপযুক্ত একটি কেদারাও তাহার নিকট একটি ক্ষুদ্র ভেরী (ছোট-চোল)। এক কোণে একটি ছোট চৌকির উপর একজন কেরাণী বিরাজমান। মন্দিরের আঁখি ব্যস্তের হিঙ্গাব রাখা তাঁহার কণি। কেবাণী বাবু তাঁহার বৃহৎ চশমাটি নাকে দিয়া কর্ণ দুই পাতিয়া বসিলে, তাহাকে ততদোনিরিশেষ বলিয়া বোধ হইত।

চোওয়াজীর মন্দিরে পুরাণশ্রোতার সংখ্যা তেমন বেশী নোণা গেল না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে পুরুষেরা প্রাচীন, মস্তকে টাকবুল বৃদ্ধ উগ্রমুখি ভণ্ড সন্ন্যাসী, দরিদ্র বণিক, ও কৌতুকময়ী অন্নবৎক বালকের সংখ্যাই অধিক। আররা মন্দিরে প্রবেশের অলক্ষণ পবে বহুসংখ্যক দানদাসীপবিত্রতা ও বিবিধ বেশ ভূষা সম্বন্ধিতা একটি মহিলা বিশিষ্ট আড়ম্বর সহকারে মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাবভাব ও বেশবিছারের মধ্যেও একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি আসন পবিত্র পূর্বক, স্বীয় পাইপ-বাহির কবিতা বিশেষ ভঙ্গী সহকায়ে ধূসপানে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর শ্রোতৃগণও তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দেখা গেল যে চুপুট সমূহ ধরচালিতবৎ ঘর ঘন এক হস্ত হইতে হস্তান্তরে নীত হইতে লাগিল। পূর্ণপাঠ আরম্ভ হইবার পূর্বে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা এই প্রকার আনন্দ প্রমোদে অতি-বাহিত হইল।

কিরৎক্ষণ পরে সভাসমুদয় হইতে সজ্জীতজনী উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। জনন কেরাণী বাবু চৌকী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববর্তিত কেদারার উপবেশন পূর্বক তালে তালে ভেবী ধনি করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গও সেই সজ্জীতে যোগদান করিলেন। শ্রীহরান সজ্জীতে বক্রবা এইরূপ, —“নাম্মিয়ে ওবেলগোক্রিয়া।” ইহা বোধ হয়, সংস্কৃত “নামস্যাং ওরদাথাং” বাক্যের অপভ্রংশ হইতে জাত। জাপানী ভাষায় এই মন্ত্রের কোনও অর্থ হয় না। সেখানকার মন্দিরের পূজক বা পুরোহিতগণও এই মন্ত্রের অর্থ জানিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না। ইহা “মিচিরন” নামক বৌদ্ধপন্থাবলম্বিগণের প্রধান মন্ত্র। শ্রোতৃবর্গ পুনঃ পুনঃ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে বেত ও বক্রবর্ণ-রেশমী চোণী পরিয়া কধকঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে একজন শিষ্য; তাঁহার হস্তে সোনারী স্ত্রীর কাপড়ে বাঁধা “ছোট্ট” নামক একখানি ধর্মগ্রন্থ। বক্রগ্রন্থখানি টেবিলের উপর একটি রেকাবীর মধ্যে রাখিত হইল। মন্দিরের মধ্যভাগে একটি বেদী (জাপানী ভাষায় টোকোনোবা) বেদীর উপর একখানি দেবমূর্ত্তি-অঙ্কিত চিত্রপট। কধকঠাকুর সেই চিত্রপটের-বল্লভ পূর্বক ব্যাসপীঠে উপবিষ্ট হইয়া, শ্রোতৃ-গণের মনোবোণ-আকর্ষণের ক্ষমতা বার-বকী নির্দাশ কবিলেন। তার পর, ধূপ জালাইয়া, ধর্মপুস্তক হইতে কয়েকটি মন্ত্র পাঠ কবিলেন। সকলেই তাঁহার সঙ্গে সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এই সকল মন্ত্র-প্রাচীন চীনা ভাষায় রচিত ছিল—বলিয়া তাঁহার অর্থ তদেদর্শনাদিগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয়।

মন্ত্রপাঠ শেষ করিয়া কধকঠাকুর গ্রন্থবন্দনাৎ প্রবৃত্ত হইলে, শ্রোতৃবর্গ পদসার পরিয়া বাঁহি টেবিলের অভিমুখে-নিষ্ক্রেপ করিতে লাগিলেন। কধকঠাকুর সে দিকে ক্রক্ষেপমাত্র না করিয়া গভীর ভাবে সেই ধর্মপুস্তক হইতে আরও কতকগুলি কবিতা পাঠ কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে, বোধ হয় কোনও দুর্ভাগ্য শ্রোতা পদসার-একটি পুবিধাতে হাত দিয়াছিল, আর অমন কেরাণী বাবুটি তাঁহার উপর চট্টা আকাশপাতাল এক করিয়া কেলিলেন। এইরূপে সে দিনকার অভিনয়ের প্রথম অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল।

বিত্তর, অক্ষের প্রারম্ভে চাপুর্ণ পানপাত্র হস্তে জনৈক মণ্ডিতমস্তক বালক-ব্যাসপীঠের

সরোপে উপস্থিত হইল। কথকঠাকুর তাহার হস্ত চইতে গানগজ গ্রহণ পূর্বক এক নিশ্বাসে ছিহ্ন মুগ্ধ কবিতা কেলিলেন। বালক পুনর্বার একপাঠ ও তার পর আর একপাঠ চা-আনমনে কবিল। কথক মহাশয় পূর্বপদে সেগুলিও বিশেষ্য করিলেন। পানাস্তব তিনি সন্তোষে আরও কবিলেন। ঠাহার সেদিনকার রক্তব্যবস্থা অতিশয় সরল ও সর্বজনপরিচিত ছিল। তিনি পূর্বোক্ত হোক্কী নামক গ্রন্থের অধ্যাববিশেষ অবলম্বনে সেদিন উপদেশ প্রদান করিয়া দিলেন। মধ্যে মধ্যে, তাহার এক একটি উপদেশ শেব হইলে, শ্রোতৃগণ উচ্চৈঃস্বরে "নমাস্মিয়ে" এই বাক্য উচ্চারণ দ্বারা তাহার মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন। কথক মহাশয় সন্তোষে বদনে বলিলেন,

"কিশিমোজিনেব উৎসব উপলক্ষে আপনাদিগকে সকলে পবিত্র জায়গায় এ স্থলে সমবেত হইয়াছেন, দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। (শ্রোতৃগণ একবাক্যে 'নমাস্মিয়ে' 'নমাস্মিয়ে'।) আমার সূচ-বিবাস যে, আপনাদিগকে কিশিমোজিনের কপালান্তরে জন্তু চেঁচাই কবিত্তে কর্তন ও পশ্চাৎপদ হইবে না। মানবগণ সংসারায়িত্তে পতিত হইয়া, যজ্ঞসভ্যের নিমিত্ত নিবস্তুর চেঁচাই কবিত্তেছে, এই কারণে ভগবান কিশিমোজিন সর্বদা তাহাদের দৃষ্টি-দ্রবিত্ত হইয়া থাকেন। (সকলে-বৃত্তজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণ স্বরে 'নমাস্মিয়ে'। 'নমাস্মিয়ে'।) কিন্তু সত্যের প্রতি অনুগ্রহ না থাকিলে, কিশিমোজিনের পূজা না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন নিরর্থক। কারণ বাহ্যেব-জগৎ সত্য প্রীতি নাই, দেবী তাহাদের প্রতি ক্ষিপ্ততাই সদয় হয় না। মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ স্বর্গপুণ্ড্র ও দোষী, তাহাদের কামনার ক্ষিপ্ততাই শেব হয় না। কিন্তু অন্তঃকরণ সত্যীয় না হইলে, নহল প্রার্থনাত্তেও তাহাদিগের কামনা পূর্ণ হইবার নহে। আপনাদেব স্বয়ং স্বয়ং সত্যনিষ্ঠ, রিহাসপূর্ণ ও সূচপ্রীতি হয়, তাহা হইলে দেবী আপনাদিগকে সমস্ত প্রার্থনাই পূর্ণ করিবেন। ইহাই-মানবের প্রতি আসাদিগের ধর্মমতের প্রবর্তক মহাত্মা নিচিরনেব উপদেশ ও পরমাত্মা বুদ্ধের পবিত্র আদেশ। (সকলে ভক্তিভরে, 'নমাস্মিয়ে'! 'নমাস্মিয়ে'!।)

"অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ সরল ও পবিত্র হইলেও, কাম, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য, দ্বেষ, ভয় ও সন্তোষ, এই সপ্ত বিকার তাহাকে বিকৃত করে। স্বপ্ন, স্মরণ, স্মরণ, স্মরণ ও স্মরণ, এই পঞ্চ বাসনা রূপ অনলের দ্বারা মানবগণ নিবস্তুর দক্ষ হইতেছে। মনুষ্য জন্মগ্রহণ মাত্র পূর্বোক্ত পঞ্চ বাসনাব-বশীভূত হইয়া অন্তঃকরণকে অন্ধকূলে নিক্ষেপ করে। এই কারণে, পরমাত্মা বুদ্ধ এই দৃষ্টান্ত সংসারের প্রতি বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। (সকলে সহানুভূতি ও সন্তোষপূর্ণ স্বরে, 'নমাস্মিয়ে'। 'নমাস্মিয়ে'।)। মানব দেহের জ্ঞান অসঙ্গল ও স্থিতি-স্থায়্য বিন-ব্রহ্মত্ব আর নাই। বুদ্ধদেবেব আদেশপালন ব্যতীত এই মনুষ্যপ্রাপ্তি-অপবিত্র শরীর, বিমল ও স্বতঃপাপ হইবে কিরণে?

"কবিবর 'সায়ীজীও'র কবিতার ও 'রঞ্জীবোসংহ' নামক গ্রন্থে মানবজীবনকে পুণ্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পুণ্যের দৌলভ্যের জ্ঞান মানবজীবনের দৌলভ্য ও স্বপ্নভর। মনুষ্যগণের মধ্যে অনেকই সংশ্লিষ্টচিত্ত ও গতানুগতিকের অনুগ্রহী হইয়া বাসনানিলে নষ্ট হইতেছে। বুদ্ধদেবের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন এই অনল হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। বাসনানিলের জ্বালায় শিখার হস্ত হইতে বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার উপদেশ মনুষ্যজাতিকে ত্রাণ কবিত্তে সক্ষম। (সকলে 'নমাস্মিয়ে'। 'নমাস্মিয়ে'।)।

"এ বিবরে ভোমাদিগকে একটি উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা 'রোহুসংহ' নামক কোনও স্থপতিতৈবজ বুদ্ধদেবের সহিত এক অরণ্যের মধ্যে দীর্ঘ গমন করিতে ছিলেন। বনমধ্যে নানাজাতীয় মনুষ্যের অস্থিরানি নিগতিত ছিল। তদ্রূপ হইতে একটি

কবোটা উদ্ধৃত করিয়া বুদ্ধদের সেই দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কবোটা বাহার, সে কোন দেশীয় ও কিরূপ চরিত্রের লোক ছিল? এবং এজন্য বা সে কোথায় গিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে?” দৈবজ্ঞ কবোটা পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। বুদ্ধদের আব একটি কবোটা উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে পূর্ববৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু দৈবজ্ঞ এবার বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাব সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিল না। তখন বুদ্ধদের বলিলেন, “এই কবোটা বাহার, সে ব্যক্তি আমাদের কোনক শিষ্য ছিল; সে বাসনার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছিল বলিয়া তাহাব সম্বন্ধে তুমি কিছু বলিতে পারিলে না।” ইহা শুনিয়া দৈবজ্ঞ অতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং সেই দিবস হইতে বুদ্ধদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। সেই দৈবজ্ঞের দ্বার সুকলেরই পরমাত্মা বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। (সকলে ‘নমাম্বিহো।’ ‘নমাম্বিহো।’)

ধর্মপুস্তকে আমরা যে মুক্তির বিষয় পাঠ করি, তাহা স্তিতান্ত-ভ্রমাপ্য নহে, এবং উহা প্রাপ্তির জন্য এই নথব দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমনেরও কোনও আবশ্যক নাই। বিষয়বাসনা পবিত্যাগ কবিত্তে পারিলে, তৎক্ষণাৎ বুদ্ধের বস্তুগত প্রাপ্তি ঘটে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মুক্তিলাভের জন্য বিষয়বাসনা পবিত্যাগ কবিত্তে হইলে, আমাদেরগকে সহাত্মা নিচিরেনের উপদেশ-সত্ত প্রথমে জন্মকে সত্যানুরাগেব দ্বারা পূর্ণ করিয়া, পরে “নাম্বিহো ওয়েনুপোকিয়ো” এই সত্ত পাঠ করিয়া উপাসনা কবিত্তে হইবে।

এইরূপে ব্যাখ্যান শেষ করিয়া কথকঠাকুর হাত্তমুখে ষেকগুণেব শ্রোতৃগণের দিকে চাহিলেন, তাহাতে বোধ হইল, এতজন যে ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইল, তাহা সমস্ত যেন (ভাষার সত্তে) একটা ভাষা মাত্র। এবং শ্রোতৃবৃন্দ ও সুকলেই “নাম্বিহো” শব্দের দ্বারা তাহার অনুমোদন কবিলেন। অনন্তর কেরাণী সহায় পুনরাব গীতাদ্বা আবস্ত করিলে শ্রোতৃগণ হাতে বোগ দিলেন। এই প্রার্থনাসম্বীত শেষ হইবার পূর্বেই, কথকঠাকুর ব্যাসপীঠ হইতে প্রস্থত করিলেন। তাহার শিষ্য টেবিলের উপবিস্তৃত ধর্মপুস্তকটি লইয়া গুরুদেবের অনুগমন করিল। এইরূপে সে দিনকাব পূর্ণাঙ্গপাঠের ব্যাপার সমাপ্ত হইল।

শ্রীমথারাম গুণেশ দেউকর।

রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা।

নয়ন-আর-বায় না।

একদিন বেলা ছটার, রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়,

হবে অতি ক্রুদ্ধ দিনের দাক্ষণ দীর্ঘতায়;

সে হুগ প্রমোদে, শুয়ে, উঠ, বোসে,

দিন স্নান বাব না' বলেন শেষে বোসে।

বাহিরেতে এসে, এদিক ওদিক দেখে,

বাড়ির-সব ভূতাপগণকে পাঠালেন ডেকে;

বলেন “বেটা রামা, তোর গায়ে নেই যে জাম?”

বোলাও শূর বাবুটিকে—বোলাও খাঁলাসা;

পাড়ে হারামজাদা,

তোব গৌক যে বড় সাদা?

দক্ষা দাব তোনু ত ঘেখ,

বৈঠকে বৈঠকে খাতা-হয়;

বাও লে-আও চাবুক—এই চন্দ্র কাঁহা

খাতা হায়?

এই সর্দাবকা নাম কা?

“হুগু-হুগারাম”—কেবা—

হুগারাম?—নিকালো উকে,

বজাং নেই কুছ কামকা।

এই প্রকাণ্ড মেজাজ কাউকে দিলেন ছাড়িয়ে, বন্ধ হবৈ ডান হাতের ব্যাপার; ঘুর চরবে-
নোবডবে সখুধ থেকে কাউকে দিলেন

খিটে

ভাড়িয়ে; এই কথা শুনি, মনী ও গুণী,
কাউকে দিলেন নানা গালি মিষ্ট হুজুয়াতি; পণ্ডিত ও পারিষদ ও সভা সমাজ,
কাউকে দিলেন চাবুক, কাউকে নিলেন লাথি। এসে হইলেন হাজির হয়ে মহা ব্যস্ত।

তবু সময় যায় না; পরে 'ডুয়িং-ক্লেশ' পৌছে, সবাই এলে বসেন রাজা গোপীকৃষ্ণ রাব-
নিম্নাস কেলি বসিলেন গিন্নে-এক কোচে; "বোলে আসছি তোমাদের-কবিতা উপায়,
দেখলেন একটা সাধা বিড়াল শুবে আছে নীচে, বা তে বিপদ সময়টা শীঘ্র কেটে যায়;
অমনি লাঠি নিয়ে বাজা ছুটলেন তাঁব পিছে। তোমরা অতি বখ, ঘোব অকর্মণ্য,
বিড়ালটা লাঠি ধেবে, বুন থেকে উঠে, পাল্লো না ত কোন উপায় কহে এর জন্ত,
চারিদিক দেখে, উঠল সেখান থেকে; আজ এটা নির্দ্বাবদ কর-অবিধবে,
সে প্রহর সবদে, ভাল কি মন্দ এ, এখনই সকলে ভেবে, নহিলে নিতবে,
বৈশা আশ্বিনান নাক'রে পালিয়ে গেল ছুটে; পুর্বে ও শিরে, পড়িবে অচিবে,
শুধু একবার মাথা নেড়ে, হেঁচে, কয়ে 'মেউ', নরতম সজা প্রণায়, অতি যনপুত-
দব-ভজলোকে এমন করে নাক কেউ। শপাশপ চাবুক ও সন্ন্যাস জুতো।"

রাজা কেব-বসিলেন 'কোচে' ফ্লিষ্ট প্রাণে;
দেখিলেন দীনভাবে চেয়ে বড়িপানে;
পড়িলেন বুবে, শৌচের উপর শু'বে,
নিলেন একখানি ছবিডানা উপস্থাস হাতে;
এমন কি ওস্তাদেনও দুই চারি পাতে;
কিন্তু তাতেও খিলেন পবে অসমর্থ;
বোধ হল বই নার কারি শক্ত বই;
অসমর্থ পাখা; নাইনগুণে সোজা,
কিন্তু তার ভাবগুণ না এত এক বৈকা,
যে যেন সে উঠে কিবা পারিষদ ভাবায় লেখা।
ডা'নদিক থেকে বাদে, বা থেকে ডানে,
নিখি তাব একই রকম মানে।

বই দিলেন ছুড়ে, দশ হাত দূবে;
উঠিলেন হাঁড়াইয়া-দু তিন ঘন বুরে;
ভাকিয়ে নিজের চেহারা'য় ঘরের বড় আয়না'য়
বলিলেন পুনবার, "সময়-আর যায় না এ।"

শেষে খড়ি দেখে, পাঠালেন ডেকে,
অন্নোবর্গে, প্রারিবে তাহার-বাড়ি থেকে;
দিলেন এই আজ্ঞা যে 'শীঘ্র ও ক্রত'
হবেন তাঁরা হাজির, নইলে নানা রকম জুতো
কড়া ও মিঠে পড়বে তাদের গীর্থে,

গতিকখানা দেখি, সবাই ভাবিল 'একি,
প্রস্তাব অবিধার; নিশ্চয় নিঃসন্দ,
'বেঙ্গলড্রি' চপিয়াছে মহারাজার স্বল্প।"
সবাই শুবে সারা, ভেবে দিশেহারা,
কিসে প্রশস্তির সাহায্য সিদারিণ কোপে;

সভায় নাহি শব্দ, সকলে নিতক;
কেউ টিকী নাড়ে, কেউ চুলকোব ঘাড়,
কাবো হাত-গুণ্ডুলে, কাবো হাত গোঁড়ে;
কারো পেল কাছি, কেউ বা নিদানি-
তাকায় আগে, পিছু গানে,
উপবে ও নীচ-পানে,
দেওরালে, কড়িতে, পাখায়; অর্থাৎ সর্বস্থানে;
কেবল কেউ ডাকায় না ক'রাজার নুখ পানে।

কহিলেন রাজা পুন: "জীবনটা ঘোর-কাঁকা;
হুবিয়া হোল না কিছু থেকে এত টাকা;
সময়ই জীবনের প্রধান বিপদ;
জীবনের প্রধান কার্য ক'বা সময় বধ।
শুনি কাকব কাকুর সময় হাওয়া'ব মত ছোটে;
আমাব সময়টা-ত দেখি এগের না ক
মোট
কিনি এত হাতি বোড়া, চড়ি এত পাড়ি,

এত নাচ এত গান দেই বাজবাড়ি ;

রাখি এত পাবিবদ মাইনে দিবে ধনে'-

রাগীতে বাগীতে গেল অন্দরমহল ভবে,

সময় যায় না ক ;—মুসলমানদের কালও

এ বিষয়ে ইংবেজদের চেয়ে ছিল ভাল ;—

তখন নবাব, রাজাবা ত, পেত বার মানই—

সময় কাটার ক্ষমতা দিতে প্রজাদের ক'সি ;

এখন সময় টিক বেন কাহিমের মত হাতে।

—বল দেখি কার সময় কি রকমে কাটে ?

তখন উঠিলেন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায়,

নিবেদিত কি বকমে তাঁর সময় যায়।

—“মহাভারত—করিতা ও নভেল ও নাটক

লিখনে ও পাঠে বেশ সময় কাটে,

আমার লেখার হোক বা নাই হোক পাঠক ;

কেউ তাতে দেখ নাক গালি, কিম্বা আটক।

স্তর-দ্বয়ের কাছ হাই না কতু ভ্রমে ;

নাটক, নভেল, লিখি বিনা পরিশ্রমে—

দুচাবধান বই বুঁজে, সহজে চোখ বুঁজে,

বিজ্ঞান, দর্শন, অথ কিছু নাহি বুঝে,

সময় বেশ কাটে রাজন—কিছুই না শিখে,

নাটক, নভেল, গড়ে ;

আর নাটক নভেল লিখে।”

বলিলেন রাজা তবে, মাথাধ হাত রাখি,

হাঁ বাবা বরাটে, তাদের সময় কাটে

একপে অনেক, কিন্তু তবু থাকে বাকি।

—সে যা হক, পূর্ণচন্দ্র তুমি জতি ছাগল,

নির্বোধ ও গণ্ডমূখ, নিরুদ্যম ও গাংল।

আব জতি ‘পাকা’, রাজ্যগাবে ফাঁকা,

খাও দাঁও, বলে থাক; উড়ো-বাগেব-টাকা।

—সর্দার। পূর্ণচন্দ্রে না কবে’ বিছু ঘেনী,

বিদায় করে’ দাঁও দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্রে ঘেনী।

কবির পাহারা শীঘ্র ছকুম-তামিল রাজার ;

করিলেন-পূর্ণচন্দ্র এবস্থিৎ সাজাব

সমাপ্তি নানা ; বলিলেন “না না—

দোহাই ছকুর”—সর্দারকে কবিলেন দানী ;

—সব বুঝা—পূর্ণচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে,

গেলেন লজ্জার আর কারো পানেতে না চেয়ে।

কহিলেন উঠে তবে নন্দলাল দত্ত।

“মহাবাজ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সম্ব—

অধিকারী আমি ; লিখে উদার প্রবন্ধ,

ইংরাজ ও বড়লোককে দিয়ে গাল মন্দ,

চলে যায় পেটে ; দিন যায় কেটে

সুখে ;—ধর্মের এবং দেশ হিতৈষিতার ভাণে,

করি বেলাগেল, কায়েই অনেকই জানে।

মহাবাজ সংবাদপত্র লেখা-অতি সোজা ;

দবকার শুধু ইংরাজি গজ গুলো ধোজা ;

আর খাত নোকদের চরিত্র নিয়ে বাটা।

কদাচ “লাটবেল” কবে-চাই জেল বাটা।”

রাজা বলেন “বটে, বুদ্ধি নাইক ঘটে

বাদের, তাঁদের ই’তে অনেক সময়

কাটে জানি।

কিন্তু তবু বাকি থাকে সময় অনেক থানি।

নন্দ তুমি ভাড়া—বুদ্ধি অতি ত্যাড়া ;

সর্দার। এব দশবার নাক ধরে নেড়ে

১৭ কাঁচটি দিয়ে করে দেও ছোড়ে।

ক্রমে কাঁচের পরিণত রাজার আদেশ ;

সে রকমে থানিক সময় কেটে গেল বেশ।

দত্ত জতি ক্রিষ্ট, আর অবশিষ্ট

সবাই বরণ সে সাজার হইলেন হুট।

কহিলেন জীবন সরকার উঠে “মহাভারত।

হিন্দু ধর্ম সংরক্ষণ কবা আমার কাজ ;

কবি ব্যাখ্যা ধর্ম, ভাগবতের সর্ম,

বেদ, দর্শন, ময়, মূর্তি—সংস্কৃত না শিখিই,

প্রচারি ধর্ম প্রজ্ঞা—চালাই এতথান

মাসিকী,

ইতে বলেন সরকার “বিদ্যে নেইক

দবকার ;

বলা দবকার “ইংবেজ মূখ, হিন্দু বাই সব ;

তাতে আমার মাসিকপত্র কাটে “অসম্ভব।”

রাজা বলেন “কর্ম না থাকিলে ধর্ম

নিয়ে নাড়াচাড়া আব মাসিকী ময় মন্দ ;

কিন্তু তা কবেও সময় থাকেই নিঃসন্দ্ব।

কিন্তু তোমার সরকার, কিছু শিক্ষা

দরকার ;

সদাঁদ, এ গল্প বা মাথা কামিয়ে গেঁবিল
জল পাঁচি—
দেশে দেওয়াও নাকে খত ৩০ পত্র পাঁচি ।
ওনে এই-বাঁধি জীবন গেলেন বড় দমে,
উত্তরপ দাত-হয়ে, নাক দ্বারা ক্রমে,
৩০ পত্র-পাঁচি, মাপিলেন পাঁচি,
নাসিকার হস্তপদে ভতরুর ইঁটি ।

চাবুক খেলে শুটু-চীৎকাবিলেন অষ্ট
এবং তিনি যে এক মহাবত্ত অতি-মুগ্ধ
রাজার সে খেতাব করিলেন প্রতিপন্ন ।
১৪
বলেন শ্রীতিনকড়ি-ঘোষ ভখন উঠে—
“মহারাজ, আমাব সবয় বায় ঠিক ছুটে,
অতি তাড়াতাড়ি, যেন রেল গাড়ি,
খেয়ে-দেখে, আর খেলে তাস, পাশ,

কহিলেন উঠে তরে শ্রীখান গোস্বামী—
“রাজন, হিন্দু-গমাজের সবেদুক আমি—
আমার কাজ অতি-সোজা—হিন্দু-মার চলি,
হিন্দু-গমাজের মধ্যে করে দলাদলি ।
বদি কোন প্রভু—একাত্তে-খান-কড়—
কুকুট ইত্যাদি, ভাগ-আমারে না দিয়ে,
হলফুল বাধিয়ে দেই সে-ব্যাপার নিয়ে ।
বদি কেউ নিরে, বিধবার দেব বিরে;
কিবা কেউ ফিরে আসি বিলেত

দাবা—
তা'তে শুধু সময়?—বার সময়ের বাবা ।
করি সিলে কয় এয়াব করাগেতে বসে,
‘পজা’ ‘কচেবার’ জাব ‘কিত্তি’ দেই কসে;
মাঝে মাঝে টানি হাঁকা-তাকিয়ায়—
১৫
তাহে আমাদের সন্নয়টা কেটে বায় বেশ ।”
রান্না বলেন না, না, আমার আছে জ্ঞান,
খেলে সময় অনেক বার, তবু সব বাব-না,

কিন্তু গিয়ে, তিনকড়ি ঘোষ, তুমি একটা মোব—
তখন বলি ‘লাগে’; আধাঙ্গিক রাগে,
বাই-তার মস্তকট চিবিয়ৈ যেতে লাগে;
পেলে মোলা-লোকের একগ বৃত্তি বিজাটে
এই রকম গোপেন্দ্রনাথ অনেক সময় কাটে ।
বলিলেন গোপীকৃষ্ণ বিয়ন্ত ও রিষ্ট,
“দলাদলি কবেও মস্ত থাকে অবশিষ্ট ।
বাহোক তুনি ঘোর, বিভীষিকার মোর;
সদাঁদ বেড়াও ১২ বাব টিকী ধবে শুব;
আব-স্রাবো ২৫ চড় গালেতে সজোর ।”
১৬
যে ২৫-৫৫ এবং ১২ টিকীপাক,
বাহিরিলেন গোদামীজি চুলকাইয়া নাক ।

সদাঁদ দেও কাটাঁয়া অকর্ণগাটাকে,
অন্তঃপুর হ'তে এল মনোহব কাটাঁ,
চীৎকাবিলেন তিনকড়ি—নবমীর পাঁচা;
সম্মার্জনী আহা, মিকটেও ডাহার,
এমন কিছু নতন নয় ত—মাগই আছে
১৭
তরে কিনা মিঠে হাতে হোলে হ'ত মিঠে!
কহিলেন উঠে তখন কৃষ্ণকমল-মুখো—
“মহারাজ আমি খেলিনে তাস,
টানিলে হাঁকা;
আনি কাটাঁই কোনরূপে লকান

কহিলেন আমজট “পেয়ে পুঁথি বেঁটে,
হিডো-তর্ক করে আনার-সবয় বায় কেটে;
যা কিছু বাঁকি-খাদে, দেই কাঁকি
টিকি-নেড়ে, টিকি বেড়ে, নস্য নিয়ে নাকে;
রাজা-নেড়ে ঘাড়, বলেন “তুমি-ব্রাহ্ম,
নস্য নিয়েও সময়ের অনেক বাঁকি থাকে ।
সদাঁদ-এ-পীঠের উপর আনার-মোড়া
চাবুক,
অতি বেগে দশবার উঠুক ও ‘নাবুক’ ।”

খেকে সন্তো,
আকির খেবে, চলে, শুয়ে হাঁই-তুলে,
বসে ফরাগে, আয়-মিলে কর-এয়ার,
তাকিয়ায়-ঠেসে, বাজা বাচশাহ সন্ধ্যা,
সবাই কবি উড়ে গল্প; আব তিন-ভুড়িলে,
নময়ের চৌদ্দ পুরুষকে দেই-উড়িলে—
রাজা বলেন “কৃষ্ণকমল তুমি অতি হাতি;
দেওয়া-বায় চলে, শুয়ে হাঁই তুলে,
অনেক সময় কাঁকি, তবু থাকে বাঁকি,—

সদীর ছেড়ে দেও এঁরে দিয়ে দশ লাখি।

১২ রঞ্জন-১ লাখি ভোজন,

করি মুখাঙ্গি গো চম্পট দশ দীর্ঘ যোজন।

রাধানন্দ চট্টাউঠে বলিলেন, "রাজা—
আমার সময় কাটে খেয়ে শুনি

এবং সীজা

আর অস্তি সবস, ভাঙ্গ ও চরস—

ভোক্তের মত চলে বাঁধ-মান ও বরষ;

কতিপয় ব্রহ্ম, বর্কর অসভ্য,

এগুলির গোরব চান করিবাবে ধর্ম;

প্রেতের বৎশিন—জ্ঞানেন পুবাণজ সর্ব।

বজ্রা বলেন "রাধা, তুমি অতি গাধা,

পাঁত্রা গুলিতে হায় না সমস্ত বর্ষটি;

"সদ্যব ছেড়ে দেও এঁরে মেয়ে বিশ চটি।"

চটি খেয়ে-চট্টজি ত দিয়ে তিন লাখ,

মভাগুহ হ'তে চোঁচা ছুটিলেন সাক।

১৭

উঠে বলিলেন শেবে বাসকান্ত বন্দ্যো;

—কোলা তাঁর গাল, চোখ তাঁর লাল,

চলি আগে পাশে, এড়ো এড়ো ভাবে;

"কাজ করের সঙ্গে আমার নাই 'নামগন্ধ'।

আমার-সময় বেশ, বার, —রাতি ও

বেস্তায়;

করিনেক আরি কোন ছোট লোকের

দেশ্যর,

মহারাজ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সভ্য;

সহুপায় সময়কে করিবারে বধ,

এই দুই যুগ্ধ জব্য—বেশ্যা ও মদ;

বেশ্যাসক্তি সভ্য এ ছিল পূর্বেও মর্ডে-ও,

আর সোমরল নাহে, ধ্বিরা লেখেনও,

সেক্সলেও এক প্রকার ছিল মদ খেনো।

কিন্তু কড়, কোথায়, হুয়া সভ্য প্রথায়

পানি ছিল না—বীকার সবাই কর্কেন

এই কথায়।

ইয়োজি প্রথায় রাতি কিবা হইলি পান,

সময়-কণের আতি অব্যর্থ সম্মান।

বেশ্যা ও মদ, উৎকৃষ্ট ও বধ,

বাদের সময় ভারি হয়—মাথার-উপর ঝোলে,

বেগে বিদ্যাবৎ ইত্তে দিন বার চলে";

তাবা ছোট করে নাক শুধু দীর্ঘ সময়,

তারি ধাটো করে দেব—এমন কি—'এমন'।

বাজা বলেন ইত্তে সময় বাব বটে দ্রুত—

কিন্তু তবু বানিক বাকি থাকেই,—বস্ততঃ

—তুমি অতি শুখোর, স্বভাব অতি কু, ওব

ধরে মুখে মারো সদীর ৭ বট ভুতো;

খেয়ে ৭ ডলনের অভ্যন্তর-বুট,

রাসকৃত্তের অবিলখে নেশ্যা পেল ছুট।

১৮

সবারে ভাড়িরে দ্বিমে—বেলা তখন ভটা

রাজার মেজাজ হ'ল আবারি বারিও চটা;

বসলেন গিয়ে বেগে, বাড়ি বন্থো বেগে;

বলিলেন-পেয়ে—"হায় এখনও-দ্রুতটা";

—ক্রীষেব বেলা—কিই বা করি এতক্ষণটা?

কবেছেন অতি মূর্খ অপদার্থ ব্রজা,

জীবনটা যোর ছোট ও সময়টা যোব-লবা।

লিখলে পড়লে চোটে মাথা ধরে' ওঠে

সে জন্তে-সে কাজ কর্তে পারিনাক মোটে।

—জমীদারী কাখে যন বসে না;—তা যে

নীরস; আর কাঁধ কর্তে বাজাদেব কি সাজে?

দেশিয়াছি বহু উপায়-কাটাইতে বেলা;

অনেক রকম নেশা, অনেক বকম খেলা,

—"অনেক রকম-রঙ্গ,"—অনেক রকম মঙ্গ,

অনেক রকম অভ্যাচার বাহা-করি, ভঙ্গ—

বিলাস, মৃদঙ্গাণ্ড ভড়ং—টাকার দাঁ মাথা,

করেছি ত সর্ববিধ আনোনের দ্বাঙ্গ।

তবু সময় যায় না ক; দেখছি ভেবে সব

রাজা রাজাদেব সময় বাওরাই অসম্ভব।

১৯

"এবন কি যায় করা?"

কোথায় বা যায়-বাওরা?"

রাজা উপায় না পেয়ে, উঠলেন বেন

হাঁপিরে,

বেন-মঙ্গ হল সেই-বরের-মথোর হাওরা;

চাকর গিয়েছে ছাড়ান; বিড়াল গিয়াছে

তাড়ান;

রজা পারিবরদের ধরে' দেওরা গিয়েছে ভুতো;

পুনবতিনর তাব-ত হয় না; বস্ততঃ

পুনশ্চ সে সব, করা অসম্ভব;

এও অতি স্পষ্ট যেন নাইক কোন কাজ আর;

আর অস্ত কোথা বাওরাও কটকর বাজা;

তাই সেলেন-রাজা-যেখা অতি

নর আমেরিকা আফ্রিকা ইউরোপে

সোজা-ভেবে

আকাশে নয় পাতালে নয়

টানে নব, ত্রক্ষে নর, রাজাজ নর, বশে নর,

রাজা গেলেন ক্ষেত্রে।

কুরুক্ষেত্রে।

(৩)

(দর্শনাংশ)

ইরাজ সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডের মতে কাব্য জীবনসমালোচনার নামান্তর। পরন্তু ঐ সমালোচনার ভাষায় সৌন্দর্য ও সত্য-সত্য সন্নিবিষ্ট পাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সুন্দর ভাষা ও সত্যতার সংযুক্ত জীবন-সমালোচনাই কাব্য। কাব্যের এই লক্ষণে কিছু অব্যাপ্তি দোষ আছে। প্রকৃতি বা বর্ণনা কি কাব্যের অন্তর্গত নহে? অথচ সে বর্ণনার জীবন-সমালোচনার গভ্যমাত্র নাই। কিন্তু একবার অবশ্য স্বীকার্য যে ব্রাহ্মকে কাব্যে দার্শনিকতা বলে অর্থাৎ জীবিতত্ব, জগৎত্ব, সৃষ্টিত্ব, সমাজত্ব, জীবনত্ব প্রভৃতি দার্শনিক প্রশ্নের কবিতাময়ী আলোচনা—সেই ‘কাব্যে দার্শনিকতা’র আদর্শমূলকৃত কাব্যলক্ষণ-অতি উৎকৃষ্ট নির্দেশনা। এই সুন্দর ভাষা ও সত্য ভাব-সংযুক্ত জীবন-সমালোচনা, এই কাব্যে দার্শনিকতা কুরুক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। ম্যাথু আর্নল্ড নির্দিষ্ট কাব্য-এ কাব্যের পক্ষে-পক্ষে বিরাজমান। কুরুক্ষেত্রের এই দর্শনাংশ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে। ‘কাব্যে দার্শনিকতার কাব্যে স্থান হইতে পারে কিনা একবার আমি অল্প অলোচনা করিয়াছি। * তাহার এস্থলে পূর্ণরূপে নিম্নয়োজন। কথটার নারমর্শ এই যে ব্রাহ্ম সুন্দর তাহাই কাব্যের বিষয় হইতে পারে। দার্শনিকতার একটা গভীর সৌন্দর্য অন্তর্নিহিত আছে, কাব্যে তাহার কবিতাময় সন্নিবেশ না হইবে কেন? আর শ্রেষ্ঠ কবির দৃষ্টান্তের যদি কোন প্রামাণ্য থাকে তবে দার্শনিকতার কাব্যে প্রবেশলাভ অবশ্যজ্ঞাবী; কারণ, কি বিদেশীয় কি স্বদেশীয় সকল কবিই নিজ নিজ কাব্যে দার্শনিকতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ব্যাস কলিদাস ভবভূতি মাঘ-ভারবি সেকুপীর মিলটন দ্যন্তে সেটে সেমি ওয়াডস ওয়ার্থ, টেলিসন ব্রাউনিং সকলেই দার্শনিক কবি।

বাস্তবিক কাব্যকে যদি জীবনপথের সহায়ক করিতে হয়, যদি কাব্যপাঠে
মানব আত্মার উন্মোচন, উত্তেজন ও বিক্ষারণ সাধিত করিতে হয় তবে
কাব্যে দার্শনিকতার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় আর-
নন্ড কাব্যকে জীবন সমালোচনার নামাস্তর বলিবাছেন। তাঁহার মতে দার্শনিক
কাব্যই কাব্য, অন্ত কাব্য কাব্যনামের অধিকারী নহে। কাব্যে দার্শনিকতার
উপযোগিতার প্রক্ষে আর অধিক বলিবার আবশ্যক আছে কি ?

কুরুক্ষেত্রে এই জীবন সমালোচনা, এই কাব্যে দার্শনিকতা ক্রিপণ
তাঁহারই আলোচনা করি।

যাহা কিছু পদার্থ আছে, সাদি অনাদি, সান্ত অনন্ত, সকলই তিন মূল
পদার্থের অন্তর্ভূত—জীব জগৎ ঈশ্বর। এই তিন লইয়া দর্শন; এই তিনের
সম্বন্ধে জ্ঞানের চরম। কুরুক্ষেত্রে এই তিন পদার্থেব অতি সুন্দর স্বয়ংপ্রসী
সত্যনিষ্ঠ আলোচনা আছে। উচ্চ অঙ্গের দার্শনিকতা উচ্চ অঙ্গের কবিত্বের
সহিত মিশ্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে এক অপূর্ণ কাব্য করিয়াছে। এ কাব্যে জীব
জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব কর্তব্য বিবৃত হইয়াছে, তাঁহার আলো-
চনায় যে কেবল বিমল কাব্যোদ উপভোগ হয় তাহা নহে; তাঁহার সাহায্যে
অনেক কঠিন জীবন সমস্যার সমাধান হয়, অনেক গুরু-স্থিতি রহস্যের উদ্ঘাটন
হয়, অনেক জটিল ঈশ্বর ভাবের গ্রহণোচন হয়। আর তাঁহার ফলে হৃদয়ের
অজ্ঞান অন্ধকারে আলোকের রেখাপাত হয়, প্রাণের শুষ্ক মরুভূমে অনুভবাবির
সেচন হয়, এবং (কাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠকল) আত্মার উন্মোচন উত্তেজন ও বিক্ষারণ
সাধিত হয়।

কুরুক্ষেত্রের মানব তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা কি ?

অসার স্বপন নহে মানব জীবন

মানব জীবন কর্ম, স্বধর্ম পালন।

মানবের স্বধর্ম কি ? মনুষ্যত্ব। তাহাই মানবের নিয়তি।

মানুষ যে ভগবলে অঙ্গজীব হ'তে শ্রেষ্ঠ

মানুষের মনুষ্যত্ব সেই ভগবত

করিছে ধারণ ভয়ি। উহাই মানব ধর্ম

আমি নব-মনুষ্যত্ব নিয়তি আমার।

মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে ?

মানুষ কি নিয়া বল মানুষ ভগিনি।

আত্মা ননকলৈব। * * *

চরিতার্থতায এ তিনের মনুষ্যত্ব।

এই স্বধর্ম পালনে, এই নল্লবাস্ত্র বর্ধনেই মানবের সুখ, সুখের উপায়ান্তর
নাই।

স্বধর্ম-পালনে

ধর্মতির অনাসক্ত চরিতার্থতার

বতই মানুষ ক্রমে হয় অগ্রসর

লভে ভূত মনুষ্যত্ব-সুখ নিরমল।

কিন্তু এক মহাপ্রাণে অল্পপ্রাণিত-মানব সমষ্টি; অতএব-এক জন অপর
হইতে বিযুক্ত নহে। মানবে ভেদকল্পনা-অমূলক।

এক রক্ত এক মাংস এক প্রাণ সকলের

এক আত্মা এক মূল ভিন্ন জলাশয়।

* * *

এক ভগবান, সর্বদেহে অধিষ্ঠান

সর্বময়-এক অধিতীয়

অতএব বাহাতে সমষ্টির সুখ, তাহাতেই ব্যষ্টির সুখ; ব্যষ্টির স্বতন্ত্র সুখ
নাই।

জলসিদ্ধ-সুখ বাহা, জলবিন্দু-সুখ তাহা

নাই সুখ দ্বিতীয় তাহার,

এই দ্রষ্টা সুখতত্ত্ব না-জানিয়া-দুঃখ-পূর্ণ

অগৎ করিছে হাহাকার।

* * *

স্বগতঃসুখনীতি সুখনীতি আনন্দের

মানবের সুখ, সুখ-তোমাব-আমার।

সেই মহাহুণ যোতে বাই তুমি-আমি ভাসি,

পাইব অনন্ত সিদ্ধ সুখ পারাবাব।

মানব যদি জলসিদ্ধির-বিশ্বদ্রাঘি হয় তবে সর্বভূতের হিতই মানব ধর্ম,
কারণ একাত্মবাদে-সকলের হিত না হইলে আত্মহিত সাধিত হয় না।

ধর্ম কৃষ্ণ! সর্বভূত হিত

তাহার সাধন কর্ম নারায়ণে কর্ম কল

ভক্তিতে কবি সমর্পিত।

অর্থাৎ কর্মকলে অনাসক্ত হইয়া নিকায় ভাবে স্বগতের হিত সাধনই

মানব ধর্ম । এই কর্ম আবার প্রকৃতি ভেদে স্বতন্ত্র । বাহ্য অধির কর্ম
তাহাই জলের কর্ম হইতে পারে না ।

অপ্রকৃতি অনুসারে নির্গুণ কর্ম সাধন ।

মানবের একমাত্র সাধন সনাতন ।

আমি জগতের অংশ এ নিঃস্বার্থ জন,

বার কর্ম মূলে—কর্ম বলে কদাচন,

নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ বার, নির্লিপ্ত সে জন ।

সর্বভূত-হিত ব্রহ্ম সাধ সর্বভূত হিত,

হইবে তেমনি কর্ম ব্রহ্মে তবে সমর্পিত ।

এই একমাত্র বাদে বিশ্বাস করিলে হৃদয় ভ্রাতৃত্বাবে উচ্ছলিত হয়, সকল
জীবকে তাই বলিয়া বক্ষে ধারণ কবিত্তে ইচ্ছা হয়, বিগ্রহ, বিতণ্ডা, ঘেঁষ,
স্পর্ধা মাছুষে মারুষে ঘৃণা নিদারুণ ভ্রম বলিয়া প্রতীতি হয় । মনে হয়,

বিপুল মেঘিনী, ক্ষুদ্র ক্ষীণ জীবী নর

বিপুল কোরব রাজ্য, কোরব পাণ্ডব

হই তাই; এ ছয়ের হয় না কি স্থান

এ বিভীর্ণ পিতৃ রাজ্যে দুঃদিনের তবে ?

আর কবির সহিত বলিতে ইচ্ছা হয় ।

সাম্রাট মাছুষে ঘৃণা করিলে জানিও মনে

উভয়েই সমুদ্রে হয়েছে পতিত

অন্তরেও গবগরে আনাতিলে দেখিয়াছ

কেমনে উভয়ে-হয় চূর্ণিত ধ্বংসিত ।

সর্বভূত হিত যদি ধর্ম হয়, এবং তাহার সাধনই যদি কর্ম হয়, তবে আর
নৈকর্ম (কর্মভাগ) ধার্মিকের পক্ষে ব্যবস্থা হইতে পারে না । কুরুক্ষেত্রে
কবি এই শিক্ষা কৃষ্ণের মুখে তত্ত্ব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন ।

গীতার সনাতন শিক্ষাও তাহাই, ইহাই কৃষ্ণ প্রচারিত নবধর্ম ।

গগণেতে গ্রহ-তারার,

ধরাতলে গিরি ওঙ্গ

তরু তৃণ নদী পারাবার

যেখানে যাহার সৃষ্টি,

সেইখানে কর্ম তার

সেই কর্ম নিয়তি তাহার ।

কেবল মানব সৃষ্টি,

জন্ম কিহে বিধাতার

জন্মক্ষেত্রে নাহি করি তাব-
এ সংসার এই গৃহ, পিতা মাতা পত্নী পুত্র
সকলি কি লম্বা রিখাভার।

* * * * *
কামনা জগৎ হিত সাধনা জগৎ হিত
একমাত্র ধর্ম সনাতন
মানবের গৃহে বনে ধর্মক্ষেত্র যেই ভর
বন নহে, গৃহের প্রাঙ্গণ।

চলিলাম গৃহে প্রভু মানবের ধর্মক্ষেত্র
কবি গৃহ অভ্যন্তরে বাস
কামনা জগৎ হিত সাধনা জগৎ হিত
সুখিলাম-প্রকৃত সম্যাস।

এই স্বধর্ম পালন, মনুষ্যত্ব বর্জন জগতেব হিত অন্বেষণের চরম ফল কি ?
ভূমানন্দ লাভি, মোক্ষ।

এই মনুষ্যত্ব পতি কি অনন্ত সিদ্ধি মুখে
সিদ্ধি চিহ্নানন্দ নারায়ণ,
অনন্ত এ মনুষ্যত্ব অনন্ত-মানব স্বধ
মোক্ষ সেই সাগর সঙ্গম।

এই সাগর সঙ্গমে উপনীত হইবার তিনটি পথ, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি।

বিস্তৃত ত্রিপথ
হইয়াছে এক মূর্খা বেদী মূলে লগ্ন।
ত্রিপথে ত্রিবেদ্যন্তী উড়িছে হৃদয়
জ্ঞান কর্ম ভক্তি কিবা স্বর্গ শোভাময়।

এই তিনের মধ্যে আবার ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। নিঃশুণ ব্রহ্মের ধারণা অর্পেণ
লগ্নপুঞ্জব্রহ্মের আরাধনা অনেক অঙ্গম।

সকলের মূলে, ভরতি ভগিনি
না থাকে ভরতি যদি,
গৃহিতে আশ্রয় চাবে কেন তুমি
জ্ঞান কর্মে নিরবধি।
জ্ঞান পদে পদে, পতঙ্গের মত
বেথানে বাইতে চায়
ভক্তি বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে
উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।

এই কুরুক্ষেত্রের কবির জীব তত্ত্ব আলোচনা। ইহাতে শিখিবার বুদ্ধি-
বার ভাবিবার অনেক কথা আছে।

কবি জী-জাতি সম্বন্ধে কয়েকটি মনোজ্ঞ কথা এ কাব্যে সন্নিবেশিত
করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যিক।

রোগে শাস্তি দুঃখে দয়া, শোকেতে সাধনা ছায়া

যিদি এই ধরাডালে রমণীর বুক।

রমণীর প্রেম রমণীর সর্বস্ব, হৃদয়ের গ্রন্থি, জীবনের জীবন, প্রাণের মর্ম্ম।

সংসারের যত দুঃখ

রোগভিক্ষা উপবাস

পদাঘাত অসিধার রমণীর প্রাণ

সহিবে প্রহসনমুখে

প্রহসন পঞ্চমুখ।

সত্যকণ নাহি হয় দিবা জুবমান

সহে বড় যন্ত্র বৃষ্টি ;

সেই দিবা সেই মর্গ

রমণীর প্রেম জাহ্নবী রমণীর প্রাণ।

সেই প্রোমে সেই প্রাণে,

রমণী প্রাণের প্রাণে

নীরাশার কীট হায় পাতিলে আসন

হউক কুবের পত্নী

ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা

অগতে দুঃখিনী নাহি তাহার মতন।

অবিনশ্চ যে জীবন নমালোচনার কথা বলিয়াছেন—যাহা তাঁহার মতে

কাব্যের সারভূত লক্ষণ, কুরুক্ষেত্রে বোধ হয় পাঠক তাহার প্রচুর পবিমাণে
সাফাৎ পাইলেন। এ সম্বন্ধে কবির সকল মন্তব্য মিলাইলে একমাত্র
সুসম্পূর্ণ জীবনতত্ত্ব সংগঠিত করা যায়।

অতঃপর অগতঃ সম্বন্ধে কবির মন্তব্যের আলোচনা করিব।—দ্বীপকে
পিণ্ডাণ্ড—এবং অগতঃ ব্রহ্মাণ্ড বলে। পিণ্ডাণ্ডের আলোচনা করিয়াছি,
ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনা করি।

গ্রীক কাব্য ও দর্শনে—একটা ‘গোলক-সঙ্গীত’ের প্রসঙ্গ শুনা যায়।
খগোলকে গ্রহতারা স্থরলয়্যোবিরজিত হইয়া কোন এক দিবা—তানে সঙ্গীত
করিতেছে। পুণ্যবান মরু অবশের অড়মুখ হইলে—সেই সঙ্গীত শুনিতে
পায়। কবির ভাষায় যাহাকে ‘গোলক সঙ্গীত’ বলে, দর্শনের ভাষায় তাহার
নাম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্তূতঙ্গ সৌম্য স্থলজা সামঞ্জস্য—জ্ঞানের কর্ণে শুনিতে
ইহার একটা মধুর গভীর মুহূর্ত্ত মন্ত্র আছে। কুরুক্ষেত্রের কবি এই মন্ত্রের
প্রতিধ্বনিতে তাঁহার কাব্য মুখরিত করিয়াছেন।

চেয়ে দেখে বীণা স্বস্তিকত-ভিত্তি ভাব

আকৃতি প্রকৃতি স্বর স্বতন্ত্র সবার।

কিন্তু সবতার হয় এক হবে নয়

সেই মূল হবে তার বাঁধা সমুদর

মহাযজ্ঞ বিদ্যারাজ্য কর দরশন

চক্ষু খুঁধা এই তারা দেখ অগনন

আকৃতি প্রকৃতি গতি স্বতন্ত্র সকল

নিত্য বিবর্তিত বিষ তবু সুষম্বল

এক মহানীতি বলে; * * করিছে ধারণ

বিবের সে মূল-নীতি ধর্ম সনাতন।

সেই মূল নীতির মুখ্য প্রকাশ বিবর্তনে। সাজ নিরঙ্গ, জড় জীব, ব্যক্ত

অব্যক্ত সর্বত্র বিবর্তনের মহা ক্রীড়া—অনাগি কাল হইতে অনন্ত কাল অবধি

বিশ্ব বিলোড়িত করিয়া বিবর্তন প্রবাহ উন্নতির অভিযুগে বাবিত হইতেছে।

এই বিবর্তনই মানুষের আশার ভরসার ভিত্তি। এই বিবর্তনে বিশ্বাস স্থাপন

করিয়াই মানুষ অমঙ্গলে মঙ্গল উপলব্ধি করে, অশান্তিতে শান্তি-স্বপ্ন-ভোগ

করে।

কবি বিবর্তনের উল্লসিত গতি, অভিরান প্রবাহ যেন প্রত্যক্ষ করিষাছেন।

তাহার কল্পার-মানুষের নিয়তি স্মরণে ভাবিয়া আনন্দ হয়।

তাহার নীতিতে বিষ হতেছে চালিত

কর কলান্তর-হতে-যোর বিবর্তিত

অনন্ত উন্নতি পথে। এই বিবর্তনে

থরে যথা শোক অশ্র-মানব নয়নে

কুটে তথা স্নেহ হাসি মানব বদনে—

এই হাসি অশ্র-পূর্ণ বিবর্তন-পথে

ছুটিছে মানব-নিত্য উন্নতির পথে।

* * * * *

হিল কত শত জীব আজি নাহি জ্ঞান

কত শত নব জীব হইবে জীবন—

ভাঙিতেছে-পুরাতন গড়িছে-নূতন,

জগতের নীতি এই মহা বিবর্তন।

* * * * *

সবে পিতা মরে পুত্র না-মরে মানব

নাহি হয় উন্নতির-তিলার্ঘ্য লাগিব ।
জলবিধ যার পার্শ্ব মিশাইয়া জলে
একে ভাটা অস্ত্র দিকে জোয়ার উঠলে ।

নাবায়ণ উন্নতির পূর্ণ পরিণতি
চারি দিকে উন্নতির-বিবর্তন গতি
বিলোড়িত করি বিষ যাইছে ছুটিয়া
কি প্রথর বেগে বিষ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ।

প্রথম দৃষ্টিতে এই বিবর্তন বিধি নির্মম বলিয়া মনে হয়—যেন অন্ধ
জড় শক্তি নিকরুণ নিষ্পেষণে পৃথিবীকে পেষিত করিতেছে—সুধুই নিয়মের
কঠোর নিগড়, করুণা-মমতার লেশ মাত্র নাই । যখন এই ভাব মনে আসে
তখন কবির কথায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় ।—

হার-রা-হার মা শিবে শাস্তি স্বরূপিণী
সর্বত্র তোমার মুখে কি শাস্তি স্নান
তবে কেন তব এই জগতে জননি ।
এতই অশান্তি আহা এত বজ্র বড় ।

কিস্ত করিলে না কেন জগত তোমার
অনন্ত শাস্তির ছায়া
আগনি করুণাময়ী সহ-মা কেমনে
জগতের এত দুঃখ ।

প্রথম দৃষ্টিতে এইরূপই মনে হয় । কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে, জগৎ
তত্ত্বের জীবৎ পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে দুঃখ স্রব্ধের পূর্বরূপ মাত্র,
মঙ্গল যত্নের জগতে অমঙ্গল ও অজস্র মঙ্গল নিদান ।

বজ্রাঘাত ঝটিকা ভীষণ
মহা সংহারক মূর্তি যোব-দাবানল
মাবন ভীষণ-নিত্য করি দবদন
জগতের সাধিছে কি-অচিন্ত্য মঙ্গল ।

তখন ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয় । তখন তাঁহার রক্ত
মূর্তিও শঙ্কর বলিয়া মনে হয় । আর ধ্বংস নীতি—যাহা নির্ভরতার একশেষ
বলিয়া জ্ঞান ছিল তাহাকেও দয়াদার বলিয়া প্রতীতি জন্মে ।

দেখিলে এ বিশ্ব রান্য-অভিন্ন চেতনে-জড়ে
নির্মম সংহার নিত্য সর্বত্র ন্যস্তে-পড়ে
নহে নির্দিষ্টতা বৎস ধ্বংস নীতি ঘৃণাধার
ধ্বংস বিনা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার ।

* * * * *

সংহারি দৃষ্টাব নীতি-হৃদয় কাবণ
জড়ে ও অজড়ে বৎস সর্বত্র সমান ।
হৃষ্ট নিতি নয় দেখ চক্রেব সত্য
ঘুরিতেছে বিধে নাহি তিলার্দ্ধ বিশ্রাম ।

জগতের উগাদান বক্ষা- সমস্ত ব্রহ্মের অস্থিতীয় লক্ষণ; সেইজন্য বোধ
হয় সাম্যনীতি জগতের অতি প্রধান তত্ত্ব । কবির এ সম্বন্ধে মন্তব্য এই—

স্বগত-নির্গম ফুল বিরাজিছে সমভাবে
বেধ অন্ধে সাতা বহুধার

সমুজ্জ্বল রত্ন সহ অনন্ত বালুকারণি
বহির্ভূত গর্ভে পারাবার ।

জগতের সাম্য নীতি স্বপ্নময় প্রেমগীতি
মানবের কি শিকার স্থান

সর্বত্র সমান প্রেম সর্বত্র সমান দয়া
গর্বিত কি একমুখ স্থান ।

জগৎ যে ঐশী শক্তির ক্রীড়া কেন্দ্র, সেই নক্তি সর্বত্র কামনা রহিত হইয়া
ক্রিয়া করিতেছে; সেইজন্য জগৎ আদর্শ-নিকাম স্থল, মানবের শিকার উৎকর্ষ
উপকরণ ।

অনন্ত নক্ষত্র রাশি, আকাশে ছুটিয়া ভাই

আপনার কি কামনা করিছে সাধন

চল হৃদয় এই ভাবা- মস্তক পাতিয়া ধরা

মঙ্গল কামনা তাঁর করিছে পালন ।

* * * * *

বলিয়া অনন্ত তরু-বরাগিয়া মেঘমল
গাথিছে কি-বার্ষ বিধ আদর্শ নিকার স্থল
আগম প্রকৃতি-মতে কলে তরু বর্ষে ঘন
জগতের হিতে মাধি স্বধর্ম সোচ্চ পরম ।

কবি জগতের স্তম্ভ সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি অমূল্যে ব্রহ্মের

নিদান দেখিলে পান; বিশ্বের নিকামতা সামান্যতির নষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া-
ছেন, স্তব্ধতা তাহার চক্ষে জগৎ সুখময় নিত্য সুখময় বোধ হইয়াছে।

দুঃখ নহে বিধাতার লিপি নিরঙ্গম

জগৎ আনন্দ-বান্ধব-সুখ প্রসবণ।

অনন্ত চাহিয়া দেখে এহ উপগ্রহ

অসংখ্য বিবর্ধ মৃষ্টি ভ্রমে-অহরহ

কি অচিন্ত্য প্রেমে, কিবা চিন্তাতীত ব্রতে

কি সুখে অচিন্তনীয় নিয়তির পথে

কি অনন্ত সৌন্দর্য্যে উঠিছে উচ্ছ্বাস

কি সুখ সঙ্গীতে পূর্ণ অনন্ত আকাশ।

এ জগৎ সুখ ময়, নিত্য সুখ ময়

নিজ বিধাতার দত্ত। অজস্র ধাব্য

স্বরে সুখ ঘোষণায়, বহে ষটিবান

পায় কোকিলের কণ্ঠে, বাসে হৃদয়তল

বলরের সঙ্গীত, ফলে তরু দলে

ফুটে কুলে ভাসে ওলে হাসে বিবালোকে।

এইরূপে কবি জগৎ তত্ত্বের নানা গভীর প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন।

সে আলোচনায় সত্য জ্ঞানও সৌন্দর্য্যের সুসঙ্গত মিশ্রণ-দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে

তাঁহার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিলে মনে যুগপৎ আশা উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার
হইতে থাকে।—

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কবি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিক কথা বলেন নাই। পরোক্ষে
অনেক কথাই বলিয়াছেন;— তাহার পাঠক বোধ হয়, ইতিপূর্বে আভাস
পাইয়াছেন।

ঈশ্বর বিশ্বকৃপ, সর্ব্বাত্ম স্বন্দর, গুণাতীত, সর্ব্বগুণাধার, চিনময়, প্রেম-পাত্রা-
বান্ধব। তিনি নিরঞ্জন-কিঙ্ক-তাঁহার কামনা অজস্র জগৎ সুখ।

যশা কি কামনা হীন? চেয়ে দেব মহাহস্তি

অনন্ত জগৎ সুখ কামনা তাঁহার

বোধিতেছে মহাবিশ্ব-অনন্ত দাবিয়া কণ্ঠে

এ কামনা অশান্ত অপার।

তাঁহার মঙ্গল রাজ্যে কতই নিত্য অমঙ্গলের অভিনব; অথচ তিনি মঙ্গল-
আনন্দময়।

অনন্ত কল্যাণ

অনন্ত করুণাময়

অনন্ত জ্ঞানের পারাবার,

বৎস! বেই নারায়ণ - তাঁহার স্রষ্টতে নিত্য

কত হত্যা কত হাহাকার।

ভথাপি তাঁহার মুখ, কি অসন্ন প্রীতিময়

কি অনন্ত প্রেমের দর্পন।

তিনি বিবাতা, স্রুত গ্রন্থের ফলদাতা; সেই অস্ত্র জগতে

মানবের উন্নয়ন বিনা মানবের পাপ

নানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ

না হয় মোচন যদি, মানবের মুক্তিগাথ

রক্তসিঁদু গড়ে যদি, স্মানে দাবাদিবৎ।

ভগবান্ বিশ্বরূপ—অর্থাৎ স্থল-স্থল-কারণ-রূপের সমষ্টি—বেদান্তের ভাষায়

তিনি স্থলরূপে বিরাট, স্থলরূপে-হিবর্ণ্যগর্ভ আর কারণরূপে দৈব। গীতার

একাদশ অধ্যায়ে এই বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। সে-বর্ণনা প্রথমোক্ত সীমা-

ভীতী কবি-চতুর্থ সর্গে স্থল বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন।

সংখ্যাতীত সৌররাজ্য চক্রে তারা প্রত্যেক

অলসিমা বহাবশু লগিতোহে নিরন্তর

* * * * *

এহে এহে বিমুনিত, সংখ্যাতীত-পারাবায়

বহিতেছে সংখ্যাতীত নন্দনদী অনিবার

* * * * *

হাবর জগদ-সব হইতেছে অবিরত

স্রষ্টস্থিত লীনদেহে জলে জলবিধ মত

এ বিরাটের বর্ণনা; অবশ্য মনোজ্ঞ বলিতে হয়। কিন্তু হিবর্ণ্যগর্ভ ও

দৈব রূপের সন্নিবেশের অভাবে এবং গীতার তুলনার অবশুভাবে এ বর্ণনা

অসুন্দর হইয়াছে।

জীব ভ দৈবের সধক কবি অতি স্বদুর্ভাগী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

জীবের জীব কামনা প্রবাহ কেবল এক দৈবেরই লীন হইয়া আত্মস্বরূপ

হারাইতে পারে। সেই আধ্যাত্মিক জগতে গঙ্গা সাগর সন্মম।

এ-তীব্র কামনা-হায় কেন মানবের ভরে

চাহ রূপ! সৌন্দর্য্যে কি বিমুগ্ধ অন্তর

এ-বিধ সৌন্দর্য্যে ভরা বাহার-অনন্তরূপ

সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কি সম্ভব।

চাহ-গুণ ? এই বিধ বার গুণ লীলাভূমি

সেই গুণাভীত হুতে গুণীকে আবার ?

চাহ প্রেম ? এই বিধ বার প্রেম পারাবার

সেই প্রেমময় হবি স্বদরে তোমার।

এই প্রেমময় হরির নাম লইয়া প্রবন্ধ শেষ করি। বারান্তরে কুক্ষিক্ষেত্রের
ঐতিহাসিক অংশের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আফজল খাঁর অভিযান। (৫৪৩)

(উদ্দেশ্য)

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানগণের শাসনাধীন ছিল। আখ্যাবর্তে মহামতি আকরের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যে বিজয়পুর, গোলকুণ্ডা ও আহম্মদ নগর, এই প্রদেশত্রয়ের সুলতানগণের আধিপত্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের মধ্যভাগে আহম্মদ নগর রাজ্য বিধ্বস্ত ও দিল্লীর করতলগত হয়। কেবল বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের যে সকল অংশ বিজয়পুরের সুলতানগণের শাসনাধীন ছিল, মহারাষ্ট্র দেশ তাহাদিগের অজ্ঞাত। খৃঃ ১৫৮৭-অব্দ হইতে ১৬৩২-অব্দ পর্যন্ত প্রায় দেড় শত বৎসর কাল, তাহারা নিরুণ্টকে মহারাষ্ট্ররাজ্য-ভোগ করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ খৃঃ মহাদ্বা শিবাজী স্বদেশের উদ্ধার কামনায় বিজয়পুর পতির বিরুদ্ধে উখিত হইয়া সর্ব প্রথম তাহাদিগের অধীনস্থিত "তোরণা দুর্গ" অধিকার করেন। তোরণা দুর্গের জীর্ণ সংস্কার কালে, উহার এক অংশ খনন করিতে করিতে, শিবাজী সুবর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক সুবৃহৎ কলস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন শিবাজীর নিকট এই আকস্মিক ঘন লাভ দেবীর রূপার নিদর্শন স্বরূপ বিবেচিত হইল। তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত কর্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বহুসংখ্যক গিরি দুর্গ ও মুসলমান শাসিত প্রদেশ সমূহের কোন কোন অংশ

তাহার দৃষ্টগত হইল। শিবাজী এইরূপ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া, বিজয়পুরের সুলতান তাহার-পিতা-শাহাজীকে (১৬৪৯ খৃঃ) কোশলে বন্দী করত কারাবদ্ধ করেন। এই ঘটনার শিবাজী বিচলিত বা কর্তব্য ভ্রষ্ট না হইয়া পিতার মুক্তি সাবনের জন্ত এক কেমেল অবলম্বন করিলেন। তিনি দিল্লীরের আল্লগত্য স্বীকার করিয়া সম্রাট সাহজাহানকে এক বিনয়গর্ভ পত্র প্রেরণ করেন। শিবাজীকে অস্বস্ত ও আশ্রয়প্রার্থী জানিয়া শাহজাহান শিবাজীর মুক্তির জন্য বিজয়পুরের সুলতানকে আদেশ প্রেরণ করিলেন। সম্রাট সাহজাহানের আদেশে ও অন্যান্য কতিপয় কারণে বিজয়পুরপতি শাহাজীকে কারাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে শাহাজী মুক্তিলভ করিলে, শিবাজী পুনরায় স্বীয় অধিকার বিস্তারে যত্নবান হইলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে “কল্যাণ” ও কঙ্কণ প্রদেশ এবং সমস্ত “ম্যাট্রাখা” (সহাদ্রির মালভূমি) অধিকার করিলেন। শিবাজীর ক্ষমতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের সুলতান তাহার দমনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতাপগড় নামক গিরিভূগের নিকটে শিবাজীর সৈন্যদলের সহিত ইহাদিগের যুদ্ধ হয়। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে এই ঘটনা “প্রতাপগড়ের যুদ্ধ” নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংরাজগণের রচিত ইতিহাসে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা :—

১৬৫২ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের সুলতান ১২ সহস্র সৈন্য সহ আল্‌জদ বা নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ সেনানায়ককে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আক্‌জদ তাঁকে নৈসৈন্তে আগমন করিতে দেখিয়া সুচতুর শিবাজী অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট অবনতি স্বীকার পূর্বক স্বীয় ব্যবহারের জন্ত অতিশয় দুঃখ ও ক্ষমক্সয়ের শরণাগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সরল হৃদয় আক্‌জদ তাহার কপটতা বুঝিতে না পারিয়া, তাহার নহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। সাক্ষাৎ কালে শিবাজী আলিঙ্গনচ্ছলে আক্‌জদের সমীপবর্তী হইয়া, হস্তস্থিত শুণ্ড অস্ত্রের (বাঘনখ ও বৃশ্চিকাস্ত্রের) আঘাতে তাহাকে হত্যা করিলেন। এইরূপ ঘোবর্ত্তর বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা আক্‌জদ বা নিহত হইলে, শিবাজীর সৈন্যগণ সহসা শত্রুনেত্রকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের পরাজয় সাধন করে।

ইংরাজ লেখকগণের ইতিহাসে আক্‌জদ বাঁর অভিধানের এইরূপ

সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত ও সেই সঙ্গে শিবাজীকে “বীর বিশ্বাসঘাতক” ও “অতিশয় পাবণ্ড” প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্রীয়-বধরকারগণ (ইতিহাস লেখকগণ) আফজল খাঁকেই অতিশয় ক্রুর ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পূর্বে আফজল খাঁ কনকগিবিব-যুদ্ধে শিবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-সান্তাজীকে বিশ্বাস-বাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। এবারেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক শিবাজীকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। শিবাজী তাহা অবগত হইয়া আত্মরক্ষা ও তাহার অসদভিপ্রায়ের যথোচিত দণ্ড বিধানের জন্ত তাহাকে হত্যা কবিত্তে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত-বিবরণের মধ্যে কোনটি কি পরিমাণে সত্য ও সঙ্গত তাহার নির্ণয়-করিবার জন্যই বর্তমান-প্রবন্ধেব অবতারণা।

ইংরাজ রচিত যে সকল ইতিহাস গ্রন্থে শিবাজীর বিবরণ সংকলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ গ্রাউট ডক্‌ প্রণীত History of the Marthas নামক গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ও সর্বজনপরিচিত। এই গ্রন্থে শিবাজীর বিবরণ যত্ন সহকারে ও বিস্তারিত-ভাবে লিখিত হইয়াছে। হট্টার ও এলফিনষ্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর জীবনী সংক্রান্ত আলোচনায় এই গ্রন্থকেই অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে ডক্‌ সাহেবের নভই আমাদেরগণের বর্তমান প্রবন্ধেব আলোচ্য বিষয়।

ভারতের অপরাপর প্রদেশের জায় মহারাষ্ট্র-দেশে ইতিহাস গ্রন্থের নিত্য-অভাব নাই। প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বদেশের ইতিহাস রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদিগের রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি “বধর” নামে অভিহিত (১)। ব্যাভনামা মিশনারী ডাক্তার মিচেল বলেন,—The Maratha Country abounds with Bakhars, or narratives of particular historical events written in prose.—J. R. A. S. (Bom) Jan. 1849. মহারাষ্ট্র দেশের কৃতবিদগণের চেষ্টায় এপর্যন্ত প্রায় ৪০ খানি বধর মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কত মহামূল্য বধর বে একবার বিলুপ্ত-বা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে; তাহার ইয়ত্তা নাই।

গ্রাউট ডক্‌ সাহেব তাহার ইতিহাস রচনার জন্ত যে সকল উপকরণ

(১) বধরের রচনা প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে “সাহিত্য” ৫ম বর্ষ কাঙ্ক্ষিত মাসের সংখ্যায় “মহারাষ্ট্র” শিরীষ-প্রবন্ধে উল্লিখ্য।

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহাবাহীরগণের স্বভাবায়-রচিত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তিনি স্বীয় গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শাসনকাল বলিয়াছেন, — “শিবাজীর জীবন-সংক্রান্ত ইতিহাস সংকলন বিষয়ে আমি মহাবাহীর বখর হইতে অধিক পরিমাণে সাহায্য পাইরাছি।” যে সকল বখরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি শিবাজীর বিবরণ সংকলন করিয়াছেন, তন্মধ্যে (১) কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদকৃত “শিবাজীর বৃত্তান্ত” * (২) মহলার রামরাজ চিটনীসপ্রণীত শিবাজীর বখর (খ), এই দুইটি গ্রন্থই প্রধান। সৌভাগ্যক্রমে আমরা সেই দুইখানি গ্রন্থই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তন্নিম্ন আরও ৩৪ খানি প্রাচীন বখর সংগ্রহ করিয়াছি। সুতরাং এন্টিক ডক্ সাহেব যেখানে Maratha M.S.S. এর উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে আমরা এই সকল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা পাইব।

শিবাজীর অধিকাংশ প্রধান প্রধান ঘটনার বর্ণনা স্থলে এন্ট ডক্ সাহেব পাঁচটাকা Maratha M.S.S. বা Persian M.S.S. ইত্যাকার উল্লেখ করিয়া, বর্ণিত বিষয় কোন মূল হইতে সংগৃহীত তাহার আভাস প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু অতীত দুঃখের বিষয় এই যে, শিবাজীর জীবনের দুইটি অতি প্রধান ঘটনা সম্বন্ধে তিনি তাঁহাব গ্রন্থের আধার নির্দেশ বিষয়ে বড়ই মনোযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম চন্দ্ররাজের হত্যা; ২য় আফজল খাঁর হত্যা। চন্দ্র রাজের হত্যার দোষ ডক্ সাহেব শিবাজীর ক্ষেত্রে আঁকিয়া দিয়াছেন; কিন্তু উক্ত হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা স্থলে, কোনও স্থানে পাঁচটাকা Persian M.S.S. অথবা Maratha M.S.S. এর কোনও উল্লেখ করেন নাই। আফজল খাঁর অভিযানের বর্ণনায় তিনি একবারে মৌনাবলম্বন

(ক) কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ—শিবাজীর জনৈক কর্মচারী। শিবাজীর মৃত্যুর ১০।১২-বৎসর পবে ইনি “শিবাজীর বৃত্তান্ত” নামক বখর রচনা করেন। বলা বাহুল্য, এই বখর অতিশয় প্রামাণিক।

(খ) এই বখর সম্বন্ধে এন্টিক ডক্ সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন, — (It is) Compiled by Mulhor Rao Chitnees, from Original Memoranda, and originals or copies of many original authentic papers, written or transcribed by his ancestors, who were all persons highly distinguished at the Courts of Raigurh, Jinji and Satara. Mulhor ram Rao's Life of Shivajee is very voluminous, but I do not think he has made a good use of the valuable letters and records in his possession. Shivajee's instructions to officers and departments are very complete and satisfactory. GRANT DUFF.

করেন নাই সত্য; কিন্তু উক্ত সপ্ত পৃষ্ঠাব্যাণী-বর্ণনার শেষ-পংক্তির পাদটীকায় সংক্ষেপে “Maratha and Persian M.S.S. and English Records.”

কেবল এইটুকু উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত বিবরণের কোন অংশ কোন মূল হইতে সংকলিত তিনি স্পষ্টতঃ কোথাও তাহার নির্দেশ করেন নাই। এই-

রূপ দুইটি গুরুতর বিসম্বাদিত বিষয়ের আধার নির্দেশ সম্বন্ধে সাহেব মহোদয়

কেন একরূপ অবহেলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ নির্দেশে আমবা সম্পূর্ণ

অসমর্থ। ফল কথা, ডক্ সাহেবের লেখার সহিত কাফি খাঁ ও অপরাপর মুসলমান

ইতিহাস লেখকগণের উক্তি মিলাইয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে,

আফজল খাঁর অভিযানের বিবরণ তিনি প্রধানতঃ মুসলমান-লেখকগণের গ্রন্থ

হইতেই সংকলন করিয়াছেন। সাহা হউক, আমরা আলোচনার সুবিধার জন্ত

প্রথমতঃ ডক্ সাহেবের উক্তি, তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণের অভিপ্রায়

আগাদের সম্ভব্যসহ নিম্নপ্রদান করিতেছি।

গ্রাণ্ট ডক্ বলেন,—শিরাঙ্গীর দৌবাত্মা অতি ক্রেশকর ও অসহনীয়

হইলে, বিজয়পুরের অধিপতি তাহার দমনার্থে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া পঞ্চ সহস্র

সাদী, সপ্তসহস্র সুশিক্ষিত পদাতি ও নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণ সহ

এক বৃহৎ সৈন্য দল সংগঠন করিলেন। আফজল খাঁ নামক একজন উচ্চ

পদস্থ প্রসিদ্ধ সেনানী “স্বৈচ্ছা পূর্বক” এই সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

যুদ্ধোজয়ার পূর্বে বিদায় কালে, আফজল খাঁ মুসলমান-স্বভাব-সিদ্ধান্তিকতা

প্রকাশ পূর্বক সভা মধ্যে সর্ব সন্মুখে ব্যক্ত করেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তুচ্ছ

বিদ্রোহী-শিবাঙ্গীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বিজয়পুরের সিংহাসন-তলে নিক্ষেপ

করিবেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর-মাসে আফজল

খাঁ শিবাঙ্গীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি বিজয়পুর হইতে প্রথমে পণ্ডর-

পুর * ও পরে তথা হইতে “ওয়াচেন” (Wacen) প্রদেশে উপনীত হইলেন।

—Grant Duff.

এই বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণ বলেন, “বিজয়পুরের স্থলতান-শিবাঙ্গী

সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা স্থির করিবার জন্ত, আদিল সাহীরাঙ্গোর সমস্ত উজীরও

* পণ্ডরপুর—মহারাষ্ট্র দেশের এক অতি প্রধান ভীষণক্ষেত্র।

(১) ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে স্থলতান মহম্মদ আদিলশাহ পরলোক প্রাপ্ত কবিলে, তাহার অগ্রাপ্ত

বয়স্ক পুত্র আলী আদিল শাহকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, স্থলতান মহম্মদের প্রী (স্থলতান)

বয়স সমস্ত রাজকাৰ্য্য পৃথিব্যেব্যপ্ত করিতেন।

আমির উমরাহগণকে রাজ সভার আহ্বান পূর্বক, শিবাজীকে ধৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎকাল প্রচলিত রীতিঅনুসারে, সুলতান একটি পাত্রে কয়েকটি তাবুল-রাখিয়া, সমবেত আগীর উমরাহ গণকে সন্মোদন পূর্বক বলিলেন, “আপনারিগের মধ্যে যিনি শিবাজীকে ধৃত করিয়া আনিতে সমর্থ, তিনি এই তাবুল গ্রহণ করুন।” সুলতানার এইরূপ আহ্বানে উপস্থিত উমরাহগণের মধ্যে আফজল খাঁ ব্যতীত কেহই এ কার্যের ভার গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না। কেবল আফজল খাঁ সুলতানার সম্মুখীন হইয়া, তাবুল গ্রহণ পূর্বক “কুর্বানী” করত নিবেদন করিলেন, — “শিবাজী অতি কুতূহল-প্রদারী। অগ্নীনের প্রতি আদেয় হইলে সে “এক অশ্ব” শিবাজীকে বৃত্ত করিয়া, আনয়ন অথবা তাহাব শিথিল করিতেও পারে। “গেরে উরুসে শিবাজী বিল্লা হোতা হার।” আফজল খাঁ ভতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ চুক্তি-প্রতিজ্ঞা করিলে, সুলতান। অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পূর্বক তাহাকে প্রশংসা প্রদান করিয়া বলিলেন, — “শিবাজীকে ধৃত করিয়া আনিতে পারিলে, তাহার অধিকৃত প্রদেশের শাসনভার (সুভেদারী) আপনার প্রতি অপিত হইবে।” এইরূপে আফজল খাঁকে উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ করিয়া সুলতান। তাহাকে বন্দী সহ্য সৈন্য ও অস্ত্র যুদ্ধোপযোগী আয়োজন সহ শিবাজীব বিকল্পে প্রেরণ করিলেন। গর্বস্থিত আফজল খাঁ কচ করিয়া প্রথমতঃ তুলজাপুরে আগমন করিলেন। এবং হিন্দুগণের প্রতি বিবেক বশত, মহারাজ শিবাজীরও অধিকাংশ মহারাত্রির পরিবারের কুল দেবতা “ভবানীর” গন্তব্য নুর্ভি ভয় ও চূর্ণ করিলেন (১); পরে তথা হইতে পট্টরপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও হিন্দুদেব দেবীগণের অপমান ও হৃদ্বিশীঃ করিয়া “ওমর্দা” প্রদেশে আগমন করিলেন। (ক)

ইহার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে গ্রাণ্ট ডফ্ লাহেব বলেন; — “আফজল খাঁকে ‘ওমর্দা’ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে দেখিয়া শিবাজী প্রতাপগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (২)। এবং আফজল খাঁকে অতি বিনয়গর্ভ পত্রাদি প্রেরণ করিতে

* পণ্ডকী নদী হইতে জাহাজ প্রভৃতি নিশ্চিত নষ্ট।

(১) (আফজল খাঁ) “পশিমধ্যে তুলজাপুর আক্রমণ করিয়া হিন্দুগণের বর্ণে অপমান করিয়াছেন।” রোয়াই চিহ্ন ৩৪৭ পৃঃ।

(ক) কুজাজী-অনন্ত সম্রাট প্রভৃতি বিরচিত শিবাজী চরিত।

(২) শ্রীমুন্সার, সত্যোজ নাথ ঠাকুর তাহাব বোদাই চিহ্নে বলিয়াছেন, (শিবাজী দেখিলেন) “আফজল খাঁ অনেক সৈন্য সামন্তে পরিবৃত্ত; তাহার সহিত সশস্ত্র যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা নাই, ছাড়া ও কোশলে তাহাকে মারিতে হইবে।” বোদাই চিহ্ন ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

লাগিলেন। তিনি আফজল খাঁকে জানাইলেন যে, খাঁ সাহেবের জায় একজন ক্ষমতাশালী বীরপুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। খাঁ অতঃপর পূর্বক যদি মধ্যস্থতা করিয়া বিজয়পুর-পতির সহিত তাঁহার সন্ধি করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি নিজে অধিকৃত সমস্ত এদেশ, তাঁহাকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অপিচ, তিনি স্বীয় ব্যবহারের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ ও খাঁ সাহেবের দয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শিবাজীর পুত্র পুত্রেরূপ সন্ধিচুক্ত প্রস্তাবে আফজল প্রীত হইলেন। তাঁহার মুসলমান-স্বভাব-সুলভ দাস্তিকতা ও শত্রুর প্রতি অগাধ ঘৃণার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তথাপি তিনি যে শিবাজীর প্রস্তাবে সন্মত হইলেন, তাহার কারণ এই যে, “ওয়ার্ড” হইতে সুদূরব্যাপী অরণ্যময় দুর্গম পার্বত্য এদেশ ভেদ করিয়া সৈন্তসামন্ত-সহ প্রতাপগড় পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া অতিশয় কষ্টকর, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত এই সকল গিরিপ্রেদেশে বর্ষার প্রকোপ এরূপ প্রবল থাকে যে, সে সময় সৈন্ত লইয়া এই সকল এদেশ অতিক্রমের চেষ্টা করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার বলিলেও দোষ হয় না। এই সকল কারণে, আফজল খাঁ শিবাজীর প্রস্তাবে সন্মতি প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি শিবাজীর আবেদনের উত্তর প্রদানার্থ, গোপীনাথ পন্ত নামক একজন মহারাজীয় ব্রাহ্মণকে দূতরূপে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিলেন।” — Grant duff.

এইখানে মহারাজীয় লেখকগণের সহিত ডক সাহেবের মতের গুরুতর প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মহারাজীয় লেখকগণ বলেন, “এই সময়ে শিবাজী রাজগড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্তসংখ্যা প্রায় বিংশতি সহস্র—সপ্ত সহস্র সাদী, তিন সহস্র শিলেদারি—(১) ও প্রায় দশ সহস্র মাওলী পদাতি ছিল। আফজল খাঁ আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া, শিবাজী তাঁহার সহিত বুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যন্ত্রদাতা কর্মচারিগণ সকলেই একতাক্যে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে নিবেদন করিয়া, সুলতানার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শিবাজী সন্ধিস্থাপনের অমৌজিকতা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—শত্রুর প্রতি তিলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে। গুপ্তচর-মুখে অবগত হইয়াছি যে, আফজল খাঁ বিজয়পুরের সুলতানার নিকট সর্ব-সমক্ষে দাস্তিকতা প্রকাশ পূর্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে যে, সে আমাকে

রক্ষা করিয়া নইয়া যাইবে। অতএব তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করা কৰ্ত্তব্য নহে। এই হুঁসায়ী আনার স্বেচ্ছাভাৱে সাম্ভাজীকে বৈরূপ-বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিনাশ করিয়াছে, ইহার সহিত সন্ধি করিলে, আশঙ্কিত ও বিশ্বাস-ভেদন করিয়া সেইরূপে বিনাশ করিবে। ইহার "হিতশত্রু" পরিণামে জামা-দের পক্ষ-অমঙ্গলজনক হইবে। এই কারণে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। যাহাতে মরি, অথবা যাহা হইবার হয়, হইবে। কিন্তু সন্ধি করা হিতহতেই উচিত নহে। কারণ সন্ধি করিলে নিশ্চয়ই প্রাণনাশ হইবে। যুদ্ধ করিয়া যদি জয়শাল্য হয়, ভালই; আর যদি সৈন্যে-প্রাণ যায়, ত-কীৰ্ত্তি থাকিবে। এ বিষয়ে নীতিশাস্ত্রকারগণ বশিয়াছেন,

জিৎবেন (জয়েন) নততে লয়াঃ মৃত্যুনাংপি সুরাধনঃ।

ক্ষণবিশ্বংগিনী কয়া কা চিন্তা মরণে যুগে ॥

অতএব যুদ্ধ করাই আমার স্থির সংকল্প। হুগুম জাওলী প্রদেপে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিব (২)। আমার পুত্র সাম্ভাজী ও জননী জীজীমাইকে তোমাদের রক্ষণার্থীনে। এই রাজগড়ে রাখিয়া যাইতেছি। আফজল খাঁকে বিনাশ করিয়া যদি ক্ষয় লাভ করিতে পারি, তবে ত-কোনও কষ্টই নাই, কিন্তু যদি যুদ্ধে আমার প্রাণ যায়, তবে তোমরা সাম্ভাজীকে রাজা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবে। সকলকে এই কথা বলিয়া জননী-চরণ-বন্দনা পূর্বক শিবাজী-বিদায় গ্রহণ করিলেন। "বৎস! বিজয়ী হও, স্বেচ্ছাভাৱে সাম্ভাজীর স্বর্ণ-পরি-শোধ করিতে-বিস্মৃত হইও না।" বলিয়া জননী তাঁহাকে আশীর্বাদ ও উত্তেজিত করিলেন। সাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিবাজী প্রতাপগড়ে গমন করিলেন।

এদিকে আফজল খাঁ পল্লবপুর হইতে প্রথমতঃ রাজগড় অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু পল্লবপুর পরিত্যাগের অন্তরদিন-পরেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, শিবাজী প্রতাপগড়ে গমন করিয়াছেন। এই কারণে তিনি রাজগড়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়াদি প্রদেশ পল্লবপুর হইতে প্রতাপগড় যাইবার পথে অবস্থিত। আফজল খাঁ পূর্বে

(১) শিবাজীর অধীনস্থিত প্রদেশ সমূহের মধ্যে "জাওলী" সর্বাপেক্ষা হুগুম। এই প্রদেশ মহাদ্রির সহিদেপে অবস্থিত, অতীব বহুব, পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত ও অরণ্যমণ্ডিত। এই প্রদেশে শিবাজী "প্রতাপগড়" নামক এক অতি-সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে থাকিয়া আফজল খাঁর সহিত যুদ্ধ করিলে পরাজয়ের সম্ভাবনা অতি অল্প, এই কারণে শিবাজী প্রতাপগড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজগড়ের বিবর্তিত নীচ দক্ষিণে

৩য়দিং প্রদেশের সুভাদার ছিলেন। এই কারণে তিনি প্রথমতঃ ৩য়দিংতে আসিয়া কয়েক দিবস অবস্থিতি করিলেন। ৩য়দিংতে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রত্যাগতের দুর্গমতা, অজ্ঞেয়তা ও পথকষ্টের বিষয় চিন্তা পূর্বক মনে মনে ভাবিলেন, “শিবাজী বড়া হরাম্‌খোর হায়। উস্কি করামত্ ওঁর হিকমত্ ইনশা আল্লাহ্‌ আল্লা জীন্‌ হায়। জাওলী অতিশয় দুর্গম স্থান; সেখানকার ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যে অনুস্থিতি করিয়া সে বুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছে। সেখান হইতে কোনও প্রকার কৌশলে তাহাকে বাহিরে আনিতে এবং বিশ্বস্ততা ও মায়ী মমতা প্রদর্শন করিয়া কৈনিক রূপে তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারিলে, যেক্ষণেই ইউক্‌, সুলতানের কার্য সাধন করিবা।” এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি গোপীনাথ পন্ত নামক দোতাকার্যো সুমিগুণ অনেক কর্মচারীকে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিলেন। বিদায়কালে তিনি গোপীনাথ পন্তকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন যে, “শিবাজীকে নানা প্রকারে মায়ী মমতা লোভ ও বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জাওলীর বাহিরে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবে; এবং তাহাকে বলিবে যে, ‘আপনার পিতা শাহাজী ও আমি (খাঁ) এক পাদসাহের অধীনে চাকরি করি, বলিয়া, তাহার সহিত আমার (আফজল খাঁর) বহুদিন হইতে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব আছে। সুতরাং আপনি (শিবাজী) আমার পর নহেন। আপনার পিতা স্বীয় অসাধারণ বীরত্ব, প্রভুত্ব ও দেশ-বিজয় সাধনাতে পাতলাহকে অতিশয় সন্তুষ্ট কবিয়াছেন। আপনিও আপনার পিতার জায় সাহসী ও সমবকুল। আপনি আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়া সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, ইহা ভাল নহে। সুলতান আপনার নিকট অনেক প্রত্যাশা করেন। সুলতান আপনার পিতাকে এতদিন পালন করিয়াছেন। আপনি তাহার পুত্র; এখন আপনাকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার জায় সাহসী বীরপুত্রের দ্বারা মহৎ কার্যসমূহ সম্পন্ন করিয়া লয়েন, পাদসাহের ইহাই ইচ্ছা। আপনি পাদসাহের বিরুদ্ধাচরণ পরি-
ত্যাগ পূর্বক আপনার পিতার জায় তাহার অধীনে থাকিয়া, তাহার রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানের জন্য চেষ্টা করুন; সুলতান আপনাকে স্বীয় সচিবের পদে নিযুক্ত করিয়া আপনার সম্মান বর্দ্ধন করিবেন। আপনার পিতা এক জন উচ্চপদস্থ মনসবদার। আপনি বিদ্রোহিতা পরিভ্যাগ করিলে সুলতান সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ক্ষমা করিবেন; এবং কঙ্কণ প্রদেশ ও অপর জাই-

তাহার প্রিয়কর্মচারী শাহাজীর পুত্রকে সত্ৰপদেশ প্রদান দ্বারা সুপ্রাণে
 জানদান করিবার জন্য সুলতান আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়া
 ছেন। আপনি বিদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া সুরলভাবে আমার সহিত
 সাক্ষাৎ করুন, আমি বাদসাহের নিকট আপনার বীরত্বের প্রশংসা করিয়া
 আপনার অধিকৃত গড়, কোট, কিল্লা প্রভৃতি সমস্তই বাহাতে আপনার
 অধীনে থাকে, তাহা করিয়া দিব। শাহাজীর পুত্রকে আমি স্বীয় লাভপুত্র
 বলিয়া মনে করি। বাহাতে সুলতানের সহিত তাঁহার বিরোধ নিরুত্ত হয়,
 তাহা করাই আমার অঙ্গিপ্রোক্ত (১)। সুলতানের সহিত যদি আপনার
 সাক্ষাৎ করিতে সাহস না হয়, তাহা হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না
 করিলেও চলিতে পারে। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই সমস্ত কার্য সিদ্ধ
 হইবে। অপরদিকে ইচ্ছামত সদ্দি বাহাতে স্থাপিত হয়, আমি তাহা করিব।
 বরুণ আপনার বিশ্বাস দ্বয়ে, মৈত্র্য করিবা দিতে প্রস্তুত আছি।' এইরূপ
 নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া শিবাজীকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
 প্রণোদিত করিবে। তিনি যদি আমার শিরিরে আগমন করিতে সন্মত হইয়া
 করেন, তবে—ইহা হইতে জানাইবে যে, আমি তাঁহার শিরিবে গিয়া
 তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছি। (২) যদি তুমি কোনও কারণে
 বাক্য কৌশলে প্রলুব্ধ করিয়া শিবাজীকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সন্মত
 করিতে পার, তাহা হইলে, সুলতানের নিকট তোমার কার্যের প্রশংসা
 করিয়া, তোমার পদোন্নতি করিয়া দিব। (৩)—এইরূপ উপদেশ প্রদান, পুরস্কার
 ও পদোন্নতির প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক আফজলখাঁ গোপীনাথ পস্তকে
 শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিলেন। শিবাজী সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় বখর-সমূহ—
 গ্রাউন্ডস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর শত্রুপক্ষীয় ইতিহাসলেখক-
 গণের কথার অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, (সমুদ্রবন্ধে কর্ণাটের
 সভাবনা না দেখিয়া) শিবাজী কৌশলে আফজল খাঁকে দমন করিবার জন্য

(১)—গ্রাউন্ডস সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে, আফজল খাঁর দূত শিবাজীকে গিয়া
 বলিল—“That the Khan (his master) and Shahjee were intimate friends,
 that the Khan bore no enmity towards his son, but on the contrary would
 move his desire to assist him by interceding for pardon, and even endeavouring
 to get him confirmed as jahagirdar in part of the territory he had
 usurped”—pp. 14

(২)—মহলার বাক্য বিটলীস, কুলাজী অনন্ত সভাসব, চিত্রগুপ্ত, শিবদিক্ষিত্য ও সারদা
 সাম্রাজ্যের বখর।

অবনতি-সূচক বিনয়গর্ভ পত্রাদি প্রেরণ দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১) কিন্তু শত্রুপক্ষীয় ইতিহাসলেখকগণের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিবার উপযুক্ত কোনও কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। প্রকৃতপক্ষে, মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণ যে বলিয়াছেন যে, শিবাজী আফজল খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং আফজল খাঁই প্রথমতঃ কণ্ঠত্যাগ পূর্বক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তাহা আমাদের নিকট সমধিক সন্দেহজনক বোধ হইতেছে। কারণ, শিবাজীর কর্মচারী কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদের লিখিত বিবরণ হইতে আমবা অবগত হইতেছি যে,—

১ম।—এ সময় শিবাজীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২০ সহস্র ছিল। আফজল, দ্বাদশ সহস্র মাত্র সৈন্য সহ তাঁহার বিপক্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

২য়।—শিবাজী জাওলীর জায়গার প্রদেশের মধ্যবর্তী প্রতাপগড়ের জায়গায় গিরিদুর্গে আসিয়া থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন হির করিয়াছিলেন, গাফিলত ও—এ কথা স্বীকার করেন। সুতরাং যুদ্ধে বিজয় লাভ করিবার তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। একপ অবস্থায় তিনি যে সহসা ভীত হইয়া সশ্রদ্ধ যুদ্ধে পারিতোষিত আফজল খাঁকে দমন করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন, ইহা আমাদের সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

৩য়।—শিবাজীর কর্মচারিগণ তাঁহাকে সন্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। কারণ, আফজল খাঁ শিবাজীকে দ্রোহী ভাৱে দেখিয়া বিপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিল, প্রথমতঃ বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়া পরে তাঁহাকেও সেইরূপে হত্যা করিতে পারে, এই আশঙ্কা শিবাজীর মনে স্বেচ্ছায় উদ্ভূত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া সগর্বে সর্বসমক্ষে প্রতীক্ষা করিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাসঘাতকতা বাহার চির অভ্যাস, তাহাকে কোশলে প্রস্তুত কবিয়া হত্যা করিতে যাইলে কৃতকার্য কত দূর হইবার সম্ভাবনা, তাহা শিবাজীর জায়গায় সচচর ব্যক্তির অগোচর ছিল না। যে দংশনোত্তর ক্ষুদ্র ভুলকে বধ করাই অভিপ্রেত ও বাহাকে সহজেই বাষ্টি প্রহারে নিহত করা যাইতে পারে, তাহাকে প্রথমে কোশলে হত্যা করিয়া পরে বিনাশ করিব; কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন? সুতরাং তিনি আফজল খাঁকে সশ্রদ্ধ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সম্ভাবনা সত্ত্বেও যে আফজল খাঁর নিকট অবনতি স্বীকারের ভাণ করিয়া সেই ভ্রাতৃহত্যা বিশ্বাসঘাতকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাব করিবেন, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না।

এই সকল কারণে, কৃষ্ণাজী অনন্ত-সভাসদ ও অপরাধের বখরকারগণ বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শনের কোন কারণ দেখা যায় না।

(১) এই বিবরণ যে মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত,—শিবাজীর সমসাময়িক ও ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থিত ইতিহাসলেখক—কানি খাঁর রচনায় তাহা প্রমাণ আছে।

পক্ষান্তরে আফ জল খাঁর পক্ষে সন্ধির প্রস্তাবসহ প্রথমতঃ শিবাজীর নিকট দূত-প্রেরণ পূর্ব-সম্ভব ও স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। কারণ,—

১ম।—আফ জল খাঁ একজন অতিউচ্চপদস্থ অহঙ্কারী সেনানায়ক ছিলেন। বিজয়পুরের একটি অট্টালিকার-গায়ে একটি প্রস্তরলিপি সংযোজিত আছে। উহাতে লিখিত আছে যে,—“অত্যন্ত ভাগ্যশালী, দাক্ষিণাত্যেব-সর্দারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ও মিথ্যা বশের উচ্ছেদকারী বর্তমান সেনাধিপতি আফ জল খাঁ মহম্মদসাহী কর্তৃক ইহা (১৬৫২ খ্রঃ)-নির্মিত।” এতাবত আফ জল খাঁ কিরূপ বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমের। তিনি কিরূপ অহঙ্কারী ছিলেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত-হইয়াছে। এইরূপ একজন উচ্চ-অতি-বিখ্যাত সেনাপতি “স্বতঃপ্রসূত-হইয়া”-সর্বসমক্ষে সগর্বে প্রতি-করিয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই শিবাজীকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া সিংহাসনতলে নিষ্কিপ্ত করিবেন। সুতরাং এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত তিনি যে-উৎকর্ষিত প্রকাশ-করিবেন, তাহা সম্ভব নহে। ভদ্রাভীত রাজবিদ্ভোহী শিবাজীকে ধৃত করিয়া দিতে বা বিনাশ করিতে পারিলে, তিনি তদধিকৃত প্রদেশের স্বত্বদারী প্রাপ্ত-হইবেন, এই-দুরাশাও তাঁহাকে এই-প্রতিজ্ঞাপালনে বিশেষ উৎসাহিত-করিয়াছিল।

২য়।—যুদ্ধের দ্বারা আফ জল খাঁর প্রতিজ্ঞা সহসা পূর্ণ-হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিলনা। কারণ জাওলীর দ্বার দুর্গম-প্রদেশে সৈন্ত-সামগ্র্য লইয়া যাও-মাহিত হুসর। যদি বা কোনওরূপে তাহা অসম্পন্ন হয়, তথাপি প্রতাপগড়ের দ্বার দুর্গ দুর্গের আশ্রয়ে অবস্থিত শিবাজীর ২০ সহস্র-সৈন্তের সহিত যুদ্ধে-অগ্রসর-সম্ভাবনা-তাঁহার অতি অল্প ছিল। আফ জল খাঁর ক্ষয়-হইলেও-হইতে পারিত, স্বীকার-কবিয়া লইলেও, শিবাজীর দ্বার অখারোহণগঠি তেজস্বী-রাজ্যিকে ধৃত-করা সহজ-ব্যাপার নহে, তাহা আফ জল খাঁ জানিতেন। কিন্তু শিবাজীকে জীবিত-অবস্থায়-ধৃত করিতে না-পারিলে, আফ জল খাঁর প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ হয় কিরূপে? কাজেই কৌশল-অবলম্বন ভিন্ন জাফ জল খাঁর স্বীয়-প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ-করিবারি অন্য উপায় ছিল না।

৩য়।—২০ সহস্র সৈন্তগহ-শিবাজী-প্রতাপগড়ের দুর্গ-দুর্গে আশ্রয়-লইয়া-ছেন। ২২ সহস্র সৈন্তগহ সেই দুর্গ আক্রমণ করিয়া শিবাজীকে পরাজিত-করা-কিছুতেই সম্ভব নহে। এইরূপ অবস্থায়-প্রলোভনের-দ্বারা শিবাজীকে-প্রতাপ-গড়ের বাহিরে আনয়ন-করিবার হুরভিসন্ধি আফ জল খাঁর মনে উদ্ভিত-হওয়া, নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্গ-দুর্গে বহু-সৈন্তগহ-অবস্থিত-করিয়াও শিবাজী-ছেন আফ জল খাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবেন, তাহার কারণ-বুঝিতে-পারা যায় না। অতএব মহারাষ্ট্র-বখরকারগণ যে বলিয়াছেন যে, আফ জল খাঁর মনে কপটতা ছিল ও তিনি কৌশল-পূর্বক শিবাজীকে-প্রতাপ-গড়ের বাহিরে আনয়নের জন্ত তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার অভিলাষ প্রকাশ-করিয়া প্রথমতঃ শিবাজীর নিকট দূত-প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা অসম্ভব-মনে করিবার কোনও-কাবণ-দৃষ্ট-হইতেছে না।

৪র্থঃ—আফজল খাঁ অতিশয় প্রকাণ্ডকার মহাবলসম্পন্ন ছিলেন। পক্ষান্তরে, শিবাজীর আকৃতি খর্ব ছিল এবং অসুস্বাকৃতি আফজল খাঁর ছায়ার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপযুক্ত শারীরিক বলও তাঁহার ছিল না। (এ কথা গ্রাণ্ট ডক্‌ও স্বীকার করেন।) এ কথা আফজল খাঁর অবিদিত ছিল না। সুতরাং আফজল খাঁর মনে এইরূপ একটা ইরতিসাক্ষ উদ্ভিত ওয়া অসম্ভব নহে, যে কোন প্রকারে একবার শিবাজীর সহিত নির্জনে কাণ্ড করিতে পারিলে তিনি তাহাকে সহজেই কুক্ষিতলগত করিতে যাবেন।

এই সকল কারণে, আফজল খাঁর মনেই কপটতা ছিল, ইহাই অধিকতর স্পষ্ট মনে হয়। এইরূপ কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সে সময়কার বিজ্ঞাপন দরবারের অনেক উমবাহ স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনাশ করিয়া স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং আফজল খাঁও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুজীকে নিহত করিয়াছিলেন। অতএব, শিবাজী ও আফজল খাঁর সৈন্তসংখ্যার তারতম্য, শিবাজীর জ্যাণ্ডীর ভ্রাতৃ-হর্গম প্রদেশে অবস্থিতি ও আফজল খাঁর সৈন্ত সহ-তথায় গমনের অসুবিধা, ভিতরের শারীরিক গঠন ও বলাবল, আফজল খাঁর অহঙ্কৃত স্বভাব, তৎকৃত ঘোর প্রতিজ্ঞা এবং তাহা পূর্ণ হইবার অন্তরায়, স্থলতানের প্রদত্ত প্রলোভন, আফজলের পূর্বচরিত্র এবং সে কালের উমরাহগণের বিশ্বাসঘাতকতা (১) প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করিলে, আফজল খাঁর চিন্তে যে কপটতা ছিল না, তিনি যে নিতান্ত সরলভাবে ছায় যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই বিবান করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই সকল কথা সম্পূর্ণ বিচার না করিয়াই গ্রাণ্ট ডক্‌ সাহেব আফজল খাঁকে নির্দোষী ও শিবাজীকে কপটচারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অপর একজন সুদৃশী ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে মুসলমান ও মহারাজীয় ইতিবৃত্ত-লেখকগণের উক্তির ধীরভাবে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, আফজল খাঁই প্রথমতঃ *Sent his secretary with offers of 'pardon and promises of promotion and also to arrange necessary steps for an interview. See Warings' History of the Deccan pp. 67/8.*

আফজল খাঁর অভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এইখানে করিলাম। ইহার পর শিবাজী আফজল খাঁর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, শিবাজী ও আফজল খাঁর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎকালে যুদ্ধের মধ্যে কে অগ্রে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক অজ্ঞচালনা করিয়াছিলেন, তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আলোচ্য।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউসরা

(১) অধিক কি, স্বয়ং শিবাজীর পিতা শাহাজী ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে স্থলতানের আদেশে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা বৃত্ত হইয়াছিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

মাধনা। প্রাণ। প্রথমই প্রাকৃতিক সত্য "ভক্ত্যাব আদর্শ" প্রতিষ্ঠিত করিয়া চেষ্টা আছে। পরিচ্ছদের প্রকারভেদের সঙ্গে ভক্ত্যাব সঞ্চয় স্থাপন করিয়া ব্যোম বলিতেছেন যে—
 "সুন্দর-মালী যখন গায়ের কোঁঠা খুলিয়া হাতেব আখির গুটাইবা বাগানের কাজ করে, তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিভাবংগীয়া প্রভুমহিলাব লজ্জা পাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আঁরা যখন কোন কাজ নাই কর্তৃ নাই, দীর্ঘ দিন বাজপথপার্থে সিজের গৃহস্থে আসে—মূল-বর্জ ল উদর উদ্ভাটিত কিনিয়া হাঁটুর উপর কাপড় গুটাইবা নিরোঁধর মত তামাক টানি, তখন বিশ্বজগতের সম্মুখে কোন মহৎ বৈরাগ্যের কোন উন্নত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া এই কুপ্রবর্তন প্রকাশ করিয়া থাকি।" হয় ত অনেকের মতে "ভক্ত্যাব" অল্প আদর্শও আছে—ব্যাপ্তনের বাহিরে তাহার রাজ্য—কেবল দেশবিশেষের পনিচ্ছদবিশেষেই ভক্ত্যাব বসতি নহে—আহৃত বা নগ্ন, সর্ববিধ জন্মেই তাহা থাকিতে পারে—শোভনতার অভাবকে "ভক্ত্যাব" বলিতে সকল সামাজিক সম্মত হইবেন—কিনা, বলি যায় না। যে ইংরেজ মালী গায়ের কোঁঠা খুলিয়া জামাব আখির গুটাইবা কাজ করে, তাহাকে দেখিয়া তাহাব অভিভাবংগীয়া প্রভুমহিলাব লজ্জা হয় না"—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে, অসভ্য আশ্রয়স্থানেব মুসলমান বাজকুমার, সেই মালীব দেশে, তাহার প্রভুমহিলা বা তদপেক্ষা অভিভাবংগীয়াদের অনাবৃত-বক্ষ দেখিয়া বলকুমের একপার্শ্বে সমুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একদা উক্ত পক্ষের কাহাকেও অশ্রদ্ধ বলিতে গেলে, দু দলের এতিই অশ্রদ্ধ করিতে হয়। পরিচ্ছদ ভিন্নও ভক্ত্যাব অল্প চিত্র ও অল্প আদর্শ আছে, তুচ্ছ বিষয় উপলব্ধ করিয়া শ্রেণীভেদ না করিলেও দুনিয়া শ্রিতান্ত অল্প হইয়া পড়িব না—প্রাকৃতিক সত্যের কোনও সত্য ব্যোমকে এই বলিয়া অনায়াসে আশ্রয় কবিত্তে পারিতেন। "সেয়েগী ব্রত প্রবন্ধে এবাব 'রঙ্গমন্দির' বা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের' বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "ক্ষুধিত পাখী" একটি অতি চমৎকার-হৃদয়িত নয়—একবার পড়িতে আরম্ভ কবিলে শেষ না করিয়া ছাড়ি যাওয়া নাই। এই গল্পের রচনাপ্রণালী যেমন হৃদয়, ইহার কল্পনাকোশলও তেমনই মনোহর। বর্ণনা যেমন বাস্তবিক, তেমনই কবিত্বপূর্ণ। গল্পটিতে পাঠকের অগ্রহ আদ্যন্ত-প্রাণবিত্ত থাকে—এবং নিঃশেষে পাঠ করিয়াও কৌতুহলপিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এই গল্পের সেই সারসম্বল সেই তরুণী ইবাণী, সেই অরালী পর্কভের শিখরে ঘনসন্ধ্যা প্রভৃতি কবিত্ব-অতি হৃদয়-সৃষ্টি-সত্য সত্যই যেন আরব্য উপস্তাসের স্বপ্ন। "শীতে ও বসন্তে" কবিতাটির আমরা রসগ্রহ কবিত্তে পারি নাই। "ব্যাকরণ ভুলনা" একটি সাবগর্ত প্রবন্ধ—অংশীলনের যোগ্য। "লক্ষীমাই" এখনও চলিতেছে। "পল্লীগানের বথবাজ" বেগ হইয়াছে। এবারকার "আলোচনার" "প্রাচী ও প্রতীচী" শীর্ষক আলোচ্যটি পাঠযোগ্য, "সত্যতার আদর্শ" এসঙ্গে আমরা যাই বলিয়াছি, ইহাব বক্তব্যও তাহাই।

ভারতী। প্রাণ। প্রথমে শ্রীযুক্ত কানাইলায় ঘোষালের "বঙ্গদেশে কাজকুমারী" লাম্বা। "নারীর প্রতিদান" ভারতীর অন্ততর সম্পাদিকা শ্রীমতীসবলা দেবীর একটি কবিতা—
 "সংযুক্তা"—একটি ঐতিহাসিক কথা। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "প্রত্যাভর্জন" দেখিয়া আর আশঙ্ক হইরাছি। এবার লবণকারী হুহু-হিন্দিল হইতে কিরিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিলাল রায়ের "সমুদ্রের প্রতি" ইতিশীর্ষক রহস্তময় কবিতাটি পড়িয়া আঁরা-আনন্দিত হইয়া লেখক অবাচনে বহুভেদ-প্রতিষ্ঠা করিয়া বিসর্জনব নন্দন কবিতাব সত্য হৃদয় বহুভেদ প্রাহন করিয়াছেন। ইহার শেষভাগও মন্দ হয় নাই, কিন্তু রহস্তেব সঙ্গে শেষটা সম্পূর্ণ ঋণীয় নয় নাই। এক বাজার "স্বধক-ফল" ভাল দেখায় না, এই বাস্তব কবিতার উপসংহারে প্রকৃত-ভাবের নিকশ চেষ্টা অপেক্ষা; তরল বহুভেদ পূর্ণ পরিপতিই অধিক বাস্তবিক হই মনে করি। "নীতি ও সাহিত্য" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। কিন্তু প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হ—
 তিনি একজন লেখক। ইনি যথেষ্ট দক্ষতার সহিত নিজ মতের সমর্থন ও প্রতিপক্ষীর মতে প্রণয়ন করিয়াছেন। "মহর সিংহাসনের" ইতিহাসটর স্তম্ভগায়ী।

বিজয়া বাটিকা।

জ্বরাদির একমাত্র মহৌষধ।

এক লক্ষ লোক সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, জ্বর, ম্যালেরিয়া, রোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ ভারতে এতদধিকৃত হয় নাই। আজ রাজ্যেশ্বর রাজার অষ্টালিকার এবং দরিদ্রের, বিজয়া বাটিকা সমুদ্রারে বর্তমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই বিজয়া বাটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজ-বিজয়া বাটিকা পরম প্রিয় বস্তু। বহু ইংরেজ-পুরুষ এবং ইংরেজ-স্ত্রী বাটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিজয়া বাটিকার এক আশ্চর্য গুণ এই যে, ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

১. ঝাঁহার অন্তর্ভাবের উপক্রম হইয়াছে, ঝাঁহার তমু জ্বালা, হাত-পা জ্বালা তছে, ঝাঁহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, বা কোমর কানড়াইতেছে; ঝাঁহার ঘর না, ঝাঁহার কোঠ খোলসা হয় না, ঝাঁহার কাসি-সর্দি হইয়াছে, —এই বিজয়া বাটিকা সেবন আরম্ভ করুন, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর ভুগিতে হইবে বিজয়া বাটিকার শক্তি প্রকৃতই মনুষ্যজীবনে অদ্বিতীয়।

সম্মিলিত আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যিনি জ্বর-ম্যালেরিয়া-রোগে ভুগিতেছেন, হাত-পা পায়স্বা সুলিষ্টাছে, ২৪ ঘণ্টাই ঝাঁহার নাড়াতে জ্বর আছে, —তার কবিরাজ ঝাঁহাকে জবাব দিয়াছেন, —এমন বোগীও বিজয়া বাটিকা সহজে আরাম হইতেছেন, —ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া, রোগীর শ্রদ্ধা-মুগ্ধ হইতেছেন। কম্পজ্বর, পালুজ্বর, আঁধানের কালজ্বর, বসন্ত-পূর্ণিমার জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, সর্বপ্রকার রোগই ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।

বিজয়া বাটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাকহাশুল	প্যাকিং
১নং কোটা	১৮	১১০/০	১০	০/০
২নং কোটা	৩৬	১২০/০	১০	০/০
৩নং কোটা	৫৪	১৪০/০	১০	০/০
বিশেষ বৃহৎ	১৪৪	৪১০	১০	০/০

বিজয়া বাটিকা প্রাপ্তি-স্থান।

দিল্লি—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি-স্থান বেড়গাম, পোষ্ট সাদিপুর্ন, —
কলিকাতা—বঙ্গবিহারী শ্রীধর জে, সি, বঙ্গের নিকট প্রাপ্তব্য, অথবা—
আবিধান রোড, পটলভাঙ্গা : কলিকাতা—ভারতে একমাত্র এজেন্ট—

এইচ. বসু এসেন্স ও পুস্পসার



এসেন্স চামেলী

এসেন্স মতিয়া

এসেন্স দেলখোম

এসেন্স হোয়াইট রোজ

এসেন্স কুমুদিনী

এসেন্স মিল কুমুদ

সমস্ত প্রস্তুত নানাবিধ সুবাসিত পুস্প হইতে অভিনব উপায়ে সার
করিয়া, উল্লিখিত এসেন্সগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। মিশ্র এবং ননোবর
বিলাত হইতে আমদানী অধিক মূল্যের এসেন্স অপেক্ষা এগুলি
অংশে নিকট নহে। অধিকন্তু এই সকল এসেন্সের সৌরভ অপ্রকৃতরূপে
অন্য এবং বিলাতি এসেন্স অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী। সুগন্ধি-প্রিয় না হই
গণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বিলাতি এসেন্স কেবল
হার করিবেন, ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। ঐক-দিন
এসেন্সের গন্ধ, সুদৃশ্য কাচের ছিপিযুক্ত চতুর্কোণ এক আউন্স পিচি
বিক্রয় হয়।

মূল্য প্রতিশিপি ১১ এক টাকা মাত্র।

এইচ. বসু,

ম্যাকুলকটারীং পারফিউমার
৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা